বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসুকুমার সেন

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রকাশিকা
শ্রীশেফালিকা রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৯
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৮
চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৬

মূল্য ঃ আঠারো টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

আচার্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েষু

পূর্বের সংস্করণে কোন কোন আলোচনায়—যেমন শেষের কোন কোন কাব্যগ্রন্থের বিচারে—কিছু কিছু ফাঁক ছিল সেগুলি সারিয়া দিয়াছি। কোন কোন বিষয়ের আলোচনা পূর্ণতর করিয়াছি।

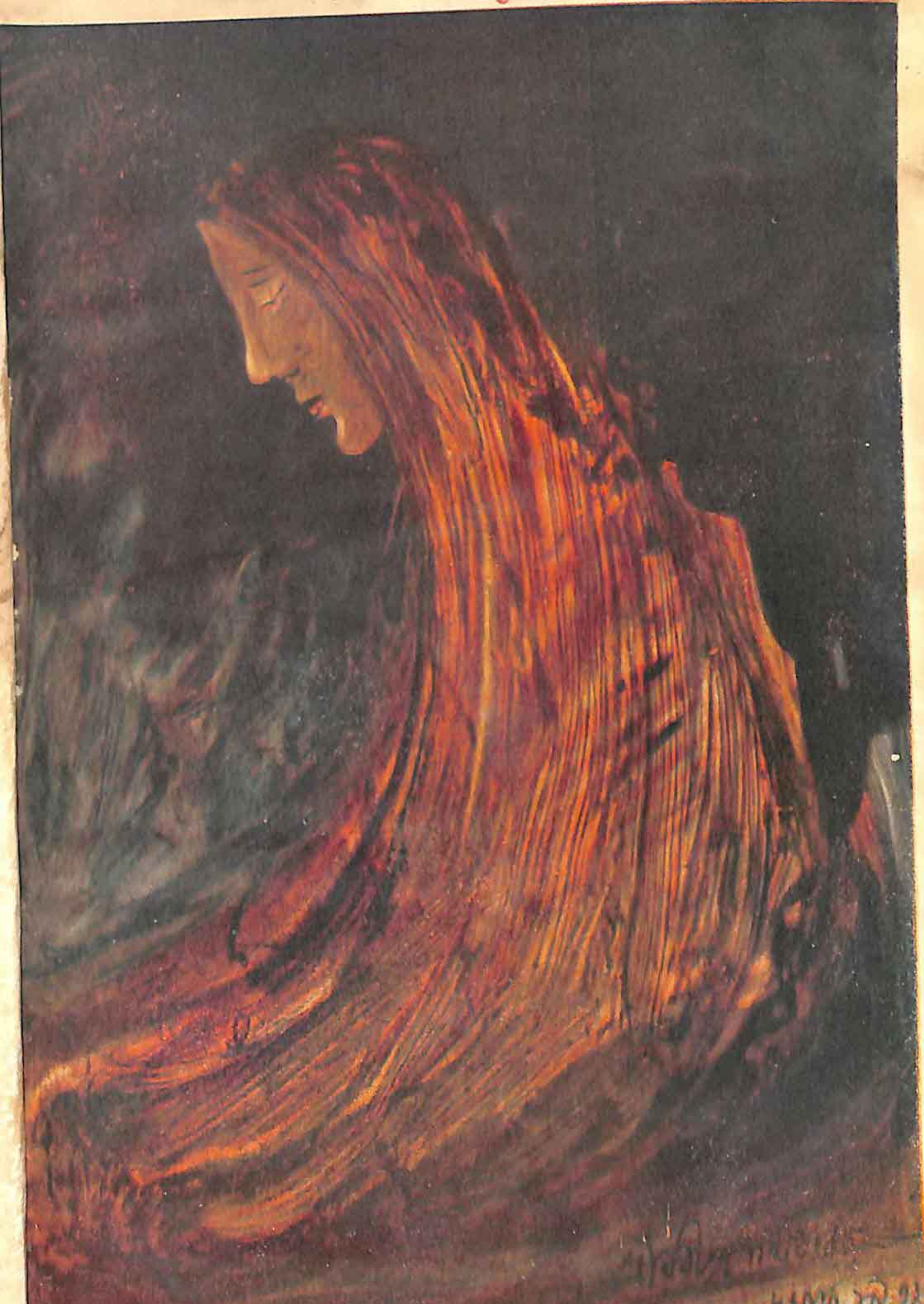
অনবধানবশত ত্রয়োদশের পর হইতে ষড়্‌বিংশ পর্যন্ত পরিচ্ছেদের সংখ্যায় ভুল রহিয়া গিয়াছে। সূচীপত্রে তাহা সংশোধিত হইয়াছে। মুদ্রণাশুদ্ধির মধ্যে একটি গুরুতর। ৩৩২ পৃষ্ঠায় 'সমস্যাপূরণ' ছাপা হইয়াছে 'সমস্যাপূর্ণ'।

শ্রীসুকুমার সেন

সূচী

চিত্রসূচী

মানচিত্রসূচী



একাকিনী—
('বিচিত্রিতা')

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

"কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত"

১

চিত্তগহনের বিবিধ প্রযতির সৃষ্টিশীল ধারায় যে বিচিত্র রচনা অভিব্যক্ত হয় তাহাতে কবির মনস্বিতার ও ব্যক্তিত্বের অনুক্রমিক পরিচয় সাধারণতঃ দুর্লক্ষ্য, কিন্তু সর্বদা অপ্রাপ্য নয়। অবশ্য একথা খাটে তাঁহাদেরই পক্ষে যাঁহারা নূতনের স্রষ্টা, "আদিকর্মিক"। অর্থাৎ যাঁহাদের রচনা সাহিত্যের শিল্পের মনোহারী পণ্য সরবরাহ করে না, যাঁহারা নিত্যনূতন সৃষ্টি করিতে করিতে নিজেকে ভরাইতে ভরাইতে অগ্রসর হন। তাঁহারা বিশ্বস্রষ্টার নবকর্মিকরূপে স্বকীয় উপলব্ধির ও হৃদয়াংশের সংযোগের নবনব রসায়নে জীবনকে ও জগৎকে উজ্জ্বলতর ও বিচিত্রতর করিয়া দিয়া বাহিরের ও অন্তরের পরিচিত পুরাতন সৃষ্টিকে বারে বারে নবীন করিয়া দিয়া যান। বিশ্বসৃষ্টির নবকর্মে সহযোগী এমন কবি বাঙ্গালা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে একজনই আবির্ভূত হইয়াছেন,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮, মৃত্যু ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮)। শুধু বাঙ্গালার কবি বলিলে অল্পই বলা হয়। একটি আধুনিক প্রান্তীয় ভাষায় লিখিলেও রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি, যেহেতু সমগ্র দেশের সর্বকালের সৎ ও আনন্দ চিন্তা ইহার বাণীতে মিশিয়া আছে। তবুও সবটুকু বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কবি, ঋগ্বেদের ভাষায় তিনি "কবীনাং কবিতমঃ"। রবীন্দ্রনাথের মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে দুঃখে-সুখে জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান্ জীবনভাবক কবি ইতিহাসে আর দেখা দেয় নাই। শিল্পনৈপুণ্যে, সৃষ্টি-উৎকর্ষে এবং কর্ম-চিন্তা-আনন্দ-নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কাহারও নাম মনে করিতে পারি না। পূর্বজ কবি-শিল্পীদের মধ্যে তিনজন কথঞ্চিৎ তুলনীয়—গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেস, ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাস। অতিশায়িত উচ্ছ্বাসের মতো শোনাইলেও

একথা বলিব যে ঋগ্‌বেদের কবিদের কাছে বৃত্রহন্তম ইন্দ্র যেমন প্রতিভাত ছিল বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তেমনি।

ন হী নু অস্য প্রতিমানমস্তি
অন্তর্জাতেষু উত যে জনিত্বাঃ

'নাই কিছুতেই ইঁহার সমকক্ষ তাহাদের মধ্যে যাহারা জন্মিয়াছে অথবা জন্মিবে।'

২

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ও শিল্পের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে তাঁহার কবিধাতুর পরিচয় নেওয়া আবশ্যক।

সব মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথেরও বিশিষ্ট প্রকৃতি যে কোন্ পথে ধাইবে তাহা শিশুকালের অবস্থাগতিকে নির্ধারিত হইয়াছিল। বড়ঘরের ছোটছেলে তিনি শৈশবে নারীলালন-সৌভাগ্য হইতে অনেকটা বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার শিশুকাল কাটিয়াছিল সদর-অন্দর সীমার বাহিরে, চাকর মহলে দ্বিতলের এক গৃহকোণে ভৃত্যশাসনের গণ্ডী-ঘেরায়। বহুসন্তানবতী কুলপালিকা মাতার স্নেহদৃষ্টি সুলভ ছিল না। জ্যেষ্ঠরা স্বভাবতই থাকিতেন তফাতে, নিজেদের নিজেদের বৈঠক-খানায় খেয়াল-খুশির কাজে আসর জমাইয়া। ছোট ছেলেদের বাড়ীর সদর দরজা ডিঙ্গাইবার হুকুম ছিল না। প্রথম পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল চণ্ডীমণ্ডপে বাড়ীর পাঠশালায়। বছর দুয়েকের বড় দুই সঙ্গীর, অব্যবহিত অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের, দেখাদেখি রবীন্দ্রনাথ জেদ করিয়া নিতান্ত কচি বয়সেই স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শিশুর অরুচিকর হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত আগায় নাই। ঘরের খাঁচা শিশুর মনকে বাঁধিয়া রাখিত না, কিন্তু ইস্কুলের খাঁচা মনকে যেন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। তাহার উপর কোন কোন শিক্ষকের নিষ্ঠুর বচনে এবং সহপাঠীদের নিকৃষ্ট সাহচর্যে কথাবার্তায় ও আচরণে গৃহকোণলালিত সুদর্শন বালকের শুচি রুচি ও কোমল মন ক্লিষ্ট হইত। তাহার ফলে খুব বালককালেই রবীন্দ্রনাথের চিত্ত সমধিক স্পর্শ-কাতর এবং হৃদয় অতিরিক্ত আত্মগত হইতে থাকে। তাঁহার এই সঙ্কোচ-পরায়ণতা কখনো ঘোচে নাই। পরবর্তীকালে ইহা তাঁহার অসামান্য সৌজন্য-বোধ ও ভদ্র আচরণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়া তাঁহাকে সর্বদা আশেপাশের নীচতা ও হীনতা হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ইহাই ছিল যেন তাঁহার সহজাত কবচ। (তবে ইহার দামও তাঁহাকে জীবন ধরিয়া শোধ করিতে হইয়াছে।

তাঁহার নিজের দেশে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অহঙ্কার-আভিজাত্যের মিথ্যা দায় বহন করিয়াছিলেন।) বিদ্যালয়ের সুড়ঙ্গপথে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালাভ না হওয়ায় আমাদের লাভ হইয়াছে অপরিমিত। ইস্কুলের ছেলেদের সাহচর্য দুঃসহ না হইলে, ইস্কুলের কারাকক্ষ ও পরীক্ষার কাঠগড়া ভীতিপ্রদ না ঠেকিলে রবীন্দ্রনাথ হয়ত আর পাঁচজন ছেলের মতোই পরীক্ষার পর পরীক্ষায় পাস করিয়া অবশেষে হাইকোর্টে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। তাহাতে আত্মীয়স্বজন-অভিভাবকেরা অনেক দুশ্চিন্তা এড়াইতে পারিতেন, কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি সে কবি-শিল্পী-মনীষীকে যে পূর্ণমহিমায় পাইতাম না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

তবে অল্পকালের হইলেও রবীন্দ্রনাথের খণ্ড ছিন্ন ঘনঘন-বদলানো ইস্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা সবই ব্যর্থ নয়। দুই একজন শিক্ষক কবিতারচনায় উৎসাহ দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অঙ্কুর-উদ্ভেদে ছায়াবিস্তার ও স্নেহসেক করিয়াছিলেন। আবার দুই একজন শিক্ষক বালকের শিক্ষার অথবা কবিতা রচনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন থাকিয়াও তাহার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিলেন। এমনি একজন অধ্যাপক ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার প্রশান্ত পুণ্য ছবি জীবনস্মৃতিতে স্বল্প রেখায় সমুজ্জল।

তখনকার সাধারণ ভদ্রঘরের অল্পবয়সী ছেলেরা ঘরে-বাহিরে যে স্বাধীনতা পাইয়া বয়স্য সহপাঠীদের সঙ্গসুখে চিত্তবিনোদনের ও আত্মবিকাশের সুযোগ পাইত তাহা হইতে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিলেন। তদুপরি লাজুক ও মুখচোরা বলিয়া উপযাচক হইয়া কাহারো সহিত হৃদ্যতা স্থাপন তাঁহার অসাধ্য ছিল। এইভাবে বাল্যের স্বাভাবিক চিত্তপ্রসার ঘটিতে পারে নাই বলিয়া নিরাবরণ উদ্দাম ক্রীড়ারত শিশুর ছবি চিরকাল রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিয়াছে। ("মন কাঁদ্‌চে, মর্‌বার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আরেকবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে।")

ভৃত্যশাসনের গণ্ডীবদ্ধ দ্বিতল গৃহকোণের সঙ্কীর্ণ বাতায়ন দিয়া বহিঃপ্রকৃতির যেটুকু অংশ শিশুর নয়নগোচর হইত,—যেমন বাহির-বাগানে পুকুরের একধারে কোণে ঝুরি-নামা চীনা বটগাছ, পুকুরের জলে পাতিহাঁসের সাঁতার আর প্রতিবেশীদের নিত্যনিয়মিত স্নানকৃত্য, আকাশপ্রাঙ্গণে মেঘের খেলা, মাটির বুকে ছায়া-রৌদ্রের লুকোচুরি, ঝড়ের দিনে গাছপালার উন্মত্ততা, বর্ষার দিনে পথেঘাটে জলপ্লাবন,—এইসব নিবিষ্টভাবে দেখিয়া শুনিয়া ও সেই দেখাশোনায়

নিমজ্জিত শিশুকল্পনা বিচিত্রভাবে খেলাইয়া রবীন্দ্রনাথের শৈশবের নিঃসঙ্গ দিনগুলি গড়াইয়া যাইত। সন্ধ্যায় ভৃত্যদের কাছে রামায়ণ আর রাত্রে দাসীদের কাছে রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়া শুনিয়া তাঁহার শিশুমনের নিরুদ্দেশ ভাবনা যেন কল্পনায় ছায়ামূর্তি পাইত। তরুপল্লবের আকম্পনে মর্মরিত, শ্রাবণধারার ঝর্ঝরতানে আমন্ত্রিত, প্রথম পাঠের সেই "জল পড়ে পাতা নড়ে" ছড়ার তালে আন্দোলিত হইয়া সে অস্ফুট শিশুকল্পনা যেন আবেগের বেগ পাইত। বিশেষ করিয়া "বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান"—এই ছেলেভুলানো ছড়াছত্রটি শিশুর মর্মে যেন মেঘসন্দেশ বহন করিয়া আনিত। ("ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।") বৃদ্ধ খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের তৈয়ারি ছড়া—যাহাতে শিশু নায়কের "ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল"—শিশুকল্পনাতে বাস্তবের রঙ ধরাইত।

বাহিরে মিশিবার স্বাধীনতা না থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দিশাহারা শৈশব-চিন্তা যথেচ্ছ উধাও করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, প্রতিভার স্ফূর্তির মুখে কোন দিকে কোন বাধা অচল হইয়া দাঁড়ায় নাই। সকালসন্ধ্যায় আলোআঁধারের জোয়ারভাটা, নিঃঝুম মধ্যাহ্নে রৌদ্রের প্লাবন ও সজীব-নির্জীবের বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ (—আকাশে চিলের চীৎকার, প্রাঙ্গণে কাকের কলরব, পথে বাসনওয়ালার ঠং-ঠং ও চুড়িখেলনাওয়ালার ডাক—), আষাঢ়ের মেঘশ্যাম দিবা, শ্রাবণের ধারামুখর সন্ধ্যা, দাশুরায়ের পাঁচালীর কলগান, কৃত্তিবাসের পয়ারের একতান, ছেলেভুলানো ছড়ার আকুলতা, রূপকথার আগ্রহ,—বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির এই বিবিধ ও বিচিত্র উদ্দীপনা শিশু রবীন্দ্রনাথের মন সর্বদা সজাগ সস্পৃহ রাখিত॥

৩

নিতান্ত শিশুকালে নিজে নিজে বইপড়া কীসূত্রে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে রামায়ণ।

> চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়া আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।
>
> সেদিন মেঘলা করিয়াছে।…দিদিমা…যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেল-কাগজমণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের

> কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা ; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোন একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

তাহার পর গীতগোবিন্দ।

> একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা ; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না ; গদ্যের মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।…গদ্য রীতিতে সেই বইখানি ছাপান ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি—অহহ কলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং—এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুসি হইয়াছিলাম !

(যিনি কখনো পদটিকে ছন্দোবিভাগ করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন এ কাজ শিক্ষিত প্রবীণের পক্ষেও বড় সহজ নয়।) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> জয়দেব সম্পূর্ণ-ত বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।

জয়দেবের ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কানে ধরা পড়িয়াছিল।—এইটুকু প্রতিভা। জয়দেবের গান তিনি খাতায় কপি করিয়া লইয়াছিলেন।—এইটুকু স্বাধ্যায়। জয়দেবের ভাষা—অর্থাৎ গীতগোবিন্দ-পদাবলীর শব্দ—তাঁহার ভাষাচেতনার মধ্যে মধ্যে এমন তলাইয়া গিয়াছিল যে তাহার অভিব্যক্তি কয়েকটি বিশিষ্ট পদের ব্যবহাররূপে রবীন্দ্ররচনায় শেষপর্যন্ত দৃশ্যমান।[১] (রবীন্দ্রকাব্য-ভাষায় বারবার ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দাবলীর মধ্যে জয়দেবের পদাবলী থেকে নেওয়া

---

১ 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ডে মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই কয়েকটি শব্দ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য,—তিমির, নিভৃত, নিলয়, নিলীন, বিপুল, মেদুর, রভস, বিপিন, বিতান, তল, নিবিড়, গহন, মধুযামিনী, ইত্যাদি।[১])

জয়দেবের আগে এবং পরে কালিদাস। যদি কোন একজন কবিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগুরু বলিতে হয় তো তিনি কালিদাস। তবে জয়দেবের মতো কালিদাস শিক্ষাগুরু নন, যাহাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন "চৈত্য গুরু", তাই।

> আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বড় হইয়া যখন মেঘদূত কাব্য পড়িয়া বুঝিলেন তখন বিরহী যক্ষের বেদনা রবীন্দ্রনাথ যেন নিজের বক্ষঃস্পন্দনে অনুভব করিয়াছিলেন। আরো বড় হইয়া যখন সংসারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া তিনি বৃহৎপ্রাণের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তখন আপন অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন যেন বিশ্বহৃদয়ের বিমূঢ় বেদনা নিখিল চরাচর ব্যাপিয়া স্পন্দিত হইতেছে।

> বাহির যার নাইক ভার
> যায় না দেখা যারে
> বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর
> নিখিল আপনারে।

রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র রচনাবলীর মধ্যে বিশিষ্টতম ধারা বলিতে গেলে গান—ভাব ভাষা ও সুর মিলিয়া। তাঁহার অনেক গানের প্রেরণামূলে আছে "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ"—কালিদাসের এই ইঙ্গিতটুকু। এই সূত্রসঙ্কেতেই মানবজন্মের চিরন্তন আশানিরাশা রবীন্দ্রনাথের গানের পরম বাণীতে প্রতিধ্বনিত।

> মনে বলে তাই চাই গো,
> যারে নাহি পাই গো।

কালিদাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিতে আসিলেন বৈষ্ণব-কবি। জয়দেবের মিলনগীতি ও কালিদাসের বিরহগাথা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের

---

[১] শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত রচিত 'রবীন্দ্র-কাব্যভাষা' (১৯৬১) দ্রষ্টব্য।

পথপ্রবেশ প্রস্তুত করিয়াছিল। তখনকার বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা মেঘনাদবধ (এবং অপর দুইচারিটি কাব্য) যাহা রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যগ্রন্থরূপে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে প্রত্যাশিত আনন্দ মিলে নাই। সমসাময়িক অপর কবিদের প্রসিদ্ধ রচনা বালক রবীন্দ্রনাথ তো প্রায় গ্রাহ্যই করেন নাই। ইহার সাক্ষ্য মিলিবে তাঁহার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধে[১] এবং অন্যত্র[২]। বৈষ্ণব-পদাবলীতেই যে তিনি প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যরস পান করিয়াছিলেন তাহা জীবনস্মৃতি-পাঠকের অবিদিত নাই। তাঁহার প্রথম জীবনের রচনাতেও যথেষ্ট সমর্থন মিলিবে। মেঘদূতের বিরহী যক্ষ রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে ধ্যানগম্ভীরতার দিকে ধাবিত করিয়াছিল, বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিণী রাধা সে ভাবনায় প্রতীকতার রঙ লাগাইয়াছিল। নিখিল জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে পতৎপতত্র-বিচলিতপত্র ও মুখরিতমোহনবংশ একতান হইয়া রবীন্দ্রচেতনায় বিশ্বভুবনের সহজ আনন্দের আস্তরণ বিস্তার করিয়াছে—"পাখীর ডাকে বাঁশীর তানে কম্পিত পল্লবে"।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় সব চেয়ে বড় সঙ্কেত "বেণু" আর সব চেয়ে বড় ইঙ্গিত "বাণী"। (শব্দ দুইটি মূলে সমার্থক।[৩]) বেণু বৈষ্ণব-পদাবলীর স্মারক, বীণা মেঘদূতের॥

৪

সঙ্গীত-বোধের বীজ সাহিত্য-বোধের আগেই উপ্ত হইয়াছিল। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ইত্যাদি পুরানো ছড়ায় আর কৈলাস মুখুজ্যের বানানো ছড়ায় ছন্দ-তালের বোধোদয়। তাহার পর ঘটিয়াছিল দ্বিতীয় পাঠ মেঘদূত-গীতগোবিন্দ।

গীতবাদ্যজ্ঞ গুণীর ভরণ পোষণ সেকালে ছিল বড়মানুষির একটা প্রধান ঠাট। সেই সূত্রে ঠাকুর-বাড়ীতে সঙ্গীতের জ্ঞানী-গুণীর সমাদর। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতের জ্ঞানী-গুণীকে পুষিতেন আরো একটু অন্য কারণে। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গাহিবার জন্য, সেই উপলক্ষ্যে নূতন রচিত গানের তালিম দিবার জন্য,

---

১ জ্ঞানাঙ্কুরে (কার্তিক ১২৮৩) ভুবনমোহিনী প্রতিভা ইত্যাদির সমালোচনা।

২ ভারতীতে (ভাদ্র ১২৮৪) মেঘনাদবধের সমালোচনা।

৩ ঋগ্‌বেদে 'বাণী' মানে বাঁশীর সুর, মধুর স্বর। শব্দটির মূলে আছে 'বাণ' (বাঁশ-জাতীয় উদ্ভিদ, reed)। এ বিষয়ে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েদের গান শিখাইবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ তখনকার বিখ্যাত কোন কোন গায়ককে বাড়ীতে রাখিতেন। ইহাদেরই কাহারো কাহারো কাছে রবীন্দ্রনাথের গলা সাধা। তবে তাঁহার আসল সুরগুরু শ্রীকণ্ঠ সিংহ। "গানাৎ পরতরং নহি" এবং গীতসিদ্ধ বলিতে কি বোঝায় তাহা রবীন্দ্রনাথ শ্রীকণ্ঠবাবুর সংস্পর্শে আসিয়াই উপলব্ধি করিবার প্রথম সুযোগ পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মে অল্প যে কয়টি ব্যক্তির প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে পিতার পরেই শ্রীকণ্ঠ সিংহ উল্লেখযোগ্য। ইহারই ছায়া ও প্রতিচ্ছায়া রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ করিয়া নাটকে, বারবার পড়িয়াছে। শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতি পঠনীয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একজন স্মরণীয়।

> আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুর্য্যে এককালে পাঁচালির গানের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায়ই বলিত—আহা দাদাজি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কি বলিব।…সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম…

এই গানগুলি দাশরথি রায়ের। মনে হয় কিশোরী চাটুজ্জে একদা দাশুরায়েরই দলে গায়ক ছিল।

শ্রীকণ্ঠ সিংহের ভজন ও কিশোরী চাটুজ্জের পাঁচালীর পরে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও তাঁহার বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বৈঠকী গান। তাহার পরে বিলাত যাত্রা এবং সেখানে বিলাতি সঙ্গীতের কিছু পরিচয় লাভ। তাহার পর দেশে ফিরিয়া গানে ও সুরে নিজের পথ খোঁজা। অনতিবিলম্বে বাউলের গানের সঙ্গে পরিচয়। এই গেল শিক্ষার পালা। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ গানে সুরে নিজের পথ খুঁজিয়া লইয়াছিলেন॥

৫

রামমোহন রায়ের ধর্মমত বেদান্ত-আশ্রিত। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই তিনি কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। রামমোহনের কাছে বেদান্তের ভাষ্যরূপেই উপনিষদের মূল্য। বেদান্তমতের পরিপন্থী না হইলে রামমোহন তান্ত্রিক আচারকে উপেক্ষা করেন নাই, স্মার্ত আচার-বিচারকে তো নয়ই। রামমোহন ফারসী (ও আরবী) ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন, তবে একেশ্বরবাদ ছাড়া তাঁহার আর কিছুতে ইসলামের প্রভাব দৃশ্যমান নয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং ব্রহ্মবাদের নেতৃত্বে রামমোহনের অব্যবহিত দায়াদ। দেবেন্দ্রনাথ কিছু ফারসীও পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তভূমি হাফেজের মতো কবি ও সূফী সাধকের চিন্তারসে অভিষিক্ত ছিল। রামমোহনের ব্রহ্মবাদে ও অধ্যাত্মভাবনায় আনন্দের অর্থাৎ ভক্তি-প্রেমের স্থান একেবারেই ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় ভক্তি-প্রেম ছিল মুখ্য। তাই দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তসূত্র ত্যাগ করিয়া উপনিষদকেই শাস্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। উপনিষদের বাণীতে জীবনের আশ্বাস ও মরণের নির্ভয় প্রতিশ্রুত,—এই সত্য দেবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

'কে শ্বাস গ্রহণ করিত কেই বা বাঁচিয়া থাকিত যদি এই আকাশ (মহাশূন্য) আনন্দময় না হইত।'

আনন্দাদ্ ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম॥

'আনন্দ হইতেই এই প্রপঞ্চ জন্মায়,
জন্মিয়াছে যাহারা আনন্দের হেতু তাহারা বাঁচে,
আনন্দের অভিমুখে যায় এবং তাহাতে (সংবিষ্ট) হয়।
সেই (আনন্দের) খোঁজ কর, তাহাই ব্রহ্ম।'

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম লইলেন তখন দেবেন্দ্রনাথের সংসারে এমনি অধ্যাত্ম-চিন্তায় পূত সংস্কৃতির খোলা হাওয়া প্রবাহিত ছিল।

বিলাসী ধনীর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ দারিদ্র্যভীতিগ্রস্ত হইয়াও অবসন্ন হন নাই। যৌবনেই তিনি ঈশোপনিষদ্ হইতে দীক্ষামন্ত্র পাইয়াছিলেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

'সংসারে পরিবর্তনশীল এই যাহা কিছু সবই ঈশ্বরের অধিকারে। তিনি যা (তোমাকে) ছাড়িয়া দিয়াছেন (তাহার দ্বারাই) ভোগরাগ চালাও। কাহারও ধনে লোভ করিও না।'

পিতৃ-ঋণের দায়ে সম্পত্তি উত্তমর্ণের প্রাপ্য। আত্মীয়বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া চলিলে সে সম্পত্তির মোটা রকম অংশ হাতে রাখা যাইত। দেবেন্দ্রনাথ পরধনে লোভ করিলেন না। ঋণশোধ করিবার পর যাহা কিছু রহিল

তাহাই "তেন ত্যক্তেন" বুঝিয়া সংসারের প্রয়োজন সংকীর্ণ করিলেন। পরে অনেক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বলিয়া অর্থস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছিল। তখনও দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সংসারে বিলাসিতার কথা দূরে থাক কোন রকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্রয় দেন নাই। তাই কলিকাতার জাঁকালো অভিজাত ঘরের ছেলে হইয়াও রবীন্দ্রনাথ অল্পবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের ছেলের মতোই অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হইয়াছিলেন।

> আহারে আমাদের সৌখীনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখনকার ছেলেদের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বছর দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।

অতএব বুঝি, দেবেন্দ্রনাথের সংসার কর্মে চিন্তায় ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনাদর্শে ও অধ্যাত্মভাবনায় প্রভাবিত ছিল।

উপনয়ন উপলক্ষ্যে গায়ত্রী মন্ত্র পাইবার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষ। তবে সে উন্মেষ অন্তরের সুগভীর অন্তস্তলে। উপনিষদ্ পড়িয়া বুঝিবার আগেই যে বালকের অবোধ চিত্তে অনির্বচনীয় আনন্দরসের পূর্বস্পর্শ লাগিয়াছিল তাহার ইঙ্গিত জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত গায়ত্রীমন্ত্রজপে চোখের জলঝরা ঘটনায় পাই।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা তাঁহার নিজস্ব। তবে এ ভাবনা ভারতীয় অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী। সে মূলের দুইটি প্রধান শাখা। এক উপনিষদের আনন্দদর্শন, দুই বৈষ্ণব সাধনার লীলাবাদ (এবং সেই সঙ্গে সহজ সাধনার তত্ত্বমুক্ত সর্বাস্তিবাদ[১])।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মে উপনিষদের প্রভাব সকল আলোচনাকারীই স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন। সে ঠিক নয়। উপনিষদ্ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আনন্দদর্শন ও সর্বাস্তিবাদ গঠন করেন নাই। তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন নিজের দৃষ্টিতে, কল্পনায়, অনুভবে। সে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হইতেই সে কাজের শুরু। আগে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে এ কথা বোঝা দুঃসাধ্য হইবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন উপনিষদের বাণীর অর্থ করিতে পারিয়াছিলেন তখনই তাহাতে নিজের মনের সায় পাইয়াছিলেন। পরে তা আরও স্পষ্ট হইয়া

---

১ সর্বাস্তিবাদ শব্দটি এখানে বৌদ্ধমতের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত নয়।

উঠিয়াছিল। তাই উপনিষদের বাণীর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তাঁহার রচনায় নিরন্তর গুঞ্জরিত॥

৬

যাহাকে বলে গৃহশিক্ষিত ও আত্মশিক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাই। বাল্যে তাঁহার পাঠশিক্ষা গৃহশিক্ষকের কাছেই হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার ধাতে সহে নাই। ইস্কুলে যাইবার বয়স হইবার আগেই তিনি জেদ করিয়া ইস্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। ইস্কুলের সঙ্কীর্ণ রুদ্ধকক্ষ ও ঘণ্টাবন্দি রুটিন বালকের অসহ্য লাগিয়াছিল। (ছুটির ঘণ্টা পড়িলে মুক্তি পাইতেন বলিয়া তাঁহার কাব্যভাষায় ঘণ্টার একটা বড় প্রতীক অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।) প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, তাহার পর নর্মাল স্কুল, তাহার পর বেঙ্গল একাডেমি এবং অবশেষে সেণ্ট জেভিয়ার্স—কোথাও তিনি টিকিতে পারেন নাই। অতঃপর বিলাতে পাঠানো হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের আশা ছিল রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিবেন। সেখানে প্রায় বছর দেড়েক কাটিল। মাস কতক লণ্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়া হইল, মাস কতক গৃহশিক্ষকের কাছে লাটিন শিখিবার চেষ্টা হইল। উদ্দেশ্য সফল হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। যেটুকু বিদ্যা রবীন্দ্রনাথ অধিগত করিয়াছিলেন তাহাও খুব উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু অন্য দিক দিয়া তাঁহার এই বিলাতবাস সার্থক হইয়াছিল। (বিলাত বাস বলিতে এখানে বিদেশবাসও বুঝিব। বিলাতে যাইবার—সেপ্‌টেম্বর ১৮৭৮—আগে মাস ছয়েক রবীন্দ্রনাথ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমেদাবাদে ও বোম্বাইতে কাটাইয়াছিলেন। এই ছয় মাসে তিনি যথেচ্ছ ইংরেজী বই পড়িয়াছিলেন।)

সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুযায়ী তখন রবীন্দ্রনাথের ও বাড়ীর অপর ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষা পরিচালিত হইত। এই শিক্ষার রুটিন এবং তাহার ফলাফল রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়া দিয়াছেন। গৃহশিক্ষায় বাঙ্গালার উপর জোর ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী উপেক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের ঝোঁক ছিল প্রধানত বাঙ্গালায় আর কিছু সংস্কৃতে। শেষের দিকে পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য তাঁহাদের সংস্কৃত পড়াইতেন। প্রকাশের আশায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনাগুলি (বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজীর অনুবাদ) ইহারই উৎসাহ-উদ্দীপিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য, কবিতা ও প্রবন্ধ—

যাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮২-৮৩) সেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীতে রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন।

এই সময়ে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকা বাহির করিলেন (শ্রাবণ ১২৮৪)। ভারতীর কার্যকরী সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহপাঠী বন্ধু ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যরসিক ও লেখক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। কিশোর রবীন্দ্রনাথও ইঁহাদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছিলেন। এখানে সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষাও চলিতে থাকে। অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যরসবোধ রবীন্দ্রনাথকে উপকৃত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় অক্ষয়চন্দ্র

> ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ.। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল।

রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যিনি রবীন্দ্রনাথকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত করিয়াছিলেন তিনি ভারতীর সম্পাদকমণ্ডলীর অপ্রত্যক্ষ পরিচালিকা কাদম্বিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্মিণী। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইনি অনুরাগিণী পাঠিকা ছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা ইঁহার প্রিয় ছিল। কাদম্বিনী দেবীর আপাত অনুৎসাহই কবিতারচনায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ অনুক্ষণ উদ্‌গ্রীব রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দোষ ইনি জোর করিয়াই পদে পদে ধরিতেন। তাহাতে কিশোর কবির প্রযত্ন বাড়িয়া যাইত, তিনি নূতনতর ছাঁদে কবিতা রচনা করিয়া বৌদিদির অনুমোদন প্রত্যাশা করিতেন। এই সূত্রেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্টতা লব্ধ হইয়াছিল।—নিজের রচনায় রবীন্দ্রনাথ কখনোই পরিতৃপ্তি ও পর্যাপ্ততা বোধ করেন নাই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায়, তাঁহার শিল্পে আগাগোড়া নবকর্ম করিয়া গিয়াছেন। কোথাও শেষের দাঁড়ি টানিয়া দিয়া কপি করেন নাই। এ অসম্ভব ব্যাপার যেসব কারণে সম্ভব হইয়াছিল তাহার একটি কাদম্বিনী দেবীর মন্দাদর ছলে উৎসাহ দান। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনেক বই ইঁহাকেই উপহৃত।

রবীন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় বহুশ্রুত হইয়াছিলেন। গৃহশিক্ষকের কাছে যখন নিয়মিত পাঠ লইতেছেন তখনই পাঠ্য বিষয়ের ও পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ্যে-অপাঠ্যে তাঁহার মন নিমগ্ন হইয়াছিল। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'অবোধবন্ধু',

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'—ইত্যাদি পত্রিকা পাঠের সুযোগের জন্য রবীন্দ্রনাথের মন উদ্‌গ্রীব থাকিত। পিতার সহিত হিমালয় ভ্রমণের কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির জ্ঞান পাইয়াছিলেন। ঘরের পাঠ্যতালিকায় পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা শারীরতত্ত্ব ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, গণিতও ছিল। কিন্তু এ সব বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল গভীর ছিল না। মনের টান ছিল বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সে সাহিত্যের ভাষার দিকে। তের-চৌদ্দ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-পদাবলী পড়িতে আগ্রহবান্ হইয়াছিলেন। ব্রজবুলি কবিতার ভাষা তাঁহার ঔৎসুক্য জাগাইয়াছিল। পনের-ষোল বছর বয়সে তিনি বিদ্যাপতি-পদাবলীর ভাষা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাহার আগেই তিনি ব্রজবুলি ভাষার ছাঁদে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুকরণে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষা প্রগাঢ় ভাবে অধিগত করিয়াছিলেন। অনুরাগের সহিত সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও কালিদাসের কাব্য-নাটক, পড়ার ফলে ভাষাবিদ্যা রূঢ়মূল হইয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য পড়িবার সময়ে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার গভীর জ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল। অল্পকালেই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীর ধাত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই নাড়ী-জ্ঞানের বলে তিনি প্রথম হইতেই নিজের রচনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালার শব্দশক্তি জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পঠনীয় কোন বস্তু তাঁহার অপঠিত রহে নাই। ("আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।") বৈষ্ণব-পদাবলীতে অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—যেমন 'চৈতন্য-ভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'ভক্তমাল' ইত্যাদি এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বাহিরে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল'—তিনি সযত্নে পড়িয়াছিলেন। ইংরেজীর কথা ছাড়িয়া দিই। রবীন্দ্রনাথ একদা লাটিন শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা প্রয়োজনপ্রযুক্ত বলিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। পরে তিনি স্বেচ্ছায় ফরাসী ও জার্মান শিখিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন যে বয়স তাহাতে নূতন কোন ভাষা ভালো করিয়া শিখিবার অবসর ছিল না বলিয়া সে উদ্যম অনতিবিলম্বে থামিয়া যায়। তবে ভাষাবিজ্ঞানে ও বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য বরাবর জাগরূক ছিল॥

৭

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে মৌলিক মূল্যবিচারের মোটামুটি তিনটি দিগ্‌দর্শনী পাই। ঋগ্‌বেদ-সংহিতা, কালিদাসের কাব্য-নাটক ও বৈষ্ণব-পদাবলী —বলিতে পারি রবীন্দ্রপূর্ব ভারতীয় সাহিত্যের সমুচ্ছ্রিত ত্রিকূট। এই ত্রিকূট-নিঃসৃত কাব্যধারার সঙ্গে—কালের গতিকে যতটা সম্ভব—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনার অন্তঃস্যূত যোগ আছে। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের সংযোগ নানাদিকেই অনেকটা শিথিল। বিশিষ্ট ধর্মচিন্তার পরিচ্ছদে মণ্ডিত ঋগ্‌বেদের উন্নত কাব্যশিল্প আমাদের কাছে অনুজ্জ্বল প্রতীয়মান হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় অনেক জীবন্ত। ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের যোগসূত্র দুর্লক্ষ্য। ভাষাব্যবধানও প্রায় দুস্পার। অতএব বৈষ্ণব-পদাবলীতে ও কালিদাসের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ যেমন সহজ ও অবারিত হইয়াছিল বৈদিক সাহিত্যে—অবশ্য উপনিষদ্ ছাড়া—তেমন নয়। তবুও কবির পরিণত বয়সের রচনায় মাঝে মাঝে বৈদিক সাহিত্যোচিত প্রতিমান দেখা দিয়া আমাদের প্রায় তিন হাজার বছরের সাহিত্য ভাবনায় অবিচ্ছিন্নতা নির্দেশ করিয়াছে। ঋগ্‌বেদের উষা-সূক্তের "অপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্" রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে, "বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে আজ দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি"। শুধু এই রকম প্রকীর্ণ প্রতি-ধ্বনিতেই পর্যবসিত নয়, বৈদিক সূক্তের পুরাণী উষা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অরুণরাগে নবীনা।

নিঃশব্দ-চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী
রক্ত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।...
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

তুলনা করিব ঋগ্‌বেদ (৪. ৫১. ৫ গঘ),

প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং
দ্বিপাচ্ চতুষ্পাচ্ চরথায় জীবম্ ॥

'জাগাইয়া দিতেছেন উষারা যাহারা ঘুমাইতেছে তাহাদের,
মানুষ পাখি পশু সকল জীবকে সচল হইবার জন্য।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতিমান বিরাটত্বে বেদের ও মহাকাব্যের কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। যেমন

রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে

অথবা

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

একটু আগেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে রবীন্দ্রপূর্ব গীতিকাব্যভূমি ঋগ্‌বেদ, কালিদাসের রচনা ও বৈষ্ণব-পদাবলী এই ত্রিবিধ শিল্প-প্রেরণায় উর্ধ্বোচ্ছ্রিত। জড়প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্পর্ক এই তিন বিশিষ্ট শিল্পকর্মে যে যেভাবে অভিব্যক্ত তাহার বিচারে উৎকর্ষের পরিমাপ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম ঋতু বর্ষা লইয়া আলোচনা করি।[১] প্রথমে দেখা যাক বর্ষার প্রকাশ কেমনভাবে হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদে বর্ষা সঞ্জীবন ঋতু, নবজীবনের আশ্বাসবহ। বেদের কবি বর্ষা-মেঘপুঞ্জকে পর্জন্যদূতরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন।

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্‌ন্‌
আবির্দূতান্‌ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ॥

'রথারোহীর মতো কশাঘাতে ঘোড়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে তিনি বর্ষার দূতদের বাহির করেন।
দূর হইতে সিংহের গর্জন ওঠে—যখন পর্জন্য আকাশ বর্ষণোন্মুখ করিয়া দেন॥'

সংস্কৃত কাব্যে বর্ষামেঘের কাজ শুধু বৃষ্টি দিয়া জীবের জীবনোপায়-ব্যবস্থাই নয়, বিরহিণীর প্রাণ বাঁচানোর দায়ও তাহার। মেঘদূতে তাই পর্জন্যের

১ 'বর্ষার কবিতা ও মেঘদূত' (জনসেবক ১৩৬৭ শারদীয়া সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

বাহন নিজেই বিরহসন্তপ্তের শরণ হইয়া, বিরহিণীর কাছে সমাশ্বাস বহন করিয়া যাইবার পথে উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিকবনিতাদের আসন্ন প্রিয়সমাগমের প্রত্যয় দিতে দিতে চলিয়াছে। বেদে বর্ষা জীবন-ভরসার সিম্বল, মেঘদূতে মিলন-আশার।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে বর্ষামেঘের ভূমিকা পরিবর্তিত। সে এখন বিরহিণীর কাছে পৌঁছিয়া গিয়া তাহার দিগন্ত ছাইয়াছে। বাহিরে মেঘশ্যাম আকাশে ঢাকা তমালনীপকুঞ্জে রসের মহোৎসবে দাদুর-দাদুরী ডাহুক-ডাহুকী মাতিয়াছে। ভিতরে মিলনের প্রত্যাশায় গৃহকোণাবদ্ধ বিরহিণীর হৃদয় অশ্রুবিগলিত। বৈষ্ণব-পদাবলীতে বর্ষামেঘ বিরহমিলনের আস্তরণ এবং চন্দ্রাতপ দুইই রচনা করিয়াছে। এখানে বর্ষা মিলনপ্রত্যাশার, দূতী-আশ্বাসনের, সিম্বলে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ষা চেতনের, জীবসত্তার, নিগূঢ় নির্হেতু ব্যাকুল প্রত্যাশার রূপক যেন। বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষা রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন লীলাভাবনার এক বিশেষ আসর। রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা বিশ্বঋতুরঙ্গে জীবলীলা-নাটের মাথুর পালার মতো। বৈষ্ণব-কবিতার রসটুকু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবির ছাঁদে ধরিয়া দিয়াছেন

এ ভরা বাদর-দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা-কূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।

বৈষ্ণব-কবিতার সাফাই ছাড়িয়া দিয়া কবি নিজের তরফেও বলিয়াছেন

ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণপুটে কোন্ খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে হৃদয়-কোণে।

সর্বশেষে ছড়াইয়া দিয়াছেন সৃষ্টিছাড়া অকারণ বিরহবেদনাকে নিখিল চরাচরের বিমূঢ় ব্যাকুলতায়

পাগল হাওয়ায় বাদল-দিনে পাগল আমার মন জেগে উঠে।
চেনা-শোনার কোন্ বাইরে
যেখানে পথ নাই নাইরে
সেখানে অকারণে যায় ছুটে।

যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে।

কালিদাসের "অন্যথাবৃত্তিচেতঃ" এই ইঙ্গিতটুকু রবীন্দ্রনাথ মানব-জীবনের নিগূঢ় অর্থহীন বেদনার নিবিড় সত্যরূপে নির্দেশ করিলেন।

ঋগ্বেদের কবিতায় নিসর্গচিত্রণে দেবলীলারই যেন প্রতিচ্ছবি। এবং সে দেবলীলাকল্পনায় যেন মানবলীলারই অনুসরণ। এই কারণে ঋগ্বেদের কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির রূপে মানবপ্রকৃতির ছায়াপাত সুগোচর। এই ছায়া গাঢ় অনুভূত হয় প্রকৃতিভাবনার প্রতিমানে। যেমন যমজভগিনীরূপে অহোরাত্রি কল্পনায়।

নানা চক্রাতে যম্যা বপূংষি
তয়োরন্যদ্ রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ
মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।

'যমজ মেয়ে দুইটি নানা সাজ করে। তাহাদের একজন সাজে উজ্জ্বল, একজন সাজে কালো। কেননা কালী গৌরী দুই বোন, দেবতাদের একই মহিমা।'

কালিদাসের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি দেবসভা ছাড়িয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া মানুষের ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মানুষের দুঃখসুখে সমবেদনার ছায়ামণ্ডপ বিস্তার করিয়াছে। কালিদাসের রচনায় মানবপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির সহযোগিতা ও সাত্ম্যতা প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস জীব ও জড়কে বেশ কাছাকাছি টানিয়া আনিয়াছেন। যেমন স্বয়ংবরসভায় রঘু-ইন্দুমতীর দৃষ্টি-বিনিময় বর্ণনায়।

ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে
লজ্জাং তনূকৃত্য নরেন্দ্রকন্যা।
দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং
প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণস্রজেব॥

'তাহার পর সুনন্দার কথা শেষ হইলে রাজকন্যা লজ্জা দমন করিয়া প্রসন্ন নির্মল দৃষ্টি দিয় যেন রঘুকুমারকে বরণমালা পরাইয়া দিলেন।'

জড়প্রকৃতিতে মানবপ্রকৃতি আরোপ করিয়া কালিদাস মেঘদূত কাব্যে আধুনিকতার দিকে আগাইয়া আসিয়াছেন। যেমন

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিশমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥

'আরো উঁচুতে গিয়া, রাবণ যাহার ভিত্তিসন্ধি শ্লথ করিয়াছিল,
যাহা দেবনারীদের দর্পণের প্রয়োজন মিটায়, সেই কৈলাসের অতিথি তুমি হইও।
উর্ধ্বক্ষিপ্ত শৃঙ্গাবলী ছড়াইয়া কুমুদশুভ্র সে কৈলাস আকাশে ব্যাপ্ত,—
যেন ত্র্যম্বকের অট্টহাস দিগদিগন্তে রাশীভূত হইয়া আছে।'

রবীন্দ্রনাথ আরো এক ধাপ আগাইয়া যেন জীব ও জড়কে গাঁঠছড়ায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। মানবিক ভাবাবেগ বিস্তারের দ্বারা তিনি বহিঃপ্রকৃতিকে নবীন রূপে ও রসে মণ্ডিত করিয়া নিসর্গসৃষ্টির পরিচিত পুরানো পটে নব নব ছবি ফুটাইয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য দিয়া আমরা বিশ্বপ্রকৃতিকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই এবং তাহার মধ্যে মানবের ভূমিকা নূতন করিয়া বুঝিতে ও মানবের মহিমা নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। জনশূন্য নদীসৈকতে সন্ধ্যাগগনের অনুরাগ দেখিয়া মনে অজানিত বিরহের অভাবিত স্মৃতি জাগিয়া ওঠে। বসন্ত-প্রভাতে নিসর্গের উজ্জ্বল পরিপূর্ণতার মধ্যে চমক লাগে, যেন কাহার "আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।" গভীর যামিনীতে ঝিল্লিরবে শুনি যেন ধ্যাননিমগ্ন বিশ্বপ্রকৃতি অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথিয়া চলিয়াছে।

নিখিল চরাচরের উপর মানবোচিত ইমোশনের এই যে অধ্যাস ইহাতেই গীতিকবিতার এক পরম অভিব্যক্তি ॥

৮

রবীন্দ্রনাথের কবিতাভাবনার অনুসরণ করিলে তাঁহার কাব্য-রচনার পরম্পরায় চারটি সুস্পষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। সমাজ-সংসারের পরিবেশ,[১] জীবনের গতি ও অন্তরের উদ্যম অনুসারে রবীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসের এই চতুষ্ক্রমকে যথাক্রমে 'স্বগত', 'প্রগত', 'অবিগত' ও 'সুগত' বলিতে পারি।[২]

প্রথম ক্রমে কিশোর কবি অস্ফুট ভাবাবেগে অস্থির, অধীর। সংসারের সঙ্গে সহজ-সম্বন্ধসূত্রটি কিছুতে ধরা যাইতেছে না। ঘরপোষা উপস্থিত জীবনের

[১] 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) দ্রষ্টব্য।

[২] দ্বিতীয় সংস্করণে তিন যুগ ধরিয়াছিলাম—'আত্মমুখীন', 'প্রাত্মুখীন' ও 'পরাত্মুখীন'। শেষ নামটিতে পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে। তাহা ঠিক নয়। চতুর্থ স্তর তৃতীয় যুগেরই জের। কিন্তু শেষের দিকে নূতন সুর বাজিয়াছে। সে সুর সংশয়ের,—ব্যক্তিজীবনের মূল্য ও ব্যষ্টিজীবনের ভবিষ্যৎ ভাবনায়।

সংকোচ ও ভবিষ্যৎজীবনের সংশয় কল্পনায় ব্যর্থতার ছায়া মেলিতেছে। বিদেশে গিয়া (১৮৭৮-১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর জীবনের কিছু নিকট পরিচয় পাইলেন। তাহাতে যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ পালা শুরু হইল। স্বপ্নের রেশটুকু কাটিয়া গেল শোকের আকস্মিক প্রচণ্ড আঘাতে, কাদম্বিনী দেবীর মৃত্যুতে (১৮৮৪)।

প্রথম ক্রমের বিশিষ্ট কাব্যগুলির নামে গানের ছাপ রহিয়াছে—শৈশবসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল।[১] তখন যেন রবীন্দ্র-কাব্যসরস্বতীর আপন মনে সুর সাধা।

দ্বিতীয় ক্রমে কবিভাবনা পলাতকা মায়ামৃগীর সন্ধানে ধাবিত। মানসী-প্রতিমার রূপ ধরিয়া সে দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইয়া বেড়ায়, তবুও সে সোনার-তরীতে বোঝাই ফসলে ভাণ্ডার ভরায়। চিত্রা সে, বিচিত্ররূপিণী—কখনও দূর হইতে ডাক দিয়া যায় ইঙ্গিতে, কখনও বা তাহার বসনপ্রান্তের ভঙ্গিখানির আভাস পাওয়া যায় গন্ধে-ভরা বসন্তের সঙ্গীতে। রহস্যময়ী সে—কাছে আসিলেও ধরা দেয় না, তাহার চৈতালি হাসির দীর্ঘশ্বাসে সে ভাসিয়া যায়।—এমনি করিয়া পদ্মাতীরের আশ্রমবাসিক পর্ব শেষ হইয়া গেলে পর কবিকল্পনা কালান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া জীবনক্ষণিকার আনন্দময় অগাধ অগৌরবে মগ্ন হইল। তাহার পর অন্তর্যামীর ডাক আসিল। তখন চলিল ধ্যানে আত্মপ্রতিষ্ঠার নৈবেদ্য সাজানো। তাহার পর শোকের সংঘাত। তখন কবিভাবনা বিরহ-পারের খেয়ায় চাপিতে সমুৎসুক। আবার বিয়োগ-বজ্রনিপাত। এখন ভাবনা লুটাইতে লাগিল হৃদয়স্বামীর দুয়ারে। নিরুদ্ধ আবেগ অব্যক্তের উদ্দেশে গানে সুরে উপচাইয়া উঠিল। সাড়া জাগিল সর্বত্র। কবির আঙ্গিনায় দেশবিদেশ আসিয়া মিলিল।

তৃতীয় ক্রমে কবিভাবনায় বর্তমান জীবন অতীত-অনাগত মহাজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যমান। নিখিল জীবস্রোত কবিভাবনাকে আগেও টানিয়াছিল, কিন্তু সে কৌতূহলসূত্রে। এখন বলাকার পক্ষস্পন্দনে সে-টানের বেগ যেন মর্মে লাগিয়াছে। বর্তমানের দাবি চুকিয়া গিয়াছে, এখন অতীত দুঃখবেদনা উজ্জ্বল ও মধুর। সেই সঙ্গে ইহাও মনে জাগিতেছে যে "এই জনমের এই রূপের এই খেলা" শেষ করিবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। কবিচিত্ত যেন পূরবীর তানে সিন্ধুতরঙ্গের তালে তালে সুগম্ভীর দিনান্ত-সঙ্গীতধ্বনি শুনিতেছে। জগতের

১ তাহার আগে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়'। তখনো যেন সুর জাগে নাই।

রূপরস পান করিয়া সাধ কিছুতে মিটিতেছে না, পরিশেষ করিয়াও পুনশ্চ। তাহার পর কঠিন রোগের আঘাত (১৯৩৮)।

চতুর্থ ক্রমে মৃত্যুপ্রান্তিক ভাবনা যেন বন্ধনমুক্ত জীবনকে স্বচ্ছদৃষ্টিতে নূতন করিয়া দেখিল ("আপনাকে দেখি আমি আপন বাহিরে")॥

৯

রবীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসের দ্বিতীয় ক্রমে কবির আত্মবোধ ধীরে ধীরে একটি বিশেষ অধ্যাত্ম অনুভবে জমিয়া উঠিতেছে। কবিসত্তা যেন এক হইয়াও দ্বিধারূপ (split personality-র মতো)। সত্তা একরূপে অন্তরে থাকিয়া জীবন পরিচালিত করিতেছে, অন্যরূপে বাহিরে থাকিয়া জীবনপথের দিক্‌নির্দেশ করিতেছে। এই আইডিয়ার পিছনে বৈষ্ণব-অধ্যাত্মচিন্তার ছাপ আছে, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গেও মিল আছে। কবির নিজের জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা তো আছেই। "এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ"—উপনিষদের এই চিন্তা বৈষ্ণব-ভাবনায় কৃষ্ণ-রাধার রূপকে প্রতিবিম্বিত। তাহার কিছু প্রতিফলন রবীন্দ্রনাথের এই জীবনদেবতা-অন্তর্যামী ভাবনায়। অন্তর্যামী যেন বিরহিণী বধূ, "বঁধু" জীবন-দেবতার খোঁজে অভিসারে সে অগ্রসর। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির এই লুকোচুরির খেলাতেই সৃষ্টির রহস্য, জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য পর্যবসিত। অন্যভাবে দেখিলে মানবাত্মা (অন্তর্যামী) যেন স্বয়ংবরা হইয়া পরমাত্মার (জীবনদেবতার) পানে চলিয়াছে, আর পরমাত্মা যেন স্বয়ংবৃত হইবার জন্য মানবাত্মার দিকে আসিতেছে। নিখিলপ্রাণের এই দ্বিমুখী স্বয়ংবরযাত্রারই শোভাসম্ভার বিশ্বভুবনে দিগ্‌বিদিকে সাজানো।

> তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
> আলোয় আকাশ ভরা।
> তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
> ফুল্ল শ্যামল ধরা।…
> তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
> যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
> পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
> চিরস্বয়ম্বরা॥

এই মিলনযাত্রাতেই জড় ও জীব সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য নিহিত।

সাংখ্য ও বৈষ্ণব-ভাবনার উল্লেখ করিয়াছি বটে তবে যদি মনে করি রবীন্দ্রনাথের এ চিন্তা কোন দর্শনসূত্রের অবলম্বনে তত্ত্বকথার পথে সমাগত হইয়াছিল তাহা হইলে ভুল হইবে। আগে উপনিষদের সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছি তাহা এখানে জীবনদেবতা সম্বন্ধেও খাটিবে। চিন্তা রবীন্দ্রনাথেরই আত্মগত, তবে তাহার মিল পাওয়া যায় পূর্বকালের মহৎ ভাবনায়। অন্তর্যামীর উল্লেখ গীতায় আছে, পরবর্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী সারথি নহেন,—রথ-রথী দুইই, তিনি প্রেমিক। আর জীবনদেবতা রথ-রথীর উদ্দিষ্ট, তিনি প্রেমাস্পদ। যে প্রাণপ্রবাহ নিখিল বিশ্বজীবনের তরঙ্গভঙ্গে অনাদি কাল ধরিয়া প্রবহমাণ, কবিসত্তার নিগূঢ় চেতনার অন্তরালে সেই প্রবাহশক্তি দুই দিক দিয়া ধারণ ও পোষণ করিয়া আছে। একদিকে অন্তর্যামী, অন্যদিকে জীবনদেবতা। জগতের দুঃখসুখমন্দ্রিত অভিজ্ঞতার পথে জন্মমৃত্যু-পরম্পরায় বিসর্পিত, ভালোমন্দের দোলায় আন্দোলিত মানব জীবনের পূর্ণতার অভিসারে জীবনদেবতা যেন বাঁশিতে ডাক দিতে দিতে আগাইয়া চলিয়াছেন। জীবনদেবতার রূপ কখনো আভাসে ভাসে, কখনো তাঁহার পদধ্বনি শোনা যায়, কখনো বা তাঁহার উত্তরীয়প্রান্ত-ছোঁয়া হাওয়াটুকু গায়ে লাগে। জীবনদেবতার অন্তরালে মাঝে মাঝে যেন কিশোরপ্রেমও উঁকি দেয়।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জীবনদেবতা-কল্পনার মধ্যে সুফী-মতের কিছু প্রভাব আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথ ফারসী পড়েন নাই একথা ঠিক। তবে সুফী-কবিতার মর্ম যে অনুবাদের মধ্য দিয়া তাঁহার পরিচিত ছিল না এমন কথা বলা যায় না। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় কবি হাফেজ। পিতার ও শ্রীকণ্ঠ সিংহের মতো পিতৃবন্ধুদের মুখে রবীন্দ্রনাথ বাল্যে সুফী-কবিদের সূক্তি অবশ্যই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং সুফী-কবিতার প্রভাব বালক কবির নির্জ্ঞান চেতনায় পড়িয়া থাকা সম্ভব। ১৯৩৩ সালে ইরানে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা হাফেজের কবিতার অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার বালক পুত্রকে হাফেজের কবিতা শুনাইতেন।[১] তবে জীবনদেবতা আইডিয়ার মূলে ক্ষীণ সুফী-প্রভাব অনুমিত হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে জীবনদেবতা-ভাবনার সঙ্গে সুফী-সাধকদের প্রেমধ্যানের মিল নাই। সুফী-প্রেমধ্যানের শেষ কথা আত্মবিলোপ ও প্রেমনির্বাণ। জীবনদেবতার অভিসারে আত্মবিলোপী ধ্যান ও মূর্ছার কথা উঠিতে পারে না। অন্তর্যামী, জীবনদেবতা

১ ইরানের রাষ্ট্রদূত মুহম্মদ আলী জা'ফারির ভাষণ (ইণ্ডো-ইরানিকা ৪ পৃ ৪৮) দ্রষ্টব্য।

এবং বিশ্ব—তিনটি আইডিয়াই রবীন্দ্রভাবনায় মূলগত। তবে বিশেষ একটি প্রতীকে সুফী-মতের সঙ্গে জীবনদেবতাকল্পনার যে মিল দেখি তাহা আকস্মিক। পরমদয়িতার উন্মুক্ত কেশপাশে রুদ্ধশ্বাস নির্বাণ সুফী-কবির পরমার্থ। জীবন-দেবতা-প্রিয়ার উদাস কুন্তলের স্পর্শের জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনাও সজাগ।[১]

গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।
আকাশ তলে এলায়ে কেশ বাজালে বাঁশি চুপে ;

১০

জীবনদেবতা যেন রসের প্রতিহারী এবং বিচিত্ররূপিণী—বৈদিক কবির কল্পনায় "বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভিঃ"। অন্তর্যামী যেন রসের ভাণ্ডারী এবং অরূপ—বৈদিক কবির কথায় "ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্"। কবিচিত্তগহনে বসিয়া অন্তর্যামী অধ্যক্ষ জীবনকে গতিশীল রাখিয়াছেন। জীবনদেবতা বাহিরে থাকিয়া কবিজীবনতরীকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, আর অন্তর্যামী অন্তরে বসিয়া কবিজীবনরথের সারথ্য করিতেছেন। একই শক্তির দুই প্রকাশ—একটি বাহির হইতে টানিয়া লইয়া যায় স্টীম এঞ্জিনের মতো, আর একটি ভিতরে থাকিয়া ঠেলা দেয় মোটর এঞ্জিনের মতো। যিনি জীবনদেবতারূপে বাহিরে তাড়া দিতেছেন অথবা বাঁশি বাজাইয়া লুকোচুরি খেলিতেছেন, তিনিই অন্তর্যামী রূপে ধরা দিয়া কবি-মন ভরাইয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্র-কবিভাবনার এই অভিনব দ্বৈতবাদ শেষ বয়সের একটি গানে সহজ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে—
গানের পরশ প্রাণে এল আপনি তুমি রইলে দূরে।
শুধাই যত পথের লোকে—
এই বাঁশিটি বাজালো কে—
নানান নামে ভোলায় তারা, নানান দ্বারে বেড়ায় ঘুরে॥

আর একটি গানে ভারতীয় সহজ-সাধকদের মতো প্রহেলিকার ছাঁদে জীবনদেবতা-অন্তর্যামীর অদ্বৈতবাদ নির্দেশিত।

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো ;
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো ;
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।

---

[১] রবীন্দ্রনাথের রচনায় এলো চুল একটা সিম্বলের মতো। ইহার একটু বাস্তব হেতুও আছে বলিয়া মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-অন্তর্যামী আইডিয়া যে তাঁহার নিজস্ব সে কথা বলিয়াছি। বৈদিক-কবির সুপর্ণ সিম্বলের প্রতিচ্ছায়া ইহাতে হয়ত আছে। যদি কবিসত্তার সহিত বৃক্ষ উৎপ্রেক্ষিত হয় তবেই জীবনদেবতাকে স্বাদু পিপ্পলাশন সুপর্ণের সঙ্গে এবং অপর সুপর্ণ যিনি "অনশ্নন্ অভিচাকশীতি" তাঁহাকে অন্তর্যামীর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া যায়।[১] রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ও জগৎকে দেখিয়াছেন পিপ্পলাদ ও অনশন সুপর্ণদ্বয়ের দৃষ্টিতে, বিজ্ঞানের ভাষায় গতি ও স্থিতি দুই অবস্থায়। জীবনকে তিনি মরণাবচ্ছিন্ন খণ্ডরূপে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন অনাদ্যন্ত প্রাণপ্রবাহের তরঙ্গশীর্ষ রূপে, আর জগৎকে তিনি দেখিয়াছেন প্রাণপ্রবাহের লীলা বা তরঙ্গভঙ্গ রূপে। এই প্রাণপ্রবাহই রবীন্দ্র-কাব্যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ("তুমি")। রবীন্দ্র-কবিভাবনায় এই তরঙ্গভঙ্গই ব্রহ্মের "আবিঃ" বা প্রকাশ—জড়ে জঙ্গমে ও তদতীতে। এই-যে জীবন-ভাবনা ও জগৎ-দর্শন ইহাতে কাল হইতে কালান্তরে প্রবহমাণ ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনা এক অভিনব সংবেদনায় ও সুগভীর তাৎপর্যে সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

১১

সাধারণ-অসাধারণ, মহৎ-অমহৎ যে-কোন কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য স্পষ্ট। আধুনিক বিদেশি কবিতায় পরিচিত ইন্দ্রিয়ভোগের তীব্রতা, এবং সে ভোগাবসাদের ক্লিষ্টতা রবীন্দ্রকাব্যে অপরিচিত। কামনার মদির জ্বালা এবং কামার্তের বিমূঢ় বেদনাও খুঁজিলে মিলিবে না। তবে রবীন্দ্রনাথ ভোগভীত শুষ্ক "সন্ন্যাসী" ছিলেন না, জীবনের ভোগ যাহা হাতের কাছে সহজে অনায়াসে পাইয়াছেন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু তিনি কখনো কোন কিছুতে লোভ করিয়া হাত বাড়ান নাই। এমন ধৈর্যের ও সংযমের অতএব ত্যাগের শিক্ষারম্ভ তাঁহার শিশুকাল হইতেই। রবীন্দ্রনাথের চরিত্র দম-ত্যাগ-অপ্রমাদ এই তিন অমৃতপদে প্রতিষ্ঠিত। এ সত্যটুকু স্বীকার না করিলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা সর্বাঙ্গসার্থক হইবে না।

---

১ ঋগ্বেদ ১. ১৬৪. ২০ ; অথর্ববেদ ৯. ৯. ২১।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

'অভিন্ন সহচর দুই সুপর্ণ একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছে। তাহার মধ্যে একজন স্বাদু ফল খাইতেছে, আর একজন কিছু না খাইয়া কেবলি চাহিয়া আছে॥'

ইন্দ্রিয়-অনুভব রবীন্দ্রকাব্যে অবশ্যই আছে—কেন না তাহা বাদ দিলে কবিতার অঙ্গহানি হয়, কিন্তু তাহা সাধারণত অন্য পাঁচজন কবির রচনায় যেমন তেমন করিয়া সোজাসুজি প্রতিবিম্বিত নয়। মনের গহনে পরিপাক পাইয়া তবেই ইন্দ্রিয়-অনুভব তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা উষ্ণতাহীন বলিয়া অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু সাহিত্যে সে উষ্ণতার মান সর্বদা এবং সর্বত্র সমান নয়। পাঠকের মনের পরিপাকশক্তিতে সে উষ্ণতার মান ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বিস্তর সহজ-মধুর কবিতা লিখিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কঠিন কবিতাও শুনিতে মধুর লাগে। কিন্তু সত্য কথা বলিব, সমালোচকেরা স্বীকার না করিলেও,—তাঁহার অনেক কবিতা অত্যন্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের সত্যকার বোদ্ধা পাঠক তাই বেশি হইতে পারে না। বিদেশি কবিতার সঙ্গে তুলনাও অনুচিত। প্রেমাভিব্যক্তির রীতিনীতি ভিন্ন-দেশে ভিন্নরূপ। প্রাচ্যদেশের আবহাওয়া, ফলফুল, রীতিনীতির মতো প্রাচ্য জীবনচিন্তায় ও কবিভাবনায়ও বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আছে। তাহা অস্বীকার করা সত্যের অপলাপ।

জীবনে ভোগসুখে অনেকটা নিঃস্পৃহ ও নিরাসক্ত ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ দুঃখসুখের জীবনকে সর্বথা অত প্রবলভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন, জীবনের আনন্দ সবদিক দিয়া অমন পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য দুই হাতে ধরিয়া আঁচড়কামড় দিয়া উপভোগ করা যায় না। জীবনপ্রবাহের মতো সৌন্দর্যও তরঙ্গবন্ধুর, এবং ক্ষণিক হইয়াও ক্ষণিক নয়। আর রসানুভূতি ব্রহ্মোপলব্ধিরই কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রসবোধ-বুদ্ধ। এ রস আলঙ্কারিকের রস নয়, জীবনের রস।

> রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
> আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে—
> বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
>   সেতো কেবলি গান, কেবলি বাণী।...
> নদীর স্রোতে ফুলের বনে বনে
> মাধুরীমাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
> সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
>   মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

এই যে মুক্তির চরমবাণী বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ সে মুক্তি বিক্ষুব্ধের পলায়ন নয়, উদাসীনের বিবিক্তি নয়। সে মুক্তি সর্বগ্রাসী মনের ছুটি—অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ

অঙ্গন হইতে আনন্দের নিঃসীম ক্ষেত্রে। এই মুক্তিবোধ কবিকল্পনা নয়, কথার ঠাট নয়, ভাববিলাস নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে মুক্তি-উন্মুখতায় নিজের জীবনধারারই অভিমুখীনতা স্থচিত। যৌবনে পদার্পণ করিবার পর হইতে বহু বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধিতে পারেন নাই। অথবা বাঁধেন নাই। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌছিয়া তবে তিনি শান্তিনিকেতনে নীড় বাঁধিলেন। কিন্তু সেখানেও কোন একটি গৃহগণ্ডীতে স্থিত হইতে পারেন নাই। বারবার বাসা বদল করিয়াছেন। বারবার বিদেশে ছুটিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের নিগূঢ় মুক্তিপিপাসার এক প্রতিফলন এই বারবার বাসা-বদলে, ঠাঁই-নাড়ায়॥

১২

রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি, উল্লাসের নহেন। বৈষ্ণব-কবির অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে যে বিষামৃত একত্র মিলনের ইঙ্গিত আছে এ আনন্দের স্বরূপ তারই মতো। (আসলে জীবন-রসই তাই।) সেখানে গভীর দুঃখ ও বৃহৎ সুখ এক হইয়া অনির্বচনীয়তে তলাইয়া যায়। এইটুকু না বুঝিলে রবীন্দ্রকাব্যের মর্মগ্রহণ অসম্ভব। রবীন্দ্রকাব্যে রসের উচ্ছ্বাসই আছে, জীবনের দুঃখবেদনার উত্তাপ নাই,—এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে জীবনের প্রতিধ্বনি সমগ্র ও অকুণ্ঠ। তাহাতে তুচ্ছ ও উচ্চ, কঠিন দুঃখ ও গভীর সুখ, সরল ও সামান্য জীবনের ভালোলাগা ও মন্দলাগা মুখরিত। রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনা চলতি অথবা বিশেষ কোন কালের রুচি অনুসরণ করে নাই। তিনি তুচ্ছকে লইয়া কবিকুর্দন করেন নাই, অথচ তিনি তুচ্ছকে যে মূল্য দিয়াছেন তাহা আর কোন কবির কল্পনায় কখনো জাগে নাই। কোন কোন বিখ্যাত বিদেশি কবির মতো রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীর-মনের যন্ত্রণা অথবা গার্হস্থ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া ব্যথার বেসাতি সাজাইয়া কাব্যের হাটে কারবার ফাঁদেন নাই। (সে কারবার যে অন্যায় ও অমহৎ তাহা বলিতেছি না।) তিনি খণ্ড ছিন্ন ব্যর্থ প্রতিহত অসমাপ্ত জীবনের—যে জীবন অতি সাধারণ লোকেরও—মালা গাঁথিয়া চিরদিনের জীবনস্রোতে অর্ঘ্যরূপে কবিতায় ও গানের তরীতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি গ্লানিতে নিমগ্ন থাকে নাই, দুঃখবেদনায় নিরুদ্ধ হয় নাই। সে দৃষ্টি সব ভালোমন্দ ভেদ করিয়া নামিয়া গিয়াছে অনাদ্যন্ত জীবনের সেই গভীর তলায় যেখানে সবকিছু অভিজ্ঞতা অখণ্ড অনুভবের মধ্যে হারাইয়া যায়।

যাহাকে আমরা ভোগ বলিয়া মানি তাহাতে আনন্দ নাই। তাহাতে সুখ আছে, তাহাতে দুঃখও আছে। সুখের শেষ আছে। দুঃখও কদাপি চরম নয়। সুখদুঃখের মালা যে সুতায় গাঁথা পড়ে সে হইল আনন্দ। আনন্দে সুখদুঃখ অবিচ্ছিন্ন। আনন্দের অবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনে কদাচিৎ ক্ষণিক উপলব্ধ হইতে পারে। সে উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় "দৃষ্টি"। (শৈশব কাল হইতে দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের প্রধান অনুভব করণ।) জীবন-রস সম্বন্ধে তাই তাঁহার শেষ কথা

চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি
চেয়ো না, চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।

বহু বহু শতাব্দবাহী বিশিষ্ট চিন্তাধারার মনীষা-অভিষেক পাওয়া যে ভারতীয় মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন তাহা কোন বিদেশি কবি—তিনি যত বড় শক্তিশালীই হোন্—পাইতে পারেন না। (আমি বিদেশি কবিদের ছোট, আর রবীন্দ্রনাথকে বড় বলিতেছি না। এখানে ছোট-বড়র কথাই নাই।) সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্যেটে-বোদ্‌লেয়র-রিল্‌কে ইত্যাদির কাব্যকলার স্বাদ না পাইয়া যাঁহারা বিদেশি সমালোচকদের প্রতিধ্বনি তুলিয়া রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবে খর্ব করিয়া দেখিতে চাহেন তাঁহারা বিভ্রান্ত। বিদেশি পাঠক-সমালোচকের রবীন্দ্রকাব্য যদি ভালো না লাগে—তাঁরা যদি বলেন, অত্যন্ত সুললিত অত্যন্ত মিষ্ট চিটচিটে, তাহা হইলে রাগ অথবা অভিমান করিবার কিছুই নাই, বরঞ্চ অনুকম্পা করিবার আছে। আমরা বিদেশি কাব্যের রস যতটা পাই বিদেশিরা ভারতীয় কাব্যের রস তার অংশের অংশও পান না। সুতরাং জিত আমাদেরই ॥

১৩

কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ দুইটি, কবির মন আর কবিতার ভাষা। কবিমানসের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ভাষা যদি প্রকাশক্ষম না হয় তবে ভাব অপরিচিতির অন্তরালেই রহিয়া যায়। আর ভাষা যদি সক্ষম হয় তবে ভাব নিজেকে ছাড়াইয়া যাইতেও পারে। ভাষা ভাবকে ঊর্ধ্বগামী করিতে পারে। ভাষা-উপকরণের উপর বড় সব কবিকেই নির্ভর করিতে হয়। বড় কবিকে তাঁহার ভাবের উপযুক্ত ভাষা গড়িয়া না লইলে চলে না।

একথা ঠিক যে শক্তিমান্ ভাষা নহিলে শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয় না। কিন্তু ভাষার শক্তি, প্রকাশক্ষমতা, যদি কালে কালে ভাবের অগ্রগতির সঙ্গে তাল

রাখিতে না পারে, নূতন ভাবব্যঞ্জনার জন্য ভাষা যদি প্রস্তুত না থাকে তবে কবির সৃষ্টি কুণ্ঠিত হইবেই। ভাষাশিল্পে সাধারণত নিত্য নূতন শব্দের আবশ্যক হয় না, এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য এ কথাও যে কালবশে প্রচলিত শব্দে অর্থের অস্পষ্টতা আসে এবং তদনুসারে পুরানো শব্দ ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া যায়। বহুব্যবহারে লুপ্তাঙ্কচিহ্ন ধাতুমুদ্রা যেমন মূল্য হারায়, শব্দও তেমনি অর্থ হারায়। টাঁকশালের ছাপ পড়িলে যেমন অচল মুদ্রা পূর্ণ মূল্য ফিরিয়া পায় পুরানো শব্দও তেমনি শক্তিমান্ কবির অভিনব প্রয়োগের দ্বারা নূতন ব্যঞ্জনা পাইয়া সঞ্জীবিত হয়।

অনাধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে একদা জোরালো সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। সে বৈষ্ণব-কবিতা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা সে কবিতার পক্ষে সমর্থ ছিল। পরবর্তী সাহিত্যেও এই ভাষার পুনরাবৃত্তি। তাই উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙ্গালা কবিতা ভাষার শক্তিক্ষয়ের ফলে ক্ষীণ-প্রাণ প্রতীয়মান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভাব ও ভাষা দুইদিক দিয়া কবিতায় নবজীবন দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার উদ্যম অচিরস্থায়ী হয় এবং তাঁহার কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। মাইকেলের অনুসরণকারী সমসাময়িক লেখকেরা তাঁহার উপাদান ঠিক মতো ব্যবহার করেন নাই। বৈষ্ণব-কবিতা তাঁহারা পড়েন নাই এবং বাঙ্গালা কাব্যের ধাতুপরিচয় তাঁহাদের ঘটে নাই। অথচ নিজের পথ কাটিয়া লইবার মতো প্রয়াসও তাঁহারা করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষার ধাতুপ্রকৃতি বুঝিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ সে ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করিলেন যে তাহার সৌন্দর্য ও শক্তি অভাবনীয় ভাবে বাড়িয়া গেল। একটানা প্রায় সত্তর বছর ধরিয়া সাধনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাসিদ্ধি বাঙ্গালাকে দিয়া গেলেন তাহা কোন দেশের কোন লেখক, একাকী তো দূরের কথা, দল বাঁধিয়াও সাধন করিতে পারেন নাই॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সঙ্কোচের বিহ্বলতা

১৮৭৩—১৮৮৪

"নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়"

১

উপনয়নের পরে দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দূর ভ্রমণে চলিলেন। (দেবেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় একটানা থাকিতেন না, বৎসরের অধিকাংশ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিমালয়ের কোলে কাটাইতেন।) রবীন্দ্রনাথের রেলগাড়ি চড়া এবং কলিকাতা হইতে দূরে যাওয়া এইই প্রথম। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে হিমালয়-যাত্রা হইতে শুরু করিয়া ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার এবং মনোগঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কলিকাতা হইতে পিতাপুত্র প্রথমে বোলপুরে (শান্তিনিকেতন ভবনে) গেলেন। সেইখানে থাকিবার সময়ে বালকের মনে বড় করিয়া কাব্যরচনার স্পৃহা জাগিয়াছিল। সে কথা জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে।

কয়েক মাস বাহিরে থাকিয়া হিমালয় হইতে ফিরিলে পর বালকের উপর মাতার এবং জ্যেষ্ঠদের দৃষ্টি পড়িল। ক্রমশ নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আসরে রবীন্দ্রনাথ স্থান পাইলেন। 'ভারতী' বাহির হইল (শ্রাবণ ১২৮৪)। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে গদ্যপদ্য লেখা শুরু করিলেন। কিন্তু ভারতীর প্রথম বছর পূর্ণ হইবার আগেই তাঁহাকে বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনে কলিকাতা ছাড়িতে হইল। মেজদাদার কাছে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে তিনি ছয়মাস কাটাইলেন। উদ্দেশ্য ভালো করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং বিলাতি চালচলনের পরিচয় পাওয়া। এই ছয়মাসের মধ্যে বালক কবির মনের বাড় অনেক বাড়িয়াছিল। বিলাতপ্রবাসে (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮—ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) তাহা আরও প্রসারিত হইল। বিদেশের অভিজ্ঞতা ও বিদেশি মানুষের হালচাল কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনকে উসকাইয়া দিয়াছিল। তাহার প্রত্যক্ষ ফল ফলিয়াছিল ভারতীতে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'গুলিতে। দেশে-বিদেশে

বছর দুই বাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তরের গুটি কাটিয়া বাহিরে আসিবার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিলেন। এ একটা মস্ত লাভ।

বিলাত হইতে ফিরিলে পর রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠদের আসরে প্রায়-সমবয়সীর আসন অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥

২

রবীন্দ্রনাথ যখন রীতিমত কবিতারচনায় নামিলেন তখন তাঁহাদের পারিবারিক গোষ্ঠীতে জাতীয়তার (ন্যাশনালিজমের) আবহাওয়া জমাট, এবং সে আবহাওয়া বাহিরের শিক্ষিতসমাজকেও ঘিরিতে লাগিয়াছে। দেশের পরাধীনতার বেদনায় তখন নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত' (শ্রাবণ ১২৭৭) কবিতায় তাল ঠুকিতেছিল। বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতারচনার প্রথম প্রচেষ্টার যে সব নিদর্শন ছাপা হইয়া রহিয়া গিয়াছে তাহাতে হেমচন্দ্রের এই কবিতাটির অনুসরণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের আদি-কৈশোরক কালের (১৮৭৩-৭৬) অধিকাংশ কবিতার বিষয় ভারতের পরাধীনতা। একটি ছাড়া এই সমস্ত কবিতা লেখা হইয়াছিল হিমালয়ভ্রমণের পরে। (হিমালয়ের ছবি কৈশোরক-যুগের কবিতায় আছেই।) রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ পড়িয়াছিলেন পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে। হয়ত এই কারণেই বহুপ্রশংসিত এই কাব্যখানি তাঁহার খুব ভালো লাগে নাই, কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভা সম্বন্ধে বালক-কবির মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। তাঁহার বাল্যরচনায় মাইকেলের প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে বেশ শোনা যায়। মাইকেলের ভাষার প্রভাব রবীন্দ্র-কাব্যের ভাষায় তখন অস্বীকৃত নয়। নামধাতুর ব্যবহারে অকুণ্ঠা, "যথা" "যেমতি" ইত্যাদির যোগে উপমা-উৎপ্রেক্ষা, এবং কদাচিৎ অনন্বিত বাক্যাংশের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। গোড়ার দিকের রচনা হইতে মাইকেল-প্রভাবের উদাহরণ দিতেছি।

> উর্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে
> সহসা করণ ক্ষেপে সহসা উঠে রে কেঁপে
> সহসা জাগিয়া উঠে চল-উর্মি সবে। (বনফুল প্রথম সর্গ।)
> আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
> মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা। (ঐ প্রথম সর্গ।)[১]

---

[১] তুলনীয় মধুসূদন, "নাহি তারা কবরীবন্ধনে"।

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি, প্রেমের কিরণে—
(রবিকরে হীনভাতি নক্ষত্র যেমন)
বিলুপ্ত হয়েছে কি রে বিজয়ের মনে ? (ঐ ষষ্ঠ সর্গ।)
বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে। (কবি-কাহিনী তৃতীয় সর্গ।)

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ মিত্রছন্দে প্রধানত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কয়েকটি কবিতায় হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" ছন্দ অনুকৃত। অমিল পয়ারেও হেমচন্দ্রের অনুসরণ লক্ষণীয়।

বড়দাদার বন্ধু বিহারীলাল চক্রবর্তী দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আত্মীয়ের মতো সমাদৃত ছিলেন। কাদম্বিনী দেবী বিহারীলালের কবিতার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। সে কবিতা রবীন্দ্রনাথেরও ভালো লাগিত। সুতরাং বিহারীলালের প্রভাব তাঁহার বাল্যরচনায় প্রত্যাশিত। কিন্তু সে প্রত্যাশিত প্রভাব খুবই ভাসাভাসা। বনফুল ও কবিকাহিনী ছাড়া আর কোথাও বিহারীলালের ছাপ স্পষ্ট নয়।[১] তবে কয়েকটি গাথা-কবিতায় বিহারীলালের বিশিষ্ট তিন মাত্রার ছন্দের ব্যবহার আছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রভাব কিছু বেশি। ভগ্নহৃদয়ের পালা চুকিয়া গেলেও এ প্রভাব মুছিয়া যায় নাই। জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠের কবিধাতু ভিন্ন প্রকৃতির, তবুও উভয়ের কাব্যশিল্পে কোন কোন বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে।[২] (রবীন্দ্রনাথের মনের গড়নে বড়দাদার ব্যক্তিত্বের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। বলিতে পারি পিতা দেবেন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ত্রিমুনি।) বনফুলের সপ্তম সর্গের প্রথম দিকে প্রতিধ্বনিত "কানের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায়"—যেন স্বপ্নপ্রয়াণের ছত্র। ভগ্নহৃদয়ের প্রথম সর্গের এই কয় ছত্রও যেন স্বপ্নপ্রয়াণের পাঠান্তর

হরিণ শাবক যত ভুলিবে তরাস,
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।

---

[১] বনফুলের প্রথম সর্গের উপক্রমে বিহারীলালের অনুকরণ বেশ বোঝা যায়। যেমন,

শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন ,

অথবা

কে ওগো নবীন বালা, উজলি পরণ-শালা
বসিয়া মলিনভাবে তৃণের আসনে ?

বনফুলের তৃতীয় সর্গ বিহারীলালের ছন্দে লেখা।

[২] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম সংস্করণ পৃ ৪৫৬ দ্রষ্টব্য।

ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিব তুলি
সবিস্ময় সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
অবাক নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে !

বাঙ্গালা সাহিত্যে "কাব্যোপন্যাস" বা "গাথা কাব্য" প্রবর্তন করিয়াছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।[১] স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। (দেবেন্দ্রনাথের কন্যাদের মধ্যে চতুর্থ, রবীন্দ্রনাথের নদিদি স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-কর্মে অনুরাগিণী ছিলেন। ইনিও ভারতীর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন, পরে বহুদিন ধরিয়া ভারতী সম্পাদন করিয়াছিলেন।) রবীন্দ্রনাথের অন্ত্য-কৈশোরক অনেক রচনা গাথা-কাব্য অথবা গাথা-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের-অগ্রজাত সাহিত্যবন্ধুদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র প্রধান। ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ইনি কতকটা সুগম করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের রসগ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মারম্ভ-পথে যে কতটা সহায়তা করিয়াছিল তাহার উদ্দেশ জীবনস্মৃতিতে পাওয়া যায় ॥

৩

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকর্মের ইতিহাসের আদিপর্ব দুই অধ্যায়ে ভাগ করিতে পারি—আদি-কৈশোরক (১৮৭৩-৭৬) ও অন্ত্য-কৈশোরক (১৮৭৬-৮৩)। আদি-কৈশোরকে পাই দেশপ্রেমাত্মক কয়েকটি কবিতা এবং লুপ্ত "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" কাব্য। পিতার সঙ্গে হিমালয়-যাত্রার মুখে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন বোলপুরে (শান্তিনিকেতনে) কাটাইয়াছিলেন (ফাল্গুন-চৈত্র ১২৭৯)। সেইস্থানে পৃথ্বীরাজ-কাব্যটি লেখা হইয়াছিল।

> বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই ॥

রবীন্দ্রনাথের এই আদিকাব্যটি কিন্তু লুপ্ত হইলেও নিশ্চিহ্ন নয়। 'রুদ্রচণ্ড' নাট্যকাব্যটিকে পৃথ্বীরাজেরই নবকলেবর বলিয়া মনে করি। পৃথ্বীরাজের

১ ঐ পৃ ৪০৪-৪১০ দ্রষ্টব্য।

পরাজয়-কাহিনী বালক-কবির মনে যে দাগ কাটিয়াছিল তাহার আরো প্রমাণ পাই—'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায়।

'হিন্দুমেলার উপহার'[১] রবীন্দ্রনাথের প্রথম সনাম মুদ্রিত রচনা। কবিতাটির ছন্দে ভাষায় ও ভাবে হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের স্পষ্ট অনুসরণ আছে। ইহার আগেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা হইয়াছিল বলিয়া মনে করি ॥[২]

৪

অন্ত্য-কৈশোরক রচনাগুলির মধ্যে "গাথা" কাব্য ও কবিতাই মুখ্য। প্রণয়ে অচরিতার্থতা এবং মিলনে আত্মকৃত অথবা দৈববিঘটিত বাধা ও পরিণামে হতাশা এই রচনাগুলির প্রায় একটানা সুর। কাহিনী বালককল্পনাসুলভ অতিনাটকীয়। নায়ক-নায়িকারা সাধারণ সংসারের বাহিরে বিজন কুটীরবাসে একাকী অথবা পিতৃসাহচর্যে অভ্যস্ত এবং আপন আপন হৃদয়াবেগে আচ্ছন্ন। নায়ক-ভূমিকায় কবি যেন নিজেকেই প্রক্ষেপ করিয়াছেন। তবুও সমস্ত আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা ছাপাইয়া যে অকৃত্রিম আবেগ এই কাব্যগুলিতে উৎসারিত এবং ভাবে ও ভাষায় যে অভিনবত্ব সূচিত তাহা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রত্যাশিত ছিল না। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরক কবিতাগুলির জন্য লজ্জাবোধ করিতেন। ("ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।") কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রতিভার অকাল-বসন্তে এই ফলপ্রত্যাশাবিহীন বনফুলমুকুলসম্ভার যে বৃথাই দেখা দেয় নাই তাহা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছিলেন। ("যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য[৩] লজ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু তখন মনের

[১] অমৃতবাজার পত্রিকার ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত এবং তাহা হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত (রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় পৃ ৬০-৩২)।

[২] যেমন, 'ভারতভূমি' (বঙ্গদর্শন মাঘ ১২৮০)। অজ্ঞাত কোন এক রোজনামচার দোহাই দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা বলিয়া দাবি করেন। "চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকেরা লেখা" এই কবিতাটির শক্তিসম্ভাবনা জ্যোতিষচন্দ্রের পরবর্তী প্রচেষ্টার দ্বারা একেবারেই সমর্থিত নয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ হয় নাই, একথা ঠিক ; কিন্তু কয়েক মাস আগে বঙ্গদর্শনে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের অংশ বাহির হইয়াছিল। তাহা এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।

[৩] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কবিতা-গানগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রাচীন সরণি অবলম্বন করিয়াছিল, তাই কৃত্রিমতা সত্ত্বেও সেগুলির স্থায়িত্ব কবিও স্বীকার করিয়াছেন।

মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে।")

৫

'বনফুল'[১] রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য, এবং লুপ্ত পৃথ্বীরাজের-পরাজয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রথম-রচিত কাব্য। তবে বনফুল গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছিল 'কবি-কাহিনী'র প্রায় দুই বৎসর পরে।

বনফুল "কাব্যোপন্যাস", আট সর্গে গাঁথা। আদ্যন্ত মিত্রাক্ষর ছন্দ। আদি ও শেষ দৃশ্য তুষারশুভ্র হিমালয়বক্ষ। পিতা ও কন্যা হিমালয়শিখরে কুটীরে বাস করে। পিতা ছাড়া কন্যা কমলা আর কাহাকেও দেখে নাই। পিতার যেদিন মৃত্যু হইল সেদিনই দ্বিতীয় পুরুষ বিজয় দেখা দিল। কমলাকে লোকালয়ে লইয়া গিয়া ভালোবাসিয়া তাহাকে সে বিবাহ করিল। কমলার কিন্তু তাহার উপর মন পড়ে নাই। বিজয়ের বন্ধু নীরদকেই সে ভালোবাসিয়াছে। এদিকে বিজয়কে ভালোবাসে নীরজা। নীরদ কমলার প্রেমভাব বুঝিয়া মন ফিরাইতে তাহাকে বারে বারে বলিয়াছিল, কিন্তু বৃথা। বিজয় ব্যাপার বুঝিল। সে নীরদকে ভর্ৎসনা করিয়া দেশত্যাগ করিতে বলিয়াও শেষে ঈর্ষার জ্বালায় তাহাকে হত্যা করিল। বিধবাবেশে কমলা হিমালয়বক্ষে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানে আর পুরানো দিনের সুখশান্তি মিলিল না। নীরদের স্মৃতি তাহার চিত্ত দিবানিশি মথিত করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন তুষারশিলায় পদস্খলিত হইয়া সে সকল জ্বালা এড়াইল।

বনফুলের প্লটের আরম্ভে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের অনুসরণ আছে। কমলা-ভূমিকায় কালিদাসের শকুন্তলার ছাপ আছে। ভাব-ভাষা-অলঙ্কার মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিহারীলালের এবং মাইকেলের রচনা স্মরণ করায়।

বনফুলের দুই বছর পরে লেখা 'কবি-কাহিনী'[২] রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা

---

১ ধারাবাহিক প্রকাশ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮২-৮৩, ১৮৭৬)। গ্রন্থাকারে ১২৮৬ (১৮৮০)।

২ ধারাবাহিক প্রকাশ ভারতী (পৌষ-চৈত্র ১২৮৪, ১৮৭৮)। পুস্তকাকারে ১৯৩৫ সংবৎ (১৮৭৮)।

বই। বনফুলের তুলনায় কবি-কাহিনীতে যেন কিছু পাক ধরিয়াছে, নিজস্বতা ফুটিবার উপক্রম করিয়াছে। যেমন

কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননী,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন!

নীরবতা ঝাঁ ঝাঁ করি গাহিছে কি গান,
মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।

ওই হৃদয়ের সাথে, মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?

যৌবনোন্মেষের ভীরুতা ও আকুলতা কবি-কাহিনীকে যেন বেষ্টন করিয়া আছে।

আঁধার সমুদ্রতলে, কি বেড়াই খুঁজি
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা।
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি।

কৈশোরক পর্বের পরেকার রচনায় এ অভাববোধের প্রকাশ বাড়িয়াছে।

কবি-কাহিনী চার সর্গে গাঁথা। ছন্দ অমিত্রাক্ষর পয়ার ও ত্রিপদী। অমিত্রাক্ষর ত্রিপদী নূতন জিনিস। প্লটে নাটকীয়তা নাই। প্রকৃতির মাধুর্যচিন্তায় বিভোর নায়ক-কবির চিত্তে যখন অনির্বচনীয় অতৃপ্তি জাগিয়াছে তখনই বালিকা নলিনীর আবির্ভাব। কবি নলিনীকে ভালোবাসিল তবুও অতৃপ্তি গেল না। আরো কিছুর জন্য উৎকণ্ঠিত কবি দেশপর্যটনে বাহির হইল। নলিনী বিরহে শুকাইতে লাগিল। দেশবিদেশ ঘুরিয়াও শান্তির ও তৃপ্তির সন্ধান না পাইয়া কবি ঘরে ফিরিল। আসিয়াই দেখিল যে তুষারের উপর নলিনীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তাহার শেষকৃত্য করিয়া কবি হিমালয়ের অন্যত্র গিয়া তপস্যায় নিরত হইল। নারীপ্রেমের স্মৃতি ক্রমশ বিশ্বপ্রেমে ডুবিয়া গেল। জগতের যত কিছু ব্যথা-বেদনা অবিচার-অত্যাচার বাল্মীকির মতো বৃদ্ধ কবির চিত্তে করুণার আঘাত হানিতে লাগিল। বিশ্বের শোকে নিজের শোক চাপা দিয়া শেষে কবি পরম সান্ত্বনার ও বৃহৎ আনন্দের অধিকারী হইলেন এবং কাল পূর্ণ হইলে পর

একদিন হিমাদ্রির নিশীথবায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া!

কবি-কাহিনীর নায়ক-কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে। তখন তাঁহার বয়স বেশ কাঁচা, তবুও মনে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশপ্রেম-উচ্ছ্বাস ও নাটকীয়তা বর্জন করিয়া কবিতা যেন ধাতস্থ হইতেছে। অত্যাচার-অবিচারকে স্থানকালের কাঠ-গড়ায় পুরিয়া বিচার না করিয়া কবি তাহার জড় খুঁজিয়াছেন মানুষের আদিম প্রকৃতিগত স্বার্থপরতায়। আর তাহার প্রতিকার দেখিয়াছেন প্রেমে ও ভ্রাতৃত্বে, মানবের মহামিলনে। বিশ্বপ্রেমের বার্তাবহন রবীন্দ্রকাব্যের যেন এক প্রধান উদ্দেশ্য। সে বাণীর কাকলি ষোল বছর বয়সে লেখা এই কবিতাটিতে অস্ফুট-ভাষিত।

কবি-কাহিনীর নায়কের বৃদ্ধবয়সের মূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রূপ যেন পূর্বাভাসিত।

বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হোত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেব!

৬

কৈশোরক পর্বের মাঝের দিকে মিত্র ছন্দে লেখা কয়েকটি ছোট ছোট গাথা পরে 'শৈশব সঙ্গীত' (১২৯১) গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

'প্রতিশোধ'[১] কাহিনীতে হ্যাম্‌লেটের ছায়া পড়িয়াছে। নায়ক কুমারের পিতা শয্যায় গুপ্তঘাতকের ছুরিতে প্রাণত্যাগ করিবার পূর্বমুহূর্তে প্রতিশোধ লইবার জন্য পুত্রকে শপথ করাইয়াছিলেন। প্রতিশোধার্থী কুমার দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে কন্যা মালতীকে লইয়া প্রতাপ বাস করে। মালতীর প্রেমে পড়িয়া কুমার প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া সেই কুটীরেই রহিয়া গেল। প্রতাপ বিবাহের আয়োজন করিল। সম্প্রদানের মুহূর্তে কুমারের পিতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হওয়ায় বিবাহ-সভা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রেতমূর্তি কুমারকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, "শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে বিবাহ করিলি আজ!" কুমার প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিয়া

১ প্রথম প্রকাশ ভারতী (১২৮৫ শ্রাবণ)। তিন পরিচ্ছেদে গাঁথা।

জানিল, সে-ই তাহার পিতার হত্যাকারী। প্রতাপ এখন অনুতপ্ত, কুমারের প্রতিশোধস্পৃহা নাই। আবার প্রেতাত্মা দেখা দিয়া কুমারকে উত্তেজিত করিল তখন কুমার প্রতাপের বুকে ছুরি বসাইল। মালতী মূৰ্ছিত হইয়া কুমারের পায়ের কাছে পড়িল। সে মূর্ছা আর ভাঙ্গিল না। কুমার পাগল হইয়া সেই বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

'লীলা'র[১] কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগল্প 'ভিখারিণী'র[২] কিছু মিল আছে। লীলা রণধীরকে ভালোবাসে, তাহার সহিত বিবাহও হইয়াছে। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় নিরাশপ্রণয়ী বিজয় তাহাকে ছিনাইয়া আনে এবং মিথ্যা করিয়া বলে যে রণধীর যুদ্ধে মরিয়াছে। শুনিয়া লীলা বুকে ছুরি হানে। এদিকে রণধীর বিজয়ের দলবলকে পরাস্ত করিয়া লীলার সন্ধানে আসিয়া দেখে সে মৃতকল্প। বিজয়ের প্রতারণার কথা তাহাকে বলিয়া দিয়া লীলা শেষ নিঃশ্বাস ফেলিল। সে প্রতিশোধ বাসনায় রণক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে বিজয় মরিয়া পড়িয়া আছে।

'ফুলবালা'[৩] রূপক গাথা, ফুলবালক অশোক ও ফুলবালিকা মালতী—এই দুইজনের প্রেমের কাহিনী।

'অপ্সরা-প্রেম' প্রতিশোধ ও লীলার মত কাহিনী-সর্বস্ব নয়। নায়ক যুদ্ধে গিয়াছে, নায়িকা ব্যথিতহৃদয়ে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আছে। রণজয়ী হইয়া নায়ক সমুদ্রপথে ফিরিতেছে। অকস্মাৎ ঝড় উঠিল।

সহসা ভ্রূকুটি' উঠিল সাগর
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল,
সহসা কিসের লাগি।
সাগরের অতি দুরন্ত শিশুরা
কহিয়া অস্ফুট বাণী,
উলটি পালটি খেলিতে লাগিল
লইয়া তরণীখানি![৪]

---

[১] প্রথম প্রকাশ ভারতী (১২৮৫ আশ্বিন)। [২] ঐ ভারতী (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪)।

[৩] প্রথম অংশ আর্যদর্শনে (চৈত্র ১২৮৩ পৃ ৫৩৫-৩৮) এবং দ্বিতীয় অংশ ১২৮৫ ভারতীতে (কার্তিক ১২৮৫) প্রথম প্রকাশিত।

[৪] প্রথম প্রকাশের পাঠ। ভারতী (ফাল্গুন ১২৮৫)।

নায়কের শৌর্যে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া এক অপ্সরা তাহার সঙ্গ লইয়াছিল। নৌকা ডুবিয়া গেলে পর অপ্সরা নায়ককে উদ্ধার করিয়া এক দ্বীপে লইয়া গিয়া বাস করিতে থাকিল। কিন্তু অপ্সরার প্রেমে নায়ক তৃপ্তি পাইল না। সে কেবলি ভাবে,

কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি,
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুম ঘোর।

অপ্সরা অবশেষে প্রিয়ের কল্যাণে নিজের সুখ বিসর্জন দিল।

এস তবে এস, মায়ার বাঁধন
খুলে দিই ধীরে ধীরে,
যেথা সাধ যাও, আমি একাকিনী
বসে থাকি সিন্ধুতীরে।

'অপ্সরা-প্রেম' এবং 'ভগ্নতরী'[১]—এই দুই কবিতার পটভূমিকা জুড়িয়া আছে সমুদ্র। (ভগ্নতরী বিলাতে থাকিতে লেখা। অপ্সরা-প্রেম বোম্বাইয়ে অথবা বিলাতে লেখা।) কবিতা দুইটিতে ভাবেরও মিল আছে। ভগ্নতরী-কাহিনীর খেই যেন বহুকাল পরে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে ধরা হইয়াছে।

অজিত-ললিতা তরুণ দম্পতী। একদা শান্ত সন্ধ্যায় তাহারা নৌকা করিয়া প্রমোদযাত্রায় বাহির হইয়াছে। অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া তাহাদের বিপন্ন করিল। নিমজ্জমান নৌকা পরিত্যাগ করিয়া ললিতার হাত ধরিয়া অজিত জলে ঝাঁপ দিল। সমুদ্রের তরঙ্গ দুইজনকে ছিনাইয়া দুইদিকে লইয়া গেল। এক বিজন দ্বীপের উপকূলে ললিতার অচেতন দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। সেই দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী সুরেশ। বহুকাল পূর্বে নৌকাডুবি হইয়া এই স্থানে তাহারও আগমন। সুরেশের যত্নে ললিতা সুস্থ হইল, কিন্তু অজিতের শোক তাহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে সুরেশের অক্লান্ত সেবার জয় হইল। ললিতার কৃতজ্ঞতা ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হইল এবং অজিতকে সে ভুলিয়া গেল। সুযোগ পাইয়া সুরেশ ললিতাকে লইয়া নিজের দেশে ফিরিল, আর বিপাশার তীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিল। একদিন দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছে। যখন খেয়াল হইল তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে

---

১ পাঁচ সর্গে গাঁথা। প্রথম প্রকাশ ভারতী (আষাঢ় ১২৮৬)। জীবনস্মৃতি হইতে জানা যায় যে ভগ্নতরী যখন লেখা হয় (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৫) তখন তিনি বিলাতে টর্কিতে ছিলেন। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে 'মগ্নতরী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এবং মাথার উপরে ঝঞ্ঝার মেঘ ঘনাইয়াছে। কাছে এক ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া দেখা গেল একটি ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সেই ঘরের কাছে গিয়া ললিতা শুনিল কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে গান গাহিতেছে। সে গান একদা অজিত তাহাকে অনেকবার শুনাইয়াছিল। গান শুনিয়া ললিতার শরীর মন বিকল হইল। ঘরে ঢুকিয়া সুরেশ ও ললিতা দেখিল, শুকনো পাতার বিছানায় মরণাপন্ন অজিত দীনবেশে শুইয়া আছে। ললিতাকে দেখিয়া অজিত উত্তেজনাবশে চীৎকার করিয়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল এবং করুণ দৃষ্টিতে ললিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ললিতাও মূর্ছা গেল। তখন

বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জ্জিল অশনি
জীর্ণগৃহ কাঁপাইয়া—ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ূচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ,—গৃহ পূরিল আঁধারে।

ভগ্নতরীর ভাষায় ও অলঙ্কারে সরলতা ও অভিনবতা দেখা দিয়াছে। যেমন,

ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করেছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী,
মেঘকোলে ঘুমাইয়া পড়েছে দামিনী,
থেকে থেকে স্বপনেতে চমকিত চায়,
ক্ষীণ হাসিখানি হেসে আবার ঘুমায়।

৭

মধ্য-কৈশোরক কালে লেখা একটি গাথা কবিতা, 'বিষ ও সুধা', সন্ধ্যা-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণে (১৮৮২) সঙ্কলিত ছিল।[১] ভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে কবিতাটিকে ভগ্নতরীর পর্যায়ে ফেলিতে পারি, যদিও রচনাকাল ভগ্নতরীর অনেক আগে ব'লিয়াই মনে হয়। নারীপ্রেমের ভঙ্গুরতা উভয় কবিতারই বক্তব্য। তবে বিষ ও-সুধায় অতিরিক্ত আছে সৌভ্রাত্র্য। কাহিনীতে বর্ণনার প্রাধান্য।

নায়ক-কবি ললিত ও তাহার ভগিনী মালতী একসঙ্গে মানুষ হইয়াছিল। তাহাদের আর কেহ ছিল না। ললিতের হৃদয় স্নেহে টলটল।

[১] পৃ ১১১-৩২। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পরিত্যক্ত। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, " 'বিষ ও সুধা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।"

মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
নূতন জীবন যেন সঞ্চারিত মনে।
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি!
মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া!

ভাইবোনের বয়স বাড়িল। নীরদ মালতীকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়া লইয়া গেল। সঙ্গিহারা ললিত অশান্ত হৃদয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সহসা পেত না ভেবে, পেত না খুঁজিয়া
আগে কি ছিল রে যেন এখন তা নাই!
প্রকৃতির কি-যেন কি গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না!

এক বসন্তদিনে ললিত নির্ঝরের ধারে বালিকা দামিনীকে দেখিল। দেখিয়াই ভালোবাসিল। দামিনীও তাহার প্রতি উদাসীন রহিল না। বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেলে ললিতকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাইতে হইল। দামিনীর কাছে বিদায় লইতে গিয়া তাহার মনে শঙ্কা জাগিল, "এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে"। বহু আশা করিয়া ললিত ফিরিয়া আসিল কিন্তু দামিনীকে আর দেখিতে পাইল না। দেখিল মালতী বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের হৃদয়ের ব্যথাকেই বড় করিয়া দেখে, তাই সে মালতীর নীরব বেদনার দুঃসহতা বুঝিল না। মালতী নিজের দুঃখ চাপিয়া ভাইকে সেবা করিতে ও সান্ত্বনা দিতে লাগিল। মালতীর শুশ্রূষায় হৃদয়বেদনা দূর হইয়া গেলে ললিত বুঝিতে পারিল যে মালতী নিজে মৃত্যুবরণ করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে।

বিষ-ও-সুধার ভাষায় আদি-কৈশোরকে প্রত্যাশিত অপরিপক্কতা থাকিলেও কল্পনায় জোর ও রচনায় বৈচিত্র্য আছে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রথম 'উপহার' কবিতাটির বীজ বিষ-ও-সুধার আরম্ভে পাই। বোধ করি সেই কারণেই এই বাল্যরচনাটিকে রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা-সঙ্গীতে স্থান দিয়াছিলেন। প্রভাত-সঙ্গীতের প্রথম কবিতা 'প্রভাত বিহঙ্গের গান'-এর কলভাষও এখানে অশ্রুত নয়॥

৮

'ভগ্নহৃদয়'[১] রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম গাথা-কাব্য, চৌত্রিশ সর্গে গাঁথা। সংলাপের আকারে লেখা হইলেও ভগ্নহৃদয় নাটক নয়, কাব্য।[২] পাত্রপাত্রীর সংখ্যা কম নয়। প্রধান নায়ক কবি। তাহার প্রতি বাল্যসখী মুরলার গোপন ও গভীর ভালোবাসা, অথচ ভালোবাসার পাত্রের অভাবে কবির হৃদয় নিরাশ্রয়পীড়া ভোগ করিতেছে। মুরলা তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। একদিন কবি বিলাসিনী তরুণী নলিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নলিনীর অসংখ্য ভক্ত। কাহাকেও সে ভালোবাসে না, কিন্তু সকলকেই হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে ইঙ্গিতে আশায় ভুলাইয়া রাখে। মুরলার ভাই অনিল ললিতাকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। ললিতা বড় লাজুক মেয়ে। অনিল কিছুতে তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিতেছে না। সেও শেষে নলিনীর চটকে ভুলিল। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ললিতা অন্তর্দাহে জ্বলিয়া মরণের দিকে পা বাড়াইল। এদিকে মুরলা ভগ্নহৃদয়ে নিরুদ্দেশ হইলে পর কবি বুঝিল তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান সে অধিকার করিয়া ছিল। মরণাপন্ন মুরলাকে খুঁজিয়া পাইল কবি এক কুটীরে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দুইজনের মিলন হইল। মোহপাশবিমুক্ত অনিলও মৃতকল্প ললিতার দেখা পাইল।

এখানেও কবির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকেই প্রতিফলিত করিয়াছেন। নায়ক-কবির মুখে যেন তাঁহারই নিজের কথা।

বহুদিন হ'তে সখি আমার হৃদয়
হোয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়,
চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিয়াসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া!
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয় ভিতরে
হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি তরে!

---

[১] বিলাতে থাকিতে ভগ্নহৃদয়ের আরম্ভ হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময় জাহাজে প্রথম অংশের বেশির ভাগ লেখা হয়। দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ কাব্যটি শেষ করেন। ভারতীতে (১২৮০ কার্তিক-ফাল্গুন) ছয় সর্গ মাত্র বাহির হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় ১৮০৩ শকাব্দে (১৮৮১)।

[২] ভগ্নহৃদয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মুরলায় বিষ-ও-সুধার মালতীর ছায়া পড়িয়াছে। নলিনী সম্ভবত কোন অবাঙ্গালী মেয়ের ছায়াবহ।[১]

বাৎসল্য-স্নেহের আবির্ভাবে মন নরম হয় এবং প্রেমের ভূমি প্রস্তুত হয়,— এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখায় পাই। ইহার ইঙ্গিত ভগ্নহৃদয়েও আছে।[২]

সপ্তম সর্গের প্রথমে যে কবিতাটি আছে তাহা 'লাজময়ী' নামে শৈশব-সঙ্গীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ভগ্নহৃদয়ের কয়েকটি গানে পরিপক্বতার আভাস আছে। যেমন,

আঁখি দুটি লইনু তুলিয়া,
দূরে যেতে ফিরানু বদন!
অমনি সে নূপুরের মত
চরণ ধরিল জড়াইয়া,
সাথে সাথে এল সারা পথ
রুনু ঝুনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

ছবি-ও-গানের 'রাহুর প্রেম'এর পূর্বাভাষ

মরিতে যেতেছি, তবু রাহুর মতন
পদে পদে সাথে সাথে করিব গমন?

৯

নামপত্রে "নাটিকা" ছাপ এবং গ্রন্থমধ্যে "দৃশ্য" বিভাগ থাকিলেও 'রুদ্রচণ্ড'[৩] গাথা-কাব্যই। ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা-কাব্য, বিলুপ্ত বাল্য-রচনা পৃথ্বীরাজের-পরাজয়ের কৈশোর সংস্করণ। রুদ্রচণ্ডের ছন্দ প্রধানত অমিত্রাক্ষর পয়ার-ত্রিপদী।

পরাজিত ও হৃতরাজ্য রুদ্রচণ্ড বিজয়ী পৃথ্বীরাজকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া কন্যা অমিয়াকে লইয়া বনবাসী হইয়াছে। চাঁদ-কবি অমিয়াকে স্নেহ করে এবং

---

১ "নলিনী"র প্রতি কবির মনোভাব সন্ধ্যা-সঙ্গীতের 'দুদিন' কবিতায় লক্ষিতব্য।

২ দ্বাত্রিংশ সর্গে নলিনীর চিন্তা, "সেদিন খেলিতেছিল নীরদের ছেলে দুটি…" দ্রষ্টব্য।

৩ ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত। ইহা রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদে থাকা কালে প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে লেখা এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রারম্ভে ইহা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল, এই অনুমানই সঙ্গততর। বৌঠাকুরানীর-হাটের সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের বিষয়বস্তুর মর্মগত মিল অনুধাবনযোগ্য।

মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে কবিতা শোনায়। আত্মগ্লানির বশে রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে। একদিন পিতার নিষ্ঠুর বাক্যে মর্মাহত হইয়া অমিয়া মূর্ছা গেল। কন্যার জ্ঞানহীন দেহ লইয়া রুদ্রচণ্ড বনের বাহিরে রাখিয়া আসিল। মূর্ছা ভাঙ্গিলে পর অমিয়া চাঁদের অন্বেষণে শহরের দিকে চলিল। পথে আশ্রয় মিলিল। এদিকে চাঁদও অমিয়াকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। মহম্মদ ঘোরীর দূতের মুখে রুদ্রচণ্ড খবর পাইয়াছে যে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিয়াছে। পৃথ্বীরাজের শত্রু সে, জানিয়া মহম্মদ ঘোরী তাহার সাহায্যার্থী। নিজের মুখের গ্রাস অন্যে কাড়িতে আসিয়াছে দেখিয়া রুদ্রচণ্ড দূতকে বলিল,

যেমন পৃথ্বীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
তেমনি আমারো শত্রু কহি তোরে দূত?
পৃথ্বীর রাজত্ব, প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি।
অশুভ বারতা এই করিব প্রচার।

রুদ্রচণ্ড দূতকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে দিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পথে চাঁদ অমিয়াকে দেখিল। অমিয়াও তাহাকে দেখিয়া "ভাই, ভাই" বলিয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সেনাপতি থামিতে দিল না। বলিল, এখন ছেলেখেলার সময় নয়, "আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত"। রণ-যাত্রার কোলাহলে চাঁদের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। পৃথ্বীরাজ বাঁচিয়া আছে কিনা জানিতে রুদ্রচণ্ড শহরে আসিয়াছে। নগরের লোক ঘৃণাভরে উত্তর দিল না। ক্রুদ্ধ নারীর মত রুদ্রচণ্ড নগরবাসীর প্রতি ঘৃণা বৃষ্টি করিতে লাগিল।

নগরকুক্কুর যত মরুক মরুক!
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল
যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে ডরিয়া মরুক!

যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইয়াছে জানিয়া রুদ্রচণ্ড যেন নিবিয়া গেল। তাহার জীবনের প্রয়োজন এক মুহূর্তে শূন্য হইয়া গেল। সে ভাবিল, পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরিয়াছে সে নিজে। জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় রুদ্রচণ্ড আত্মঘাতী হইল। যখন সে নিজের বুকে ছুরি হানিয়াছে তখন অমিয়া আসিয়া পড়িল। মরণের পূর্বমুহূর্তে রুদ্রচণ্ডের স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতি যেন ফিরিয়া আসিল। সে কন্যাকে বুকে

টানিয়া লইল। এদিকে পৃথ্বীরাজের পরাজয়-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চাঁদও অমিয়াকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সে যখন অমিয়ার কুটীরে পৌছিল তখন রুদ্রচণ্ড মৃত, অমিয়া মুমূর্ষু। চাঁদকে দেখিয়া অমিয়া তাহার শেষ প্রশ্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। চাঁদ-কবির হৃদয়ে করুণ ক্রন্দন বাজিতে লাগিল।

করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল,
উত্তর শুনিতে তার দাঁড়ালি নে কেন?
ভাল বোন, দেখা হবে আর একদিন
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দু-জনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।

রুদ্রচণ্ডের ভূমিকা ভালো, তাহাতে নাটকীয়তাও আছে। পূর্ববর্তী গাথা-কাব্যের সঙ্গে রুদ্রচণ্ডের পার্থক্য—প্রেমের স্থানে ভ্রাতৃস্নেহ। এই হিসাবে রুদ্রচণ্ডকে 'বৌঠাকুরানীর হাট-এর'[১] পূর্বাভাষ বলা যায়। অমিয়ার মর্মবেদনা বৌঠাকুরানীর-হাটের একাধিক পাত্রপাত্রীর অন্তরে অনুভূত।

সঙ্কীর্ণ হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটীর সম্মুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!

বনফুল ও কবি-কাহিনী অংশতও পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ভগ্নহৃদয়ের কিছু কিছু অংশ মুক্ত কবিতারূপে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) কৈশোরক ভাগে গৃহীত হইয়াছিল।[২] রুদ্রচণ্ড হইতে দুইটি অংশ,[৩] অপ্সরার প্রেম হইতে তিনটি অংশ[৪] ও ফুলবালা হইতে একটি অংশ[৫] তাহাতে ছিল। কাব্যগ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত অংশগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন আছে॥

---

১ প্রথম প্রকাশ ভারতী (১২৮৮ কার্তিক—১২৮৯ আশ্বিন)।

২ কৈশোরক ভাগের চল্লিশটি কবিতার মধ্যে উনত্রিশটি ভগ্নহৃদয় হইতে নেওয়া—'বাসক-সজ্জা' (১), 'শ্যামা' (২), 'চাঞ্চল্য' (২), 'প্রথম দর্শন' (৪), 'মোহ' (৪), 'আন্দোলন' (৪), 'উল্লাস' (৪), 'একাকিনী' (৫), 'ভাববেগ' (৬), 'উচ্ছ্বাস' (৬), 'লাজময়ী' (৭), 'হারা হৃদয়ের গান' (৯), 'ছায়া' (১১), 'বুঝা পড়া' (১২), 'আত্ম-সমর্পণ' (১৩), 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' (১৭), 'অভাগিনী' (১৮), 'নৈরাশ্য' (১৯), 'অবজ্ঞা' (২০), 'জাগরণ' (২১), 'বসন্ত সমীর' (২২), 'সংশয়' (২৪), 'প্রত্যাখ্যান' (২৬), 'সায়াহ্নে' (২৮), 'বিশ্রাম' (২৯), 'খেলাভঙ্গ' (৩০), 'শেষ' (৩৪)।

৩ 'আরম্ভ' (৩), 'অবসান' (৩)। ৪ 'সান্ত্বনা', 'সোহাগ', 'বিদায় গান'। ৫ 'নির্বন্ধ'।

১০

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা ছোট কবিতা (লিরিক) বোধ হয় 'শ্মশানে রজনীগন্ধা', জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। এই সংখ্যায় বনফুলের কোন অংশ বাহির হয় নাই। বনফুলে যেমন এ কবিতায়ও তেমনি লেখকের নাম নাই। তবে কবিতাটির ভাব ও ভাষা হইতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া বোঝা যায়। অন্যত্র সঙ্কলিত নয় বলিয়া কবিতাটির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

মরি কি ফুল ফুটেছে আজ সকালে!
রাত্রযোগে গেছে ঝড়, মহীরুহ দড়মড়
জানিনে যে এত সুখ ছিল মোর কপালে!
ভীষণ প্রবল ঝড়ে, গোলাপ গিয়েছে পোড়ে
ফুটন্ত কামিনী গাছ ধরাসাৎ হয়েছে!
বেল যূঁই যূথি জাতি— সকলেই হীনভাতি
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সব ভুঁয়ে পড়ে রয়েছে!
ভেবেছিনু বুঝি হায়, বাগান শ্মশান প্রায়
ভেঙ্গে গেছে সব গাছ এই ভাঙ্গা কপালে!
তা নয় তা নয় সখি, একি অপরূপ দেখি
শ্মশানে রজনীগন্ধা ফুটে আছে সকালে।

কবিতাটি ক্ষণিকার 'দুর্দিনের' আরম্ভ স্মরণ করাইয়া দেয়

এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ
কি জানি কি ভাবি মনে।
ঝড় হয়ে গেছে কাল রজনীতে
রজনীগন্ধার বনে।

১১

১২৮৩ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতী বাহির হইল। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম সংখ্যায় 'ভারতী', দ্বিতীয় সংখ্যায় 'হিমালয়' এবং তৃতীয় সংখ্যায় 'আগমনী' রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই মনে করি।[১] এই (আশ্বিন) সংখ্যা হইতেই 'ভানুসিংহের কবিতা'

[১] তৃতীয় কবিতাটির সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই। ইহার আরম্ভ, "সুধীরে নিশায় আঁধার ভেদিয়া"। রবীন্দ্রনাথের মধ্য-কৈশোরক কালের রচনায় "সুধীরে" শব্দের প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

শুরু হইয়াছিল। প্রথম কবিতা "সজনি গো—শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা"। দ্বিতীয় কবিতা "গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে" বাহির হইল অগ্রহায়ণে। এই কবিতাটি লিখিয়া কবি মনের মধ্যে যে নিবিড় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি সুদীর্ঘকালেও লুপ্ত হয় নাই।

> একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম "গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে"। লিখিয়া ভারী খুশী হইলাম।

১২৮৪ সালের ভারতীতে ভানুসিংহের সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়, পরে আরও ছয়টি। ছবি-ও-গানে দুইটি ছিল। সবশুদ্ধ এই পনেরোটি পুরানো ও ছয়টি নূতন লেখা ব্রজবুলি-ছাঁদের কবিতা লইয়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১২৯১, ১৮৮৪)। কড়ি-ও-কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) নয়টি এমন কবিতা গানরূপে ছিল, তাহার মধ্যে একটি নূতন।[১] কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) 'কৈশোরক' ভাগের দ্বিতীয় অংশ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ইহাতে প্রত্যেক কবিতার নাম ছিল। আর "দেখ লো সজনী চাঁদনী রজনী"[২] কবিতাটির স্থানে ছিল "কো তুঁহু বোলবি মোয়"। "হম সখি দারিদ নারী" আর "সখি রে পিরীত বুঝবে কে"[৩] পরিত্যক্ত এবং 'সংশয়' নামে "হম যব না রব সজনী" পরিগৃহীত হইয়াছিল। ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলীর প্রচলিত গ্রন্থরূপ কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ বালক-কবি টমাস চ্যাটার্টনের রচিত এবং "T. Rowlie" ছদ্মনামে প্রকাশিত, প্রাচীন ইংরেজী কবিদের ধরনে লেখা জাল কবিতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলী রচনার একমাত্র অথবা প্রধান প্রবর্তক নয়। বৈষ্ণব-পদাবলী, বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতির কবিতা, ইহার আগেই রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করিয়াছিল এবং জয়দেবের পদাবলীর পরিচয় আরও আগে পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। অনুকরণ হইলেও ভানুসিংহের কবিতায় যে বিশেষত্ব দেখা গেল তাহা সমসাময়িক গাথা- অথবা গীতি-কবিতায় নাই। তাহার কারণ ভানুসিংহের পদাবলী লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ ভাব ভাষা ও ছন্দ তিনটিই হাতের কাছে তৈয়ারি পাইয়াছিলেন। অনুরূপ কারণে গদ্য রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা প্রথম হইতেই প্রকট।

---

[১] "কো তুঁহু বোলবি মোয়"। [২] ভারতী (বৈশাখ ১২৮৭)। [৩] ভারতী (মাঘ, ফাল্গুন ১২৮৪)।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক কাব্যের মধ্যে একমাত্র ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলীই —সুরের উপর ভর করিয়া—শেষ পর্যন্ত টিকিয়া গিয়াছে। পদগুলি "কপিবুকের কবিতা" হইলেও এবং তাহাতে প্রাচীন পদকর্তাদের অকৃত্রিম ভাবাবেগের "প্রাণগলানো ঢালা সুর" না থাকিলেও গান হিসাবে নির্গুণ নয়। প্রাচীন পদকর্তারা সকলেই যে দৈবী প্রেরণা লইয়া ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে পদাবলী রচনা করিতেন এমন কথা বলিতে পারি না। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দের পদাবলী অধিকাংশই যে নিতান্ত গতানুগতিক রচনা সে কথা মনে রাখিয়া আমরা কবির কথায় সায় দিতে পারি ("ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয়ই ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।") এই গানগুলির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কৈশোরক যুগের অপর গান, গাথা[১] ও গীতিকবিতা পরে শৈশব-সঙ্গীতে (১২৯১, ১৮৮৪) সঙ্কলিত হয়। কেবল একটি কবিতা ('দুদিন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭), সন্ধ্যা-সঙ্গীতে ও দুইটি কবিতা ('শরতে প্রকৃতি', আশ্বিন ১২৮৭ ; 'শীত', মাঘ ১২৮৭) প্রভাত-সঙ্গীতে স্থান পায়। শৈশব-সঙ্গীতের অপর কবিতার মধ্যে 'লাজময়ী' ভগ্নহৃদয় (সপ্তম সর্গ) হইতে নেওয়া। 'অতীত ও ভবিষ্যৎ', 'ফুলের ধ্যান' ও 'প্রভাতী'—এই তিনটি কবিতা নূতন। শৈশব-সঙ্গীতের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।"

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনে (১৮৮০ ফেব্রুয়ারি) কৈশোরক যুগের অবসান ঘটল। এ অবসানের সূচনা 'দুদিন'-এ। কল্পনার রঙীন মায়া ছাড়িয়া দিয়া কবি সর্বপ্রথম এইখানে নিজের হৃদয়াবেগকেই বড় করিলেন। এইজন্য 'দুদিন' কবিতাটির একটু বিশেষ মূল্য আছে।

ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া !
দুদিনের পদচিহ্ন চিরকাল তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে !

---

[১] শৈশব-সঙ্গীতে গাথাগুলি কিছু কিছু কাটছাট করা হইয়াছিল। সবচেয়ে বেশি হইয়াছে 'ভারতী বন্দনা'য় (ভারতী মাঘ ১২৮৪)।

১২

ভগ্নতরী-ভগ্নহৃদয়ের হৃদয়ের পালা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু নিরুদ্ধ বাসনাপাশ হইতে মুক্তি কই। নবযৌবনের অব্যক্ত ও অবক্তব্য বেদনা তাই প্রকাশের প্রত্যাশা ভরসা করিল সাঁঝসকালের আলো-আঁধারিতে। এ পালার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২)। সন্ধ্যা-সঙ্গীতে প্রথমে পঁচিশটি কবিতা ছিল।[১] 'বিষ ও সুধা' বাল্যরচনা দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯২) বাদ গেল। আরও দুইটি[২] বাদ পড়িল কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (১৯০৩)।

সন্ধ্যা-সঙ্গীতে অপরিণতির নিদর্শনের অভাব নাই, কিন্তু ইহাতে ভাষায় ও ছন্দে যে অভিনবত্ব প্রকাশিত তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রসজ্ঞের চোখ এড়ায় নাই। ইতিপূর্বে বিহারীলালের কবিতায় যে আত্মগত ভাবতন্ময়তা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের ভাবালুতা অন্য রকমের। এ ভাবরস আনন্দও নয়, বিষাদও নয়। প্রত্যাসন্ন প্রকাশবেদনার ব্যাকুলতা যেন নব-যৌবনের অস্থিরতার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া কবিচিত্তকে সঙ্কুচিত, প্রকাশভীরু ও স্পর্শকাতর করিয়াছিল। হৃদয়াবেগের গুটী কাটিয়া বাহির হইবার বেদনা সন্ধ্যা-সঙ্গীতের বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে গুঞ্জরিত। একটি সমসাময়িক টিপ্পনীতে এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনের গতিক বোঝা যায়।

> আমরা মানুষরা কতকগুলি কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকার মত জগতকে চারিদিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছি; উষাকে, জ্যোৎস্নাকে গানের শব্দকে দংশন করিতেছি, একটুখানি খাদ্য পাইবার জন্য। হায়রে, খাদ্য কোথায়! সূর্য্য, উদয় হও! চন্দ্র হাস! ফুল ফুটিয়া ওঠ! আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা কর; আমাকে আমার পাশে বসিয়া থাকিতে না হয়; অনিচ্ছারচিত বাসর শয্যায় শুইয়া আমাকে যেন আমার আলিঙ্গনে পড়িয়া কাঁদিতে না হয়।

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের আরম্ভ জোড়াসাঁকোয়, বিস্তার চন্দননগরে, আর অবসান দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে। জীবনস্মৃতিতে আছে

> এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতলার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি যাপন করিতাম। এইরূপে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্য রচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল।

---

[১] বারোটি কবিতা প্রথমে ভারতীতে ছাপা হইয়াছিল।

[২] 'কেন গান গাই' ও 'কেন গান শুনাই'।

এই মুক্তিলাভের প্রথম পরিচয় 'দুঃখ আবাহন' কবিতাটিতে[১]। যৌবনবেদনায় প্রেমের যে নিগূঢ় তাড়না আছে তাহা আত্মনিপীড়নের মধ্যে স্বস্তি খোঁজে। কবির অন্তর তাই প্রাণের সঙ্গী রূপে দুঃখকে আহ্বান করিয়াছে ॥

১৩

স্থান, কাল ও ভাব অনুসারে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিতায় চারিটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরের কবিতাগুলি জোড়াসাঁকোয় লেখা—'দুঃখ আবাহন', 'পরিত্যক্ত', 'তারকার আত্মহত্যা', 'সুখের বিলাপ', 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি'। কৈশোর বাসনার সঙ্গে বয়ঃসন্ধি-লাজুকতার দ্বন্দ্ব, অন্তর্দাহ, দুঃখাতুরতা, আত্মলোপেচ্ছা ও ভবিষ্যতের আশা—সব কিছু মিলিয়া যেন উত্তপ্ত আবেগের বাষ্পোচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়াছে এই কবিতাগুলিতে। দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে (বৈশাখ ১২৮৮), দেরাদুনের পথে অথবা দেরাদুন হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরে—'আশার নৈরাশ্য', 'শিশির', 'পরাজয়' ও 'গান সমাপন'।[২] ভবিষ্যৎ-জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্ট পথ হইতে বার বার ভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার প্রতিধ্বনি যেন এই কবিতাগুলিতে।

> সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হ'ল
> তোরি শুধু হ'ল পরাজয়,
> প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
> জীবনের রাজ্য সমুদয়। ('পরাজয় সঙ্গীত')

চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের কুঠীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সপরিবারে কিছুকাল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। গদ্যপদ্য অনেক রচনায় মোরান সাহেবের কুঠীর স্মৃতি বিজড়িত আছে। সেইখানে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের তৃতীয় স্তরের কবিতাগুলি লেখা,—'অসহ্য ভালবাসা', 'হলাহল', 'পাষাণী', 'শান্তি-গীত', 'আবার', 'গান আরম্ভ' ও 'অনুগ্রহ'।

প্রতিদানবিহীন প্রেমের জ্বালা হৃদয়াবেগের দাহ এবং অবশেষে শ্রান্তির ক্ষণিক শান্তি—এই ভাবপরম্পরা কবিতাগুলির উৎস। প্রথমে দেহমনের সংঘর্ষ।

---

১ প্রথম প্রকাশ ভারতী (ফাল্গুন ১২৮৭)।

২ ভারতী (শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ ১২৮৮)।

এইরূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ বাগে
এত বুঝি ভাল নাহি লাগে ! ('অসহ্য ভালবাসা')

তাহার পরে ক্ষোভ।

ললিত গলিত হাস, জাগরণ দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন সলিলধার,
মৃদু হাসি, মৃদু কথা, আদরের, উপেক্ষার,
এই শুধু—এই শুধু—দিনরাত এই শুধু,
এমন ক'দিন কাটে আর। ('হলাহল')

শেষে অবসাদ।

কাল উঠিস্ আবার
খেলিস্ দুরন্ত খেলা হৃদয় আমার !
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস্ বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।
আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়। ('শান্তি-গীত')

আবার উন্মাদনা জাগিবার শঙ্কা জাগে মাঝে মাঝে।

যাও, মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে
নিও না, নিও না মন মোর ;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ সখ্যতার ডোর ! ('আবার')

বাসনার দাহ জুড়াইয়া গেলে চিত্ত শান্ত হয়, মনের সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়াও হয়, কাব্যলক্ষ্মীর অধিবাসের জন্য কবিচিত্ত প্রস্তুতি বোধ করে।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার, ('গান আরম্ভ'[১]

[১] ভারতীতে (পৌষ ১২৮৮) 'কবিতা সাধনা' নামে প্রকাশিত।

চতুর্থ স্তরের কবিতাগুলি সদর স্ট্রীটের বাসায় লেখা,—'সংগ্রাম সঙ্গীত', 'আমিহারা', 'সন্ধ্যা', 'কেন গান গাই', 'কেন গান শুনাই', 'উপহার' (প্রথম) ও 'উপহার' (দ্বিতীয়)। এই কবিতাগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে হৃদয়দ্বন্দ্বের অবসানে শান্তি আসিয়াছে আর ধৈর্যের ও কারুণ্যের সহযোগে প্রেমভাবনায় স্নিগ্ধতা আসিয়াছে। কাব্যদেবীর বেদী সাজাইয়া বসিয়া থাকিয়া আর স্বস্তি নাই। এখন উঠিয়া পড়িয়া হৃদয়ের সঙ্গে যুঝিতে হইবে। বিফল বাসনার তিক্ততা দূর হইলেই সংসারের কাজে মন লাগানো সহজ হইয়া আসিবে।

এ আমার বিদ্রোহী হৃদয়
আমারে করিয়াছে জয়।
যেদিকে মেলিছে আঁখি জ্বলে তরু মরে পাখী,
সে দিক হতেছে মরুময় !
চরাচরে আগুন লাগায় !
চারিদিকে দুর্ভিক্ষ জাগায় !
পরাণের অন্তঃপুরে কাঁদিছে আকাশ পুরে
স্নেহ প্রেম বিধবার বেশে। ('সংগ্রাম সঙ্গীত')

তাই সংকল্প

মিছা ব'সে রহিব না আর
চরাচর হারায় আমার।…
আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব বেঁধে ;
জগতের একেকটি গ্রাম।…
হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে ;
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে। ('আমি হারা')

কিন্তু চেষ্টা করিলেও শৈশবের সহজ সম্পর্ক ফিরিয়া আসিবার নয়। তাই ব্যাকুলতা রহিয়া যায়।

পরাণের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে
আমি মোর হারাল' কোথায় ?…
দিবস শুধায় মোরে—রজনী শুধায়,
নিতি তারা অশ্রুবারি ফেলে,
শুধায় আকুল হ'য়ে চন্দ্র সূর্য্য তারা
"কোথা তুমি, কোথা তুমি গেলে ?"

১৪

সদর স্ট্রীটে থাকিতে থাকিতেই কবিচিত্তগহনে প্রদোষের আঁধার কাটিয়া গিয়া প্রত্যুষের আলো জাগিয়া উঠিল। 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) গ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে নবজীবনের প্রভাতে জাগরণের আভাস ফুটিয়াছে। প্রভাত-সঙ্গীতের একুশটি কবিতার মধ্যে একটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর লেখা--'অভিমানিনী-নির্ঝরিণী'।[১] পাঁচটি ইংরেজীর অনুবাদ।[২] দুইটি কৈশোরক রচনা,—'শরতে প্রকৃতি' ও 'শীত'।[৩] দুইটি সন্ধ্যা-সঙ্গীতের সমকালীন—'মহাস্বপ্ন'ও 'সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়'।[৪]

প্রভাত-সঙ্গীতের সূত্রপাত 'অনন্ত মরণ' কবিতাটিতে।[৫]

আনন্দে পুরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহাযজ্ঞে এসেছি রে
উঠেছে মহান কলরব।

মূল সুর বাজিয়া উঠিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়[৬]। অকস্মা... ...কদিন
হৃদয়ের তামসী যবনিকা সরিয়া গেল এবং নিখিল জীবলীলার ... ...ময় প্রবাহ
অপরূপ হইয়া দেখা দিল। (জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।) কবির ... ...হেতু উল্লাসে
উদ্বেল হইয়া গাহিয়া উঠিল

জগতে ঢালিব প্রাণ
গাহিব করুণা গান
উদ্বেগ অধীর ...
সুদূর সম... গান করিব শেষ।

সে প্রাণ মিশাব, ...কস্মাৎ অভাবিত মহিমায় উদ্ভাসিত
বৃহৎ সংসারের প্রাঙ্গণে মা...
...ন আছে যত
হইয়া দেখা দিল।
...মানুষ শত শত
...ণে মোর হাসিছে গলাগলি ('প্রভাত-উৎসব')

...তার প্রসঙ্গে রচিত এবং ভারতীতে (অগ্রহায়ণ ১২৮৯) একত্র
... (চৈত্র ১৮১৩ শক, ১৮৯২) হইতে কবিতাটি পরিত্যক্ত।

১ 'নির্ঝ... ...রতীর আষাঢ় ও কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।
প্রকাশি... ...বন ও মাঘ ১২৮৭)। দ্বিতীয় সংস্করণে 'শরতে প্রকৃতি' বাদ গিয়াছে।
২ ...ঘ ও চৈত্র ১২৮৮)। ৫ ঐ আশ্বিন ১২৮৯। ৬ ঐ অগ্রহায়ণ ১২৮৯

কবি অতীত জীবনকে যেন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন।[১] (রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় তাঁহার বাল্যস্মৃতির রেশ আছে। এইখান হইতে তাহার সূত্রপাত।)

কে রে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

এই অভিনব বাৎসল্যের স্নেহধারায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইল॥

১৫

প্রথম সংস্করণ প্রভাত-সঙ্গীতের 'স্নেহ-উপহার' কবিতায় বাৎসল্যস্নেহ প্রস্ফুট।[১] 'সাধ'-এর সঙ্গে শৈশব-সঙ্গীতের 'ফুলবালা' ধরনের কবিতার পার্থক্য এইখানেই। বিতাটির প্রথম স্তবকেই নূতনতর ছন্দতরঙ্গ দেখা দিয়াছে।

অরুণময়ী তরুণ উষা
জাগায়ে দিল গান।
পূরব মেঘে কনক মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগত ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ!
কাহার হাসি বহিয়া এনে
“কাহার হাসি বহিয়া   করিলি সুধা দান!

মর্মকথা এই। কবিচিত্তের যে করিলি সুধা দান”—'প্রতিধ্বনি' কবিতারও 'প্রতিধ্বনি'তে তাহা দিকে দিকে নস নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে স্বত-উৎসারিত, উপলব্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন দর্য ও আনন্দস্রোতের অংশরূপে

এতদিনে জগতকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখি
আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আ
হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপ এইজন্য তাহার একটা সমগ্র
জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল ন একটা গভীর কেন্দ্রস্থান
করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার . পড়িল তখন সেই
অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আগাগোড়া পরিপূর্ণ
পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়াছিল যে
স্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিং দাইয়া
সৌন্দর্য্যে ব্যাকুল করে।

---

১ 'পুনর্মিলন', ভারতী চৈত্র ১২৮৯।

প্রভাত-সঙ্গীতে বড় কবিতা আছে তিনটি—'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (ছত্র-সংখ্যা[১] ২৬৭), 'প্রতিধ্বনি' (ঐ ১৫০) ও 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়'[২] (ঐ ২৭৮)। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পরিচিত কবিতার অন্যতম। প্রতিধ্বনির মর্ম নির্ঝরের-স্বপ্নভঙ্গের অপেক্ষাও নিগূঢ়। অন্তরের আবেগ যাহা আভাসে বোঝা যাইতেছে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া ধরা যাইতেছে না তাহাই প্রতিধ্বনির সিম্বলে অভিব্যক্ত।

সঙ্গীত সৌরভ, শোভা, জগতে যা কিছু আছে,
কবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।

কবিতাটির ভাষায় একটু নূতন রকমের দৃঢ়তার পরিচয় আছে। আর আছে একটি বিরাট প্রতিমান।

অরণ্যের, পর্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার মর্মর,…
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচরে,

'মহাস্বপ্ন'তেও একটি বিরাট প্রতিমান আছে। এই প্রতিমানটি দীর্ঘকাল পরেও দেখা দিয়াছে।

ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তামসিনী নিশি

'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়' রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কবিতা যাহাতে পৌরাণিক মিথলজি ও হিন্দুশাস্ত্রীয় দেবভাবনা ভাবলোকসৃষ্টির প্রতিমার কাজে আগাগোড়া ব্যবহৃত। কবিতাটির আরম্ভে ব্রহ্মা

দেবশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্যপরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।

মধ্যে বিষ্ণু

বিষ্ণু আসি মহাকাশে লেখনী ধরিল করে
মহান্ কালের পত্র খুলি,
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
একে একে পরম যতনে
লিখি লিখি যুগ যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।

১ ছত্রসংখ্যা প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসারে। ২ ভারতী বৈশাখ ১২৯০।

অন্তে শিব

প্রলয়-পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদি অন্ত থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।

'স্রোত' কবিতায় কবিচিত্তের ভাবতন্ময়তা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত।

আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনকে যে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায় তাহার একটু ইঙ্গিত রহিয়াছে 'চেয়ে থাকা'য়। বোধ করি এইটিই প্রভাত-সঙ্গীতের বিশিষ্টতম কবিতা।

সুধীর-স্রোতে তরণীগুলি যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায় ভাসিয়া যায়, কত না নরনারী!
না জানি তারা কোথায় থাকে যেতেছে কোন্ দেশে ;
সুদুর তীরে কোথায় গিয়ে থামিবে অবশেষে!
কত কি আশা গড়িছে ব'সে তাদের মনখানি
কত কি সুখ, কত কি দুখ, কিছুই নাহি জানি!

সব দিক দিয়া জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের এষণা রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলগত প্রয়তি (ইম্পাল্স্)। এখন শুধু দুই চোখ ভরিয়া জগতের রূপরস নিঃশেষে পান করিবার জন্য সমুৎসুকতা।

যায় রে সাধ জগত পানে কেবলি চেয়ে রই
অবাক্ হয়ে আপনা ভুলে কথাটি নাহি কই ;

এই চোখের নেশা যৌবনস্বপ্নকে নবরাগে রঞ্জিত করিয়া দিয়া রবীন্দ্রকাব্যে পালা-বদলের সূচনা করিল। গানে ছবি ফুটিল॥

১৬

'ছবি ও গান'এর[১] (১৮৮৪) পালা শুরু প্রভাত-সঙ্গীত শেষ হইবার আগেই। বইটির প্রথম সংস্করণে তিরিশটি কবিতা ছিল। তাহার মধ্যে প্রথম ও শেষ

[১] অনেকগুলি কবিতা লেখা হইয়াছিল ১২৮৯ সালের শেষের দিকে, প্রভাত-সঙ্গীত বাহির হইবার আগে। "গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এই বৎসরকার বসন্তের মালা গাঁথিলাম" (উৎসর্গ)। "এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতাগুলি গতবৎসরে লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।" (বিজ্ঞাপন)।

কবিতা ব্রজবুলি ছাঁদে।[১] তাহার পর ছবি-ও-গান দ্বিতীয় সংস্করণ কড়ি-ও-কোমলের (১৩০১) অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহাতে ছয়টি মাত্র কবিতা স্থান পাইয়াছিল।[২] কাব্য-গ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) ছবি-ও-গান আবার পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিল।

কাল ও ভাব অনুসারে ছবি-ও-গানের রচনা তিন স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে 'নিশীথ-চেতনা' ও 'নিশীথ-জগৎ'।[৩] দ্বিতীয় স্তরের কবিতাগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রকায়। এগুলি ১২৮৯ সালের শেষে ও ১২৯০ সালের প্রথমে, কারোয়ার যাত্রার আগে লেখা—'কে ?',[৪] 'সুখ-স্বপ্ন', 'একাকিনী', 'গ্রামে', 'বিদায়', 'বিরহ', 'বাদল', 'আর্তস্বর', 'পোড়ো বাড়ি', 'অভিমানিনী' ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরের কবিতাগুলি ১২৯০ সালের মধ্য ও শেষ ভাগে, কারোয়ারে ও সেখান হইতে ফিরিবার পরে লেখা—'যোগী',[৫] 'সুখের স্মৃতি',[৬] 'স্মৃতিপ্রতিমা', 'স্নেহময়ী', 'রাহুর প্রেম', 'মধ্যাহ্নে', 'পূর্ণিমায়'[৭] ইত্যাদি।

প্রথম স্তরের কবিতা দুইটিতে জাগরোদ্বেল কবিহৃদয় প্রভাত-সঙ্গীতের জন্য উৎকর্ণ। বৃহৎ সংসারের বিচিত্র কর্মচাঞ্চল্য কবির স্তব্ধ মানসপটে হালকা তুলি বুলাইয়া ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে।

কত আলো, কত ছায়া,
কত আশা, কত মায়া,
কত ভয়, কত শোক, কত কি যে কোলাহল,
কত পশু, কত পাখী, কত মানুষের দল !
উপরেতে চেয়ে দেখ কি প্রশান্ত বিভাবরী,
নিশ্বাস পড়ে না যেন জগৎ রয়েছে মরি !
একবার কর মনে
আঁধারের সঙ্গোপনে
কি গভীর কলরব—চেতনার ছেলেখেলা—
সমস্ত জগত ব্যেপে স্বপনের মহা-মেলা ! ('নিশীথ-চেতনা')

ছবি-ও-গানের অনেকগুলি কবিতার ছন্দে ও ভাষায় যেন এই নেশার ঘোর লাগিয়া আছে। নিম্নের উদ্ধৃতিতে পরিচিত ছন্দোবন্ধের যতি তাল মিলিবে না। ভাষায়ও ছড়া-বন্ধের স্বাধীনতার আভাস।

১ 'দুহুঁ' ও 'অভিসার' (ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, শ্রাবণ ১২৮৮) পরে ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলীভুক্ত।

২ 'সুখের স্মৃতি', 'যোগী', 'স্মৃতিপ্রতিমা', 'স্নেহময়ী', 'রাহুর প্রেম', 'মধ্যাহ্নে', 'পোড়ো বাড়ি' এবং 'নিশীথ চেতনা'।

৩ ভারতী আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৯০। রচনা অনেক আগে। ৪ ভারতী ভাদ্র ১২৯০।

৫ ঐ আশ্বিন। ৬ ঐ কার্তিক 'মধুর স্মৃতি' নামে। ৭ ঐ পৌষ। জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

একটি মেয়ে একেলা
সাঁজের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে। ('একাকিনী')

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
একা একটি বনফুল ফোটে ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে, ('আদরিণী')

কয়েকটি কবিতায় ভাবাবেশ নাই। সেগুলির সুর কিছু চড়া। এগুলিতে যেন ছবি-ও-গানের পট-পরিবর্তন ও তাল ফেরতা।[১] বাসনাদীপ্ত প্রেমের ক্ষুধায় 'রাহুর প্রেম' জীবন্ত। ভাবের দিক দিয়া এটিকে কৈশোরক যুগের মধ্যে ধরিব না এইজন্য যে এখানে প্রেমের ক্ষুধা অস্ফুট কিংবা কলভাষিত নয়, স্পষ্ট ও মুখর। বর্ষানিশীথের ঝঙ্কারব কবিহৃদয়ের ক্রন্দনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে 'আর্তস্বর' কবিতায়।

কে আজি রে তোর সাথে
ধরি তোর হাতে হাতে
খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে।...
তীক্ষ্ণশিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে,
হু হু করি নিশ্বাসিয়া
চলে যাবে উদাসিয়া
কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে।

বর্ষার রূপ-চিত্রণ ও রস-প্রকাশ রবীন্দ্রকাব্যের এক বড় বিশিষ্টতা। ছবি-ও-গানের 'বাদল' কবিতায় ইহার প্রথম আবির্ভাব।

ভাঙ্গাচোরা পথের ধারে,
ঘন বাঁশবনের পরে,
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে!

স্বপ্নাবেশে ভোর আতুর কবিহৃদয় জীবনপ্রভাতক্ষণে প্রতিদিনের মানব-সংসারের মাঝে জাগিয়া উঠিতে চায়।

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে
র'য়েছি পড়িয়া!
কেবল র'য়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে ল'য়ে
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া!...
রুদ্ধ প্রাণ ক্ষুদ্র প্রাণী, রুদ্ধ প্রাণীদের সাথে
কত রে বহিব!

---

১ 'আর্তস্বর', 'রাহুর প্রেম' ও 'পোড়ো বাড়ি'।

ছোট ছোট সুখ দুঃখ, ছোট ছোট আশাগুলি
পুষিয়া রাখিব !
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পূরব আকাশ পানে
র'য়েছি চাহিয়া,
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
উঠিবে গাহিয়া ! ('নিশীথ-জগৎ')

হৃদয়গুহার অন্ধকার হইতে জাগিয়া উঠিয়া কবিহৃদয় যে কর্মচঞ্চল সংসারে উৎসবের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে তাহার ইঙ্গিত প্রভাত-সঙ্গীতের শেষের দিকের কবিতাগুলিতে আছে। সেই সঙ্গে যে বহির্নিরপেক্ষ উল্লাস জাগিয়াছিল তাহার আবেগ ছবি-ও-গানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কবিতায় লাগিয়াছে। নিষ্পিষ্ট কামনার নাগপাশ হইতে মুক্তির আরাম নবযৌবনের নেশাকে জমাইয়া তুলিল।

গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর-আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ ! ('জাগ্রত স্বপ্ন')

মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিয়ে মধুর বাঁশিটি ! ('সুখস্বপ্ন')

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় যেন খর মধ্যাহ্নের দীপ্তি আধৃত। ছবি-ও-গানের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় ইহার সূত্রপাত। প্রাচীন ভারতের তপোবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের প্রথম পরিচয়ও পাওয়া যায় এই কবিতায়॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যৌবনস্বপ্ন
(১৮৮৪ - ১৮৮৬)

"আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়"

১

ছবি-ও-গানের পর এক অঘটন ঘটিয়া গেল। বধূঠাকুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। এই দুর্ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বোধ করি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইহা না ঘটলে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাস সম্ভবত অন্য রকম হইত। এই আকস্মিক রূঢ় আঘাতে কবিচিত্তের সকল জড়িমা যেন অপসারিত হইয়া গেল। সহসা রবীন্দ্র-কাব্যে প্রৌঢ়িমার সঞ্চার ঘটিয়া গেল। চিত্র-সঙ্গীতের আবেশ ছাপাইয়া সুরের রেশ বাজিতে লাগিল। 'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩, ১৮৮৬)[১] বইটির নামের মধ্যে হয়ত এই তত্ত্বটুকু নিহিত আছে।

কড়ি-ও-কোমলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রূপকর্ম আপন বিশিষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কবিকল্পনা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ভাষা সমর্থ হইয়াছে। ছন্দে কমনীয়তা দেখা দিয়াছে। সবদিক দিয়াই কড়ি-ও-কোমল বাঙ্গালা কাব্যে অভাবিত অভিনবত্ব প্রকট করিয়াছিল। সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত ও ছবি-ও-গান ভাবে-ভাষায় অল্পবিস্তর আবেগ-কুহেলিকা-বিজড়িত বলিয়া সেখানে সাধারণ পাঠকের প্রবেশ সহজ ছিল না। কড়ি-ও-কোমলের কবিতার বিষয় বিচিত্র, ভাব অভিব্যক্ত, ভাষা সুদৃঢ়, ছন্দ সুললিত। সুতরাং হাতে পাইলে সহৃদয় পাঠকের পক্ষে কাব্যটিকে উপেক্ষা করার কথা নয়। কিন্তু বিদগ্ধ কাব্য-রসিকের সংখ্যা সবদেশেই বেশ কম, আমাদের দেশে আরো কম। অতএব যেমন ঘটবার তেমনই ঘটিল। নিন্দার ঢাকে প্রশংসার মধুপগুঞ্জন চাপা পড়িল। তবে সত্য কথা বলিতে কি, যাঁহারা কাব্যটিকে লইয়া ভেঙচাইতে লাগিলেন তাঁহারা অনেকেই বইটি চোখেও দেখেন নাই এবং যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের রসগ্রহণের সামর্থ্য ছিল না। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তো

---

[১] কড়ি-ও-কোমলের কবিতাগুলির বিন্যাস আশুতোষ চৌধুরী করিয়াছিলেন।

ছিলই।[১] তবে সব মন্দেরই কিছু না কিছু ভালো ফল ফলে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া একজন নবীন কবির সম্বন্ধে বাঙ্গালা পত্র-পত্রিকার সাধারণ পাঠক অবহিত হইল॥

২

প্রথম সংস্করণ কড়ি-ও-কোমলের দুইটি পত্রকবিতা[২] ও 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' পরে বাদ গিয়াছে। 'কো তুহুঁ' ভানুসিংহ-ঠাকুরের-পদাবলীভুক্ত হইয়াছে। কয়েকটি কবিতা নাম বদল করিয়া[৩] অথবা না করিয়া[৪] 'শিশু' গ্রন্থে (১৩১০) স্থান পাইয়াছে। "ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের পদাবলী সম্বলিত" কড়ি-ও-কোমলের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) প্রথম সংস্করণের শতাবধি কবিতার মধ্যে—এক নামের একাধিক কবিতা ও 'কো তুহুঁ' বাদ দিলে—উনসত্তরটি গৃহীত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনে আছে "ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি-ও-কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হইয়াছে।" কড়ি-ও-কোমলের তৃতীয় সংস্করণ পাই কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩)। এখানে কবিতার সংখ্যা ছিয়াত্তর। 'বসন্ত অবসান' ইত্যাদি নয়টি গান এবং 'মথুরায়',

---

১ কড়ি-ও-কোমলের কোন কোন কবিতার ভাব ও ভাষা লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত বিদ্বিষ্টভাবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতা লিখিয়া 'মিঠেকড়া' নামে নিতান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকা (প্রথম প্রকাশ ১২৯৮, সংস্করণ ১৩০১) ছাপাইয়াছিলেন। এই অভদ্র আক্রমণ ও ভাঁড়ামি রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করিয়াছিল। তাহার প্রতিক্রিয়া পাই মানসীর 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতায়।

কাব্যবিশারদের রবীন্দ্র-বিদ্বেষের মূল কারণ ব্যক্তিগত এবং দলগত। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ সেই খাতা লইয়া গিয়া আর ফেরৎ দেন নাই এবং পরে তিনি নিজে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। এই-টুকু ব্যক্তিগত কারণ। কড়ি-ও-কোমলের প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত (পরে পরিবর্জিত) একটি কবিতায় ("দামু চামু") রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের কটাক্ষ করিয়াছিলেন কাব্যবিশারদ তাঁহাদেরই দলের লেখক ছিলেন। এই দলগত কারণই ছিল মুখ্য।

২ "বসে বসে লিখলেম" এবং "দামু বোস আর চামু বোস"।

৩ 'পত্র' ("মাগো আমার"), 'জন্মতিথির উপহার', 'চিঠি' ও 'শরতের শুকতারা' যথাক্রমে 'শিশু' কাব্যের 'বিচ্ছেদ', 'উপহার', 'পরিচয়' ও 'অন্তসখী'। 'ফুলের ঘা' তৃতীয় সংস্করণ (কাব্য-গ্রন্থাবলী) হইতে পরিত্যক্ত এবং 'শীতের বিদায়' নামে শিশুতে সঙ্কলিত।

৪ 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা', 'পুরানো বট', ইত্যাদি।

'পত্র' (প্রিয়নাথ সেনকে লেখা), 'ক্ষুদ্র অনন্ত' ও 'বিজনে'—দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত এই চারিটি কবিতা তৃতীয় সংস্করণে স্থান পাইয়াছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ছয়টি কবিতা তৃতীয় সংস্করণে বাদ গিয়াছে।[১]

বধূঠাকুরানীর আকস্মিক মৃত্যুজনিত শোকের আঘাতে কবিচিত্তে ছবি-ও-গানের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। কবি লিখিয়াছেন, "জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল।" কিন্তু প্রকৃতি যেমন মানবজীবনও তেমনি কোন কিছুকে দীর্ঘকাল আঁকড়াইয়া রাখিতে পারে না। শোকের আঘাত কবিচিত্তে এমন একটি নির্লিপ্ততা আনিয়া দিল যাহাতে দৃষ্টির আত্ম-কেন্দ্রিকতা দূর হইয়া সংসারের চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। এই নিরবলেপ স্বচ্ছদৃষ্টিই কড়ি-ও-কোমলের রহস্য।

'কোথায়'[২] ও 'শান্তি' কবিতায়, 'বাকি' কণিকায় ও 'গান'এ শোকের ব্যক্তিগত রেশটুকু বিলুপ্ত নয়। 'যোগিয়া',[৩] 'বিরহীর পত্র'[৪], 'বসন্ত অবসান', 'বিরহ',[৫] 'বিলাস', 'সারাবেলা', 'আকাঙ্ক্ষা', 'তুমি', 'যৌবন-স্বপ্ন', 'ক্ষণিক মিলন' ও 'গীতোচ্ছ্বাস' ইত্যাদি কবিতায়-গানে বেদনা শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল-মকুলে ;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে'
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে? ('যৌবন স্বপ্ন')

সে এল না এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর ? ('গীতোচ্ছ্বাস')

স্মৃতিরস অবলম্বন করিয়া প্রেমভাবনা সহজেই বৃহত্তর হৃদয়াবেগের কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল। 'উপকথা',[৬] বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর',[৭] সাত ভাই চম্পা',[৮] 'পুরানো বট',[৯] 'কল্পনার সাথী', 'কল্পনা-মধুপ' ইত্যাদি কবিতা এই পর্যায়ের।

---

[১] 'পুরানো বট', 'ফুলের ঘা', 'স্বপ্নরুদ্ধ', 'অক্ষমতা', 'আত্মাভিমান' ও 'আহ্বান গীত'।

[২] ভারতী পৌষ ১২৯১। [৩] ঐ কার্তিক। [৪] ঐ ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৩। [৫] ঐ 'কত রচিব শয়ন'।

[৬] ঐ ফাল্গুন ১২৯১। [৭] ঐ বালক বৈশাখ ১২৯২। [৮] ঐ আষাঢ়। [৯] ঐ ভাদ্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (পৃ ৬৮) অন্তর্ভুক্ত "এস গো এস বনদেবতা" গানটি এই কবিতার প্রথম খসড়া।

মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে ব'সে,
নয়ন মিলাতে চায় সুদূর আকাশে,
কখন আঁচলখানি পড়ে যায় খ'সে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখী থাকি তব সাথে। ('কল্পনার সাথী')

শোকশান্ত চিত্তের করুণ কোমলতার প্রকাশ স্নেহরসের কবিতাগুলিতে। প্রেমের মোহমোচনের সঙ্গে স্নেহ-বাৎসল্যের যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গুলির কাহিনীতেও পাই। যে স্নেহব্যক্তি শৈশবে অপর্যাপ্ত জোটে নাই তাহাই কড়ি-ও-কোমলের এই কবিতাগুলিতে উপচিত।

বৃহত্তর জীবনের সার্থকতালাভের বাসনা "কল্পনা-মধুপ" কবিকে "আপনার সৌরভে আপনি উদাসী" থাকিতে দিল না। সংসারের সান্ত্বনায় তিনি ভবিষ্যতের আহ্বান শুনিতে পাইলেন।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর। ('ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি'[১])

একি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি!
বিলাপের শেষ তান, না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি!
আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি-ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা। ('নূতন'[২])

দেশের দৈন্য-হীনতা-মূঢ়তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করিতেছে। তাহার প্রকাশ 'বঙ্গভূমির প্রতি' ও 'বঙ্গবাসীর প্রতি' গানে ও 'আহ্বান-গীত' কবিতায়। দেশের প্রতি তাঁহার যে কর্তব্য আছে তাহা ইতিমধ্যেই মানসে স্পষ্ট রূপ ধরিয়াছে।

গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।

এ আশংসা ফলিয়াছিল॥

---

১ প্রচার অগ্রহায়ণ ১২৯২। ২ ভারতী বৈশাখ ১২৯২।

৩

সনেট অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতাগুলি কড়ি-ও-কোমলের বিশিষ্ট রচনা। অধিকাংশ সনেটই পয়ারে লেখা, দুই একটি দীর্ঘতর চরণে। লিরিক সৌন্দর্যে এবং ভাব-ভাষার উজ্জ্বলতায় ও ঋজুতায় এই কবিতাগুলি প্রদীপ্ত। কয়েকটি কবিতায় নারীর দেহসৌন্দর্য নন্দিত ও বন্দিত। একটিতে নারীরূপের বর্ণনায় দৈহিক প্রেমের তীব্রতা ও উষ্ণতা প্রকটিত। কিন্তু এখানেও দেহের মধ্য দিয়া দেহাতীতের জন্য ব্যাকুলতা, এবং তা যেন বৈষ্ণব কবিতাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

> প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে
> প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

এতো বৈষ্ণব-কবিও বলিয়াছেন। কিন্তু একথা আর কেহ তো এমন করিয়া বলে নাই

> হৃদয় লুকান আছে দেহের সায়রে,
> চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
> সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
> দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন!
> আমার এ দেহমন চির রাত্রি দিন
> তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন। ('দেহের মিলন')

কড়ি-ও-কোমলের কয়টি সনেটে যেমন প্রেমরভসের প্রকাশ এমন রবীন্দ্র-নাথের পরবর্তী রচনায় আর পাই না।

> ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
> এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।…
> ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
> চতুর্দশ[১] বসন্তের একখানি মালা! ('তনু')

তবুও এই দেহতন্ময়তায় মাঝে অতীতস্মৃতি খোঁচা দেয়।

> সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
> মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ!
> তোমার মুখেতে চেহে তাই নিশি দিন
> জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন। ('স্মৃতি')

রভসবশংবদ প্রেম তাই কবিচিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। দেহ-মাধুরীর ফাঁদে পড়িয়া হৃদয় মোহমুক্তির প্রত্যাশায় কাঁদিতে থাকে।

---

১ পরিবর্তিত পাঠ "পঞ্চদশ"।

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ !
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান !···
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ !
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক্ অবসান !
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ। ('বন্দী')

জীবনের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া দুঃখসুখের যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে কবিচিত্ত এখন সমুৎসুক।

চল দোঁহে থাকি গিয়ে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়। ('মরীচিকা')

ভোগের অতৃপ্তি ও বাসনার ক্ষণিকত্ব বারবার সংশয় জাগায়।

এ কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই ! ('অক্ষমতা')

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায় !
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে। ('মোহ')

ভোগবাসনা ত্যাগ করিলে তবেই হয়ত প্রেয়ঃ হাতের কাছে ধরা দিবে।

তোমারেও মাগিব না অলস কাঁদনি !
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি ! ('প্রত্যাশা')

হৃদয়ে প্রেমের পরম সত্য আভাসিত হইলে ত্যাগ সহজ হয়। সর্বব্যাপী সেই প্রেমের স্পর্শের লাগিয়া কবি উদ্‌গ্রীব।

কাহারে পুজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেম টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে—কোথা সেই অনন্ত জীবন ! ('চিরদিন'[১])

এই পরম প্রেমেই চরম চরিতার্থতা।

কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয় ! ('শেষ কথা')

---

১ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩।

যৌবনস্বপ্নের অবসানে ব্যাকুল প্রার্থনা

আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে নাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া। ('সত্য'[১])

৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ভারতী বাহির হইয়াছিল। প্রধান উদ্যম ছিল তাঁহার পত্নী কাদম্বিনী দেবীর। ইহার মৃত্যুর (বৈশাখ ১২৯১) পর ভারতীর পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের উৎসাহ কমিয়া আসিল। এক বৎসর পরে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নামে সম্পাদিকা থাকিয়া এবং রবীন্দ্রনাথকে কর্মাধ্যক্ষ করিয়া সচিত্র 'বালক' পত্রিকা[২] বাহির করিলেন। উদ্দেশ্য, ঠাকুরবাড়ীর উঠতি বয়সের নবীন লেখকেরা লিখিবার সুযোগ পাইবে এবং রবীন্দ্রনাথের ও অপর পরিণত লেখকের শিশু-পাঠোপযোগী গদ্য ও পদ্য রচনার স্থান হইবে। বালকে রবীন্দ্রনাথের যে "শিশুপাঠ্য" কবিতা বাহির হইয়াছিল—যেমন 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা' ইত্যাদি—সেগুলি কড়ি-ও-কোমলে সংকলিত হইয়াছিল। ছেলে ভুলানো ছড়া ও রূপকথা অবলম্বনে লেখা এই কবিতা দুইটি বেশ পরিপক্ব রচনা। মেয়েলি ছড়ার ও রূপকথার মূল্যের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই দুই কবিতা দ্বারাই আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে এ কবিতাগুলি 'শিশু' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল॥

---

১ তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা শ্রাবণ ১২৯৩।

২ এক বছর পরে 'বালক' ভারতীর মধ্যে বিলুপ্ত হয়। শুধু নামটি যুক্ত থাকে—'ভারতী ও বালক'। ১৩০৫ সাল হইতে আবার কেবল 'ভারতী' নামটি থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনুরাগ

(১৮৮৭—১৮৯০)

"সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম?"
"দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।"

১

'মানসী'তে (১২৯৭, ১৮৯০) রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প স্বমহিমায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যকলার প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য কিছু-না-কিছু প্রকারে মানসীর কবিতাগুচ্ছে (১২৯৩-১২৯৭ সালের মধ্যে রচিত) প্রকটিত। এই বৈশিষ্ট্য ভাবে, কল্পনায়, প্রতিমানে (অর্থাৎ অলঙ্কার-রচনায় ও রূপচিত্রণে), ভাষায় (অর্থাৎ শব্দশক্তিতে) এবং ছন্দে অভিব্যক্ত। কড়ি-ও-কোমল এবং মানসীর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা রবীন্দ্রনাথের আর কোন পর-পর প্রকাশিত দুইটি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় না। রচনাস্থানের ও রচনাকালের এমন প্রসারও আর কোথাও নাই।

মানসী রবীন্দ্রকাব্যের সবচেয়ে বিশিষ্ট কবিতাগ্রন্থ। তাহার মানে এই নয় যে মানসীর কবিতার চেয়ে ভালো কবিতা তিনি আর লেখেন নাই। মানসী কবিতার ভাষা খুব জোরালো তবুও তাহাতে কিছু যেন অপূর্ণতা ছিল। সে অপূর্ণতা পরে কাটিয়া গিয়াছে এবং কবিতাকর্মে রবীন্দ্রনাথ বহুবিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বিশিষ্টতা এই যে মানসীর কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কবি নিজের হৃদয়কন্দর হইতে অনেকটা দূরে দূরে বিচরণ করিয়াছেন এবং দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি করিয়া ধরা দিয়াছেন। বহিঃসংসারের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের সাধারণ সংস্রবের পরিচয় মানসীতে যেমন ঘনিষ্ঠ তাঁহার আর কোন কবিতাগ্রন্থে তেমন নয়।

মানসীর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৮৮৭ হইতে ১৮৯০। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি করিয়া নানাস্থানী ছিলেন—স্বদেশে-বিদেশে, স্থলে-জলে। যে

কয়মাস তিনি গাজিপুরে ছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যশিল্পের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল। গাজিপুরের নিসর্গ—গঙ্গা, গঙ্গার চর, পরপারের বনশ্রেণী, চারিপাশের জীব ও জীবন—মানসীর অনেকগুলি কবিতায় শান্তচ্ছবি প্রতিবিম্বিত এবং কল্পনালোক উদ্দীপ্ত করিয়াছে। শুধু তাই নয়, কবিচেতনায় গাজিপুরের প্রকৃতি প্রায় চিরস্থায়ী রঙ ধরাইয়াছিল। মধ্যজীবনের তো বটেই শেষজীবনের রচনাতেও তাহার আভাস অলক্ষণীয় নয়। বৈশাখ-মধ্যাহ্নে গাজিপুরের ছবি দিয়া 'কুহুধ্বনি' কবিতার আরম্ভ।

প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয় ;
নিম্ববৃক্ষ[১] ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা
আম্রবন তাম্রফলময় !······
ছায়ায় কুটীরখানা দুধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ ;
তারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ !······
বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি ;
বাঁধা কূপ, তরুতল ; বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর ; বসিয়া মাচার 'পর
শস্যক্ষেত্র আগলিছে চাষি ;
রাখাল শিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে ;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ, কত খেলা, কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখে ভাবনা অশেষ,—
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ।

১ গাজিপুরে কবির বাসভবনের হাতায় এই মহানিমগাছের উল্লেখ পরবর্তী কালের রচনায়ও পাওয়া যায়।

অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'মরণ স্বপ্ন' কবিতায় প্রথমেই সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে গাজিপুরের গঙ্গাবক্ষের আলেখ্য।

একপারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া
অন্যপারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে;
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

'বিচ্ছেদ' কবিতায় সূর্যাস্তের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকপ্লাবে গাজিপুরের গঙ্গার দৃশ্যপট ঝলমল।

চারিদিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান মাস-দুয়েকের বেশি নয়। তবুও এখানকার স্মৃতি কখনও মুছিয়া যায় নাই। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য।[১]

একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারে বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইল খানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার সর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায়, গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলা দেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলেছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী। গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গে এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।

---

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডে মানসীর ভূমিকা (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০)।

২

'উপহার' কবিতায় (৩০ বৈশাখ ১২৯৭) কবিতাগ্রন্থটির নামের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অচরিতার্থতার বেদনা[১] মিলাইয়া গিয়াছে নিগূঢ় বিরহের স্তিমিত স্পন্দনে। জীবনের আহ্বান ও বিশ্বের সৌন্দর্য কিছুতে সেই বিরহ—দিশাহারা আকাঙ্ক্ষার টান—শিথিল করিতে পারিতেছে না। তবে বাহিরের আকর্ষণ বৃথা যাইতেছে না, তাহা কবির অন্তরে "বিরহের বীণাপাণি", মানসী প্রতিমা, গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গান কত দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,…
সেই মহামন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা।
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।

সেই মর্মকামনামূর্তিকে মনের মতো গড়িয়া তোলাই কবির কাজ।

এ চিরজীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গ'ড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

৩

মানসী ক্রিয়ার দুইটি ছাঁদ, ভাবনা ও কামনা। সেই অনুসারে, বিচার করিয়া দেখিলে, মানসীর কবিতাগুলি দুইভাগে পড়ে। একভাগের কবিতায় বিরহের পিছুটানে ও জগৎসংসারের সম্মুখটানে চিত্তের দ্বন্দ্ব, আলো-আঁধারি গোধূলি-রাগ। অপরভাগের কবিতায় জীবনকে সত্যভাবে জানিবার উদ্দীপনা ও সংসারের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিবার আগ্রহ। প্রথম ভাগের বিশিষ্ট রচনা 'নিষ্ফলকামনা' কবিতায় বিরাট অতৃপ্তির আভাস।

---

[১] তিনটি কবিতার নামে "নিষ্ফল" বিশেষণ লক্ষণীয়,—'নিষ্ফল কামনা', 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'নিষ্ফল উপহার'।

যে-জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর, অন্ধ দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে ?
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে-যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।

দ্বিতীয় ভাগের কবিতার প্রতিনিধি ধরিতে পারি 'দুরন্ত আশা' (১৮৮৮,) ভাষায় ও ছন্দে অত্যন্ত দৃপ্ত কবিতা। সংসারে-সমাজে প্রতিহতপ্রবেশ, অশান্ত ও দুর্দান্ত কবিহৃদয় যেন বাহিরে প্রকাশপথ খুঁজিতেছে।

উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি'
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

মানসীর কয়েকটি কবিতার ভাবনা ও কামনা দুইয়ে মিলিয়া একটি বিক্ষুব্ধ আবেগের আবর্ত রচনা করিয়াছে। তবে এই আবেগ-আবর্ত স্থায়ী হয় নাই। ভোগবিরহিত প্রেমের সংবেদনায়, বিশ্বপ্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিচর্যায়, স্মৃতির জ্বালা-হীন আলোয় তাহা শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই।[১]

---

[১] মানসীর শেষ, এবং সর্বশেষ লেখা (রেড সী ১১ কার্তিক ১২৯৭), 'আমার সুখ' কবিতার শেষ কয় ছত্র।

পাঠায় গগন-পানে ; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনাসম ; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

কৈলাসের তুষাররাশিকে কালিদাস তুলনা করিয়াছেন, "রাশীভূতঃ প্রতিদিশমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ"। হিমালয়ের দিগন্তব্যাপী তুষার-আস্তরণকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিককালের উপযোগী প্রতিমানে প্রকাশ করিয়াছেন।

কুহুধ্বনি উপস্থিত কালের মালিন্য ও তুচ্ছতা ছাপাইয়া ডাক দিয়াছে নিত্যকালের আনন্দলোকে।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্ত্তমান,
দেশকাল করি অভিভব। ('কুহুধ্বনি')

মানসীর দ্বিতীয় কবিতা 'ভুলে'।[১] ইহাতে দেখি পুরাতন প্রেমের বেদনাহীন স্মৃতি প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্যের মধ্য দিয়া কবিচিত্তে জাগরূক। এই স্মৃতির প্রতিফলন 'ভুল-ভাঙা'য়। এটির সঙ্গে 'নারীর উক্তি' তুলনীয়। নূতনতর মাত্রাছন্দে লেখা 'বিরহানন্দ'[২] কবির হৃদয়াবেগের অতীত-ইতিহাসের পরিচয়হীন। 'বিফল-মিলন'এর পরিবর্জিত দ্বিতীয় স্তবককে[৩] কেন্দ্র করিয়া দুই বৎসরেরও পরে 'ক্ষণিক মিলন' লেখা। 'ভুলে'র সঙ্গে 'ভুল-ভাঙা'র যে যোগ 'বিরহানন্দ'এর সঙ্গে 'ক্ষণিক মিলন'এরও সেই যোগ। 'শূন্যহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'য়[৪] কবিহৃদয় নূতন প্রেমের স্পর্শের জন্য অপেক্ষারত। অতীতে

গেয়েছে পাখী ছেয়েছে শাখী
মুকুলে !
গানের গান প্রাণের প্রাণ
কোথায় তারা লুকোলে ![৫]

এখনও তাই প্রত্যাশা

তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

---

১ ভারতী আষাঢ় ১২৯৪ 'এসেছি ভুলে' নামে। ২ ঐ জ্যৈষ্ঠ 'বিফল মিলন' নামে।
৩ মানসীতে প্রথম দুই স্তবক বর্জিত। ৪ ভারতী শ্রাবণ ১২৯৪ 'নূতন প্রেম' নামে। মানসীতে তিনটি স্তবক পরিবর্জিত আর দুই-একটি শব্দ পরিবর্তিত।
৫ মানসীতে পরিবর্তিত।

এ প্রত্যাশা পূর্ণ হইবার নয়, তাই নিষ্ফল কামনার ব্যথা বাজিতেই থাকে। আদর্শকৃত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের সংঘর্ষ-জনিত বেদনা এই কবিতাটিতে বাঙ্ময় হইয়াছে। ভাব ভাষা ও মিলহীন অসমপংক্তি ছন্দ ধরিয়া নিষ্ফল-কামনাকে মানসীর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিতে পারি। ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির জন্য, খণ্ডের মধ্যে সমগ্রতার নিমিত্ত কবি উৎকণ্ঠিত। একদা চকিত-উপলব্ধ এক হারানো আনন্দানুভূতির জন্য ক্রন্দন।

যে-অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকারে সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।

সৌন্দর্যে ও প্রেমে সমগ্রগ্রাসের অসম্ভাব্যতার বিষয়ে কবি অত্যন্ত সচেতন।

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম?

নিষ্ফল-কামনার পরের দিনে লেখা 'বিচ্ছেদের শান্তি'তে কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার ইচ্ছা।

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয় ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই,
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

তবুও পিছুটান রহিয়া যায়।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ-ভরে কাটে সন্ধ্যা বেলা
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা। ('তবু')

বিচ্ছেদের-শান্তির পরের দিনে লেখা 'সংশয়ের আবেগ' কবিতায় সংসারের কাজে ছাড়া পাইবার জন্য আকুলতা শুনিতে পাই।

কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছো মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে—প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

'নিষ্ফল-প্রয়াস', 'হৃদয়ের ধন' ও 'নিভৃত আশ্রম'—এই সনেট তিনটি একদিনে লেখা (১৮ই অগ্রহারণ ১২৯৫)। নিষ্ফল-প্রয়াসে কবি বলিতেছেন, সৌন্দর্যকে ভোগের জন্য ধরা যায় না। সৌন্দর্য বস্তু-সাপেক্ষ বটে তবে মরীচিকার মতো। ধরিতে গেলেই পালায়, এবং সৌন্দর্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া অথবা যাহাতে আধৃত হইয়া আছে তা ভোক্তা হইতে পারে না। অতএব

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

শেষ বয়সে লেখা একটি কবিতা-গানে রবীন্দ্রনাথ এই কথা আরও সোজাসুজি বলিয়াছেন।

চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।...

কবিতা তিনটির মধ্যে হৃদয়ের-ধন কেন্দ্রস্থানীয় মধ্যমণি। প্রথম অংশে (অষ্টকে) সৌন্দর্যলুব্ধ দৈহিক প্রেমের দীপ্তি ও উষ্ণতা বিচ্ছুরিত।

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি—
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।...
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবস-নিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।

নিভৃত-আশ্রমে কবিচিত্ত যেন নিরাসক্তির বেড়া দিয়া আপনাকে ঘিরিয়া রাখিতে চায়।

'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' মানসীর প্রথম স্তরের শেষ দুই কবিতা।[১] প্রেমিকা নারীর প্রেম সম্পূর্ণ মোহমগ্ন। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে প্রেমিক পুরুষের রূপমোহ ঘুচিয়া গিয়াছে, সংসারের কাজ তাহাকে টানিতেছে। নারী যাহা চায়

[১] রচনাকাল যথাক্রমে ২১ ও ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪।

পুরুষ আর তাহা দিতে পারিতেছে না। সাধারণ মানুষের জীবনে দেহজ প্রেমের ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। পুরুষের সঙ্গ নারীর কাম্য, কিন্তু সে বুঝিতেছে যে পুরুষের মনকে সে আর আগেকার মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহার প্রতি পুরুষের প্রেম এখন অভ্যাসে পরিণত। তাহাতে নারীর তৃপ্তি কই

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

কিন্তু প্রেম তো দেওয়া-নেওয়ার কারবারের বস্তু নয়। নারী যাহাকে প্রেম বলিতেছে সে মোহ, সে মায়া, সে আসক্তি। তাহাতে শ্রান্তি আসে তৃপ্তি আসে না।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া।
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে হায় হায়
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

প্রেম জাগে দুর্লভতায়। সুলভতায় মোহ নষ্ট হয়, প্রেমের ঘোর জমে না। পুরুষেরও তাই হইয়াছে।

কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

গৃহসংসারের কাজে নিরত নারীর হৃদয়ে দুর্লভ প্রেমের টান সর্বদা জাগরূক থাকে না। দুর্লভের কামনায় সে প্রেমের যোগ, তা গৃহসংসারে ব্যস্ত নরনারীর প্রত্যাশিত নয়। তাই পুরুষের শেষ কথা

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না, চেয়ো না তারে আর।
এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

৬

মানসীর দ্বিতীয় স্তরের প্রথম কবিতা 'শূন্যগৃহে', গাজিপুরে লেখা (১২ বৈশাখ ১২৯৫)। জীবনের দুঃখশোকে সান্ত্বনা খুঁজিতে গিয়া কবি আপন অন্তরে আশ্বাসবাণী শুনিলেন।

নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে ;
তোমার ব্যাকুল স্বর উঠিছে আকাশ-'পর
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে।

দ্বিতীয় কবিতা 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' দুই দিন পরে লেখা। মৃত্যুব্যবচ্ছিন্ন খণ্ড জীবনে কোন সার্থকতা আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগিয়াছে।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে।

বিশ্বসৃষ্টির কর্তা কেহ আছে কি নাই, এ বিষয়ে বৈদিক কবির যেমন সংশয় ছিল, মানবজীবনের সুখদুঃখের তাৎপর্য খুঁজিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথও তেমনি সংশয়ে পড়িয়াছিলেন। সে সংশয় তিনি ঠেকাইয়া রাখিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাস দিয়া।

তুমি কি শুনিছ বসি হে-বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানব শিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা।
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক কল্পনা।

বাহিরের সংঘটনা—যতই গুরুতর ব্যাপার হোক না কেন—তা লইয়া রবীন্দ্রনাথ খুব কম কবিতাই রচনা করিয়াছিলেন। এমন যে দুই-একটি কবিতা আছে তাহার মধ্যে 'সিন্ধুতরঙ্গ'[১] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু শত পুরী-তীর্থযাত্রি-বাহী এক স্টীমার সাগরে ঝড়ের মুখে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় কবিচিত্ত সৃষ্টির ও জীবনের প্রধান সমস্যায় সমাকুল হইয়াছিল।

গাজিপুরের প্রশান্ত পরিবেশে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মন ডুবাইয়া কবি কল্যাণের সান্ত্বনা অনুভব করিলেন ('জীবন-মধ্যাহ্নে' [২])।

[১] রচনাকাল আষাঢ় ১২৯৪। প্রথম প্রকাশ 'মগ্নতরী' নামে (ভারতী ও বালক শ্রাবণ ১২৯৪)। মানসীতে কিছু কিছু পরিবর্তিত, শেষস্তবক সম্পূর্ণভাবে।

[২] 'নিষ্ঠুর-সৃষ্টি' কবিতার পরের দিনে (১৪ বৈশাখ) লেখা।

নিত্য-নিশ্বসিত বায়ু ; উন্মেষিত উষা
কনকে শ্যামলে সম্মিলন ;
দূর-দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন ;
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি',—
জগতের মন হ'তে মোর মর্ম্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

তাহার পরের দিনে লেখা 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতিকে হৃদয়াবেগের অবলম্বন কল্পনা এবং অনুভূতির প্রতিবিম্বন। বহিঃপ্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরে যে লীলারঙ্গিণী সদা বিরাজমান তিনিই যেন কবির এবং নিখিল মানবের চিত্ত চিরদিন ধরিয়া নানাভাবে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিতেছেন। এই অপরিণত নির্ব্যক্তিক আইডিয়াটিই পরে পূর্ণতর ব্যক্তিরূপ লইয়া পরবর্তী কালের 'কৌতুকময়ী', 'লীলাসঙ্গিনী' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত।

'শ্রান্তি' কবিতায়[১] প্রকৃতির শান্তিক্রোড়ে নির্বাণকল্পনা। পরের দিনে লেখা 'মরণস্বপ্ন' কবিতায় আত্মহারা অবস্থায় নিদ্রাঘোরে প্রলয়কল্পনা। অনুভূতির প্রগাঢ়তায় এবং কল্পনার ব্যাপকতায় ও বিরাট বৈচিত্র্যে কবিতাটি অদ্বিতীয় বলিতে পারি।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা ;
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন একবিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দুপারাবার।
অন্ধকারহীন হ'য়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার।
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

প্রকৃতির প্রশান্তির মধ্যে শান্তহৃদয় হইয়া কবি অবিস্মরণীয় পুরানো প্রেম স্মরণ করিতেছেন 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতায় (২০ বৈশাখ ১২৯৫)। দিগন্তে

---

[১] রচনাকাল ১৬ বৈশাখ ১২৯৪

নবমেঘের সমারোহ, দিকে দিকে পূর্ববায়ু আকুল উদাস, হৃদয়ের গোপন কথা প্রকাশব্যাকুল।

কতকাল ছিল কাছে, বলিনিতো কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্য হানাহানি,
তা'র মাঝে র'য়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

এই ভাবটিই আরও ঘোরালো হইয়া আবর্তিত 'বর্ষার দিনে' (৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬)।

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে-কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়॥

শ্বশুরালয়ে নবাগত, জনতাপীড়িত, স্নেহক্রোড়বিচ্যুত, পল্লীনীড়লালিত বালিকাবধূর মনকেমন গুঞ্জরিত হইয়াছে 'বধূ'তে। তখন ঠাকুরবাড়ীর বধূরা খুব অল্পবয়সে শ্বশুরালয়ে আসিত, এবং বাপের বাড়ি যাওয়া সাধারণত তাহাদের ঘটিত না। বোধ করি, গাজিপুরে থাকিতে কবিতাটি লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানকার বালিকা বধূ দেখিয়া বাড়ীর বালিকা বধূদের কথা স্মরণ করিয়া থাকিবেন।

দিনাবসানের কোমলকরুণ পশ্চাৎপটে প্রেমাভিসারের বর্ণসুষম আবেগ-অনুভূতি রমণীয় ছন্দনিক্কণে গুঞ্জরিত হইয়াছে 'অপেক্ষা' কবিতায় (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫)।

দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী পানে
বিদায় নাহি চায়।
মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

সঙ্কীর্ণ-পরিধি ভদ্র-বাঙ্গালী জীবনের বিমূঢ় সন্তুষ্টি রবীন্দ্রনাথের সমুৎসুক মন পীড়িত করিত। তখনকার দিনের শিক্ষিত ব্যক্তিদের জাতীয় ও

রাষ্ট্রীয় ভাববিলাসের অবাস্তবতা এবং "আর্যামি"-বড়াইয়ের ক্ষুদ্রতা তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। সেই ক্ষোভের অনল-উদ্গার দ্বিতীয় স্তরের কয়েকটি কবিতায় পাই।[১] এই কবিতাগুলিতে আমরা সমসাময়িক দেশকালে কবির মনক্রিয়া সরাসরি অনুভব করি। এই ধরণের প্রথম কবিতা 'দুরন্ত-আশা' শিক্ষিত সমাজের নিবীর্য ভণ্ডামি ও থিয়েটারি দম্ভ লক্ষ্য করিয়া কবিহৃদয়ের সমস্ত তিক্ততা দৃপ্ত উচ্ছ্বাসে শাণিতভাষায় যুক্তাক্ষরচপল ছন্দে-তালে উৎসারিত।[২] এমন স্পষ্ট ও নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ আর কোথাও নাই।

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
        মিষ্ট হাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না তো
        ভদ্রতার বাণী!
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি'
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি',
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
        করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
        বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডী মাঝে
        শান্তি নাহি মানি!

দেশের-উন্নতি, যাহাকে বলে জলন্ত ও "জ্বালাময়ী" কবিতা। নিজেদের নির্বুদ্ধির সম্বন্ধে এমন অপ্রিয় সত্য কথা এমন সরস ও স্পষ্টভাবে, ঘা মারিয়া কোন দেশের কোন কবি কখনো বলিয়াছেন কিনা জানি না। জীবনের নানা-ক্ষেত্রে আমাদের "অভিভাবক" নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোভাব ও আচরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৫ সালে এই যে রায় দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিকার দিন পর্যন্ত অনড়।

---

১ 'দুরন্ত আশা' (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫), 'দেশের উন্নতি' (পরের দিনে লেখা), 'বঙ্গবীর' (২১ জ্যৈষ্ঠ), 'পরিত্যক্ত' (২৮ জ্যৈষ্ঠ), 'ধর্ম্মপ্রচার' (৩২ জ্যৈষ্ঠ), ও 'নববঙ্গ-দম্পতীর প্রেমালাপ' ২৩ আষাঢ় ১২৯৫)। সব কয়টিই গাজিপুরে লেখা।

২ কবিতাটির প্রথম ছত্র 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে" 'স্বদেশ' কাব্যে পরিবর্তিত হইয়াছিল, "হৃদয়ে যবে বিফল আশা সাপের মত ফোঁসে"। এখানে যুক্তাক্ষর বর্জন করায় ছন্দের জোর কমিয়া গিয়াছে।

আমোদ করা কাজের ভাগে,
পেথম তুলি' গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে,
আপন গৌরবে!

কবে আমরা একথা হৃদয়ঙ্গম করিব যে

ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়ে রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

এবং

পরের কাছে হইব বড়
এ কথা গিয়ে ভুলে'
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।...

আর

সবাই বড় হইলে তবে
স্বদেশ বড় হবে;

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তখনই অভিযোগ উঠিয়াছিল যে তিনি সুললিত প্রেমের কবিতা লিখিয়া দেশের তরুণদের মাথা খাইতেছেন।

বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বল টিকিবে আর
প্রেমের গানে করেছে তা'র
দুর্দশার শেষ!

এ অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে তিনি "জাতীয়" শোকের উচ্ছ্বাস না তুলিয়া নিজের মনে অলস ক্ষণে "ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে প্রেমের কথা" কহেন। কিন্তু সকলের পথ তো এক নয়। অভিযোক্তারা নিজের কাজ করুন, কবিও নিজের প্রতিভার অনুসরণ করুন।

পষ্ট তবে খুলিয়া বলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্বোধের মত?

'পরিত্যক্ত' কবিতার সুর অনুযোগের। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ শ্রদ্ধেয় দেশনেতার

উদার বাণীতে রবীন্দ্রনাথ একদা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন এখন আর তাঁহাদের হিতোপদেশে উলটা পথে উজান স্রোতে ফিরিতে পারেন না।[১]

কড়ি-ও-কোমল বাহির হইবার পর কয়েকটি কবিতার দোষ ধরিয়া ও ব্যঙ্গ করিয়া কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠে কড়া' লিখিয়াছিলেন, সে কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি। 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' কবিতায় (২৪ জ্যৈষ্ঠ) তাহারই জবাব।

বর্তমানের কর্মোদ্যত জীবনে অতীত-রোমন্থনের সংঘর্ষ প্রকাশিত 'ভৈরবী গান' কবিতায় (২৯ জ্যৈষ্ঠ)। যে প্রেম জীবনে জীবন পাইবার নহে তাহারি করুণ মায়া পিছনে টানিতেছে, অথচ জীবনের ডাকে সাড়া দিতেই হয়।

এই সংশয় মাঝে কোন পথে যাই,
কার তরে মরি খাটিয়া।
আমি কার মিছে দুখে মরিতেছি বুক
ফাটিয়া।
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া।
যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে।...

মহৎ জীবনের আদর্শে ও ঈশ্বর-বিশ্বাসে কবি ভরসা পাইলেন।

থাম' শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া।
যাব যার বল পেয়ে সংসার পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

এবং হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া কবি যেন প্রতিদিনের জীবনের কঠিন পথে পা বাড়াইতে চাহিলেন।

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে!

মানসীর দ্বিতীয় স্তর ও গাজিপুরের পালা একরকম এইখানেই সাঙ্গ হইয়া গেল॥

---

[১] এই সময়ে ধর্মমত লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের কিছু মতান্তর হইয়াছিল (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড দ্বি-স পৃ ৫-৮ দ্রষ্টব্য)।

৭

'প্রকাশবেদনা'[১] কবিতাটিতে আত্মপ্রকাশের কুণ্ঠা ও জড়তা এবং ভাবব্যক্তির অপূর্ণতার বেদনা প্রকাশিত।

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে,
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

প্রেমস্বপ্নের ঘোর কাটিয়াও কাটে না। কারণ সে ছায়াছবির পিছনে যেন একটা কিছুর আভাস ভাসে।[২] সে অনুভূতির পরিচয় 'ধ্যান', 'পূর্ব্বকালে', 'অনন্ত প্রেম', ও 'আত্ম-সমর্পণ' কবিতাগুলিতে।[৩]

নিজের অন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া কবি শান্তিলাভ করিলেন আত্মসমর্পণে।

বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেলে আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

মানসী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হইল।

ধরিত্রীর হৃৎকেন্দ্রে থাকিয়া যে শিবশক্তি নিখিল জীবলীলা পরিচালিত করে তাহারি নিগূঢ় বোধের রূপকময় প্রকাশ 'অহল্যার প্রতি' কবিতায়।[৪] জীবনের নূতন-পুরানোর সন্ধিস্থলে ভাবনা-কামনার দোলায় কবিচিত্ত যে দোটানা বেগ অনুভব করিতেছে তাহারি প্রকাশ 'বিদায়' ও 'সন্ধ্যায়' কবিতাদ্বয়ে।[৫] 'শেষ উপহার' (৯ কার্তিক ১২৯৭) বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের ইংরেজি কবিতা অবলম্বনে লেখা।[৬]

মানসী প্রতিমা সম্পূর্ণ হইলে পর কবিচিত্ত আত্মস্থ হইয়া জীবনের দিকে মুখ

---

[১] রচনাস্থান সোলাপুর (বোম্বাই প্রদেশ), কাল ৬ বৈশাখ ১২৯৬। [২] 'মায়া' (১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) ও 'মেঘের খেলা' (৭ জ্যৈষ্ঠ)। [৩] রচনাকাল শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৯৬।

[৪] রচনাকাল ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। অহল্যার গল্পকে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তায় মণ্ডিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে একটি চমৎকার গান রচনা করিয়াছিলেন (পরে দ্রষ্টব্য)।

[৫] প্রথম কবিতা ১২৯৭ সালের আশ্বিন মাসে, দ্বিতীয় কবিতা ৭ কার্তিক রচিত।

[৬] প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। রচনাকাল ৯ কার্তিক ১২৯৭।

ফিরাইয়াছে। পরাজিত এখন যেন জয়ী। মানসীর শেষ কবিতা 'আমার সুখ'[১] ইহাই বুঝাইতেছে।

> তাই ভাবি এ জীবনে, আমি যাহা পাইয়াছি
> তুমি পেলে নাকো।

৮

মানসীর কতকগুলি কবিতায় নবযৌবনের অকৃতার্থ প্রেম রূপায়িত ও আদর্শার্পিত হইয়া কবিহৃদয়কে চিরবিরহী করিয়াছে। এই বিরহপ্রেম রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রধান আলম্বন,—"এ প্রেম আমার সুখ নহে দুখ নহে"। দুই-একটি কবিতায় এই আদর্শাপিত প্রেমকল্পনা নির্ব্যক্তিক অধ্যাত্ম-ভাবনার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। যেমন

> তুমি যেন ওই আকাশ উদার
> আমি যেন এই অসীম পাথার,
> আকুল করেছে মাঝখানে তার
> আনন্দ-পূর্ণিমা।...
> একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
> সকল প্রেমের স্মৃতি,
> সকল কালের সকল কবির গীতি।

৯

রচনা কাঁচা হোক, পাকা হোক, কাঁচা-পাকা হোক—রবীন্দ্রনাথের কোন একখানি কবিতাগ্রন্থকে যদি তাঁহার কাব্যশিল্পের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তো সে মানসী। দেশ কাল বস্তু ভাব ভাষা ছন্দ—সবদিক দিয়াই মানসীর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। (একথা বলি না যে মানসীর কবিতাগুলিই শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু এ কথা বলিতে চাই যে মানসীর কবিতায় দোষত্রুটি সত্ত্বেও যে সংহতশক্তি ও সম্ভাবনা প্রকটিত তাহা পূর্বে অথবা পরে লেখা আর কোন কবিতাগ্রন্থে নাই।) কলিকাতায় (জোড়াসাঁকোয় ও পার্ক স্ট্রীটে), বোলপুরে, গাজিপুরে, সোলাপুরে, পুনায়, লণ্ডনে, লোহিত-সমুদ্রবক্ষে জাহাজে—বিভিন্ন বিচিত্র স্থানে মানসীর কবিতাগুলি লেখা। রচনাকাল ১৮৮৬ হইতে ১৮৯০। বস্তু ভাব ও ছন্দের আলোচনা পূর্বের প্রসঙ্গগুলিতে দ্রষ্টব্য॥

---

[১] রচনাকাল ১১ কার্তিক ১২৯৭ (স্থান লোহিত সমুদ্র)।

১০

ছন্দের বিচিত্রতা ও ধ্বনির তরঙ্গরঙ্গ মানসীর কবিতায় অদ্ভুতভাবে প্রকটিত। সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ধ্বনির ও ছন্দের এই নিপুণ ও অভিনব পরিচালনা পাঠকের কান এড়াইতে পারে। সেইজন্য প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা এইখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।

> এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যথা
>
> নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
> উর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।[১]
>
> 'নিম্নে' 'স্বচ্ছ' এবং 'উর্ধ্বে' এই কয়েকটি পদে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে ; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে বাঙ্গালা ছন্দ সম্বন্ধে খাঁটি কথা প্রথম শোনা গেল।

মানসীর কবিতায় নূতন ছন্দের ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে 'বিরহানন্দ'।[২] মাত্রাবৃত্ত : ছত্রের প্রথম পর্বে দ্বিতীয় অক্ষরে স্বর দীর্ঘ, অন্যত্র হ্রস্ব।

১ ২ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১
ছিলাম	নিশিদিন	আশাহীন	প্রবাসী
১ ২ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১
বিরহ	তপোবনে	আনমনে	উদাসী

'ক্ষণিক মিলন'ও[৩] এই ছন্দে লেখা।

'বধূ'তে[৪] ছত্রে যতির প্রথম পর্বে দ্বিতীয় অক্ষরে স্বর দীর্ঘ, অন্যত্র হ্রস্ব।

১ ২ ১	১ ১ ১ ১	১ ২ ১	১ ১ ১ ১
ছিলাম	আনমনে	একেলা	গৃহকোণে

'গুপ্তপ্রেম'ও[৫] এই ধরণের ছন্দে লেখা।

---

১ "এই ছন্দে যে যে স্থান ফাঁক শুধু সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক।" ২ রচনাকাল জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪। ৩ রচনাকাল ৯ ভাদ্র ১২৯৬। ৪ রচনাকাল ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫। ৫ রচনাকাল ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫।

ঝোঁক-দেওয়া কাটা কাটা তালে লেখা 'অপেক্ষা' ও 'দুরন্ত আশা' ছন্দের দিক দিয়া খুব উল্লেখযোগ্য।[১] পয়ারে যেমন

বরষার। নির্ঝরে॥ অঙ্কিত। কায়
দুই তীরে। গিরিমালা॥ কতদূর। যায়।[২]

'নিষ্ফল কামনা'[৩] অসম ছত্রের পয়ারে লেখা, মিল নাই। ১৯১৪ সালের আগে রবীন্দ্রনাথ আর কোন কবিতা এ ছাঁদে লেখেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যশিল্পের সবদিকের রাজা এবং মিলেরও রাজা। "ফেনা ঢোকে নাকে চোখে প্রবল মিলের ঝোঁকে,"—একথা অত্যুক্তি নয়।

কবিতার স্তবক-গঠনে রবীন্দ্রনাথ মানসীতে যে বিচিত্রতা দেখাইয়াছেন তাহাও তাঁহার আর কোন কাব্যে দেখা যায় নাই। যেমন

পাঁচ ছত্রের স্তবক ; মিল—ক খ গ গ ক : 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'শূন্যগৃহে', 'মেঘের খেলা'।

পাঁচ ছত্রের স্তবক ; মিল—ক খ গ গ ক খ : 'মরণস্বপ্ন'।

পাঁচ ছত্রের স্তবক ; মিল—ক ক খ খ ক : 'কবির প্রতি নিবেদন' ও 'বর্ষার দিনে'।

আট ছত্রের স্তবক ; মিল—ক খ ঘ গ ঘ ঙ খ খ : 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'।

তিন ছত্রের স্তবক ; মিল—ক ক ক : 'ভৈরবী গান', 'ধর্মপ্রচার' ও 'ভালো করে বলে যাও'। উদাহরণ

কোথায় রহিল কর্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম !
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায় বেদ পুরাণের মর্ম ![৪]

---

[১] রচনাকাল ১৪ ও ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫। [২] 'নিষ্ফল উপহার'।
[৩] রচনাকাল ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৪। [৪] 'ধর্মপ্রচার'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থলে—জলে

(১৮৯০—১৮৯৩)

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে মানব-হৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে চলিতে দিবস নিশীথে।"

১

পারিবারিক জমিদারির ভারপ্রাপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ সংসারের কর্মে যোগ দিলেন। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় কাটিতে লাগিল উত্তর মধ্যবঙ্গে পদ্মার ও শাখা-নদীর উপরে বোটে অথবা তীরে কাছারি ভবনে। গাজিপুরে গঙ্গা অদূরবাহিনী ছিল। এখানে, পতিসর-শিলাইদহ-সাজাদপুরে ছোট বড় নদীগুলি ছিল ঘরের প্রান্তবাহিনী, বোটে থাকিলে ঘরের তলবাহিনী। নদী এখন কবিচিত্তকে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং মধ্যস্থ হইয়া জড় ও জীব প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া দিল।

বিরহ-বেদনার স্মৃতিরেশ যেটুকু ছিল এই পরিবেশে তাহা ফিকা হইয়া আসিল এবং মানসী প্রতিমা জীবন্মুক্ত হইয়া রূপকথার রূপসীমূর্তিতে দেখা দিল।[১] এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সিম্বলিজমের সূত্রপাত। অর্থাৎ তাঁহার কবিভাবনায় তখন সিম্বল গুটি বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। যেমন 'সোনার বাঁধন'[২] কবিতায়।

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।

বহির্জগতের প্রতি কবির দৃষ্টি প্রখর এবং অন্তর্ভেদী হইতেছে। তাহার আভাস কবিতায় গল্পের আমেজে, উদ্ভাস ছোটগল্পে, প্রকাশ প্রবন্ধে। এই দৃষ্টিফসলের ক্ষেত্র হইল 'সাধনা' (১২৯৮-১৩০২)। এই সময়ের একটি চিঠিতে

---

[১] 'রাজার ছেলে' (কলিকাতা, চৈত্র ১২৯৮), 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' (শান্তিনিকেতন, ১৪-১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯), 'মানসসুন্দরী' (শিলাইদহ বোটে, ৫ পৌষ ১২৯৯), 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০)।

[২] শান্তিনিকেতন, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।

(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিতে পারি যে ভবিষ্যৎ কালান্তরের যবনিকা ভেদ করিয়া তখনি তাঁহার প্রত্যয় 'সাধনা'র মধ্য দিয়া সিদ্ধি অনুভব করিয়াছিল।

> মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক এক সময়ে আমি নিজেই খুব দুর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু'চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—একে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। আমি যদি আমার সহকারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

মানব-জীবনস্রোতে অবগাহনের যে সঙ্কল্প মানসীর কোন কোন কবিতায় শ্রুত হইয়াছিল তাহার সিদ্ধি দূরবর্তী রহিল না। অতঃপর পারিবারিক বিষয়-কর্মের ভার লইয়া কবিকে শহর ও গঙ্গা ছাড়িয়া দুই একবার উড়িষ্যায় যাইতে এবং দীর্ঘকাল উত্তর মধ্যবঙ্গে নদীবক্ষে ও নদীকূলে—শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর-কালিগ্রামে বাসা বাঁধিতে হইয়াছিল। এই অবকাশে রবীন্দ্রনাথ শহর থেকে দূরের দেশে সাধারণ মানুষের অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন। নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব শান্ত হইয়া গিয়াছে, স্মৃতির বেদনা এখন জীবনের আনন্দে মিশিয়া গিয়াছে। সে আনন্দের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে মানসসুন্দরীর মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠে। কল্পনার রাজ্যে মিলনের বাধা নাই। জড়প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি যেখানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এমন পরিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কবি যেন নিখিল-জীবসূত্রের টান অনুভব করিতে লাগিলেন। এ আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, ভাববিলাসও নয়, জীবনের নাড়ীর স্পন্দন। তাই এখন নিতান্ত সাধারণ মানুষের ছোটখাট দুঃখ-সুখ, তাহার ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ আশানিরাশা সুমহৎ তাৎপর্য লইয়া ধরা দিল।

আগেই বলিয়াছি এই সময়ের অনেক কবিতায় রূপকথার গুটি ধরিয়াছে ও রূপকের ছোঁয়া লাগিয়াছে। কোন কোন কবিতায় কাহিনীসূত্র ধরিয়াই

কাব্যরস জমিয়াছে। মোট কথা, এখন হৃদয়াবেগ সংযত ও কাব্যবস্তু সংহিত হইয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে শিল্পকৌশলের দিকে আগেকার মতো দৃষ্টি আর নাই, তাই দুইই সরল, একটু হয়ত তরল, তবে সর্বদা সুষম ॥

২

পদ্মা-পালার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'সোনার তরী' (১৩০০, ১৮৯৩)। ইহাতে তেতাল্লিশটি কবিতা আছে, তাহার মধ্যে অন্তত চৌদ্দ-পনেরোটি পদ্মা-ভূভাগের বাহিরে—কলিকাতায়, শান্তিনিকেতনে, সিমলায়, উড়িষ্যায় জলপথে—লেখা।

সোনার-তরী কাব্যনামটি—প্রথম কবিতাটির নামও 'সোনার তরী'—রূপক এবং রূপকথা দুইয়েরই আশ্রিত। কবিতাগ্রন্থটির নামের ও ভাবের ইশারা মানসীর শেষ কবিতা আমার-সুখে পাওয়া গিয়াছিল।

ভেসে যেত মনখানি কনকতরণীসম
গৃহহীন স্রোতে,

'বিদায়' কবিতাটিতেও সোনার-তরীতে নিরুদ্দেশ-যাত্রার বাসনা পরিস্ফুট। বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে যে লিখিয়াছিলেন—"সোনামুখী তরীখানি গিয়াছে কোথায়", তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সোনার-তরীর সম্পর্ক নাই।

ভাব ও বিষয় ধরিয়া সোনার-তরীর কবিতাগুলিকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—রূপক, কাহিনী, বাসনা-ভাবনা, ও প্রেমদৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি আবার দুইভাগে পড়ে—আত্মচিন্তা ও বিশ্বভাবনা। আত্মচিন্তার মধ্যে পড়ে, রচনাকালানুক্রমে, 'সোনার তরী', 'অনাদৃত', 'নদীপথে', 'ঝুলন', 'মানস-সুন্দরী', 'দেউল', 'হৃদয়যমুনা', 'ব্যর্থযৌবন', 'ভরা-বাদরে', 'অচল স্মৃতি', 'প্রতীক্ষা' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' যথাক্রমে সোনার তরীর প্রথম ও শেষ কবিতা।

'সোনার তরী'[১] ও 'অনাদৃত'[২] কবিতা দুইটির মধ্যে শুধু ছন্দে নয় ভাবেও গভীর ঐক্য আছে। দুইটিতে রূপকচ্ছলে এই কথা বলা হইয়াছে যে নিরাসক্ত

[১] শিলাইদহে লেখা, ফাল্গুন ১২৯৮। প্রথম প্রকাশ সাধনা আষাঢ় ১২৯০।

[২] উড়িষ্যায় জলপথে ২২ ফাল্গুন ১২৯৯। একটি চিঠিতে (সাজাদপুর ২০ আষাঢ় ১৩০০) কবিতাটি 'জালফেলা' বলিয়া উল্লিখিত ('ছিন্নপত্র')।

আনন্দদৃষ্টিপথেই মানববোধে চরমসত্যের প্রতীতি। মানুষের ব্যক্তিক অনুভবে সে সত্যের প্রতীতি সে আনন্দের প্রত্যয় হয় না। ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ়তম প্রকাশ তাহার বাসনায় নয় কর্মেও নয়, সে তাহার নিরাসক্ত অনুভবে।

'সোনার-তরী' কবিতাটির ছন্দে যেন নদীপ্রবাহের খরস্রোতে জলতরঙ্গ বাজিতেছে। ধ্বনি-শব্দ-অর্থের এমন ত্রিবেণীসঙ্গম সুদুর্লভ। সোনার-তরীতে ফসল কাটিয়া লইয়া কবি যেন ওপারের খেয়ার অপেক্ষায় নদীকূলে উপবিষ্ট। খেয়া আসিয়া ফসল তুলিয়া লইল, মালিককে লইল না। 'অনাদৃত' কবিতায় কবি যত্ন করিয়া জাল গাঁথিয়া সারাদিন ধরিয়া দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু যাহার জন্য আনা সে কিছুই লইল না, অপরে লুটিয়া লইল। 'নদীপথে'[১] কবি যেন তীরে বাঁধা তরীতে বসিয়া। এই তিনটি কবিতা মিলিয়া যেন নিরুদ্দেশ-যাত্রার ভূমিকা-পর্ব।

মানসীর "মানসী প্রতিমা" সোনার-তরীর 'মানসসুন্দরী'[২] কবিতায় চিরন্তন রসলোকে কাব্যলক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠিত।

ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের রসানুভূতির গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব-সৌন্দর্যের অঙ্গনে মানসসুন্দরীর লীলাবিলাস, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া কবিহৃদয় তাহাকে মূর্তিতে ধরিতে চায়। মৃত্যুর আড়ালে থাকিয়া অপরূপের সিংহাসন হইতে যে নারী কবির হৃদয়-বীণায় বিচিত্ররাগিণীতে ঝঙ্কার তুলিতেছেন, তাঁহাকে রূপের গোচরে নূতন করিয়া দেখিবার আশা জাগিতেছে।

গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চির সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।

---

১ 'অনাদৃত' কবিতার পরের দিনে লেখা (উড়িষ্যার জলপথে)। ২ শিলাইদহে বোটে লেখা ৪ পৌষ ১২৯৯।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'[১] কবিতায় মানসসুন্দরী ছদ্মবেশে কনকতরণীর কাণ্ডারী-রূপে দেখা দিয়াছে।

'অনাদৃত' ও 'নদী পথে' যেমন 'দেউল' কবিতাটিও তেমনি উড়িষ্যায় খাল-পথে বোটে থাকিয়া লেখা। তিনটি কবিতার মধ্যে ভাবেও সাম্য আছে। শিল্পীর বিজন সাধনার ফল তখনই ফলিয়াছে যখন সে সাধনার আয়োজন তাঁহার কাছে আর আবশ্যক নয়। উড়িষ্যার প্রাচীন দেবমন্দির ও তাহার স্থাপত্য রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনাকে কিভাবে রঞ্জিত করিয়াছিল তাহার পরিচয় কবিতাটিতে পাই। 'চিত্রা'র 'প্রস্তরমূর্তি' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতায় এমন স্থাপত্যশিল্প উপলক্ষ্য হয় নাই।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি' চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি' রাখে।
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত
পক্ষীরাজ উড়িছে কত শত।
ফুলের মত পাতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে'
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি' নত,...

৩

বিশ্বভাবনার মধ্যে পড়ে 'শৈশবসন্ধ্যা', 'আকাশের চাঁদ,' 'যেতে নাহি দিব', 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা'। জড় ও জীব জগতের মধ্যে ওতপ্রোত মহাচেতনাকে বিশ্বধাত্রীরূপে অনুভূতি ও কল্পনা এই মহৎ কবিতাগুলিতে বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত। মহাজীবনের অখণ্ড পরিচয়ের নিমিত্ত আগ্রহ সোনার-তরীর অনেকগুলি বিশিষ্ট কবিতার মর্মবাণী। এই কবিতাগুলি তাহার মধ্যে পড়ে।

---

১ রচনা ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০। প্রথম প্রকাশ 'সাধনা' (পৌষ ১৩০০)।

রচনাকাল ধরিলে 'শৈশব সন্ধ্যা'[১] সোনার-তরীর প্রথম চারটি কবিতার অন্যতম। প্রসারিত প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে শৈশববোধকে অবলম্বন করিয়া কবিচিত্তে একদা কেমন করিয়া বিশ্বভাবনার বেদনা জাগিয়াছিল এই কবিতায় তাহারই স্পন্দন।

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার
মায়ের অঞ্চল সম।

গৃহমুখী বালক-পথিকের "উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক" এই স্তব্ধতাকে অকস্মাৎ ছিন্ন করিয়া দিল।

তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দুখান।

অমনি জাগিয়া উঠিল চিরন্তন জীবনপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে আপন শিশুকালের চেতনাটুকু।

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

'যেতে নাহি দিব'[২] ভারতীয় সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম মহাকাব্য। কবিতাটিতে বাৎসল্যের হৃদয়াবেগ জল স্থল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। অবুঝ মানবহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা যেন দিকে দিকে বাহুবিস্তার করিয়া জীবধাত্রী মূক বৃহৎ বেদনাময়ী পৃথিবী জননীর ব্যাকুল চেতনাদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছে। একটি চিঠিতে কবিতাটির তত্ত্ব-ব্যাখ্যা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, যখনি দৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধির প্রমাণ—এই "দুইয়ের মাঝে মাঝে একান্ত বিরোধ ঘটে

---

১ রচনা ফাল্গুন ১২৯৮ প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯। সোনার-তরীতে প্রথম বাইশ ছত্র বাদ গিয়াছে। সাধনায় কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ

সরিষার ক্ষেতভরা ফুটিয়াছে ফুল
পুকুরের এক পারে; বাতাস আকুল
থেকে থেকে গন্ধ তার উড়াইয়া আনে
বহু বরষের কথা জাগায়ে পরাণে।...

২ রচনা ১৪ কার্তিক ১২৯৯, প্রকাশ সাধনা অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

তখনি রহস্য বড়ো কঠিন ও বড়ো দুঃখকর হয়ে ওঠে। স্বয়ং মৃত্যুর মধ্যেই এই বিরোধ আছে—আমাদের হৃদয়ের সহজ বোধ তাকে চরম বলে মানতে চায় না—কিন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণের আর অন্ত নেই—এই দুই প্রতিপক্ষের টানাটানিতেই তো এই দুঃসহ বেদনা। আমার 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি এই বেদনারই কবিতা…"[১]

চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ-ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী।…
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তার সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

'সমুদ্রের প্রতি'[২] কবিতায় বিশ্বজননীর শান্তিময়ী সমবেদনার প্রকাশ, তাঁহার যেন ঘুমপাড়ানি বেশ। ('যেতে নাহি দিব' কবিতায় জীবধাত্রীর সন্তান-বিয়োগব্যথাশঙ্কিনী মূর্তি।) কবিতাটির দীর্ঘবিলম্বিত পয়ার ছন্দের স্পন্দনে ও প্রতিমানের করুণ গম্ভীর আবেদনে যেন সিন্ধুতরঙ্গ অনুদাত্ত-উদাত্ত-স্বরিতে উদ্বেল। উদাত্ত কাব্য বলিতে আমরা সচরাচর যাহা ভাবিয়া থাকি তাহার পূর্ণ লক্ষণ এই স্বল্পকায় গীতিকবিতাটিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বিশ্বজগতের মর্মস্থলে বসিয়া যে মহাচেতনা সৃষ্টিসংহারে তাল ঠুকিয়া চলিয়াছে, মানবহৃদয়ে সে তালের যে অবোধ প্রতিধ্বনি বাজিতেছে তাহাই কবিতাটির দ্যোতনা।

---

[১] 'পথে ও পথের প্রান্তে' পৃ ১৬। [২] রচনা ১৭ চৈত্র ১২৯৯, প্রকাশ সাধনা বৈশাখ ১৩০০।

শুধু অর্ধ-অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে, মনে তা'র দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

'যেতে-নাহি-দিব'য় বিশ্বচেতনা আশঙ্কাব্যাকুল জীবধাত্রী, 'সমুদ্রের-প্রতি'তে তিনি ঘুমপাড়ানি মা, 'বসুন্ধরা'য়[১] তিনি অঙ্কপালিকা শিশুজননী। জীবনরস পরিপূর্ণভাবে পান করিবার, সর্ববিধ জীবলীলায় যোগ দিবার আগ্রহ বসুন্ধরায় গুঞ্জরিত। যে ব্যক্তাব্যক্ত জীবন মানুষের নানা সমাজে নানা অবস্থায় নানা-কালে নানাভাবে এবং পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-তৃণ-পাষাণ-মৃত্তিকার মধ্যে স্পন্দমান, সেই নিখিলপ্রবাহিত জীবনসত্তার সজাগ অনুভূতি কবিচিত্তকে গভীর ভাবে নাড়া দিতেছে। এবং কবিচেতনা বিশ্বচেতনার সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করিতেছে। এ যেন সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতির কাব্যময় প্রকাশ। তবে সব ছাপাইয়া জাগিয়াছে পৃথিবীর প্রতি কবির ভালোবাসা।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল…
তাই আজি
কোনদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মিলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর !…

অনাদিকাল হইতে যে জীবস্রোত বসুন্ধরার "মৃত্তিকা সনে মিশায়েছে অন্তরের প্রেম" তাহা কবিহৃদয় আপনার প্রেমে নূতন রঙে রঙাইয়া নূতন অলঙ্কারে সাজাইয়া দিবে, তাহাতে কবিসত্তা মানবের জীবলীলায় একটুখানি অতিরিক্ত আনন্দের যোগান দিবে,—ইহাই অন্তরের কামনা।

---

১ রচনা ২৬ কার্তিক ১৩০০।

আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে'
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি র'ব না আমি?

৪

বিশুদ্ধ কাহিনীর মধ্যে পড়ে 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'—এই চারিটি রূপকথামূলক কবিতা; 'হিং টিং ছট্‌', 'পরশপাথর', 'দুই পাখী', 'গানভঙ্গ' ও 'আকাশের 'চাঁদ'—এই পাঁচটি কাহিনীগর্ভ রূপকাশ্রিত কবিতা। 'হিং টিং ছট্‌ (স্বপ্নমঙ্গল)'[১] কবিতাটির কঠিন ব্যঙ্গ ও সরস বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেও অসাধারণ। বাঙ্গালী শিক্ষিত-সমাজের এক সম্প্রদায়ের মানসে তখন জাতীয়তার নামে যে অতীত-দিনোচিত মূঢ়তা লালিত হইতেছিল তাহারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আক্রমণ। এই বাগ্‌বজ্রের লক্ষ্য সেকালের "আর্যামি"র পাণ্ডারা এবং পণ্ডিতাভিমানীরা সাধারণ ভাবে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সন্ধান এমনি অব্যর্থ হইয়াছিল যে উদ্দিষ্ট দলের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তিকে লাগিয়াছিল।

'পরশপাথর'[২] অপূর্ব রূপককাহিনী। মানুষ সর্বদা অতৃপ্ত। সুখ যে অত্যন্ত সহজ সরল এবং, মন প্রস্তুত থাকিলে অনায়াসলভ্য, তাহা না জানিয়া সে এ নহে এ নহে বলিয়া হাতের কাছের সব-কিছু উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের ধ্যানে বুঁদ হইয়া জীবনের মূল্যবান্ দিন কয়টি অবহেলায় কাটায়। যখন তাহার হুঁশ হয় তখন সে বোঝে যে একদা সে সুখ হাতের কাছে পাইয়াছিল। কিন্তু জীবনে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্তন কখনো নয়। মানবজীবনের যথার্থ সত্য এই ব্যর্থতার মধ্যে নিহিত।

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণ চক্ষু বুঝি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর
বাকী অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিছে খুঁজিতে সেই পরশপাথর।

---

[১] রচনা ১৮ জ্যৈষ্ঠ, প্রকাশক সাধনা শ্রাবণ ১২৯৯। [২] রচনা ১২ জ্যৈষ্ঠ, প্রকাশ সাধনা ভাদ্র ১২৯৯।

'আকাশের চাঁদ' কবিতাটির বার্তা একটু অন্যরকম। এই কবিতারই মর্ম অনেককাল পরে আর একটি কবিতায় পাওয়া গিয়াছে।

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।[১]

সংসারের স্নেহ প্রেম সুখ উপেক্ষা করিয়া যে আকাশের চাঁদের জন্য কাঁদে সে যখন তাহার ভুল বোঝে তখন আর জীবনের সামান্য সুখ-দুঃখের আঙিনা-টুকুতে ফিরিয়া যাইবার পথ নাই।

'গানভঙ্গ'[২] কবিতার বিষয় স্বপ্নলব্ধ।

বাসনা-ভাবনা পর্যায়ে পড়ে 'বর্ষাযাপন', 'বিশ্বনৃত্য', 'পুরস্কার' ও সনেট আটটি। 'বর্ষাযাপন'[৩] কবিতায় যেন মানসীর 'পত্র'-এর জের। শেষ কয় ছত্রে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনায় ঝোঁকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমুদ্রদর্শনে কবিচিত্তের বিপুল উদ্দাম আনন্দ-অনুভূতির ছন্দমুখর প্রকাশ 'বিশ্বনৃত্য'[৪] কবিতায়। এই আনন্দ-অনুভূতি বৈদিক কবির "একোহহং বহু স্যাম্" চিন্তার সগোত্র।

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।

'ঝুলন'[৫] কবিতার উদ্দীপনাও প্রায় সমুদ্রতাণ্ডব। কিন্তু এখানে আনন্দানুভূতি সমষ্টির সংযোগে নয়, ব্যষ্টির সহযোগে। এখানে বিশ্ব-রাসনৃত্য নয়, পরাণ-বধূর সঙ্গে ঝুলন খেলা। 'পুরস্কার'[৬] রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম কবিতার একটি। অত্যন্ত সহজ ও সরল এবং সরস। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যবোধের প্রয়াস বোধকরি ইহাতেই প্রথম পাইলাম। নিজের সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতও আছে।

---

[১] 'খেয়া' কাব্য দ্রষ্টব্য। [২] 'সভাভঙ্গ' নামে সাধনায় (চৈত্র ১২৯৯) প্রকাশিত। রচনা সাজাদপুরে ২৪ আষাঢ় ১৩০০। কবি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ২ জুলাই ১৮৯৫ (ছিন্নপত্র, ৩ জুলাই ১৮৯২ তারিখে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য)।

[৩] রচনা কলিকাতা ও শান্তিনিকেতন, সমাপ্তি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

[৪] রচনা কটক হইতে কলিকাতা-প্রত্যাবর্তনের পথে স্টীমারে, ২৬ ফাল্গুন ১২৯৯।

[৫] রচনা রামপুর বোয়ালিয়া, ১৫ চৈত্র ১২৯৯। [৬] রচনা সাজাদপুর, ১৩ শ্রাবণ ১৩০০।

না পারে বোঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চম কূজে
মাগিছে তেমনি সুর ;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু চারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর ।

সোনার-তরীর বাকি কবিতাগুলি শেষ পর্যায়ে পড়ে—'তোমরা এবং আমরা', 'সোনার কাঁকণ', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'দুর্বোধ', 'ব্যর্থ যৌবন', 'প্রত্যাখ্যান' ও 'লজ্জা'। বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় তাঁহাদের অবচেতন অন্তরের প্রেমভাবনা মিশিয়া গিয়াছিল, এবং তাহাতেই বৈষ্ণব কবিতার সজীব ও কালাতীত আবেদন নিহিত,—এই ইঙ্গিত 'বৈষ্ণব কবিতা'র[১] তাৎপর্য।

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

বৈষ্ণব কবিতার রাধার মতো আপনাকে বিরহিণী নারীরূপে কল্পনা প্রথম দেখা গেল 'ব্যর্থ যৌবন'[২] কবিতায়। অতএব এই কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসরণিতে একটি মার্গচিহ্ন বলিতে পারি।

এ বেশভূষণ লহ সখী লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহ-
শয়নে।...

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে
এসেছি।...

মনে লেগেছিল হেন, আমারে সে যেন
ডেকেছে।...

কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মত
রজনী-প্রভাতে বসে' র'ব কত!

---

[১] রচনা সাজাদপুর, ১৮ আষাঢ় ; প্রকাশ সাধনা ফাল্গুন ১২৯৯। [২] রচনা ১৬ আষাঢ় ১৩০০।

এ কবিতার "সখী" আর 'দুর্বোধ'[১] প্রভৃতি আগেকার কবিতার "সখী" এক নয়। আগেকার "সখী" এখন হইয়াছে "বধূ" ('ঝুলন'[২]), প্রিয়া। ব্যর্থ-যৌবনের সখী হইয়াছে বেদনাদূতী, কবির আপন হৃদয় (বৈষ্ণব কবিতার দূতী-সখী)। ঝুলনে যাহাকে বধূরূপে পাওয়া গিয়াছিল ("বধূরে আমার পেয়েছি আবার"—) অতঃপর তিনি "বঁধু" (=বন্ধু) রূপে রহিয়া গিয়াছেন।

বসন্ত নিশীথে বঁধু
লহ গন্ধ, লহ মধু![৩]

'প্রত্যাখ্যান'[৪] এবং 'লজ্জা' কবিতাদ্বয়ে যেন বৈষ্ণব-কবিতার রাধায় অনুভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনার অনুসরণ সূচিত। যেমন

সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
যেয়ো না।
অমন দীন নয়নে তুমি
চেয়ো না।

---

১ পদ্মায় জাহাজে ১১ই চৈত্র ১২৯৯।
২ ১৫ চৈত্র ১২৯৯।
৩ 'লজ্জা' (২৮ আষাঢ় ১৩০০)।
৪ ২৭ আষাঢ় ১৩০০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
অভিসার
(১৮৯৩-১৮৯৬)

"তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

১

'চিত্রা'য় (১৩০২, ১৮৯৬) রূপকথার তুঙ্গ প্রাসাদ হইতে যেন সাধারণ জীবনের সমতল ভূমিতে অবতরণ। সোনার-তরীর ও চিত্রার কাহিনী-কবিতাগুলি তুলনা করিলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। একটা সর্বব্যাপী প্রশান্তিপ্রবাহে কবিচেতনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আর কবিভাবনা যেন জীবন-স্রোতোবাহী জীবলীলায় চলৎচিত্রার্পিত হইয়াছে। এইখানেই কাব্য-নামটির বিশেষ সার্থকতা।[১] চিত্রার প্রথম কবিতা 'সুখ'[২] সোনার-তরীর সময়ের রচনা হইলেও কেন যে তাহা সোনার-তরীতে না গিয়া চিত্রার দ্বিতীয় আদি কবিতা হইল, তাহার কারণও ইহাই।

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত ; ...

অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে ; ভাঙা উচ্চতীর ;

---

[১] চিত্রা বাহির হইবার একমাস আগে (২২ মাঘ ১৩০২) 'নদী' পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ-উপহার রূপে। কবিতাটি পরে শিশুতে সঙ্কলিত হইয়াছে। 'নদী'র মধ্যে চিত্রা কাব্যের গূঢ় মর্মের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

[২] রচনা ১৩ চৈত্র ১২৯৯, প্রকাশ সাধনা আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০।

ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটীর ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দুর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মত ;

২

অতীত স্মৃতির নারীমূর্তি সোনার-তরীর 'মানসসুন্দরী'তে এবং চিত্রার 'অন্তর্যামী'তে আর তাহার দেবমূর্তি চিত্রার 'জীবনদেবতা'য়। অন্তর্যামী যেন কবির ঈপ্সা (Quest) আর জীবনদেবতা যেন কবির ভাগ্য (Fate)। তাই একদিকে নিরাসক্ত নির্বন্ধন সৌন্দর্যের উদাত্ত কল্পনা, অপরদিকে জীবনের শ্রান্তি-ক্লান্তি হইতে মুক্তিকামনা,—এই দুই ভাবনা চিত্রা কাব্যের বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে প্রকট।

চিত্রার কবিতাগুলি পাঁচ পর্যায়ে ভাগ করা যায়,—কাহিনী, চিত্র, স্বীকৃতি (apologia), অন্তর্যামী ও জীবনদেবতা। 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'—এই তিনটি কাহিনীর অন্তর্গত। অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবনের মহৎ মূল্য এই তিন কবিতায় রেখাচিত্রিত। এ তিনটি কবিতা এবং সোনার-তরীর 'গানভঙ্গ' ও 'পুরস্কার' যেন সমসাময়িক কবিতার ভূমিতে গল্পগুচ্ছের—অনধিকার বলিব না, অনপেক্ষিত কিন্তু স্বাগত—প্রবেশ। চিত্রা পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের প্রশান্তি প্রেম ও সৌন্দর্যকল্পনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে একতানে মিলিয়াছে,—'সুখ', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'প্রেমের অভিষেক', 'সন্ধ্যা', 'পূর্ণিমা', 'উর্বশী', 'সান্ত্বনা', 'দিনশেষে', 'বিজয়িনী', 'প্রস্তরমূর্তি', 'নারীর দান', 'রাত্রে ও প্রভাতে', 'প্রৌঢ়' ও 'ধূলি'। স্বীকৃতি পর্যায়ে পড়ে 'এবার ফিরাও মোরে', 'মৃত্যুর পরে', 'সাধনা', 'শীতে ও বসন্তে', 'নগরসঙ্গীত', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'গৃহশত্রু', 'মরীচিকা', '১৪০০ সাল' ও 'দুরাকাঙ্ক্ষা'। এগুলিতে বোঝা যায় যে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বোঝাপড়া এবং সমাজে-সংসারে সহজ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। অন্তর্যামী পর্যায়ে পড়ে 'চিত্রা', 'অন্তর্যামী' ও 'উৎসব'। জীবনদেবতা পর্যায়ে পড়ে 'আবেদন', 'শেষ উপকার', 'জীবনদেবতা', 'নীরব তন্ত্রী' ও 'সিন্ধুপারে'। অপর পর্যায়ের কোন কোন কবিতায়ও অন্তর্যামী-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত॥

৩

প্রকৃতির প্রশান্ত সৌন্দর্যানুভূতির তলায় যে সত্তা লুকাইয়া আছে 'জ্যোৎস্নারাত্রে'[১] কবিতায় তাহারই উপলব্ধির প্রকাশ। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় যে বিরহিণীর জন্য ঈপ্সা, চিত্রার 'জ্যোৎস্নারাত্রে' বাসকসজ্জারূপিণী সেই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীরই আরতি।

জীবনদেবতার প্রেমমহিমায় কবিসত্তা মহীয়ান্,—ইহাই 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার[২] মর্মকথা। জ্যোৎস্নারাত্রে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সমীপে কবি যেন মালা লইয়া উপস্থিত, এখানে যেন কবিহৃদয়ের প্রেমাভিষেক ও অর্ধাসন-লাভ। দিনে বাহিরে যে দীন রাত্রিতে অন্তরে সে রাজা।

সোনার-তরীর যেতে-নাহি-দিব কবিতায় যে বসুন্ধরার স্নেহশঙ্কিনী মাতৃমূর্তি, চিত্রার 'সন্ধ্যা'[৩] কবিতায় সায়াহ্নের ম্লানায়মান দিগন্তে তাঁহারই উদাসী হৃদয়ের বিষাদ ধূসরতা বিস্তারিত। অপূর্ব ছবি।

গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।
অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে ;

জীবধাত্রী জননীর অস্ফুট মনোবেদনা, কবিহৃদয়কে জীবনের কর্মক্ষেত্রে টানিতে লাগিল। এই আহ্বানের স্বীকৃতি 'এবার ফিরাও মোরে'।[৪] স্বধর্মে থাকিয়া স্বকর্মের দ্বারাই কবি এই আহ্বানে সাড়া দিবেন।

যে দিন জগতে চ'লে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।

[১] ৬ মাঘ ১৩০০, প্রকাশ সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০১। প্রথম আট ছত্র পরে পরিত্যক্ত।

[২] ১৪ মাঘ ১৩০০, সাধনা ফাল্গুন ১৩০০। চিত্রায় অর্ধেকেরও বেশি ছত্র পরিত্যক্ত, এবং নায়ক (বাঙ্গালী কেরানী তরুণ) পরিবর্জিত হওয়ায় কবিতাটি কালপরিবেশমুক্ত। বর্জিত অংশ প্রথম খসড়ায় ছিল না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি (৬ চৈত্র ১৩০২) দ্রষ্টব্য।

[৩] পতিসর ৯ ফাল্গুন ১৩০০ সন্ধ্যা। প্রকাশ সাধনা মাঘ ১৩০১।

[৪] রামপুর বোয়ালিয়া ২৩ ফাল্গুন, সাধনা চৈত্র ১৩০০।

... ... —সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তা'র ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।

'স্নেহস্মৃতি', 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' ও 'ব্যাঘাত'[১]—এই চারটি কবিতা এবং 'বিকাশ', 'বিস্ময়', 'বন্দনা', 'মনের কথা', 'আত্মোৎসর্গ', 'অতিথি', 'নবজীবন', 'মানস বসন্ত' এবং 'ভঙ্গ'—এই নয়টি গান চিত্রার প্রথম সংস্করণে ছিল না। এগুলি কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) প্রথম সংযুক্ত হইয়াছিল।

পুরানো প্রেমের স্মৃতি আবার ভাসিয়া উঠিয়াছে 'স্নেহস্মৃতি'তে[২]। এই স্মৃতি চিত্তে যে বিষাদভার জাগাইয়াছিল তাহা বাকি তিনটি কবিতাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে। 'মৃত্যুর পরে'[৩] কবিতায় মৃত্যুশোক যেন মরণরহস্যের দ্বার খুলিতে চাহিয়াছে। এই জীবনই শেষ নয়, জীবনের অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তিও চরম নয়, মরণের তোরণ দিয়া মানবাত্মা জন্মজন্মান্তরের অভিসার-পথে আগাইয়া চলে। ইহাই কবিতাটির মর্মকথা॥

৪

'অন্তর্যামী'[৪] ও 'জীবনদেবতা'[৫] চিত্রার বিশিষ্ট কবিতার অন্তর্গত। (নামের জন্য বিশিষ্টতমও বলা যায়।) এই দুই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিজীবনের রহস্য একটি তত্ত্বরূপে দেখিতে চাহেন।[৬] এই তত্ত্বের ভূমিকা রচিত হইয়াছিল সোনার-তরীর 'মানসসুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দুইটিতে। যিনি মানসে সৌন্দর্যের অনুভূতি ও জীবনে প্রেরণা জাগাইয়া দয়িতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন তিনি "মানসসুন্দরী"। সেই মানসসুন্দরী নিরুদ্দেশ-যাত্রায় ছলনাময়ী

[১] রচনা যথাক্রমে বর্ষশেষ ১৩০০, নববর্ষ ১৩০১, ৫ বৈশাখ ও ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১।

[২] প্রথম তিন স্তবক পরে শিশুতে সঙ্কলিত।

[৩] জোড়াসাঁকো ৫ বৈশাখ ১৩০১, প্রকাশ সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০১।

[৪] রচনা ভাদ্র ১৩০১, প্রকাশ সাধনা অগ্রহায়ণ ১৩০১।

[৫] রচনা ২৯ মাঘ ১৩০২।

[৬] পূর্বে আলোচনা (পৃ ২০-২৩) দ্রষ্টব্য।

পথপ্রদর্শিকা। অন্তর্যামীতে মানসসুন্দরী কিন্তু গোপনচারিণী ও অধরা সর্বময় কর্ণধার।

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।

জীবনমরণ হরণ করিয়া জীবনদেবতা কেবলই খেলাইতেছেন। তিনি ক্রীড়া-নিষ্ঠুর বঁধু, তাঁহার ছোঁয়া লাগে কিন্তু তিনি বাহুবন্ধনে ধরা পড়েন না। লুকোচুরি খেলার ছলে তিনি যেন কবিসত্ত্বকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতরের মধ্য দিয়া পূর্ণতমের দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাই কবিহৃদয় সর্বদা নূতনতরের অর্থাৎ পূর্ণতরের প্রত্যাশী।

নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

এখানে মনে হইতে পারে, ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার পরিভাষায় যাহা জীবাত্মা অথবা কূটস্থ এবং বৈষ্ণবতত্ত্বে রাধা তাহাই তো অন্তর্যামী, এবং যাহা পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবতত্ত্বে কৃষ্ণ তাহাই তো জীবনদেবতা। কিন্তু মিল যতই থাক রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কোন দর্শনসূত্র ধরিয়া আগায় নাই এবং কোন তত্ত্বসূত্রও বয়ন করে নাই। আত্মভাবনা বিশ্লেষণ এবং আত্মজীবন অনুধাবন করিয়াই তিনি অন্তর্যামী-জীবনদেবতা কল্পনায় উপনীত হইয়াছিলেন। (অন্তর্যামী নামটি তিনি পাইয়াছিলেন উপনিষদ্ ও গীতা হইতে। উপনিষদে আত্মা "অন্তর্যামী অমৃতঃ", ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। গীতায় অন্তর্যামী দেহীর পরিচালক সারথী—যেমন অর্জুনের কৃষ্ণ—এবং তিনি দেহীর আত্মা, ঈশ্বরের অংশ, ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন নয়। জীবনদেবতা নামটি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত। দেবতার প্রধান লক্ষণ ক্রীড়াশীলতা। দেবতার দেবতা কৃষ্ণ ক্রীড়াশীলতায়ও সর্বোত্তম। রাধার প্রতি কৃষ্ণের ব্যবহার স্মরণ করিলে নামটির যথার্থতা উপলব্ধ হইবে।) পার্সোনালিটিতেই বলি আর মনেই বলি মানুষের মধ্যে দ্বিমুখ প্রবৃত্তি আছে। একটায় সে চায়, অপরটায় সে পাইতে প্রযত্ন করে। এই চাওয়া-পাওয়ার মিল কদাচিৎ এবং দৈবাৎ ঘটে। তবুও দুই প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য সম্ভব, এবং সে সামঞ্জস্যেই জীবনের সার্থকতা—তা সে যাই হোক। এই চাওয়া-পাওয়ার রাশ বাগাইয়া, যাহা অনির্বচনীয় চরম পাওয়া-না-পাওয়া তাহার আভাস

পাইয়া রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌-গীতার পরিভাষায় "অন্তর্যামী" বলিয়াছেন। আর "জীবনদেবতা" কথাটি সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিতে চাহিয়াছেন সেই ডিভিনিটি (ঋগ্‌বেদের ভাষায় "অসুরত্ব") যাহা মানবাত্মাকে চাওয়া-পাওয়ার চির-অভিসার পথে প্রলুব্ধ করিয়া আগাইয়া লইতেছেন। অন্তর্যামী ও জীবন-দেবতা ভিন্ন নয়—এক এবং অভিন্ন। দুই ভাবনার দ্বৈতও মায়া নয়—সমান সত্য। বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে যেমন, রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনায়ও তেমনি, এক ও অদ্বিতীয় অনির্বচনীয়ের দ্বৈধভাবে অর্থাৎ—প্রত্যেক জীবের বেলায় স্বতন্ত্র অস্তিত্বে—সৃষ্টিসংহারের লীলা প্রকটিত। সেই লীলাতেই পরম দেবত্ব॥

৫

অন্তর্যামী-জীবনদেবতার অদ্বৈতরূপ 'চিত্রা' কবিতাটিতে (১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২) প্রতিফলিত। কবিতাটিতে বহির্বিশ্বের বিচিত্রসৌন্দর্য যেন ধ্যানলোকে প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি। 'সাধনা'য়[১] সর্বস্বনিবেদন।

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চরণে আসি'—
অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনারাশি।

'শেষ উপহার' কবিতায় (১ পৌষ ১৩০২) কবি জীবনদেবতার প্রসাদী বরমাল্যখানি যাচিয়া লইতেছেন।

এত গান গাহিয়াছি, তার মাঝে নাহি কি গো
হেন কোন গান
আমি চলে গেলে তবু বহিবে সে চিরদিন
অনন্ত পরাণ।
সেই কথা মনে করে দিবে না কি, নব
বরমাল্য তব,

৬

'সাধনা'র চারি মাস পরে লেখা হইল 'ব্রাহ্মণ'।[২] প্রাচীন ভারতের মহৎ ও বিরাট আদর্শের দিকে কবির দৃষ্টি এখন নিবিষ্ট। তাহার পর দুইটি কবিতায়—

[১] রচনা ৪ কার্তিক, প্রকাশ সাধনা অগ্রহায়ণ ১৩০১। [২] রচনা ৭ ফাল্গুন, প্রকাশ ফাল্গুন ১৩০১।

'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'—অবজ্ঞাত অনাদৃত নির্যাতিত মানুষের কোমল করুণ অন্তঃকরণ সরল সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত। 'শীত ও বসন্ত' কবিতার প্রথমার্ধ সরস দ্বিতীয়ার্ধ গম্ভীর,—অপূর্ব সংযোগ।

মানসীর দুরন্ত-আশায় বাঙ্গালীর চিন্তার সঙ্কীর্ণতা ও আচরণের হীনতা কবিহৃদয়ে যে পীড়া দিয়াছে তাহার প্রকাশ ছিল। চিত্রার 'নগর সঙ্গীত'[১] কবিতায় নগরে জনজীবনের ব্যস্ততা ও আবিলতা এবং জননেতৃত্বের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা স্তিমিত ও উজ্জ্বল ভাবে আঁকা পড়িল। কবিতাটির আরম্ভে প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের অপস্রিয়মাণ যবনিকা।

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্মল শ্যামল কান্ত
উজ্জ্বলনীল-বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী।

তাহার পরেই দেখা দিল কোলাহলাবিল নগরের কারাগারে মৃত্যুমুখে অন্ধবৎ ধাবমান জনসংঘ।

করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর-ভাষ্য
চলিছে কাতারে কাতারে।

এই জনযজ্ঞের হোতারা ক্ষণিকের শক্তিমদমত্ততায় উচ্ছ্বসিত।

আমি নির্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।...
তবে দাও ঢালি,—কেবলমাত্র
দু চারি দিবস, দু চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবন পাত্র
জনসংঘাত-মদিরা।

'পূর্ণিমা'য় কবিহৃদয় প্রকৃতির শান্ত-সৌন্দর্যে স্নাত ও পরিতৃপ্ত। 'আবেদন'[২] কবিতাটিতে যেন প্রেমের-অভিষেকের অনুবৃত্তি। তাহার পরের দিন লেখা হইল

[১] প্রকাশ আশ্বিন-কার্তিক ১৩০২।

[২] রচনা ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

'উর্বশী', কমনীয় নারীসৌন্দর্যের পরিপূর্ণ মহিম্নঃস্তোত্র। চিরন্তন নারীর দুইরূপ—প্রেয়সী ও শ্রেয়সী, মোহিনী ও গেহিনী। প্রেয়সী-মোহিনীর পরিপূর্ণতার কল্পনায় প্রতীক উর্বশী,—সৃষ্টির আদি কাল হইতে যাহার রূপদীপ্তিতে পুরুষের বাসনা-বারিধি উদ্বেল হইয়া আসিয়াছে, যে অনাদি অতৃপ্তি মানবের সৌন্দর্য-পিপাসার মধ্যে সর্বদা জাগরূক।[১] চিরন্তন মানবহৃদয়ের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-পিপাসার ও নারী-কামনার অনাদি ব্যাকুলতা এই কবিতায় পৌরাণিক কল্পনার সামগ্রিক সম্ভারে বিমণ্ডিত হইয়া উপস্থাপিত।

ঋগ্বেদের কবিতার কাল হইতে উর্বশীর কথা ভারতীয় কাব্যের বিষয় হইয়া আসিয়াছে।[২] কালিদাসের নাটকে তার এক পরিণতি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর এক। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আগেকার পুরূরবার স্থান লইয়াছে চিরকালের নরহৃদয়, এবং দেশীয় পুরাণ-কাহিনীর (যেমন সমুদ্রমন্থন) সহিত বিদেশীয় (গ্রীক) মিথলজির মিশ্রণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী=উর্বশী+ধন্বন্তরি+মোহিনী-বিষ্ণু+ভেনাস্ (আর্তেমিস্)। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ আদর্শমূর্তি নয়, আরো কিছু! মানবহৃদয়ের চিরদিনের পিপাসা যে সৌন্দর্যময়ীকে যুগ যুগ ধরিয়া তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী সেই তিলোত্তমা।

বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।

পৌরাণিক দেবলোকের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীও যবনিকান্তরিত। সে আর কোনো পুরূরবার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়া পলাইবে না। তবুও বিশ্বের সৌন্দর্যসমারোহের মাঝখানেই সেই অধীর সৌন্দর্যপিপাসা তেমনি জাগিয়া আছে, বিমূঢ় ভাবে। এই অবোধ অতৃপ্তিই উর্বশীর স্মৃতিবেদনা।

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রুরাশি।

---

১ উর্বশী শব্দের মৌলিক অর্থও কতকটা সেই রকম—"উরুবশী" অর্থাৎ বহুলোক যাহাকে কামনা করে, অথবা যাহার কামনা বহুব্যাপ্ত।

২ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ২৬-৩৩, ৫৫-৫৭, ২৬৪ দ্রষ্টব্য।

উর্বশীর পরের দিন লেখা হইল 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। যে চিরন্তন প্রেয়সী-গেহিনী নারী আশা দিয়া ভাষা দিয়া ভালোবাসা দিয়া অন্তরের বেদনা মথিত করিয়া তাহার সবটুকু অমৃত যোগাইয়া পৃথিবীর বক্ষে যুগ যুগ ধরিয়া মানবজীবন পোষণ করিয়া আসিতেছে সেই প্রত্যক্ষ কল্যাণী মানবীর বন্দনা এই কবিতায়। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা, ক্ষণদাবিলাসিনী সে। তাহার মন সুখদুঃখের আলোছায়া-সম্পাতে নিরুত্তর। এই হৃদয়হীন সৌন্দর্যপ্রতিমা মানবের কামনা বাড়ায়। ভোগের প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রেম ফলাইতে পারে না। সেই ভীরু ও শঙ্কিত প্রেমের সুধা মানবহৃদয়েই সঞ্চিত।

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে।

কামনার রঙ যাহাতে একটুও লাগে নাই এমন প্রশান্ত মহিমাময় নারী-সৌন্দর্যের অবদাত প্রতিমা 'বিজয়িনী'।[১] মনে হয় যেন বাণভট্টের মানসী মহাশ্বেতা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নবাবতার লাভ করিয়াছে। মধ্যাহ্নসূর্য ও পূর্ণিমাচাঁদের মধ্যে যে অন্তর, 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী'র মধ্যে তেমনিই। অচ্ছোদ-সরোবরে স্নান করিয়া সোপানপংক্তি বাহিয়া তীরে উঠিয়া সুন্দরী দাঁড়াইয়াছেন।

ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া,
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

নির্জন সুন্দর পরিমণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের এই নিরাবরণ মহিমার সম্মুখে কামনা-বাসনা নির্বাপিত। তাই

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল, নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণশূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

---

[১] রচনা ১ মাঘ ১৩০২।

জীবনদেবতা বিচিত্র অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্য দিয়া কবিকে পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। অন্তর্যামীতে তিনি প্রভু, 'জীবনদেবতা'য়[১] তিনি স্বয়ংবরা—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।

জীবনে পরিপূর্ণতার আদর্শ সব সময়ে সজাগ থাকে না। তাই অনুনয়

নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

এই প্রার্থনার উত্তর মিলিল চিত্রার শেষ কবিতায়, 'সিন্ধুপারে'।[২] ছদ্মবেশে জীবনদেবতাই কবিচেতনাকে ঘর ছাড়া করিয়া স্বপ্ন-অভিসারের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া নবজীবনলোকে জীবনস্বামিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই মধুভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে চিরদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানা পুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।

কবিতাটি পড়িলে মনে হয় যেন রূপকের স্ফটিক পাত্রে রূপকথার উজ্জ্বল রস উছলিয়া পড়িতেছে॥

---

[১] রচনা ২৯ মাঘ ১৩০২।

[২] রচনা ২০ ফাল্গুন ১৩০২। এখানে আবার রূপক দেখা দিয়াছে। মনে হয় বিষয় খানিকটা স্বপ্নলব্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্ষণ-মিলন

(এপ্রিল-জুলাই ১৮৯৬)

"সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরেছে আমারে"

১

চিত্রার অব্যবহিত পরেই 'চৈতালি'র[১] কবিতাগুলি রচিত। অধিকাংশ চৈত্র মাসে (১৩০২) পতিসরে লেখা, (বাকিগুলি সাজাদপুরে)। তাই এই নাম। সেই সঙ্গে চৈতালি ফসলের এবং চৈত্রকালিক উৎসবের ব্যঞ্জনা আছে। 'চিত্রা'র সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। জমিদারি ভাগ হইয়া যাইতেছে। সাজাদপুর রবীন্দ্রনাথদের ভাগে পড়িতেছে না। সুতরাং পদ্মাতীরের এই অংশে বাস-পর্ব এইবার শেষ। কবিহৃদয়ের এই ভাবনা পদ্মাতীরের জড় ও জীব লীলাকে বেলাশেষের মাধুর্যে ও বর্ষশেষের বেদনায় মণ্ডিত করিয়াছে। সেই সঙ্গে এক অপূর্ব জীবনরসানুভূতি কবিচেতনাকে কালের গণ্ডীপাশ হইতে মুক্তি দিয়াছে। তাই প্রথম লেখা কবিতাটিতেই পাই

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো। ('প্রভাত')

ভালোবাসার এই সর্বভূমিক চেতনায় ক্ষণিকতার বেদনা দুর্লভতার মোহ বাড়াইতেছে। বৃহত্তর জীবনের ক্ষণভঙ্গপ্রবাহে দুঃখসুখ সমান স্পৃহণীয়।

সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে,
ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে। ('ধরাতল')

যে প্রশান্তি-পারাবারে এই অস্থিরপ্রবাহের পরিণতি সেই সত্যশিবসুন্দরের প্রতীক্ষায় কবিহৃদয় ব্যাকুল।

শুধু মনে হয় চিরজীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।
কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চ'লে যায় শিহরিয়া প্রাণ।

---

[১] রচনা ১১ই চৈত্র ১৩০২ হইতে ১৫ শ্রাবণ ১৩০৩, প্রকাশ কাব্যগ্রন্থাবলী (আশ্বিন ১৩০৩)।

দৈবযোগে জ্বলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো ; ('প্রেম')

এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান !
অবশেষে বুক ফেটে শুধু ব'লে আসি—
হে চিরসুন্দর আমি তোরে ভালোবাসি। ('শেষকথা')

কবিসত্ত্ব এখন উপলব্ধি করিতেছে, জীবনদেবতাকে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ানো নিরর্থক কেননা তিনিই তো সর্বক্ষণ চিত্তপদ্মে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মধু ঢালিতেছেন।

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা ; ... ...
তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হ'তে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।...
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে হাতে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে। ('প্রিয়া')

২

পদ্মাতীরের বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র নীড় বাঁধিতে হইবে, তাই নূতন আশ্রয়ের চিন্তা জাগিতেছে। স্বভাবতই এই সময়ে কালিদাস-চিত্রিত প্রাচীন ভারতের তপোবন-আশ্রমপদের সৌম্যশান্ত আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মন টানিয়াছে। চৈতালির অনেকগুলি কবিতায় ইহারি প্রতিফলন।[১] কালিদাসের কাব্যে নূতন দীপ্তি ও লাবণ্য আবিষ্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা হইতে সান্ত্বনা ও শক্তি আহরণ করিলেন।[২] সেই সঙ্গে নিসর্গের সর্বব্যাপী মায়াপটে জীবনের বিচিত্র লীলা কবিচিত্তকে গভীরতার দিকে টানিতে লাগিল। নিরাভরণ কবিকল্পনা এখন দেশকালের সীমানা ডিঙাইয়া অতীত-অনাগত জনপ্রবাহের অনুগমনে সমুৎসুক। যেমন, 'অনন্ত পথে' কবিতায়,—নৌকার জানালা হইতে নদীতীরে কর্মরত একটি

[১] 'বনে রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন' ও 'প্রাচীর'।
[২] 'ঋতুসংহার', 'মেঘদুত', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান', 'মানসলোক' ও 'কাব্য'।

ছোট মেয়েকে দেখিয়া নিরলস কবিকল্পনা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনসূত্রের জাল বুনিয়া চলিয়াছে।

আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে,
বালিকাও যাবে কবে কর্ম-অবসানে
আপন স্বদেশে ; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানিনে ওরে ; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি'।
কোন্ অজানিত গ্রামে কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

বিচ্ছিন্ন কালের দূরত্ব হইতে দেখিতেছেন বলিয়া নিতান্ত সাধারণ বস্তুও কবিনেত্রে রমণীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছে। 'সামান্য লোক' কবিতায় তাই তিনি বলিয়াছেন

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনায় এমন একটি স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতা ও নির্লিপ্ততা ছিল যাহাতে নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বিষয় ও বস্তু যুগপৎ ভাবদৃষ্টির লক্ষ্যকেন্দ্রে অবস্থান করিত। এইজন্য শুধু কালিদাসের কল্পলোকের স্রোতোবহা মালিনীই নয়, নিতান্ত একালের ইচ্ছামতী নদীও তাঁহার অন্তরের অর্ঘ্য আহরণ করিয়াছে। এই দুর্লভ ভাবদৃষ্টির আলো পড়ায় 'পুঁটু' ও 'হৃদয়-ধর্ম' কবিতা দুইটি সামান্য হইয়াও সমুজ্জ্বল।

'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'বৈরাগ্য', 'পর-বেশ', 'সমাপ্তি', 'বর্ষশেষ', 'সভয়', 'ঐশ্বর্য', 'স্বার্থ'—এই কবিতাগুলিতে উপদেশের ভাব আছে। 'দুই উপমা' ও 'তত্ত্বজ্ঞানহীন' কবিতা-কণিকা। নারী ও প্রেম সম্পর্কিত কবিতাগুলি সমৃদ্ধ ও রূপকাবৃত, এবং একেবারে নির্ব্যক্তিক নয়॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভাবনা ও নির্ভাবনা

(১৮৯৬-১৯০১)

"চল্‌রে ছুটে
কালের পিছু পিছু।"

১

রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর ছাড়িলেন, শিলাইদহে গেলেন। সেখানেও নদী। তাই এখানেও নদী তাঁহার ভাবনাকে আঁকড়াইয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথ নূতন করিয়া সংসার পাতিতেছেন, ব্যাবসাও ফাঁদিতেছেন। তাই বর্তমানের কর্মপীড়া হইতে মুখ ফিরাইয়া ভাবনা যেন অতীতে বিশ্রাম খুঁজিতেছে। মন চায় জীবনের সহজ পথ অনুসরণ করিতে।

এই সময়ের কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' অতীতধ্যান-সঞ্জাত রসপ্রধান, 'ক্ষণিকা' বর্ত্তমানভাবনালব্ধ রূপপ্রধান, 'নৈবেদ্য' ভবিষ্যৎ-চিন্তাপ্রণোদিত আদর্শপ্রধান। রচনার দিক দিয়া বিচার করিলে কথা-কাহিনী-কল্পনা উজ্জ্বল রীতির, ক্ষণিকা সহজরীতির, নৈবেদ্য তক্ষণরীতির॥

২

চৈতালিতে কবিদৃষ্টির দুই কোণ ঈষৎ দেখা গিয়াছিল, তির্যক্ বা তাত্ত্বিক আর সরল বা কাব্যিক। তাত্ত্বিক দৃষ্টির প্রকাশ 'ক্ষণিকা'য় (১৮৯৯)[১], সহজ সরল কবিতাকণায়, 'কথা'র (১৯০০)[২] মহৎ-চিত্রাবলীতে এবং 'কাহিনী'র (১৯০০)[৩] নাট্য-কবিতায়। কথার চব্বিশটি কবিতার মধ্যে চারটি লেখা হইয়াছিল ১৩০৪ সালের কার্তিকে আর বাকি সব ১৩০৬ সালের আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণে। কাহিনীর সাতটি কবিতার মধ্যে দুইটি সাধারণ, আর পাঁচটি নাট্যকবিতা। এগুলি ১৩০৪ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণে লেখা। শেষ কবিতাটি গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে রচিত।

'কথা' ও 'কাহিনী'র[৪] কবিতায় পাই মহৎ ত্যাগের মহিমা-ভাবনা। এই ত্যাগ সমাজধর্মের উপরে সর্বভূমিক ও সর্বকালিক মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করিয়াছে। ইহার বস্তু রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ পুরাণ, বৈষ্ণব জীবনী,

[১] মুদ্রণ সমাপ্তি ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬। [২] ঐ ১ মাঘ ১৩০৬। [৩] ঐ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬।

[৪] 'কথা' ও 'কাহিনী' পরে 'কথা ও কাহিনী' নামে একত্র সংকলিত।

মারাঠা ইতিহাস, লোকাচার ইত্যাদি বিবিধ আকর হইতে আহৃত। বৌদ্ধ শাস্ত্রপুটে আবদ্ধ মহৎ কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু কাহিনীবীজ আছে যাহার মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুভব করিয়া প্রকাশ করিলেন। এদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রকে শিক্ষিতের গোচরে আনিয়াছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন বাঙ্গালী (এবং ভারতীয়) মনীষীর দৃষ্টি সে সাহিত্যসম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপরায়ণ প্রতিভার এখানে এক বিশেষ প্রকাশ।

'কণিকা'—নামেই বোঝা যায়,—অতি ছোট কবিতার বই। সবশুদ্ধ কবিতা-সংখ্যা এক শ দশ। তাহার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ যেগুলি—বারো ছত্রের—সেগুলির সংখ্যা চার, তার চেয়ে ছোট যেগুলি—দুই ছত্রের—সেগুলির সংখ্যা বিশ। সব-চেয়ে বেশি চার ছত্রের কবিতা—সংখ্যায় চৌষট্টি। ছন্দ সর্বত্র পয়ার।

কণিকার কবিতা বস্তুদৃঢ় ও পিনদ্ধকায়, বলিতে পারি—বাঙ্গালায় অভিনব চাণক্যশ্লোক। বাঙ্গালী সমালোচকেরা যাহাকে সারগর্ভ বলিতেন (হয়ত এখনও বলেন) রবীন্দ্রনাথের তেমন রচনা কণিকাতেই আছে। নীতি ও তত্ত্বগর্ভ ও উপদেশময় বস্তুভার থাকিলেও কণিকার উপভোগ্যতা কম নয়। বিভিন্ন ধরনের কবিতার উদাহরণ দিতেছি।

সূচ্যগ্র

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে ॥

নীতিগর্ভ

আম্র কহে—একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ঃ
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,
মূল্যভেদ সুরু হ'ল সাম্য গেল ঘুচি' ॥

বিদ্রূপময়

কানা-কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোল আনা মাত্র নহ পাঁচশিকে !
টাকা কয়, আমি ভাই, মূল্য মোর যথা,
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা ॥

ব্যঙ্গাত্মক

যথাসাধ্য ভাল বলে, ওগো আরো ভাল,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি ক'রে থাকো আলো?
আরো ভাল কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়॥

গভীর

সংসারে জিনেছি ব'লে দুরন্ত মরণ
জীবনবসন তার করিছে হরণ।
যত বস্ত্রে টান দেয় বিধাতার বরে
বস্ত্র বাড়ি চলে তত নিত্যকাল ধ'রে॥

৩

কাহিনীর পাঁচটি কবিতায় ('গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'নরকবাস', 'সতী' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা') সংলাপ রীতি অবলম্বিত। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনেও নাটকীয়তা আছে।

গান্ধারীর-আবেদন ও কর্ণকুন্তী-সংবাদ মহাভারত থেকে নেওয়া। গান্ধারী ও কর্ণ মহাভারতের মহত্তম চরিত্রগুলির অন্যতম। মহাভারতের কাহিনীতে ইঁহাদের মাহাত্ম্য অপ্রকটিত নয়। তবে আধুনিক কবিদৃষ্টিতে, রবীন্দ্রনাথের মতো গভীর অনুভববান্ সাহিত্য-দ্রষ্টার কাছে, সর্বকালের মানুষ হিসাবে চরিত্র দুইটিতে মহাকাব্যোচিত গৌরব পরিবর্ধিত হইয়াছে। শুধু এই দুইটি নয়, অপর কয়েকটি ভূমিকাও (—ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কুন্তী—) সর্বকালের মানুষের চারিত্র্যে ধরা পড়িয়াছে। এই চরিত্রগুলিতে নূতন আলো ফেলিয়া এবং কথাবস্তুকে ঈষৎ পুনর্বিন্যস্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কাহিনীতে সমুন্নতি অর্পণ করিয়া প্রাচীন ভারতের মহিমাদীপ্তি আরও সমুজ্জ্বল করিলেন।

গান্ধারীর-আবেদনের বস্তু মহাভারতে ঠিক অমনভাবে নাই। প্রথমবার দ্যূতক্রীড়ার পর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসিয়া দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন।

তন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
তস্মাদয়ং মদ্‌বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ॥ ২. ৭৫. ৮

'তোমার পুত্রেরা তোমার নেত্র হোক। তাহারা যেন বিধ্বস্ত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া না যায়। অতএব আমার কথায় এই কুলাঙ্গারকে ত্যাগ কর!'

ধৃতরাষ্ট্র সংক্ষেপে উত্তর দিলেন

অন্তং কামং কুলস্যাস্য ন শক্নোমি নিবারিতুম্। ২. ৭৫. ১১খ

'এ বংশের ধ্বংস আর ইচ্ছা করিলেও নিবারণ করিতে আমি সমর্থ নই।'

গান্ধারী

ত্যাগ করো এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র

কারে, হে মহিষী?

গান্ধারী

পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শাণ ধর্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র

—এখন তো আর
বিচারের কাল নাই, নাই প্রতিকার।
নাই পথ—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

দ্বিতীয়বার দ্যূতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ বনগমনে উদ্যুক্ত হইলে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বিদায়-আশীর্বাদ দিলেন।

ভূমেঃ ক্ষমা চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলং প্রাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদম্। ২. ৭৮. ২০

'(আশীর্বাদ করি,) তুমি যেন পাও—ভূমি হইতে ক্ষমা, সমগ্র সূর্যমণ্ডল হইতে তেজ, বায়ু হইতে বল, জড়প্রকৃতি হইতে আত্মসম্পদ্।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি গান্ধারীর আশীর্বাদের মধ্যে শ্লোকটির প্রতিধ্বনি আছে।

বায়ু হ'তে বল,
সূর্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য ক্ষমা
করো লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর!

সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কৃষ্ণ কুরুসভায় আসিলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে দিয়া গান্ধারীকে সভায় আনাইলেন এবং তাঁহাকে দুর্যোধনের দুর্মতির কথা বলিলেন।[১]

[১] "এষ গান্ধারি পুত্রস্তে দুরাত্মা শাসনাতিগঃ।
ঐশ্বর্যলোভাদৈশ্বর্যং জীবিতঞ্চ প্রহাস্যতি।" ৩. ১২৯. ৭

গান্ধারী উত্তর দিলেন, পুত্রস্নেহান্ধ তুমি, তোমারি তো দোষ। তুমি মোহে পড়িয়া জানিয়া শুনিয়া তাহার নীতিই অনুসরণ করিতেছ।[১]

তাহার পর দুর্যোধনকে ডাকিয়া আনা হইল। গান্ধারী তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করিলেন

ন হি রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্বেন কামেন শক্যতে।
অবাপ্তুং রক্ষিতুং চাপি ভোক্তুং বা ভরতর্ষভ ॥ ৩. ১২৭. ১২

'হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতশ্রেষ্ঠ, রাজ্য নিজের ইচ্ছামত অধিকার, পালন অথবা ভোগ করা যায় না।'

ন লোভাদর্থসম্পত্তির্নরাণামিহ দৃশ্যতে।
তদলং তাত লোভেন প্রশাম্য ভরতর্ষভ ॥ ৩. ১২৭. ৫৪

'লোভ করিলেই যে মানুষের ঈপ্সিত সম্পত্তি লাভ হয় এমন তো দেখা যায় না! অতএব, বৎস, লোভে কাজ নাই। ভরতশ্রেষ্ঠ তুমি, শান্ত হও।'

দুর্যোধন প্রত্যুত্তর না দিয়া সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।

এইভাবে সভা ও উদ্যোগ পর্ব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর-আবেদন রচনা করিয়াছেন। ভানুমতীর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহাতুর ও দুর্বলচিত্ত, তবে কখনও কখনও পুত্রের দোষ সম্বন্ধে অবহিত হন। গান্ধারীর-আবেদনে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা দৃঢ় ও সম্পূর্ণ কৌরবোচিত। রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝা যায় কেন তিনি শাসন না করিয়াও রাজা বলিয়া সম্মানিত। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র হয়তো আরও সাধারণ মানুষের মতো, তবে মহাকাব্যোচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্র জানেন, "অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে"। তিনি জানেন পুত্রস্নেহ সর্বনাশের দিকে টানিতেছে। কিন্তু এখন তো তিনি দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে পারেন না। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ধৃতরাষ্ট্রের মহত্ত্ব। মহাভারতের কবি যা নিয়তিনির্দেশ বলিয়াই ক্ষান্ত, রবীন্দ্রনাথ তা চরিত্রের দৃঢ়তা ও পৌরুষ বলিয়া দেখাইয়াছেন।

সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে, আসিবে সময়
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরো না সংশয়,
...ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে—
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার।

[১] "তং হেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয় ॥
যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞামনুবর্তসে।
স এব কামমন্যুভ্যাং প্রলব্ধো মোহমাস্থিতঃ ॥" ৩. ১২৯. ১১-১২

মহাভারতে দুর্যোধনের ভূমিকা কতকটা যেন আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্পষ্ট করিয়া সমুন্নতি দিয়াছেন। দুর্যোধনের যে মানসিক ব্যাধি তা লোভ নয়, ঈর্ষা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাহাকে বলে ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌স্‌, এ ঈর্ষা তাহা নয়। এ "ঈর্ষা সুমহতী"—প্রতিযোদ্ধার বিজিগীষা।

ক্ষুদ্র জনে
বল ভাগ ক'রে ল'য়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী ; রাজদণ্ডে যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা তত তার ক্ষয়। ...
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই—
শুধু জয়ধর্ম আছে,

দুর্যোধন জয় চায়, তা সে যে উপায়েই হোক।

ব্যাঘ্র সনে নখে দন্তে নহিক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়া মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে, জয়লাভ এক লক্ষ্য তার—

দুর্যোধনের যুক্তিতে অবশ্যই জোর আছে।

গান্ধারী মহাভারতের এক অত্যন্ত উদাত্ত চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ সে চরিত্রে আরও গৌরব ন্যস্ত করিয়াছেন। গান্ধারী কৃষ্ণের মতো অবতার নহেন, ভীষ্মের মতো ত্যাগী পরমহংস নহেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে মানবী,—পত্নী মাতা স্নেহময়ী কুলপালিকা। তাঁহার কাছে ধর্মের কোন বিশেষণ নাই। তাঁহার হৃদয় সবার হৃদয়ের সঙ্গে একতারে বাঁধা। সে হৃদয়ে যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হয় তাহাই তাহার কাছে ধর্ম। পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি ধর্মখণ্ডের উর্ধ্বে যে সত্যবোধ মানুষের সঙ্গে মানুষের সমব্যবহারের নামান্তর তাহাই গান্ধারীর ধর্ম। এ ধর্মের অনুশাসন—ধৈর্য, ক্ষান্তি, অপ্রমাদ। এ ধর্মের দীপ্তি ফুটিয়া ওঠে গান্ধারীর মতো ব্যক্তির জীবনের গভীর ট্রাজিডিতে।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে' কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।

রবীন্দ্রনাথ বিদুরকে গান্ধারী-ভূমিকায় মিলাইয়া দিয়াছেন।

কর্ণকুন্তী-সংবাদের বস্তু সরাসরি উদ্যোগপর্ব (১৪৪-১৭৬ অধ্যায়) থেকে নেওয়া। তবে কাহিনীর উপস্থাপনে নূতনত্ব আছে। চরিত্র দুইটি, বিশেষ করিয়া কুন্তী, রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নূতন করিয়া আঁকা।

মহাভারত-কাহিনীতে আছে যে, কুন্তী যখন গঙ্গাতীরে কর্ণের কাছে গেলেন তখন পূর্বাহ্ণ। কর্ণ পূর্বমুখ করিয়া সূর্য-আরাধনায় নিরত। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আতপ্ত না হইলে, অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে না ঢলিলে জপভঙ্গ হইবে না। কুন্তী কর্ণের পিছনে তাঁহার উত্তরীয়ের ছায়ায় বসিয়া ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পৃষ্ঠদেশ পরিতপ্ত হইলে কর্ণ জপ শেষ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন ও কুন্তীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কুন্তীকে অভিবাদন করিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ কর্ণকে সন্ধ্যাসূর্যের বন্দনারত বলিয়াছেন, এবং কর্ণের আত্মপরিচয় দিয়া শুরু করিয়াছেন।

> পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা-সবিতার
> বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
> অধিরথ সূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত,
> সেই আমি—কহ মোরে তুমি কে গো মাতঃ।

মহাভারতে প্রায় এই রকমই আছে।

> রাধেয়োঽহমাধিরথিঃ কর্ণস্ত্বামভিবাদয়ে।
> প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রূহি কিং করবাণি তে॥

কুন্তী আত্মপরিচয় দিয়া কর্ণের জন্মরহস্য জানাইয়া বলিলেন, তুমি ভাইদের না চিনিয়া ভ্রান্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের উপাসনা করিতেছ। জানিয়া শুনিয়া এখন আর তাহা উচিত হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কুন্তী এমন সহজে আত্মপরিচয় দেন নাই। কর্ণের প্রতি আবেদন ছিল তাঁহার মাতৃত্বের ও কর্ণের ভ্রাতৃত্বের জোর। মহাভারতে কুন্তী কর্ণকে রাজ্যলোভ দেখাইয়াছিলেন।

> অর্জুনেনার্জিতাং পূর্বং হৃতাং লোভাদসাধুভিঃ।
> আচ্ছিদ্য ধার্তরাষ্ট্রেভ্যো ভুঙ্‌ক্ষ্ব যৌধিষ্ঠিরীং শ্রিয়ম্॥

'অর্জুন পূর্বে জয় করিয়াছিল যে ঐশ্বর্য তা এখন অসাধুরা অপহরণ করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের হইতে কাড়িয়া লইয়া তুমি যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য ভোগ কর।'

---

[১] "প্রাঙ্‌মুখস্যোর্দ্ধবাহোঃ সা পর্যতিষ্ঠত পৃষ্ঠতঃ। জপ্যাবসানে কার্যার্থং প্রতীক্ষন্তী তপস্বিনী॥
অতিষ্ঠৎ সূর্যতাপার্তা কর্ণস্যোত্তরবাসসি। কৌরব্যপত্নী বার্ষ্ণেয়ী পদ্মমালেব শুষ্যতী॥
আপৃষ্ঠতাপাজ্‌জপ্ত্বা স পরিবৃত্য যতব্রতঃ। দৃষ্ট্বা কুন্তীমুপাতিষ্ঠদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ॥" ২৮-৩০

কর্ণ বলিলেন, জন্মমুহূর্তে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি মায়ের কাজ কর নাই। এখন নিজের সুবিধার জন্য আমাকে ভুলাইতেছ। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা আমার উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমি তাহাদের পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তবে তোমার মান রাখিবার জন্য আমি এইটুকু করিব যে অর্জুন ছাড়া তোমার আর কোন সন্তানের বিনাশ আমার হাতে ঘটিবে না। আমি মরি অথবা অর্জুন মরুক, তোমার পুত্রের সংখ্যা ঠিকই থাকিবে।

মহাভারতের কুন্তী বিমাতার মতো। রবীন্দ্রনাথের কুন্তী অনুতপ্ত মাতা। তিনি আসিয়াছিলেন স্বার্থের প্রেরণায়। কর্ণকে দেখিয়া ও তাঁহাকে নিকটে পাইয়া তাঁহার দমিত মাতৃস্নেহ প্রকট হইয়াছিল।

পুত্র মোর ওরে,
বিধাতার অধিকার ল'য়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্বিচারে;
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃঅঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান।

কুন্তীর মাতৃত্বের আবেদন মহাভারতে অনুক্ত। কিন্তু কর্ণ তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাই মাতাকে চারিপুত্রের বিষয়ে অভয় দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্ণকে আরও মহীয়ান্ করিয়াছেন। ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিবার মুখে যখন কুন্তীর হতাশা ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল

সেইদিন কে জানিত হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে
আপনার কোলের সন্তান…
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে!
এ কী অভিশাপ।

তখন কর্ণ সান্ত্বনা দিল

মাতঃ করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
…যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্রের উত্তুঙ্গতা॥

৪

'নরকবাস' কবিতার বস্তু কঠিন, ট্রাজিক। বৈদিক সাহিত্যে শুনঃশেপ-আখ্যানে[১] যে নরমেধ যজ্ঞের ইঙ্গিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পিত। ধর্মবিশ্বাস কঠিন হইলে মানুষের মৌলিক ধর্মবোধকে বিলুপ্ত করে। বহুপুত্রের লোভে একপুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে বিসর্জন দিতে স্নেহশীল পিতা কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। কিন্তু পাপ তাহার নহে, কেননা সে দৃঢ়বিশ্বাসী। পাপী পুরোহিত, কেননা সে বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে নাই। কিন্তু পিতা নিজেকে পাপমুক্ত মনে করিলেন না। কৃতকর্মের কঠিন ফলভোগ তিনি করিবেনই। এই সত্যই গান্ধারীর-আবেদনের, কর্ণকুন্তী-সংবাদের এবং নরকবাসেরও অন্তর্বাহী।

'সতী'-কবিতার বিষয় মারাঠী ঐতিহাসিক গাথা থেকে নেওয়া।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের দীর্ঘতর রচনা। ছন্দ ছড়ার ("একাবলী")', ভাব গৃহস্থালি, ভাষা কথ্য ॥

৫

'কল্পনা' ছাপা শেষ হইয়াছিল ২৩ বৈশাখ ১৩০৭ সাল (১৯০০)। ইহাতে সর্বসমেত উনপঞ্চাশটি কবিতা ও গান[২] আছে। তাহার মধ্যে উনত্রিশটি ১৩০৪ সালে লেখা, দশটি ১৩০৫ সালে আর বাকি নয়টি ১৩০৬ সালে। কাব্যকৌশলের দিক দিয়া মানসীর পরে কল্পনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ। বাক্‌রীতিতে ও ছন্দ-ব্যবহারে নূতন ঝোঁক দেখা দিয়াছে। প্রতিমানকল্পনায় চিত্রাঙ্কণরীতি আরও পরিস্ফুট।

পদ্মা-পালা চুকিয়া যাইবার আগেই, কালিদাসের কাব্য বার বার পড়ার ফলে, কল্পনার কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন কালিদাসের যুগের মধ্যে প্রয়াণ করিতেছেন।

এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের হাওয়া বহিতে শুরু হইয়াছে। সে হাওয়া রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার ফলে 'ভারতলক্ষ্মী'[৩], 'সে আমার

[১] ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৪২-৫২ দ্রষ্টব্য।

[২] গানের সংখ্যা ১৭, 'যাতনা' কবিতাটি ধরিলে ১৮। এটি গানই, পরে গানের মধ্যে ধরাও হইয়াছে। কিন্তু তখন সুর দেওয়া হয় নাই বলিয়াই গানের সংকেত দেওয়া ছিল না।

[৩] "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী…" (১৩০৪)।

জীবন রে', 'হতভাগ্যের গান',[১] 'বঙ্গলক্ষ্মী'[২] প্রভৃতি গান এবং 'শরৎ' ও 'মাতার আহ্বান' প্রভৃতি কবিতা। যাঁহারা তখন দেশের "অভিভাবক" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টা ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার অসন্তোষ দুই একটি কবিতায় সরস ও ঝাঁঝালো ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।[৩] 'জুতা আবিষ্কার' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এটি ছেলেভুলানো গল্পের ছাঁদে অত্যন্ত সরল ও সরস কবিতা। বস্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বলিয়া মনে হয়। সহজ সমাধান না দেখিয়া যে নেতারা দুরূহ সমাধানের ফিরিস্তি প্রণয়ন করেন তাঁহারাই কবিতাটির নিগূঢ় ব্যঙ্গের লক্ষ্য। তাঁহার রচনার প্রতি সমালোচকদের বিরূপতায় এবং শিক্ষিত পাঠকদের উপেক্ষায় কবির ক্ষোভ 'আশা' কবিতায় মৃদুভাবে প্রকাশিত।

কল্পনার অধিকাংশ কবিতা বর্ণসুষম চিত্রময়। ছন্দের ধীর গম্ভীর গতি-মন্থরতা এই বাণীচিত্ররীতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম কবিতা 'দুঃসময়'। কবিতাটি গাঢ়নিবদ্ধ, ছন্দঃস্পন্দিত এবং বর্ণাঢ্যতায় সমুজ্জল।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে,
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

'অসময়' দুই বছর পরে লেখা, তবে ভাবে ভাষায় ছন্দে 'দুঃসময়' (১৩০৪) কবিতাটিরই জের টানিয়াছে। দুঃসময়ে ভোরের অন্ধকারে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, সে যাত্রা যখন শেষ হইয়া আসিতেছে তখন অসময়, সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইতেছে।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।

'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় ধারাবর্ষণের তারধ্বনি মাত্রা-ছন্দের চৌতালে তরঙ্গিত।

---

[১] এটি দীর্ঘ কবিতাও বটে। [২] প্রকাশ প্রদীপ অগ্রহায়ণ ১৩০৫।

[৩] যেমন 'উন্নতি-লক্ষণ' (প্রকাশ ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩০৬)। এইটিই বোধ করি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সোজাসুজি ব্যঙ্গকবিতা।

'মদনভস্মের পূর্বে' এবং 'মদনভস্মের পর' কবিতা দুইটির ছন্দে জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" এবং ছড়ার "হাত ঘুরুলে নাড়ু দেব" ছন্দের অপূর্ব অনুসরণ। 'পসারিণী' কবিতার[১] প্রেরণা আসিয়াছে বৈষ্ণব গীতিকাব্য হইতে। 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতায়[২] সোনার-তরীর 'প্রত্যাখ্যান' কবিতার রূপক দেখা দিয়াছে। 'প্রণয়প্রশ্ন' কবিতাটিতে[৩] পরবর্তী কাব্য ক্ষণিকার পূর্বাভাস। কয়েকটি কবিতায় ও গানে দেশভক্তির আবেগ ও দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত। 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় কবিহৃদয়ের ইমোশন মাতৃমূর্তির কল্যাণ-সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে শান্ত, অশ্রুস্নাত। দেশের ও সমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের সম্মানহীন আচরণে ক্ষোভের প্রকাশ 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতায়।

কল্পনার শেষদিকের কয়েকটি কবিতায় কবি-অনুভূতি রোমান্টিক ভাবতন্ময়তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কবি যেন এক নূতনতর সংগ্রামের আহ্বান শুনিতেছেন। সেই আহ্বানের স্বীকার 'অশেষ' কবিতায়।[৪] এ সাধনা নবীন ভৃত্যের শ্রমদুর্ভর কর্মচাঞ্চল্য নয়, বিশ্বস্ত সেবকের লীলা-সাহচর্য।

সেবক আমার মত রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে।
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দুয়ারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাইনে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে ;
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।

'বর্ষশেষ' কবিতায়[৫] কালবৈশাখীর তাণ্ডবে সর্ববিধ গ্লানি জড়তা ও সংস্কার হইতে মুক্তিলাভের দুর্জয় আহ্বান শোনা যাইতেছে।

চাব না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

'বৈশাখ' কবিতায়[৬] ভুবনডাঙ্গার শুষ্কশষ্প রক্তকঙ্করময় দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে বৈশাখমধ্যাহ্নের দীপ্ত দাহ বিষাণপাণি রুদ্রমূর্তিতে উৎপ্রেক্ষিত। ভাষা ও

১ প্রকাশ ভারতী কার্তিক ১৩০৬।
২ ঐ আশ্বিন-কার্তিক, রচনা ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪।
৩ প্রকাশ পুণ্য আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৬, রচনা ১০ আশ্বিন ১৩০৪।
৪ প্রকাশ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬।
৫ "১৩০৫ সালে ৩০ চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।"
৬ রচনাকাল ১৩০৬।

শ্রাবণের প্রথমে (১৩০৭)। ক্ষণিকার প্রায় সব কবিতাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এই দুই মাসের মধ্যে লেখা। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে। শুধু দেশকালের গণ্ডীতে নয় ভাবের ও রচনারীতির স্বকীয়তায়ও ক্ষণিকার কবিতাগুলি অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর কোন প্রধান কবিতাগ্রন্থে বোধ করি এতটা বিবিক্ততা নাই। কণিকায় কবিভাবনার প্রকাশ নিরাবরণ, নিরাভরণ ও ঋজু। জীবনের বর্তমান ক্ষণগুলি অতীত-অনাগত ভাবনামুক্ত হইলে তবেই চিত্তে অনন্ত প্রতিফলিত হইতে পারে।—ইহাই 'ক্ষণিকা' নামটির রহস্য। এ "ক্ষণ" মূহূর্তও বটে উৎসবও বটে। বৌদ্ধ মহাযানমতের ক্ষণভঙ্গবাদ অতীত ও অনাগত হইতে বর্তমানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পায় নাই। ক্ষণিকার কবিভাবনায় অতীত ও অনাগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্তমান ক্ষণোদ্‌ভাসিত।

ক্ষণিকায় শারদ প্রসন্নতা যেমনই থাকুক ইহার রস কিন্তু শরৎকাব্যকথাশ্রয় নয়। বরং ইহাকে প্রৌঢ় বর্ষার কাব্য বলা যাইতে পারে। 'কল্পনা'র দাবদগ্ধ তৃণাঙ্কুর যে জীবন-উল্লাস বহন করিয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহিরে আসে সেই জীবন্মুক্তির হর্ষ ক্ষণিকায় ঝলক দিয়াছে। শেষদিকের কয়েকটি কবিতায় নব-বর্ষার অপ্রস্তুত অগ্রদূত অকালবসন্তের অকারণ পুলকচঞ্চলতার সুর বাজিয়াছে। ক্ষণিকায় কবিচেতনার অভিনব মুক্তির ও আনন্দের স্বাদ লাগিয়াছে। জীব-প্রকৃতির ও জড়প্রকৃতির অখণ্ডতা আর তাহার সহিত কবিসত্তার একতানবোধ এই জীবন্মুক্তির প্রেরণা। শুধু চোখে নয়, মন দিয়া প্রাণ দিয়া অন্তর বাহিরকে এক অনুভব করিয়া কবিসত্তা যেন বর্তমান মুহূর্তের অগাধ অবকাশে অস্তিত্বমাত্র-বোধের নির্হেতু আনন্দ (*joie de vivre* বা বাঁচিয়া থাকার হর্ষ) অনুভব করিতেছে। তাই মেঘলা দিনে পাড়াগাঁয়ের মাঠে কালো মেয়েকে দেখিয়া চিত্তে কারণহীন সুখ জাগে।

এমনি করে শ্রাবণরজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে,
কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণচোখ। ('কৃষ্ণকলি')

মানসবন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কবিসত্তা দিক্‌বিদিকের নিঃসীমতায় আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

আপ্‌নারে হায় চিত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থসকলে। ('সম্বরণ')

ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির নব নব রূপ, প্রহরে প্রহরে দিবা-রাত্রির নব নব বেশ। কোনটিই চরম নয়, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সার্থকতা। বাহিরের এই ক্ষণভঙ্গরস কবিচেতনায় যে সংস্কারমুক্তির উল্লাস ও মৌহূর্তিক আনন্দ আনিয়াছিল তাহা ক্ষণিকার প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। মুক্তিবোধের সাড়া দুই রকমের,—কারণহীন সুখ, আর সর্ববিধ বন্ধনবিমুখতা। ক্ষণিকার মূল সুরে কবিচিত্তের এই দুই রকম সাড়ার তালফেরতা। 'ক্ষণিকা', 'যথাসময়', 'বোঝাপড়া', 'অচেনা', 'বিদায়', 'সেকাল', 'সম্বরণ', 'উদাসীন', 'শেষ' ইত্যাদি কবিতার প্রধান সুর হইতেছে বর্তমান মুহূর্তের নির্লিপ্ত আনন্দস্বাদ। শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, স্মৃতি, আচার ও শিষ্টতা, শান্তি ও নির্ভরতা, যশ, ক্ষমতা, ভবিষ্যতের আশা—ইত্যাদি যাহা-কিছু মানুষকে বাঁধিয়া রাখে সমাজশৃঙ্খলে, গোষ্ঠীবন্ধনে ও ব্যক্তি-স্নেহে, সে সকলের প্রতি কবিচেতনার নির্লিপ্তি প্রকাশিত 'মাতাল', 'যুগল', 'শাস্ত্র', 'অনবসর', 'অতিবাদ', 'কবির বয়স', 'ক্ষতিপূরণ', 'জন্মান্তর', 'বিলম্বিত' ইত্যাদিতে॥

৭

ইতিহাসের গণ্ডীতে ঘেরা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা ভালোমন্দর বাছবিচার ছাড়িয়া কালচেতনানির্মুক্ত হইয়া এখন কবিচিত্ত ক্ষণমুহূর্তের ভাবসত্যকে সহজমনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

মনেরে আজ কহ, যে
ভাল মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে। ('বোঝাপড়া')

সর্বব্যাপী "অস্তি"কে গ্রহণ করিলে সকলকেই স্বীকার করা হয়, কোথাও কোনো "নাস্তি"র সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না।

তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমন কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি। (ঐ)

অতএব সারসত্য এই

থাক্‌ব না ভাই থাক্‌ব না কেউ
থাক্‌বে না ভাই কিছু,
সেই আনন্দে চল রে ছুটে
কালের পিছু পিছু। ('শেষ')

৮

গভীর অনুভূতি ভাষায় সোজাসুজি প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রহস্যটুকু উবিয়া যায়। তাই আমাদের দেশের কবিসাধকেরা চিরকাল তাঁহাদের ধ্যানধারণার অনুভূতি-উপলব্ধি সিম্বলের সাহায্যে রূপক-উৎপ্রেক্ষার আধারে আপাতবিরোধের আবরণে অথচ সাধারণের ব্যবহৃত ভাষায় ও জানা ভঙ্গিতে যথাসম্ভব রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে চাহিয়াছেন। এমন রচনার দুই উদ্দেশ্য। প্রথমত অন্তরের গভীর উপলব্ধি সাধারণ অভিজ্ঞতার সাজ-পোষাকে সহজবোধ্য করা। দ্বিতীয়ত পণ্ডিতের বিরুদ্ধতা ও অনধিকারীর দৌরাত্ম্য হইতে বাঁচাইয়া তাঁহাদের সাধনার ধারা বহমান রাখা। ক্ষণিকায় প্রতিবিম্বিত কবিচিত্তের অনুভূতি আধ্যাত্মিক নয়, সাধনালব্ধ তো নয়ই। "গভীর সুরে গভীর কথা" শুনাইয়া দিবার সাহস না পাইয়া অজানিতেই কবি এই সহজ কবিতাগুলিতে সহজ সুরে অতি গভীর কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা রূপের প্রান্ত ছুঁইয়া অরূপের সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে। যদিও ক্ষণিকার কবিতাগুলি কোনমতেই আধ্যাত্মিকতার কাছ ঘেঁষিয়া যায় না, তবুও এগুলিতে প্রাচীন সাধককবিদের রচনার সঙ্গে অন্তরের মিল অনুভব করি। একাদশ শতাব্দের সহজযানিক সিদ্ধাচার্য কাহ্ন যে ভাবাশ্রয়ে কহিয়াছিলেন, "কাহ্ন বিলসই আসবমাতা"[১] তাঁহার প্রায় সমসাময়িক সুফী কবি পণ্ডিত ওমর খৈয়াম যে ভাব-কল্পনার বশে লিখিয়াছিলেন

> খ্বাহম্ কি দমি জি খেশ্‌তন্ বাজ্ রহম্
> মই খুর্দম্ ব মস্ত্ বুদনম্ অজ্ উন্ সব্‌বস্ত্।[২]
> 'আমি চাই কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছ থেকে তফাত থাকিতে;
> আমার মদ্যপানের ও মত্ততার ইহাই হেতু।'

কতকটা সেই অনুভবেই বিংশ শতাব্দের আরম্ভক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন

> উচ্ছ্বসিত মদের ফেনা দিয়ে
> অট্টহাসি শোধন করি' নিব!
> ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
> উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া।
> শপথ ক'রে বিপথ-ব্রত নেব—
> মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া! ('মাতাল')

---

১ অর্থাৎ, কাহ্ন আসবমত্ত হইয়া বিলাস করিতেছে।

২ বার্লিন পুথি (রোজেন সম্পাদিত) রুবাঈ ৬৮ গঘ।

সত্য-মিথ্যার জাল সংস্কারের বয়ন। কালের দুই সীমানা অতীত-অনাগত নিশ্চিহ্ন হইলে পরে তবেই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব যায় ঘুচিয়া। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনমতেই
বলব নাক সত্য কথা। ('অতিবাদ')

ক্ষণিকার মর্মবাণীর মধ্যে ওমর-খৈয়ামি সুর খানিকটা অনুভূত হয়। আনন্দবোধ ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়ও নাই অতীতের আলোচনায়ও নাই, আছে জীবনের প্রতিমুহূর্তের নির্বন্ধন অনুভূতিতে। "নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক শেষ বহি নিমেষের কাহিনী"—ক্ষণিকার এই বীজমন্ত্র ওমর খৈয়ামেরও বাণী। যেমন

বর্ চিহর্ এ গুল্ নসীমি নওরূজি খুশস্ত্,
দর্ যহন্ই চমন্ রূই দিলফুরূজ্ খুশস্ত্,
অজ্ দী কি গুজশ্ত্ হর্ চেহ্ গুইএ খুশ্ নীস্ত্,
খুশ বাশ্ জি দী মি গও ইম্রূজ্ খুশস্ত্।[১]

'গোলাপের গায়ে বসন্তের ছোঁয়াটুকু মধুর,
উদ্যানের ছায়াতলে প্রিয়ার মুখখানি মধুর।
গতকল্য গিয়াছে চুকিয়া, যতই বল আর তাহা নয়।'
খুশি থাক, গতকল্যের কথা আর বলিও না। আজিকার দিনই মধুর।

তবে ক্ষণিকার কোন কবিতায় কোনো রকম ব্যঙ্গ কটাক্ষ বা খোঁচা নাই।

৯

ক্ষণপরিচিতির চপলতায় ও ক্ষণহাসির দীপ্তিতে ক্ষণিকার প্রেমের কবিতাগুলি উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা কখনো কোন হৃদয়বন্ধন দীর্ঘকালের জন্য স্বীকার করে নাই। অনেককাল পরে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে যে নির্বন্ধন ক্ষণসৌহৃদ প্রেমের নির্দেশ পাই তাহার বহুপূর্বাভাষ ক্ষণিকায় রহিয়াছে। এ প্রেমের স্বল্প আয়োজনে দূরসান্নিধ্যই যথেষ্ট। এ প্রেম বিরহের আকাশে পাখা মেলে।

আমরা দু'জন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক। ('এক গাঁয়ে')

---

১ অক্স্ফোর্ড (আউস্লি) পুথি রুবাঈ ১৭, বার্লিন পুথি (রোজেন সম্পাদিত) রুবাঈ ২৫।

এই রূপকের প্রথম ছোঁওয়া সোনার-তরীর 'প্রত্যাখ্যান' কবিতায়—পথিক প্রিয় ও গৃহবাসিনী প্রিয়া। ক্ষণিকার কয়েকটি কবিতায় এই রূপকেরই জের আছে।[১] সোনার-তরীর "নায়ে ভরা" সিম্বলের অনুবৃত্তি আছে দুই-একটি কবিতায়।[২] চিত্তগহনের স্বপ্নচারিণী প্রিয়ার আবির্ভাব 'নষ্ট স্বপ্ন' কবিতায়।

কণিকার শেষদিকের কোন কোন কবিতায় কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অভিজ্ঞতার গভীরতা ও বৈচিত্র্য একটি নিটোল আত্ম-অনুভবে মিলিয়া গিয়াছে।

হোক্ রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ ;
হোক্ রে রিক্ত কল্পলতা।
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
এক্লা থাকার সার্থকতা। ('শেষ হিসাব')

জীবনের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে কবিচিত্ত যে অভিসারিকার পদধ্বনির জন্য সর্বদা উৎকর্ণ, একদা অপ্রত্যাশিত শুভক্ষণে তাহারি দেখা মিলিয়া গেল।

আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায় ;
এস এস ভরা বরষায়। ('আবির্ভাব')

ক্ষণিকার কবিসত্ত্ব পথচলা পথিক। পথের ওঠানামা চলাবসা তাহাকে বিচলিত করে না। পথ-চলতি রূপরস তাহার মন ভরাইতেছে। আর প্রাণে জাগিয়া আছে অন্তরতমের সান্নিধ্য।

যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান
এক গান রাখি গোপনে,
নানা মুখ পানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে। ('অন্তরতম')

মুহূর্তমালার প্রবাহে যাহা দেখায় বিচিত্র ও বহুরূপী, ধ্যানের অচঞ্চলতায় তাহারি স্বরূপ উপলব্ধি 'অন্তরতম' কবিতায়।

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা। ('সমাপ্তি')

কবিসত্ত্ব যে পথের পথিক সে পথের গন্তব্য শেষ নাই এবং অন্তরতম তাঁহার

---

১ 'অতিথি', 'বিরহ', 'ক্ষণেক দেখা', 'দুই বোন' ও 'ভর্ৎসনা'।

২ 'যাত্রী' ও 'যৌবন-বিদায়'।

দূরে নাই। অন্তরতম পলাইয়াও বেড়াইতেছেন না, লুকোচুরি খেলিতেছেন। অনেককাল পরে লেখা একটি গানে এই ভাবটি পাই জীবন-মরণের প্রসঙ্গে।

কে বলে "যাও যাও"—আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে।
লাগবে আমার ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া।

ক্ষণিকা কাব্যটির ভাষায় ও ছন্দে নির্বন্ধন বেপরোয়া নির্ভাবনা প্রতিফলিত। তদ্ভব শব্দের মর্যাদা এখানে তৎসম শব্দের অপেক্ষা কিছুতে কম নয়। এই দুই ধরনের শব্দ এখানে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে ভাষায় নূতনতর শক্তি আর ছন্দে নূতনতর নমনীয়তা ও কমনীয়তা সঞ্চারিত। যেমন

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এখানে একটিমাত্র তৎসম শব্দ, "কথা", তবে সেটি তদ্ভবেরই সামিল। কিন্তু এ দুই ছত্রের ভাব তৎসম রীতিতে এমন করিয়া বলা যাইত কি॥

১০

বর্তমান শতাব্দের উপক্রম মুহূর্তে 'নৈবেদ্য' কাব্যের (আষাঢ় ১৩০৮, ১৯০১) কবিতাগুলি (অধিকাংশই চতুর্দশপদী) লেখা। তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। বিদেশে বুয়র যুদ্ধের ঘনঘটা। এই বুয়র যুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বার্থপর হিংস্র রূপ আমাদের কাছে প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। রবীন্দ্রনাথ নির্ভীক সত্যকথা বলিতেছেন

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
••• লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়। (৬৪)

"সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে কুব্জপৃষ্ঠ" নতশির আমরাও সভ্যতানাগিনীর বিষনিঃশ্বাস এড়াইতে পারি নাই।

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি পুরিছে ভুবন।
দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শ বিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার। (৯২)

সদাচার ও ধর্মের নামে স্তূপীকৃত মূঢ়তার ভারে আমরা মুহ্যমান। এখন তা পরিত্যাগ না করিলে বাঁচিবার উপায় নাই।

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জনা। (৬১)

ধর্মের নানা পথ এবং সে নানা পথ বিপদসঙ্কুল। সাধারণ লোক যাহারা দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িয়া পুণ্য অর্জন করিতেছে তাহাদের সে কাজ শিশু সাজিয়া পূজা পূজা খেলা করার মতো। বৃহত্তর মানব সমাজে তাহারা উপহসিত, উপেক্ষিত, পীড়িত।

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া,
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।
… সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল। (৫০)

ভক্তি-উচ্ছ্বাসময় সাধনার দ্বারা সমষ্টিজীবনের কাজ সমাধা হইবে না। তাহা কবির কাম্যও নয়।

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিরসধারা
নাহি চাহি নাথ। (৪৫)

জ্ঞানী-বৈরাগীর সাধনাও চলিবে না। কবির প্রার্থনীয়, অন্তরে ভক্তি জাগ্রত রাখিয়া সংসারের, সমাজের ও দেশের প্রাত্যহিক দায় ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়া চলা।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা-বর্ণগন্ধময়।…
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে উঠিবে ফলিয়া। (৩০)

জীবনের কাজের ডাকে সাড়া দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কখন ডাক আসিবে ঠিক নাই, দীর্ঘকাল বিলম্ব হইতেও পারে।

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।…
বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা—
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধ'রে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন। (৩৯)

"ভাবের ললিত ক্রোড়ে" নিলীন না রহিয়া কবি ফলপ্রত্যাশা না করিয়া "কর্মক্ষেত্রে…সক্ষম স্বাধীন" হইতে চান। তাই প্রার্থনা

ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে। (৪৭)

জীবনসংগ্রামে কবি দেশের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত…
যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। (৭২)

আর নিজের জন্য চাহিতেছেন

মুক্ত কর মুক্ত কর নিন্দাপ্রশংসার
দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে। (৮৪)

কল্পনার কবিতায় কবি ব্রহ্মাণ্ডে অনবচ্ছিন্ন-আমিকে অনুভব করিয়াছিলেন, নৈবেদ্যের কবিতায় তিনি অন্তরের অনির্বাণ-আমির প্রত্যক্ষ পরিচয় লইতে ব্যাকুল।

ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়। (৫১)

প্রাচীন ভারতে একদা ঋষিকণ্ঠে যে অভয়বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল[১] তাহাই জীবনে মরণে একমাত্র মন্ত্র।

---

১ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥"

শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্যপথ নাহি। (৬০)

প্রাচীন-ভারতের শিক্ষা ও জীবন-আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সে তো সহজ নয়।

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।
আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধিরপুষ্ট বিলাসব্যসনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়,
নিঃসংকোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়
নীরব গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল, (৯৫)

১১

ক্ষণিকার শেষে কবি অন্তরতমকে পাইয়াছিলেন নিশীথে একান্তে, প্রশান্ত উপলব্ধিতে—"সব শেষ হল যেখানে সেথায় তুমি আর আমি একা।" নৈবেদ্যে তাঁহাকে দেখিলেন কর্মচঞ্চল নিখিলের মাঝখানে, ধ্যানে।

তখন সহসা দেখি মুদিয়া নয়ন
মহাজনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি,— ...
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা সব চেষ্টা পরে,
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা। (২২)

এই সুনিবিড় দৃষ্টি-ধারণী কবিকে জীবনের মহৎ কর্তব্যের, মুক্তির পথে ধ্রুবদর্শন করাইল। এই মুক্তি মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নির্বাণ নয়, ইহা লীলাবাদী রসিকের সাযুজ্য।

সকল সংসারবন্ধে বন্ধনবিহীন
তোমার মহান্ মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন। (২৮)

কবিসত্ত্ব ভক্তিপথের তীর্থযাত্রী। বৈষ্ণব রসিকভক্তের মতোই তিনি পরমাত্মার নিত্য সংসার লীলার দৃষ্টি-অধিকার হারাইতে চাহেন না।[১] নিখিল বিশ্বকে যিনি লীলাপ্রপঞ্চ দ্বারা অহরহ অজস্রভাবে জয় করিতেছেন, তাহারি লীলান্বিত কবিচিত্তকে দুঃখ-সুখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করিতেছে। এই জাগতিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করিয়া মনপ্রাণ দিয়া লীলার তাৎপর্য-অনুভাব কবির জীবনসাধনা। মনে শক্তি ও প্রাণে ভক্তি না থাকিলে দুঃখের অভিজ্ঞতাকে আনন্দের পারে নেওয়া যায় না।

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি। (২০)

এই আত্মনিবেদনই নূতন সুর জাগাইল নৈবেদ্যের কবিতায়॥

১২

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন (—তবে সর্বাংশে কোন প্রচলিত ধর্মমত বা বিশ্বাস অনুযায়ী নয়, তাঁহার নিজের মতে)। ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম বা ভগবান্) বলিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন সেই সর্বভূ সত্তা ও শক্তি যাহা বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকট হইয়া অনির্বচনীয় সার্থকতার দিকে ধাবমান। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এই দুই রূপে নিজেকে লইয়া ঈশ্বরের নিজের এই খেলাই নিখিল জড়ের ও জীবনের রহস্য-বিলাস বা লীলা। নৈবেদ্যের কবিতাগুলি এমন ঈশ্বরভক্তির রসেই ভরপুর, এবং 'নৈবেদ্য' নামটিতেই তাহা প্রকাশিত।

নৈবেদ্যের প্রথম অংশে আছে ধ্যানজীবনের আদর্শ, দ্বিতীয় অংশে কর্ম-জীবনের। এই অংশকে এক হিসাবে চৈতালির ভাবুক অংশের জের বলা চলে। নৈবেদ্য রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ অন্তরে এক প্রবল কর্মোদ্যম অনুভব করিতেছিলেন। যেন দেশের সুপ্ত শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া কবিচেতনাকে ঠেলা

---

১ পরবর্তী কালের একটি গান এই সঙ্গে তুলনীয়,

যিনি সকল কাজের কাজী মোরা তাঁরি কাজের সঙ্গী
যাঁর সকল রঙে রঙ্গ মোরা তাঁরি রসে রঙ্গী।...

দিতেছিল, নিরাসক্ত ভাবজীবন দূরে রাখিয়া জীবনসাধনাকে মহৎকর্মে রূপ দিবার জন্য। নৈবেদ্যের এই আকুতি অঙ্কুরিত হইল "ব্রহ্মচর্যাশ্রম" প্রতিষ্ঠায় (পৌষ ১৩০৮)।

পরাধীন ও পরপ্রত্যাশালোলুপ দেশের মূঢ়তা ও দুর্গতি কবিচিত্তকে মনুষ্যত্বের মর্যাদারক্ষার জন্য ঈশ্বরবিশ্বাস-নির্ভর কর্মপথ নির্দেশ করিল। যেখানে প্রতিপদে মানুষের অবমাননা সেখানে দেবত্বের জপ ধ্যান ষোড়শোপচার আরাধনা নিষ্ফল কেননা মানুষের মধ্যেই তো দেবতার প্রকাশ। দেশের প্রচলিত ধর্মে জনগণ বিশ্বদেবতাকে মানুষের বাহিরে নানা খণ্ডমূর্তিতে দেখিয়া আসিয়াছে, অখণ্ড মানবদেবতা তাহাদের নজরে পড়ে নাই। সেই অন্ধতাই এই দুর্দশার প্রধান কারণ। যাঁহারা নিষ্কাম ভক্তিপথের পথিক তাঁহারা মানবমহাতীর্থের সাধনাপথ হইতে পাশ কাটাইয়া বসিয়া আত্মমগ্ন। তাঁহারা পথ দেখাইবেন কিসে।

> দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা পরে
> যাহারা পড়িয়াছিল ভাবাবেশভরে
> রসপানে হতজ্ঞান ; যাহারা নিয়ত
> রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত,—...
> তারা আজ কাঁদিতেছে! আসিয়াছে নিশা,
> কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা। (৫২)

শুধু জ্ঞানযোগে ও কর্মযোগে সিদ্ধি নাই, শুধু ভক্তিযোগেও নাই। বিশ্বদেবতার করুণা অন্তরে জাগ্রত থাকিয়া শক্তিসঞ্চার না করিলে কিছুতেই হইবে না, কেননা "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। সে অকারণের ভরসা কবির আছে।

> আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
> সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
> গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হ'য়ে
> তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!
> আমি ছাড়ি নাই আশা, ওগো মহারাজ! (৬২)

১৩

নৈবেদ্যের কবিতা-শতকের মধ্যে আটাত্তরটি চতুর্দশপদী। প্রথম একুশটি গানের ধরনে লেখা, এবং এগুলি গান হিসাবেই প্রচলিত। এই গান-কবিতাগুলি যেন গীতাঞ্জলির উপক্রমণিকা। নৈবেদ্যে রবীন্দ্রনাথের সনেটের এক নূতনতর রূপ দেখা দিয়াছে,—পয়ারের মিলে। কতকগুলি সনেট একটানা লেখা, এগুলিকে সনেটগুচ্ছ বলা যায়॥

নবম পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুর

(১৯০১-১৯০৩)

"তুমি আজ মোর মাঝে আমি হয়ে আছ"

১

সংসারে স্নেহসম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন যতক্ষণ তাহা লাভক্ষতি হিসাবের অতীত না হইয়াছে ততক্ষণ তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণা উদ্‌বুদ্ধ করে নাই। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ কেন, যে-কোন ভালো কবিই) যেন পৃথক্ দুই সত্তা। রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষের পরিধি ছাড়াইয়া বিশুদ্ধ অনুভূতিরূপে স্থিরতা পাইলে তবেই তাঁহার কাব্যবস্তু হইতে পারিয়াছে। তাঁহার কবিতায় যে মানুষ-ছায়াপাত তাহা প্রধানত তাঁহারি অন্তর-লোক হইতে প্রতিবিম্বিত। কেবল 'স্মরণ'[১] বইটিতে তাহার ব্যতিক্রম। পত্নীর পরলোকগমনের (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৮) শোক-বেদনা স্মরণের কবিতাগুলিতে অভিনব স্বাদ দিয়াছে। কবিপত্নী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি কবির কাব্যে স্থান পান নাই এবং কবির জীবনের অনেক ক্ষেত্রেও তাঁহার আহ্বান হয় নাই।[২] এ ব্যাপার অস্বাভাবিক নয় এবং অনেক কবির পক্ষেই সত্য। তবে ঘরোয়া জীবনে পতি-পত্নীর অন্তরের যোগ যে কতখানি নিবিড় ছিল তাহার অভ্রান্ত পরিচয় স্মরণের কবিতাগুলিতে আছে। যে গার্হস্থ্য জীবনের কোন স্পষ্ট প্রতিবিম্বন কবিকর্মে ঘটে নাই তাহারি স্নিগ্ধ করুণ স্বীকার এখানে। যেন "যেতে-নাহি-দিব"র উল্‌টা ছবি—ধরা-নাহি-দেয়।

যুগলমিলন সম্পূর্ণতা লাভ করিল যেন মৃত্যুতে। জীবৎকালে কাব্যের উপেক্ষিতা মৃত্যুর তোরণ দিয়া অন্তরের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোমা সনে
এ বিচ্ছেদবেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল। ('মিলন' ; ৮)

---

১ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ ভাগে প্রথম সংকলিত (১৩১০)। প্রথম দুইটি ছাড়া কবিতাগুলি বঙ্গদর্শনে (অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০৯) প্রকাশিত হইয়াছিল।

২ 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৩ দ্রষ্টব্য।

বিরহিহৃদয়ের সুগভীর বেদনা স্মৃতিবাহিনীতে আলোছায়ার আলিম্পন আঁকিয়াছে।

তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্যঘরে আনে ডাকি ডাকি। ('বসন্ত' ১৯)

কবিচিত্ত প্রকৃতির পটে বিদেহিপ্রিয়ার দৃষ্টিরাগ অনুভব করিয়া সান্ত্বনা খোঁজে।

আজি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া
তোমার নয়ন যেন ফিরিছে চাহিয়া।
তোমার সে হাসিটুক,
সে চেয়ে দেখার সুখ
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়া
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়া। ('সম্ভোগ'; ২৭)

স্মরণের কোন কোন কবিতায় অতীত দিনের অবজ্ঞাত মুহূর্তের ও উপেক্ষিত অবকাশগুলির জন্য অনুশোচনার রেশ আছে। এইখানেই শোচক-কাব্যের অবিস্মরণীয় ধ্বনি।

তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে,
আপনারে খর্ব করি রেখেছিলে, তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। হৃদয়ের গূঢ় আশাগুলি
যখন চাহিত তারা কাঁদিয়া উঠিতে কণ্ঠ তুলি
তর্জ্জনি-ইঙ্গিতে তুমি গোপন করিতে সাবধান
ব্যাকুল-সঙ্কোচ বশে, পাছে ভুলে পায় অপমান। ('কথা'; ১০)

বাক্যহীন শেষ বিদায়ের বেদনা কবির বীণায় একটি নূতন তার পরাইয়া দিল—এই কাব্যে।

দুজনের কথা দোঁহে শেষ করি লব
সে-রাত্রে ঘটেনি হেন অবকাশ তব।
বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায়
চারিদিকে চাহিয়াছি ব্যর্থ বাসনায়।
আজি এ হৃদয়ে সর্ব ভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে। ('মিলন'; ৮)

২

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা তাঁহার শৈশবকল্পনা হইতে প্রথম উৎসারিত এবং সর্বদা শৈশবকল্পনায় ওতপ্রোত ছিল, একথা প্রথমেই বলিয়াছি। বাৎসল্য অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল তাহাও

কড়ি-ও-কোমলের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। কড়ি-ও-কোমলের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ও 'সাত ভাই চম্পা' কবিতা দুইটিতে[১] রবীন্দ্রনাথের শৈশব অনুভাবের সার্থক প্রকাশ। এই ছড়া-ও-গল্প কবিতা দুইটিতে বাঙ্গালী-শিশুর চিরদিনের মধু-উৎস অমরতা পাইয়াছে। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্য অনুভাবের নূতন প্রকাশ হইল চিত্রার 'যেতে নাহি দিব'য়। এটি "শিশু" পর্যায়ের কবিতা নয়, তবুও 'শিশু' কাব্যের[২] তরুণকরুণ মর্মবাণী ইহাতে গুঞ্জরিত। শিশুর চপল লাবণ্যের ছটায় সদ্যোদীপ্ত জীবনদীপের প্রতি চরাচরের নিঃসহায় ব্যাকুলতার রহস্য প্রতিফলিত। কোন্ এক শুভ-মুহূর্তে বিদায়ব্যথাতুর শিশুকন্যার মুখচ্ছবিতে আদিজননী বসুন্ধরার মাতৃহৃদয়ের স্নেহশঙ্কা অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা কবিতাটির মধ্য দিয়া চিরন্তন ও সার্বভৌম করিয়া দিয়াছেন। চঞ্চলকে ধরিয়া রাখিবার অবোধ আকুলতা, স্নেহের ধনকে অঞ্চলপ্রান্তে ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস—যাহা মানবপ্রকৃতির মর্মের কামনা—তাহা এই কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির উপর অধ্যাসিত হইয়াছে। বিরহচ্ছায়ানিবিড় কবিহৃদয় যেন নিখিল মাতৃহৃদয়ের বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন। এখানে সন্তান উপলক্ষ্যমাত্র, মাতাই প্রধান। এ এক অভিনব বাৎসল্যভক্তি। 'শিশু' কাব্যে এই দৃষ্টিরই প্রতীপ প্রসার। এখানে শিশুর মধ্যে বিশ্বরূপ না দেখিয়া কবি বিশ্বব্যাপ্তির মধ্যে শিশুরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর বাজনা।
তপন-শশী হেরিছে বসি'
তোমার সাজনা।[৩]

---

১ প্রকাশ বালক বৈশাখ, আষাঢ় ১২৯২।

২ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগ রূপে প্রকাশিত (২ আশ্বিন ১৩১০)। উপক্রমণিকা সমেত বাষট্টি কবিতার মধ্যে শেষের তিরিশটি পূর্বপ্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থ হইতে সংকলিত। তাহার মধ্যে একটি 'নদী' (১৩০২ মাঘ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম তিরিশটি কবিতাই শিশুর মৌলিক অংশ। 'শিশু' কাব্য বলিতে আমরা এই কয়টি কবিতাই বুঝিব। শিশুর নূতন কবিতার অধিকাংশ আলমোড়ায় ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে লেখা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ফাল্গুন ১৩৪৯ পৃ ৫২৫-৫২৬, ৫২৯-৫৫১ দ্রষ্টব্য)। একটিমাত্র কবিতা বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল।

৩ 'খেলা'। বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১৩১০) 'শিশু' নামে প্রকাশিত। ইহা কবিতাটির যথার্থ নাম।

পত্নীবিয়োগ, মাতৃহীন শিশুপুত্রের বেদনা, সর্বোপরি বালিকা কন্যার মরণান্তিক পীড়া কবিচিত্তে এই নূতনতর বাৎসল্য-অনুভাবের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। জগৎপারাবার তীরে যে চিরন্তন শিশু

বালুকা দিয়া বাঁধিছে ঘর
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল পরি
ভাসায় তা'রা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি'
পাতায় গাঁথা ভেলা।[১]—

মানবসংসারের গোকুল-বৃন্দাবনে যাহার নূপুরঝঙ্কার শুনিয়া বিশ্বহৃদয় মুগ্ধ, বিশ্ব-সংসারের বহিঃপ্রাঙ্গণে যাহার ধূলিমলিন বিরলবাস দেহছন্দে তপনশশিতারকার নয়ন আবিষ্ট, সেই নিত্যকালের শৈশব হাসিকান্নার দোতারা বাজিয়াছে শিশুর বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে।

শিশুর কবিতাগুলিকে এই চারি বর্গে ভাগ করা চলে,—বাৎসল্যভাবময়, বাৎসল্যরসময়, শিশু-বোধ এবং শিশু-কল্পনা। প্রথম দুই বর্গে কবির কথা, শেষ দুই বর্গে শিশুর কথা। প্রথম বর্গে পড়ে তিনটি কবিতা—'জন্মকথা', 'খোকার রাজ্য' এবং 'ভিতরে ও বাহিরে'। 'জন্মকথা'র শেষ স্তবকে 'যেতে নাহি দিব'র প্রতিধ্বনি। আর দুইটি কবিতায় শিশুমনের অগাধ রহস্য অবগাহনের চেষ্টা।

'খেলা', 'খোকা', 'ঘুমচোরা', 'অপযশ', 'বিচার', 'চাতুরী', 'নির্লিপ্ত' ও 'কেন মধুর' দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত। ঘুমচোরায় ঘুমপাড়ানি-ছড়ার সমস্ত রূপরসের রহস্য যেন দিগ্‌বিদিকে ঝলক দিয়াছে। রূপ ও ধ্বনির সমন্বয়ে কবিতাটি অত্যন্ত মনোরম। মা যখন "জল নিতে ও-পাড়ার দীঘি'তে গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া" তখন সেই ফাঁকে ঘুমচোরা ঘরে ঢুকিয়া খোকার ঘুম চুরি করিয়া আকাশে উড়িয়া গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া মা অবাক হইয়া দেখেন খোকা ঘরময় হামাগুড়ি দিয়া ফিরিতেছে। মাতৃহৃদয় তখন ঘুমচোরার সন্ধানে বাহির হইবার জল্পনা করে।

---

১ উপক্রমণিকা বা উৎসর্গ কবিতা।

যাব সে গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলুকুলু বহে যেথা ঝরণা।
যাব সে বকুলবনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘরকরনা।
যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে-দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনীতে রুনুঝুনু নূপুরে।
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবন মাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি,
শুধাব মিনতি ক'রে আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানাশোনা কি ?

'প্রশ্ন', 'সমব্যথী', 'ব্যাকুল', 'সমালোচক', 'জ্যোতিষ শাস্ত্র' ও 'বৈজ্ঞানিক'—এই ছয়টি কবিতা তৃতীয় বর্গে পড়ে। শিশুমন সংসারের সংস্কার-নিগড়ের অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার নিজের জগৎ আধা-বাস্তব আধা-কাল্পনিক। বয়স্ক মানুষের সংসারেও তাহাই প্রত্যাশা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

মনে কর্ না উঠ্‌ল সাঁঝের তারা,
মনে কর্ না সন্ধ্যে হ'ল যেন!
রাতের বেলায় দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন ? ('প্রশ্ন')

চতুর্থ বর্গের মধ্যে পড়ে চৌদ্দটি কবিতা—'বিচিত্র', 'মাষ্টার', 'বাবু', 'বিজ্ঞ', 'ছোট বড়', 'বীরপুরুষ', 'রাজার বাড়ী', 'মাঝি', 'নৌকাযাত্রা', 'ছুটির দিনে', 'বনবাস', 'মাতৃবৎসল', 'লুকোচুরি', 'দুঃখহারী' ও 'বিদায়'। এই কবিতাগুলির পিছনে কবির শৈশবকল্পনার ছায়া আছে। কবিসত্ত্ব এখানে যেন নিজের অতীত শিশুরূপকে ফিরিয়া পাইয়াছে। 'মাতৃবৎসল', 'লুকোচুরি' ও 'বিদায়'—এই তিনটি কবিতায় কল্পনার সঙ্গে সংবেদনার—প্রতিমানের সঙ্গে অনুভাবের (ইমেজারির সঙ্গে ইমোশনের)—সুন্দর সংযোগ।

তার চেয়ে মা আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ!
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ! ('মাতৃবৎসল')

পুজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে—খোকা নেই যে ঘরের মাঝে!
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে! ('বিদায়')

'শিশু' কবিতাগুলির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে একটু বিশেষ মমতা ছিল। তাহার প্রধান কারণ, এগুলির মধ্যে কবির নিজের আবেগ অনেকটাই ধরা পড়িয়াছিল। তাই বই বাহির হইবার আগে কবিতাগুলিকে মাসিকপত্রের হাটে ছাড়িয়া যাচাই ও অনুকরণ করিতে দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। আলমোড়া হইতে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এ কবিতাগুলি কোনো মাসিকপত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে…বেশ তাজা টাটকা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিকপত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়।"[১] তিনদিন পরে আর একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "এইত ২২টা হল। কিন্তু শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তাহলে শুকিয়ে মারা যাবে—এরা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের—হাটবাটের জিনিষ নয়।"

একথা "স্মরণ' কাব্যের পক্ষেও সত্য, যদিও স্মরণের অধিকাংশ কবিতা বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল॥

---

[১] বিশ্বভারতী পত্রিকা ফাল্গুন ১৩৪৯ পৃ ৫৩০-৫৩১।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতীক্ষা

(১৯০৩-১৯০৬)

"সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবুডুবু
ঘরে কি মন রয় ?"

১

১৩০৩ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'কাব্যগ্রন্থাবলী' বাহির হইয়া তাঁহার কাব্যসৃষ্টি-সূত্রের প্রথম গ্রন্থি রচনা করিল। এই গ্রন্থাবলীর শেষ কাব্য 'চৈতালি' এইখানেই প্রথম প্রকাশিত। দ্বিতীয় গ্রন্থি পড়িল ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশে। এই গ্রন্থাবলীর শেষ কাব্য 'শিশু'র প্রকাশ এইখানেই প্রথম।

এই কাব্যগ্রন্থে 'স্মরণ' ও 'শিশু' ছাড়া আর কোন বইয়ের কবিতা সমগ্ররূপে একত্র স্থান পায় নাই। কতকগুলি কবিতা স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, কতকগুলি বাদ গিয়াছে, আর কতকগুলির কিছু কিছু অংশ পরিবর্জিত হইয়াছে। সংকলিত কবিতাসমূহ নয় ভাগে তের খণ্ডে প্রকাশিত। প্রত্যেক ভাগ ও খণ্ডের কবিতাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে সাজানো হইয়াছে,—'যাত্রা', 'হৃদয়ারণ্য', 'নিষ্ক্রমণ', 'বিশ্ব' (প্রথম ভাগ প্রথম খণ্ড); 'সোনার তরী', 'লোকালয়' (প্রথম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড); 'নারী', 'কল্পনা', 'লীলা', 'কৌতুক' (দ্বিতীয় ভাগ প্রথম খণ্ড); 'যৌবনস্বপ্ন', 'প্রেম' (দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড); 'কবিকথা', 'প্রকৃতিগাথা', 'হতভাগ্য' (তৃতীয় ভাগ); 'সংকল্প', 'স্বদেশ' (চতুর্থ ভাগ); 'রূপক', 'কাহিনী', 'কথা', 'কণিকা' (পঞ্চম ভাগ); 'মরণ', 'নৈবেদ্য', 'জীবনদেবতা', 'স্মরণ' (ষষ্ঠ ভাগ); 'শিশু' (সপ্তম ভাগ); 'গান' (অষ্টম ভাগ); 'নাট্য'—'সতী', 'নরকবাস', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'বিদায়-অভিশাপ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (নবম ভাগ প্রথম খণ্ড); 'নাট্য'—'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জ্জন', 'মালিনী' (নবম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড); 'নাট্য'—'রাজা ও রাণী' (নবম ভাগ তৃতীয় খণ্ড)।

এই আটাশটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির বিশেষ প্রবেশক রূপে রবীন্দ্রনাথ আটাশটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা উৎসর্গের উপক্রমণিকার মতো ছাপা হইয়াছিল।

এই কবিতাগুলি ও আরো কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে প্রথমপ্রকাশিত কবিতা লইয়া অনেককাল পরে (১৩২১) 'উৎসর্গ' প্রকাশিত হইল।[১] রচনাকাল হিসাবে 'উৎসর্গ' স্মরণ-শিশুর সমসাময়িক, ভাবের দিক দিয়া নৈবেদ্য-খেয়ার মধ্যস্থ॥

২

নৈবেদ্যে রবীন্দ্রনাথের মানবসত্তা তাঁহার কবিসত্তাকে কিছু যেন ঝাঁপিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্মজীবনের একটি সুস্পষ্ট আদর্শ এখন তাঁহার কাছে প্রতিভাত এবং সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া তিনি এখন কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতৃত্বে অগ্রসর। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠায়, গানে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়—দেশ-চৈতন্য-উদ্বোধনের প্রচেষ্টায় এই আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বহুমুখ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কবিসত্তাই সর্বদা গরীয়ান্, তাহা বেশিদিন পিছাইয়া থাকে না। অচিরে কর্মের বল্গায় শিথিলতা আসিল এবং কল্পনার শাখা ডাল-পালা মেলিতে শুরু করিল। আত্মীয়বিয়োগ-বেদনায় কবিসত্তার আত্মপ্রকাশ ত্বরিত হইল।

উৎসর্গের অধিকাংশ কবিতা (—উৎসর্গের কয়েকটি মাত্র কবিতা ১৩০৮ সালে লেখা, অধিকাংশ ১৩০৯ ও ১৩১০ সালে—) কাব্যগ্রন্থাবলীর বিভিন্ন ভাগের ও খণ্ডের শ্রেণীগুলির প্রবেশক (কিংবা উৎসর্গ) রূপে লিখিয়াছিলেন অথবা ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বকৃত ভাষ্যের মতো নেওয়া যায়। তবে 'উৎসর্গ' কাব্যনামের সার্থকতা শুধু এইদিক দিয়াই নয়। দেবপূজার প্রধান সম্ভার "নৈবেদ্য"। তাহা দেবতাকে "উৎসর্গ" করিতে হয় এবং দেবপূজা-সমাপনের পর পূজাকর্মের ফল দেবতাকেই নিবেদন করিতে হয়। তাহাও "উৎসর্গ"।

উৎসর্গের কবিতাগুলির অধিকাংশে কবিস্বরূপের পুনঃপ্রকাশ লক্ষ্য করি। নৈবেদ্যের অব্যবহিত পরে লেখা কবিতাগুলিতে নৈবেদ্যেরই ভাবানুসরণ।[২] তখনো কবি তত্ত্বদৃষ্টি একেবারে বর্জন করেন নাই, দ্বৈতাদ্বৈত রহস্য তখনো কবিচিত্তে কুতূহল জাগাইয়া রাখিয়াছে।[৩] নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কবি

[১] রচনাকাল ১৩০৮-১০। অনেকগুলি কবিতা বঙ্গদর্শনে (১৩০৮-১০) আর কয়েকটি সমালোচনী (১৩০৯-১০) প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ অনেক কাল পরে, ১৩২১ সালে। তখন তৃতীয় দফায় কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন চলিতেছিল।

[২] কবিতা-সংখ্যা ১৬, ২১, ২২, ২৪-৩০। প্রথমটি ও শেষের সাতটি কবিতা কাব্যগ্রন্থের 'স্বদেশ' অংশেও সংকলিত।

[৩] কবিতাসংখ্যা ২২ ('কবির বিজ্ঞান', বঙ্গদর্শন ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়।)

দ্বৈতরূপের সন্ধান পাইয়াছেন,—মর্ত্য ও অতিমর্ত্য। অতিমর্ত্য রূপটিতেই তাহার যথার্থ পরিচয়, এই রূপে কবিসত্ব নিখিলের আত্মীয়, বিশ্বলীলার রসিক।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,

সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে? (২১)[১]

স্বপনবিহারী কবিসত্ব জনতারণ্যে দীপ্তমধ্যাহ্ন-আলোকে বিশ্বদেবতাকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে না, তাহাকে স্বাগত করে প্রদোষের অন্ধকারে অন্তরের নির্জন নিভৃত একান্তে।

রাজপথ দিয়া আসিয়ো না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে
প্রখর আলোকে। (৩)

বিশ্বদেবতার মধ্যে জীবনদেবতাকে ধরাছোঁওয়া যায় না। আপনার অন্তরের ধন জীবনদেবতা লীলাদুর্ললিত। ক্ষণে ক্ষণে ধরা দিয়া তিনি ক্ষণে ক্ষণে লুকাইয়া পড়েন। দুর্নিবার আকর্ষণে এই রহস্যলীলা অন্তরকে টানিতেছে।

বুঝি গো আমি, বুঝিগো তব
ছলনা,
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চল না! (৪)

অন্তরের জন্য ব্যাকুলতা বুকের মধ্যে হাহাকার তুলিয়াছে, অধরাকে ধরিবার জন্য কবিচেতনা সুদূরের পিপাসা লইয়া আপন গন্ধে পাগল কস্তুরীমৃগের মত বনে বনে উন্মনা হইয়া ফিরিতেছে। অস্ফুট বাসনার মধ্যে সান্ত্বনার আশা ঝলকায় কিন্তু চরিতার্থতা কই।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম!

---

[১] 'কবিচরিত' বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০৮।

বাহু মেলি তা'রে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না! (৭)

কবিহৃদয় বিরহিণী নারী। অদেখা প্রিয়ের প্রতীক্ষায় সে অশান্তচিত্তে দিন গণিতেছে।

দিন চ'লে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।
"অজানাকে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিনী নারী। (১০)

প্রিয় অদেখা, কিন্তু অচেনা নয়।

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা
বলত কেমনে বলি?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও
খনে খনে যাও ছলি! (৬)

বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যপ্লাবনে অকস্মাৎ যবনিকা ভাসিয়া যায়। অন্তরের অকারণ বেদনা-আনন্দ আচম্বিতে অধরার আবির্ভাব ঘোষণা করে। এই চকিত অনুভাব কবি কাব্যে গানে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টার সার্থকতা অনিশ্চিত, তবুও চিত্ত বিশ্বাস হারায় নাই।

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।...
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চ'লে যাবে না। (৯)[১]

শুধু অন্তরের মধ্যে নয় বাহিরেও কবিচিত্তের জন্য সান্ত্বনা রহিয়াছে।[২] শুক্লসন্ধ্যায় চন্দ্রালোক রাজহংসের শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া পর্যুৎসুক চিত্তে প্রিয়-পরিচয়বার্তা বহন করিয়া আনে।[৩]

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তা'র নাম
লিপি যার লেখা।

---

[১] 'অস্ফুট', সমালোচনা আশ্বিন ১৩০৯। [২] ১১ ('চিঠি', বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১৩১০)।
[৩] 'শুক্লসন্ধ্যা', বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০৯।

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
র'ব আমি একা। (২৩)

অন্তরতমের সঙ্গে সম্বন্ধ তো আজিকার নয়। চিরদিনের কবিসত্তায় অন্তরতমই নিজেকে নবনব রূপে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

হে চির পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া;
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া! (১৩)

কবির অন্তর ও অন্তরতম পরস্পরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে, স্বয়ংবর-অভিসারে খুঁজিতেছে। অন্তরতমের মধ্যে অন্তরের পূর্ণতা এবং অন্তরের মধ্যে অন্তরতমের রসায়ন। পরমাত্মা আসিতেছেন ভাব হইতে রূপে, জীবাত্মা যাইতেছেন রূপ হইতে ভাবে। এই দ্বিতালেই বিশ্বলীলার দোল।

প্রলয় সৃজনে না জানি এ কা'র যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা। (১৭)

সুখদুঃখ-লাভক্ষতিবোধের অতীত হইয়া নিরাসক্ত দর্শকের আসন গ্রহণ করিলে তবেই বিশ্বলীলানৃত্যের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করা যায়।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে!···
নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি! (৪০)

কবির উপর ভার পড়িয়াছে এই মহানাটকের নাটশালার তোরণদ্বারে বাঁশি বাজাইবার। বিশ্বরঙ্গের আনন্দরসাস্বাদ পাইয়া কবি তাহাই বিলাইয়া দিতেছেন কথায়-গানে-সুরে। যাহারা এই নাটশালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত অচেতন তাহাদেরও মন কবির বাঁশির সুরে ক্ষণকালের জন্যও উচ্চকিত হয়।

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া। (১৯)[১]

মেঘোদয়ে চিত্ত প্রিয়সমাগম-প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হয়, চিত্ত-আকাশ স্পন্দিত করিয়া বকপংক্তি কোন্ দূর সমুদ্রপারের উদ্দেশে উড়িয়া যায়, দিগদিগন্তে মেঘরাশি বাহিরের জগৎকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে। তখন যেন চেতনায় জন্মজন্মান্তরের লুপ্তস্মৃতি ফুটিয়া উঠিতে চায়।

কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
আজ্‌কে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে
কত জন্মের ভালবাসাবাসি। (৩৬)[২]

মেঘারম্ভে জাগাইয়া তোলে প্রিয়মিলন-উৎকণ্ঠা আর রৌদ্রপ্লাবন বহিয়া আনে স্বপ্নালসতা। খেয়ার প্রত্যাশায় নদীকূলে তৃণসমাকীর্ণ তরুচ্ছায়ায় নিলীন হইয়া শোনা যায়

দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান। (৬৮)[৩]

এই স্বপ্নবিলাস অকস্মাৎ কিশোর-প্রেমস্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিল।[৪] এই স্মৃতিচিত্রকল্পনা যেন ব্যাকুল বেদনার মেদুর। এমনটি ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই॥

৩

বর্তমান জীবনের ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশা, ক্লান্তি-অবসাদের মধ্যে থাকিয়া আগামী জীবনের পূর্ণতার জন্য ধ্যানস্তব্ধ আত্মমুখী প্রতীক্ষা 'খেয়া' (১৯০৬) কাব্যের রহস্য। খেয়া—জীবনের পালাবদলের। কবিতাগুলি বারো তেরো

---

১ 'বাদক', সমালোচনী, কার্তিক ১৩০৯। ২ 'মেঘোদয়ে', বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১৩১০।
৩ 'চৈত্রের গান', বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১৩১০।
৪ ঐ ৪৩ ('যাত্রিণী', বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১০); ঐ ৩৯ ('সন্ধ্যা', বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১৩১০)

মাসের মধ্যে লেখা (আষাঢ় ১৩১২ হইতে আষাঢ় ১৩১৩)। বইটির মূল সুর শোনা যায় 'পথের শেষ' কবিতায়। ক্ষণিকায় পথের নেশা—"নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,"—ছুটিয়া গিয়াছে। এখন ভাবনা

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা,
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়া-তরী ভাসা।

আনন্দের মধ্যে সুখ আছে, দুঃখও আছে। দুঃখবেদনার ফ্রেমে-আঁটা ত্যাগের দর্পণেই আনন্দের অমৃতরূপ প্রতিভাত। জীবনের ব্যথাবেদনা 'ঘাটের পথ', 'শুভক্ষণ', 'বিদায়', 'দীঘি' ইত্যাদি খেয়ার বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে কতকটা মিস্টিক ভাব পাইয়াছে। এখন অন্তরতম প্রিয় যেন প্রয়াণপথিক রাজা, আর কবিসত্ব যেন গৃহকোণে অপেক্ষমাণা বাসকসজ্জা বধূ। এই প্রতীকসূত্রেই খেয়ার কবিতামালা গ্রথিত।

'আগমন', 'দুঃখমূর্তি', 'প্রভাতে', 'দান' ইত্যাদি কবিতায় নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কবিকল্পনার বিচিত্র রাগে অনুরঞ্জিত।

তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক মোরে,
চা'ব না কিছু, ক'ব না কথা,
চাহিয়া র'ব বদনে হে!
নয়নে আজি ঝরিছে জল,
ঝরুক জল নয়নে হে! ('দুঃখমূর্তি')

অন্তরতমের সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইয়া কবি উৎসর্গে সংশয়-ব্যাকুল। খেয়ার অপরিচিতির সংশয় নাই। এখন স্তব্ধতায় শ্রান্ত প্রতীক্ষার বেদনাব্যাকুলতা।

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে? ('প্রতীক্ষা')

রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভাবে বর্ষার মেঘমেদুরতা যেমন প্রিয়াগমনসম্ভাবনার উৎকণ্ঠা জাগায় শেষ-বসন্তের ও গ্রীষ্মের আলোকপ্লাবন তেমনি স্বপ্নালসতার মায়া বিস্তার করে। এই অনুভাবের প্রকাশ খেয়ার কয়েকটি কবিতায়ও আছে।

চৈত্র-বৈশাখে লেখা 'নিরুদ্যম', 'কুয়ার ধারে', 'জাগরণ', 'বৈশাখে', 'দীঘি' ইত্যাদি কবিতায় নিসর্গের মোহময় পরিবেশে স্বপ্নালস্যের ঘোর লাগিয়াছে। সংসার-সমাজ-দেশের কর্মভার লইবার পুনঃপুন আহ্বান আসিতেছে তবু মনে সাড়া লাগে না।

ওগো ধন্য তোমরা সুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে!
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে—
পাখীর গানে, বাঁশীর তানে,
কম্পিত পল্লবে! ('নিরুদ্যম')

দীর্ঘ দিনমানে প্রতিদিনের খুঁটিনাটি কাজের বোঝা, "বাক্যহারা স্বপ্নভরা" কর্মহীন রাতে অন্তরতমের নিস্তব্ধ প্রত্যাশা। মাঝে শুধু গোধূলির সময়টুকুতেই অভিসারের অবকাশ।

তারি মাঝে দীঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
একটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয়? ('দীঘি')

বর্ষার কবিতাগুলিতে প্রতীক্ষমাণার আবেগ-উচ্ছ্বাস অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথায় শান্ত হইয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ যখন বর্ষাধারায় জুড়াইয়া আসে তখন সমস্ত হৃদয়ভার গানে-সুরে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়।

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
শোনাই কখন বল?
ভরা চোখের মত যখন নদী
ক'রবে ছলছল, ('গান শোনা')

সে গানে-সুরে ভাসিয়া ওঠে সুরপুরীর ছবি। যেখানে

নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে। ('সব-পেয়েছির দেশ')

৪

শব্দ-সিম্বলিজম্ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে খেয়ায়। ইহার সূত্রপাত ছিল ক্ষণিকায় (বাঁশি) ও উৎসর্গে (এলোচুল, হাট, বাট, ঘাট)। খেয়ায় পাই,—পথ, রথ, ভেরী, প্রদীপ, তরী, পাড়ি, খেয়া, কূল, অকূল, মালা, বাঁশির সুর, পথ, পথিক, রাজা, এলোচুল ("এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ"), মাঝি, কাছি, পাল, শহর, ঘণ্টা, ঢেউ, বধূ।

খেয়ার সময় হইতে কবিতার ধারা আর গানের ধারা পৃথক পথ লইতে শুরু করিয়াছে। তাহার আগেও কোন কোন কাব্যে গান ছিল। কিন্তু সে গান কোন স্বতন্ত্র কাব্যরীতির রূপ পায় নাই। গানের ধারায় বেগ আসিল স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিবার সময়ে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি দেশপ্রেমের গান লেখেন ও তাহাতে বাউলের ঢঙে সুর লাগান।[১] গানগুলি 'বাউল' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯০৫)। রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি স্বদেশী আন্দোলনে আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার পর এই ধারা প্রধান হইয়া বহিল গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে। অতঃপর কবিতার ধারার সঙ্গে গানের ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছিল—গীতালি-বলাকার সময় হইতে শেষ পর্যন্ত॥

---

[১] বাউলের সুরে ও সহজ ঢঙে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশিষ্ট গানটি হইল 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের (১৮৯২) সমাপ্তি সঙ্গীত, "যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভাল !"

একাদশ পরিচ্ছেদ

গানের তরী

(১৯০৬-১৯১৩)

"বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর"

১

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার নির্ব্যক্তিক প্রকাশ কবিতায়, সব্যক্তিক প্রকাশ গানে। এই দুই প্রকাশকে যথাক্রমে নির্ভাবন ও সংজীবন বলিতে পারি। নির্ভাবনে আছে প্রতীক্ষানম্রতা, নাই অভিসরণ। সংজীবনে চিত্ত প্রতীক্ষানম্র নয়, প্রতীক্ষাব্যাকুল এবং অভিসরণসমুৎসুক।

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।[১]

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা?[২]

'উৎসর্গ' আর 'খেয়া'র সময়ে গান লেখা চলিয়াছিল প্রচুর।[৩] ইতিমধ্যে (১৩১৪ সালের মাঝামাঝি) কনিষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে কবিধর্ম কিছুদিনের মতো যেন বিচলিত হইল। তখন শোকবেদনার উৎসার হইল এক অভিনব ভক্তিরসে। তাহার মুখ্য প্রকাশ 'গীতাঞ্জলি'তে (১৩১৭)।[৪] গীতাঞ্জলির রচনাগুলি গানও বটে, কবিতাও বটে। দুইটি ছাড়া[৫] সবগুলিই সাধারণ গানের মতো বহরে ছোট। তবে কোনটিই ঠিক গানের আকারে—অর্থাৎ ধ্রুবপদ দিয়া—লেখা নয়। অনেকগুলি গান সুর আশ্রয় করিয়া লেখা। বাকি প্রায় সবগুলিতেই ক্রমে ক্রমে সুর দেওয়া হইয়াছিল, এমন কি বড় কবিতা দুইটিতেও।

---

[১] গীতাঞ্জলি। [২] গীতিমাল্য। [৩] 'গান' (১৯০৯) গ্রন্থে সংকলিত।

[৪] মোট গানের সংখ্যা ১৫৭। আটানব্বইটি গান ১৩১৭ সালে ২৯ শ্রাবণ মধ্যে লেখা। পঁয়তাল্লিশটি গান ১৩১৬ সালে, চারিটি গান ১৩১৩ সালে, বাকিগুলি ১৩১৪ ও ১৩১৫ সালে রচিত।

[৫] সংখ্যা ১০৬, ১০৯ ("হে মোর চিত্ত"; "হে মোর দুর্ভাগা দেশ")। সংখ্যাগুলি অষ্টম সংস্করণ (১৩২৯) অনুসারে।

নৈবেদ্যে যে ভক্তিরসের পরিচয় পাইয়াছিলাম ঠিক সে বস্তুটি গীতাঞ্জলিতে নাই। কবি বুঝিতেছেন যে তাঁহার অন্তরতম সাধনা স্বস্তির নয় আত্মোপলব্ধির, আনন্দের। সংসারে তাঁহার প্রধান কাজই আনন্দের ফুল তুলিয়া তুলিয়া বাছিয়া মালা গাঁথা।

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।…
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি। (৪৫)[১]

আনন্দের ফুল তো নয় স্ফুলিঙ্গ, চকিতে দেখা দিয়া মিলায়, তবুও তাহা দুর্লভ নয়।

আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে,
নব-পল্লব-মর্মর-ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে। (৫৫)[২]

গীতাঞ্জলি যাঁহার জন্য তিনি "নিভৃত প্রাণের দেবতা"। তিনি জীবনদেবতা এবং তিনিই অন্তর্যামী, তিনি পূজ্য এবং তিনিই পূজারী।

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার,
আজ ল'ব তাঁর দেখা…
তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি'
হে পূজারী, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি। (৫১)[৩]

অখণ্ড প্রাণ-সত্তা ("জীবনদেবতা") খণ্ড জীবন-সত্তার ("অন্তর্যামী") দ্বারা ভঙ্গুর জীবজীবনে আনন্দ অনুভব করেন।

—হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি করিবারে চাহ পান? (১০২)[৪]

---

১ শিলাইদহ ৩০ আশ্বিন ১৩১৬।
২ ফাল্গুন ১৩১৬।
৩ ১৭ পৌষ ১৩১৬।
৪ ১৩ আষাঢ় ১৩১৭।

কবি উপলব্ধি করিতেছেন

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই ত আমি এসেছি এই ভবে। (১৩১)[১]

এই বোধ অন্তরে অনির্বচনীয় নবীনতা আনিয়া দিল। তাহার ফলে

পুরাতন ভাষা ম'রে এল যবে মুখে
নব গান হ'য়ে গুমরি উঠিল বুকে। (১২৫)[২]

গীতাঞ্জলিতে এই নব গানের রাগিণী প্রথম গুঞ্জরিত।

২

কয়েকটি গানে তত্ত্বদৃষ্টি প্রখর। ইহাতে জীবনসাধনার যে মর্মকথাটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমাদের দেশের পূর্বতন অধ্যাত্মচিন্তার অনুসরণ আছে। জীবনের সহজ অনুভূতির মধ্যেই যে পরম উপলব্ধির ঝলক ঝলে তাহা বৈষ্ণব-বাউল-সহজিয়া-সূফী-মরমিয়া সাধনার সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই তত্ত্বের মীমাংসা।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।

রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা কবিরও। রূপরসের পেয়ালাতেই সে সাধনার পুষ্টি।

অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
এমন সুমধুর।

গীতাঞ্জলিতে কবির আশংসা

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে,
সে-গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে। (১৬)[৩]

তাঁহার জীবধর্মের আকুতি

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,

---

[১] শ্রাবণ ১৩১৭। [২] কলিকাতা। ঠিকাগাড়িতে ৩১ আষাঢ় ১৩১৭। [৩] আষাঢ় ১৩১৬।

দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়। (৪)[1]

বহিঃপ্রকৃতির রূপও কবিচেতনাকে দুই টানে টানিয়াছে, নির্ভাবনে ও সংজীবনে। নির্ভাবনে দিবালোকে শরৎসৌন্দর্যে অন্তরতমের নয়ন-ভুলানো রূপ মোহ বিস্তারে অন্তরবাহির ভরাইয়া তুলিয়াছে।

কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে। (১৩)[2]

সংজীবনে গভীর নিশীথে নক্ষত্রাবলীর নির্নিমেষ নেত্রে, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারায়, মানবসংসারের দুঃখসুখে এবং নিজের আশানিরাশায়, অন্তরতমেরই বিরহের অবোধ বেদনা স্পন্দিত।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে। (২৬)[3]

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির কোন কোন গানে অনেক আগেকার ব্যবহৃত রূপকের নূতন এবং ভাবোচিত রূপান্তর লক্ষ্য হয়। 'সোনার তরী' কবিতাটির সঙ্গে গীতাঞ্জলির ৭০ সংখ্যক গান তুলনা করিলে একথা সহজে বোঝা যাইবে। সোনার-তরীর কাণ্ডারী ফসল বোঝাই লইয়াছিলেন, কিন্তু কবিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন না তখন সময় হয় নাই। এখন সময় হইয়াছে, কিন্তু কবি এখন নিজের বোঝা আনিয়া জড় করিতেই ব্যস্ত।

ঐ রে তরী দিল খুলে
তোর বোঝা কে নেবে তুলে!…
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হ'ল গেলি ভুলে।…

৩

'গীতিমাল্য' (১৯১৪)[4] গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় খণ্ড নয়। গীতাঞ্জলির গানে কবি-চিত্ত অন্তরতমের সামনে প্রার্থী, গীতিমাল্যে যেন আড়াল পড়িয়াছে। এখানে

[1] ১৩১৩। [2] ১৩১৪। [3] ১২ ভাদ্র ১৩১৬। [4] কবিতাসংখ্যা ১১১। দুইটি কবিতা ১৩১৬ সালে, একটি ১৩১৭ সালে, বাকিগুলি ১৩১৮-১৩২১ (৩ আষাঢ়) মধ্যে রচিত।

মাঝে মাঝে, বিশেষ করিয়া প্রথম অংশে, শিলাইদহে লেখা কবিতাগুলিতে, নির্ভাবনের প্রকাশই মুখ্য।

এই যে তোমার আড়ালখানি দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে হাজার ছবি আঁকা ;...
এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে ব'সলে সেজে
সোজা কিছু রাখলে না, সব মধুর বাঁকে বাঁকা। (১৫)[১]

এই দ্বৈধব্যক্তিব্যঞ্জনায় নির্ভাবন জীবনরসের—মিলনের, আর সংজীবন মরণ-বেদনার—বিরহের। গীতিমাল্যের কয়েকটি কবিতায় নির্ভাবন-সংজীবনের দ্বন্দ্ব প্রকটিত। অস্তি-নাস্তির মতো এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব চিরকালের অধ্যাত্ম-সমস্যা। যে-অনুভূতি সহজ আনন্দের মধ্য দিয়া দৈবাৎ ক্ষণোদ্ভাসে প্রতিভাত, তাহাকে ধরিবার সাধনা কঠিন, সিদ্ধি সহজ।

সবার চেয়ে কাছে আসা সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা যার, বড় সহজ সুর। (১৭)[২]

অন্তরের গভীরতা হইতে উৎসারিত "নাস্তি"র বেদনায় যখন বিশ্বপ্রপঞ্চের "অস্তি"র বন্দনা-সুর লাগে তখনি সৃষ্টিরহস্যের কূল মিলে।

"এই যে তুমি"—এই কথাটি বলব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"-র স্রোত ব'হে যায়
"কই তুমি কই"—এই কাঁদনের নয়নজলে গ'লে। (১৪)

রবীন্দ্রনাথের দ্বৈধব্যক্তিত্বে যে অংশ কবির, সে যেন তপস্যানিরত অতি-আত্মা, আর যে অংশ মানুষের, সে যেন অনু আত্মা। বছর খানেক পরে লেখা একটি গানে এই দ্বৈধতার স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা ?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
চিনি নাই তো আমি তা'রে,
আঘাত করি বারে বারে,
তা'র বাণীকে হাহাকারে ডুবায় আমার কাঁদনা। (১০৫)[৩]

---

[১] শিলাইদহ ২৫ চৈত্র ১৩১৮। [২] শিলাইদহ ২৪ চৈত্র ১৩১৮। [৩] রামগড়। জ্যৈষ্ঠ ১৩২১।

গীতিমাল্যের কবিতায়-গানে ভক্তিরস তলায় ফেলিয়া জীবনরস উপচিত। তাই অনুভাবে মাঝে মাঝে রূপের জগতের সঙ্গে ভাবী বিরহের পূর্ব-ছায়া পড়িয়াছে।

একদা কোন বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজবে বেণু
নদীর কূলে চ'রবে ধেনু
আঙিনাতে খেলবে শিশু পাখীরা গান গাবে। (৪০)[১]

এই সুর পরে ধীরে ধীরে চড়িয়াছে॥

৪

গীতিমাল্যের ২৫ সংখ্যক গানে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা ও জীবনপ্রেতি এক হইয়া গিয়া বিশিষ্ট ভাবসত্যরূপে প্রকাশিত। তাঁহার নিজস্ব কবিতাগানটি অত্যন্ত পার্সোনাল এবং অত্যন্ত গভীর। বিলাতে যাইবার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে রচিত।[২]

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহিরে মোর নাহিরে।...
তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।...

৫

'গীতালি'র (১৯১৪)[৩] রচনাগুলি—শেষের দুইটি ছাড়া[৪]—সবই গান এবং সাধারণ গানের মতোই ছোট এবং হালকা রচনা। বিশুদ্ধ কবিতা এবং সুর-মণ্ডিত গান—দুই হিসাবেই গীতালির রচনাগুলি বিশেষত্বপূর্ণ। দুই চারিটি ছাড়া (যেমন ৭, ২৪, ২৭, ৫২, ৫৪), বাক্‌ভঙ্গিতে ও সুরে বাউল-গানের সঙ্গে গীতালির গানের বাহ্যসম্পর্ক স্পষ্ট নয়। বাউল-গানের ধাতুকে গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রগীতি গীতালিতে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত।

[১] City of Lahore জাহাজে লেখা। রোহিত সাগর ১৮ সেপ্‌টেম্বর ১৯১৩।

[২] শান্তিনিকেতন ৯ বৈশাখ ১৩১৯।

[৩] 'আশীর্ব্বাদ' (শান্তিনিকেতন ১৬ আশ্বিন ১৩২১ রাত্রি) ছাড়া গান-কবিতা সংখ্যা ১০৮। রচনাকাল শ্রাবণ হইতে ৩ কার্তিক ১৩২১। [৪] সংখ্যা ১০৭. ১০৮।

প্রাচীন সাধককবিদের ভাবধারা যে সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথেরও চেতনায় সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার একটি নিঃসংশয় প্রমাণ দিতেছি। হাজার বারো শ বছর আগে এক সাধককবি নিজেদের নিভৃত পূজা-আরাধনার জন্য একটি গান লিখিয়াছিলেন। গানটির ভাবার্থ নিদ্রিত প্রিয়তম উপাস্যকে জাগাইয়া তোলা অর্থাৎ বোধন। সাধককবি নিজেকে প্রিয়া বা প্রণয়প্রার্থিনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। প্রথম দুই ছত্র এই

উট্‌ঠ ভড়ারো করুণমণু
পুক্‌খসি মহু পরিণাউ
মহাসুহজোএ কামমহু
ছাড়হি সুন্নসহাউ

এই অপভ্রষ্ট গানটি ১৯১৬ সালের আগে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং কোন রকমেই তাহা রবীন্দ্রনাথের জানিবার কথা নয়। তবুও গীতালির একটি গানে ইহার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শুনি।

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো। (৫০)[১]

এটিও ভাষায় ভাবে সুরে বোধন গান।

পরের দিনে লেখা একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বাউলদের "সহজ" কথাটি ব্যবহার করেছেন, তাঁহাদের উদ্দিষ্ট বাচ্যার্থে নয়, মৌলিক ব্যঙ্গার্থে। গানটিকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব "বাউল"-গানের একটি ভালো নমুনা বলিয়া নেওয়া যায়।

সহজ হবি, সহজ হবি,
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে,
তা'র থেকে তুই দূরে র'বি। (৫২)[২]

কোন কোন গান কবিতা হিসাবেও খুব ভালো। যেমন ৬৫-সংখ্যক রচনাটি। সর্বকালে সর্বাবস্থায় মানবজীবনের সংকট ও ভরসা একটি বৃহৎ ও বিরাট চিত্রপ্রতিমানের মধ্য দিয়া এই গানে অভিব্যক্ত। অকূল সমুদ্রে তরী ভাসিতেছে। অন্ধকার রাত্রি, প্রলয় ঝড, আকাশ মেঘতুঙ্গ। যাত্রীর অন্তরে ভরসা জাগে। সে বোঝে মেঘ কাটিয়া যাইবে, ঝড় থামিবে, রাত্রি প্রভাত হইবে, এবং সমুদ্রের কূল মিলিবেই।

---

[১] সুরুল ৮ আশ্বিন ১৩২১ প্রভাত। [২] সুরুল ৯ আশ্বিন ১৩২১ সন্ধ্যা।

মেঘ বলেছে, যাব যাব
　　রাত বলেছে যাই ;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
　　আমি তো আর নাই।

তাহার পর দুঃখদুর্যোগের অভিজ্ঞতা কঠিন পরীক্ষা-উত্তরণের মতোই সুখের স্মৃতি হইয়া মনে থাকিবে।

দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে,[১]
আমি বলে, মিলাই আমি
　　আর কিছু না চাই।

যে আনন্দ সহজ ও সর্বত্রব্যাপ্ত, তাহার স্পর্শলাভের জন্য কোন আয়োজন-উপকরণ আবশ্যক নয়।

ভুবন বলে, তোমার তরে
　　আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে
　　লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।

যাহার অন্তরে প্রেম সর্বদা জাগরূক মরণ তাহার কাছে মরণ নয়। সে যেন খেয়ারি হইয়া তাহাকে এক জীবনের ঘাট হইতে পর জীবনের ঘাটে পৌঁছাইয়া দেয়।

প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি' আছি জেগে ;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

একটি কবিতায় কবিসত্তের জীবন্মুক্ত দৃষ্টির আলোক পড়িয়াছে। জীবনকে খণ্ডিত ও ব্যক্তিভাবে দেখিলে বন্ধন আর অখণ্ড ও সমষ্টিভাবে দেখিলে মুক্তি।

জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা জড়ায় শ্রীচরণে।
আপন মাঝে আপন জীবন দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হয়ে আমায় তখন বাঁধে।

গীতালির শেষ কবিতা দুইটি[২] ভাবে ভাষায় ও ছন্দে গানগুলি হইতে সম্পূর্ণ

---

[১] এখানে পৌরাণিক কাহিনীর—নারায়ণের বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন = কৌস্তুভমণি বা শ্রীবৎসলাঞ্ছনের—সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বিস্ময়াবহ।

[২] এলাহাবাদে লেখা, যথাক্রমে ২ কার্তিক ১৩২১ সন্ধ্যায় ও ৩ কার্তিক প্রভাতে

পৃথক্। এ দুইটি 'বলাকা'র অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। বলাকার প্রথম কবিতাগুলি গীতিমাল্যের শেষ কয়টি গানের সমসাময়িক। (গীতালির রচনা শেষ হইবার আগেই বলাকার একটি বিশিষ্ট কবিতা লেখা হইয়াছিল।) জীবনশেষের চিন্তা বলাকার কবিতায় স্পষ্ট হইয়া বার বার দেখা দিয়াছে। এই চিন্তার প্রথম আবির্ভাব গীতালির উপান্ত্য কবিতাটিতে লক্ষ্য করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া,
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।...

শেষ কবিতাটিতে অতীতের দিকে মুখ ফিরানো কৃতজ্ঞ কবিহৃদয়ের বিদায়বাণী প্রথম শোনা গেল।

হে মোর অতিথি যত, তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
... ... যখন গিয়েছো চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

৬

বাউল-গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রায় কিশোর কাল হইতে। একটি আধুনিক বাউল-গানের সংকলনগ্রন্থ উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে 'বাউলের গান' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[১] (ইহার অনেককাল আগে, শৈশবে, এক গানের চরণ—"তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে"—তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কিন্তু সেটি যে বাউল-গানের কলি তা তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন।) বাউল-গানের সাদাসিধা ভাষা ও সরল গভীর ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যত্র নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তখনও তাঁহার কবিতায় পাক ধরিতে অনেক দেরি। রবীন্দ্রনাথ বাউল-গানের মধ্যে যে প্রেমগভীরতা অনুভব করিয়াছেন তাহা আধ্যাত্মিক অর্থেও প্রেম। বাউল-

১ প্রকাশ ভারতী বৈশাখ ১২৯০, 'সমালোচনা' গ্রন্থে (১৮৮৮) সংকলিত।

গান রবীন্দ্রনাথকে প্রীত করিয়াছিল কেননা তিনি তাহার মধ্যে নিজের মনের মিল পাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই অপরিচিত ও বর্জিত প্রবন্ধটির যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাহার প্রমাণ শেষ অংশ হইতে এই উদ্ধৃতিটুকু।

> আমরা কেন যে প্রাচীন ও ইংরাজীতে অশিক্ষিত লোকের রচিত সঙ্গীত বিশেষ করিয়া দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ। আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগ-বিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না, অসীম মানব-হৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত।

সাধনা পত্রিকা চালাইবার কাল হইতে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে উত্তর মধ্যবঙ্গে আন্দী বোষ্টমীর মতো অনেক বাউল-বৈষ্ণব-দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সামান্য লোকেরও গীতনিষ্ঠ ঈশ্বর আরাধনার পরিচয় পাইয়াছিলেন।[১] কিন্তু সে পরিচয়ের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলে নাই। কিন্তু বোলপুরের পথে শোনা বাউল-গানের এই পদ

> খাঁচার মধ্যে অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়।

রবীন্দ্রনাথের মনে মিস্টিক অনুভাবের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল এবং বাউল-গানের দিকে তাঁহার লেখনী ও কণ্ঠ পরিচালিত করিয়াছিল। তাহার প্রথম ফল পাওয়া গেল 'বাউল' (১৩১২) নামে পুস্তিকাখানি, যাহাতে বাউল-রীতিতে লেখা ও বাউলের সুর দেওয়া স্বদেশী গানগুলি সংকলিত। "আমার নাই বা হল পারে যাওয়া"—খেয়ায় সংকলিত এই তাৎপর্যমণ্ডিত গানটিও এই সময়ে লেখা। তাহার পর—গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি।

গীতাঞ্জলি রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ কবীর-প্রমুখ অ-বাঙ্গালী মরমিয়া কবিদের রচনার সহিত পরিচিত হইলেন। ভারতীয় ধারাবাহিক অধ্যাত্মগীতি-কবিতার

---

১ গীতিমাল্যে ১০ সংখ্যক কবিতাটি ("এই যে এরা আঙিনাতে এসেছে জুটি") দ্রষ্টব্য। পরবর্তী কালের একটি গানে ("পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে") বলরাম হাড়ীর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে সকৌশলে।

রচয়িতা সহজিয়া-বাউল-মরমিয়াদের মানসপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির যেটুকু সাধর্ম্য ছিল তাহা এখন প্রকাশের অবকাশ পাইল। নিম্নে উদ্ধৃত বাঘেলা গেয়ানদাসের উর্দূ কবিতাটির ভাবের ও প্রতিমানের আভাষ রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে-কবিতায় পাই।

ফজর মে জব আয়া য়ল্‌চী পুশাক সুন্‌হলী তেরী
গমক ভর জব শ্বাঁস লগায়া চীত জগায়া মেরী।
ধূপমে হম কো কিয়া উদাসা ক্যা পীড় দুর সমায়া
গায়া গেরুয়া সুর মগরবী মরণ সা রৈন আয়া।
কাগজ কালা হরফ উজালা ক্যা ভারী খৎ পায়া
ইত্তী রৌনক কোঁ রে য়ল্‌চী তূঁহী য়াদ ভুলায়া।
ভারী জলসা আজম দাবৎ তূঁহী ইক মেহমান
খল্‌ক্‌ খল্‌ক্‌ মে খৎ হৈ ফৈলী মখ্‌ক্কুর হম ফরমান॥

'দূত, তুমি যখন প্রত্যূষে আসিলে তখন তোমার সোনালি পোষাক। গমক করিয়া তুমি যখন শ্বাস ছাড়িলে তখন আমার চিত্ত জাগিল। রৌদ্রে আমাকে উদাস করিল, কী বেদনা দূর-দূরান্তে ব্যাপ্ত হইল। অপরাহ্ন গেরুয়া সুর গাহিল, মরণের মত রাত্রি আসিল। কাগজ কালো, হরফ উজ্জ্বল—কী বিরাট চিঠি পাওয়া গেল। দূত, এত জাঁকজমক কেন? তুমি আমার কাজ ভুলাইয়া দিতেছ।'

'ভারি জলসা, বিরাট আয়োজন। তুমিই একমাত্র অতিথি। বিশ্বসংসারে নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া হইয়াছে। আমি সেই পরোয়ানার দূত।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব-বাউল-দরবেশদের অন্তরের অহেতুক যোগ যে কতটা নিবিড় ছিল তাহা বোঝা যায় উভয়ের রচনায় আকস্মিক অথচ গভীর সাদৃশ্যে। এখানে একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় ও গানে জাল-ফেলার ফাঁদ-পাতার সিম্বল আছে। যেমন,

বিশ্বহৃদয় পারাবারে
রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে

এবং

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি
আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি।

একটি পুথিতে (১২৬০ সালে লেখা) এমন একটি বাউল-গান পাইয়াছি, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত রচনার বাহিরের মিল নাই অথচ ভাবের অন্তর্বাহী প্রবাহ উভয়ের একই।

তোরা পালাবি আর কোন পথে
রসিক জেলে জাল ফেলেছে জগতে।...

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মানসোৎক

(১৯১৩-১৯২৫)

"দলে দলে পলে পলে
কেবল চলে দূরের আশায়"

১

'বলাকা' (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্পে আবার দিক্-পরিবর্তন সূচনা করিল। ভাবে-ভাষায় সরলতা হইতে কঠিনতা, অনুভব (emotional impulse) হইতে অনুভাব (emotional experience), সংজীবন হইতে নির্ভাবন—এমনি নানা দিক্ সঞ্চরণ বারে বারে দেখিয়াছি। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে মানসী, মানসী হইতে চৈতালি, চৈতালি হইতে কল্পনা, কল্পনা হইতে ক্ষণিকা, ক্ষণিকা হইতে নৈবেদ্য। এখন দেখিতেছি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি হইতে বলাকা, এবং বলাকা হইতে 'পলাতকা'।[১] পূর্বে ক্ষণিকায় কবিচিত্তের যে দিগন্তটুকু উদ্ভাসিত দেখিয়াছিলাম তাহার সঙ্গে বলাকার সংযোগ নাই, কিন্তু বিরোধও নাই। ক্ষণিকার ভাব যেন প্রসন্ন সরোবর অগাধ হইয়াও গভীরত্ব গোপন করিয়া আছে, ভাষাও "চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষণীয়"। বলাকার ভাব বনানীবলয়িত শৈবালাচ্ছন্ন দীর্ঘিকার মতো, ভাষা "মৃদঙ্গধ্বনিমন্দ্রমন্থর"। শৈবালে ও তীরতরুচ্ছায়ে দীঘির গভীরত্ব যেমন গভীরতর করে বলাকার কবিতায় তেমনি ভাষার ঐশ্বর্য ও বর্ণনার প্রসন্নতা ভাব-গম্ভীরতাকে গম্ভীরতর করিয়াছে। বস্তুত তত্ত্বের দিক দিয়া ক্ষণিকার তুলনায় বলাকা ভারি নয়। ক্ষণিকার ভাষায়-ভাবে প্রসন্নতার খরতর প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে আর বলাকার ভাবে-ভাষায় তরঙ্গভঙ্গ আন্দোলিত। তবে বলাকার মর্মবাণী ক্ষণিকার ঠিক বিপরীত। ক্ষণিকায় কবি পথিক, তবে নিরুদ্দেশের। তাহার পথে চলাই উপায় এবং লক্ষ্য, পথই চরম, পথের শেষ নাই। বলাকায়ও কবি পথিক, তবে নিরুদ্দেশের নয়। পথের শেষে যে ধ্রুবলোক ধ্যানধারণার অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছে তাহারি জন্য কবিচেতনা উন্মুখ। ক্ষণিকায় বিশ্ব-প্রকৃতি সৌরমণ্ডলের মতো কবিচেতনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবর্তন করিতেছে,

[১] বাহিরের দিকে এই পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে ইণ্ডিয়ান প্রেস (এলাহাবাদ) প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশের (১৯১৫-১৬) দ্বারা। ইহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংগ্রহ।

আর বলাকায় কবিচেতনা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সৌরমণ্ডলের মতোই চলিয়াছে এক বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের অভিমুখে। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ছোটগল্প দুইটির ('রাজপথের কথা' ও 'ঘাটের কথা') মধ্যে যে দৃক্‌কোণের ভিন্নতা, ক্ষণিকা ও বলাকার মধ্যে সেইরকমই। একমতে পথ সচল—পথিক ধ্রুব, অপরটিতে যাত্রী সচল—ঘাট ধ্রুব। ক্ষণিকা প্রৌঢ়যৌবনের কাব্য, শ্রী মধুর। বলাকা গতযৌবন-জীবনসীমান্তের কাব্য, শ্রী গোধূলিধূসর।

ক্ষণিকায় কবি নিরাসঙ্গ বর্তমান মুহূর্তকে চরম মূল্য দিয়া উপভোগ করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন। বলাকাতেও বর্তমান মুহূর্তের চরমতা স্বীকৃত, কিন্তু এখানে একটু "মনকেমনের হাওয়া" (nostalgia) আছে। (এই ভাবের সূত্রপাত এই খানেই। পরবর্তী সব রচনাতেই অল্পবিস্তর এই ভাব।) কবির চিত্তে একটু বেদনা জাগিতেছে,—এ মুহূর্ত আর তো কখনও আসিবে না।

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
এইতো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।…
তোমার ঐ অনন্তমাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু॥[১]

বহুকাল পরে পদ্মাতীরে আসিয়া পুরাপরিচিত পরিবেশে যে নূতন অনুভব পাইলেন তাহার মর্মকথা ৩২ সংখ্যক কবিতায় ও তাহার এক বৎসর পরে লেখা ৪১ সংখ্যক কবিতায় ধ্বনিত।

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার;
যে আনন্দবেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।[২]

নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তি (১৯১৩) ও ইউরোপে কবির কাব্যপ্রতিভার প্রতিষ্ঠা, ইউরোপীয় জীবনের বিচিত্র কর্মপ্রেতি, এবং বিশ্বযুদ্ধের হিংস্র উন্মাদনা কবিচিত্তে নূতন প্রেরণা ও নূতন আহ্বান আনিয়াছিল। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ

[১] সংখ্যা ৪২ ('সন্ধ্যায়' নামে প্রকাশিত)। রচনা পদ্মাতীর (শিলাইদহ) ২৭ মাঘ ১৩২১।
[২] সংখ্যা ৪১। রচনা ঐ, ৮ ফাল্গুন ১৩২২।

ভারতবর্ষে ও বাহিরে নানা দেশে গতায়াত করিতে থাকেন। তাঁহার সমসাময়িক জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রপরিধি বাড়িল এবং আত্মজীবনের বাহিরে বিশ্বজীবনের দিকে ঝোঁক পড়িল। ভারতীয়মানবত্বের সত্য আদর্শে ধ্রুব থাকিয়া কবি এখন বিশ্বমানবত্বের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতবর্ষ তাহার সাম্যমৈত্রীর বাণীর দ্বারা বিশ্ব-সংসারের চিত্তজয় করিবে—এই বিশ্বাস তাঁহার কর্মপ্রেরণাকে নূতন পথে চালিত করিল। ইহার ফলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে বিস্তারিত হইল। বিশ্বমানবত্বের পোষকতা করার জন্য কবির ভাগ্যে বহু বিড়ম্বনা ঘটিল। বিড়ম্বনাকারীরা বোঝে নাই যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবত্বের ধ্যান-ধারণার মূলে তো ভারতবর্ষেরই চিরকালের সাধনা—সর্বভূতের কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কবি, ভারতবর্ষের ভাবুক—এইজন্যই তাঁহার প্রতিভা নিঃসঙ্কোচে মানব-সংসারের সর্বত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছে। এইজন্য মানবাত্মার নিপীড়ন, মনুষত্বের অবমাননা যেখানে হোক না কেন তাঁহার মর্মে লাগিয়াছে। বলাকায় রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমগ্র মানবাত্মার এমন কি চরাচরাত্মার হৃদয়স্পন্দন অনুভব করিরাছে।

অনেকে বলাকার আইডিয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বেয়র্গসঁর (Bergson) কাছে ঋণী বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা আছে এই মত তাহারি একটি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা পড়িয়া বুঝিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতির পরিচয় যাঁহারা কিছুমাত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানিবেন যে কাহারো অনুসরণ-অনুকরণ রবীন্দ্রনাথের কবিধাতুর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাঁহার রচনায় পরস্ব বলিয়া যাহা মনে হইতে পারে তাহা নিজস্বই। বেয়র্গসঁ আর রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়া কতকটা একই আইডিয়ায় পৌছিয়াছেন। বলাকার ভাবটি ইতিপূর্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখা দিয়াছে। এই অভিনব "সংসার"-বাদ ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার একটা অনিবার্য বিশেষ সিদ্ধান্ত।

রবীন্দ্র-সাহিত্যশিল্পের দিক্-পরিবর্তনের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সাময়িক পত্রিকার যোগাযোগ থাকিত। প্রথমে 'ভারতী' (১২৮৪-৯৮), তাহার পর 'সাধনা' (১২৯৮-১৩০২), আবার 'ভারতী' (১৩০৪-০৮), তাহার পর 'বঙ্গদর্শন' (১৩০৮-১৪), অতঃপর 'প্রবাসী' (১৩১৫-১৯), এখন হইল 'সবুজ-পত্র' (১৩২১)। গীতোৎসার পালার শেষের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে নিজের স্বদেশের ও মানবসংসারের পক্ষে একটা আসন্ন বিরোধের ও বিদ্রোহের পূর্বচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। এই বিদ্রোহের একটা বিশেষ প্রকাশ হইল সবুজ-পত্র উপলক্ষ্য করিয়া। কবির

শিল্পতরু যেন পুরাতন পত্র ফেলিয়া দিয়া নবীন পত্রসম্ভার মেলিয়া ধরিল। রবীন্দ্রনাথ সর্বকালই পদে পদে নিজের সৃষ্টির মায়া কাটাইয়া চলিতেন। সবুজ-পত্রসমীরিত রচনায় যে নবীনত্ব ফুটিয়া উঠিল তাহা আরো অভাবিত। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কথ্যভাষার বাচনপদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং পর্বসৌষম্য উপেক্ষা করিয়া পদ্যরীতিতে গদ্যবন্ধের প্রসার আনিয়া দিলেন। এইভাবে গদ্যে-পদ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতনতর পালা শুরু হইল॥

২

বলাকার বিশিষ্ট কবিতাগুলিকে এই পাঁচ পর্যায়ে ভাগ করা যায়,—নূতনের আহ্বান ও সংঘর্ষের স্বীকৃতি, স্মৃতিগৌরব, স্মৃতিপ্রবাহ, দৃষ্টিরস ও মনকেমন, এবং বিবিধ। কবিতাগুলির রচনাস্থান বিভিন্ন—শান্তিনিকেতন-সুরুল, রামগড়, কলিকাতা, এলাহাবাদ, শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতা, রেলপথ, শিলাইদহ-পদ্মাতীর, শ্রীনগর (কাশ্মীর)। রচনাকাল ১৫ বৈশাখ ১৩২১ হইতে ৯ বৈশাখ ১৩২৩। উৎসর্গ (উইলিয়ম পিয়র্‌সনকে)—৭ মে ১৯২৬ (জাপান যাত্রার পথে জাহাজে)।

কবির মেজাজে যেমন কালের ছায়া কালাতীত হইয়া পড়ে তেমনি স্থানেরও ছোঁয়া স্থানাতীত হইয়া লাগে। কবির রচনায় কালের ছায়া লক্ষ্য করা কঠিন নয় তবে স্থানের ছোঁয়া অনুভব করা কিছু শক্ত। কিন্তু বলাকার কয়েকটি কবিতায় স্থানের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। রামগড়ে লেখা কবিতা তিনটিতে (২-৪) কবিচিত্ত আসন্ন সংঘর্ষকে উল্লাসভরে স্বাগত করিতেছে। কিন্তু এই পর্যায়ের সবচেয়ে জোরালো কবিতায় (১১)—শান্তিনিকেতনে লেখা—কবির মনের গতিক উল্লাসের প্রীতিস্নিগ্ধ করুণ স্বীকৃতির। এলাহাবাদে লেখা স্মৃতিগৌরব পর্যায়ের তিনটি কবিতায় (৬, ৭, ৯) একটি বিশেষ প্রেমস্মৃতির মর্মরসৌধ উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার চূড়ায় উড়িয়াছে মর-জীবনের জয়পতাকা। ইহারি একটির (৬, 'ছবি') সঙ্গে শিলাইদহে লেখা এই পর্যায়ের কবিতাটি (৪০) মিলাইয়া পড়িলে দেখি, কোথায় সেই বিশেষ প্রেমের অভ্রভেদী স্মরণসৌধ।

আজি মনে হয়, বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা—
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।

সেইসব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে—
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতায় ঝলক-ঝিকিমিকে॥

একই ভাবের তিনটি কবিতা (৮, ১৬, ৩৬) যথাক্রমে এলাহাবাদে, সুরুলে ও শ্রীনগরে লেখা। প্রথমটিতে ভৈরবী বৈরাগিণী গঙ্গাবন্যাপ্রবাহের পাথেয় ক্ষয়-করা নিরুদ্দেশ গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া সৃষ্টির জড়জঞ্জালনাশিনী জীবনসঞ্চারিণী শক্তির বন্দনা। দ্বিতীয়টিতে বিশ্বচেতনাধারার সঙ্গে কবিচেতনাধারার সংযোগ এবং সেই চেতনাধারার পরিণতিভাবনা। তৃতীয়টিতে বিশ্বের জীবন ও চেতনা-প্রবাহের নিরুদ্দিষ্ট সাগরসঙ্গমের ইঙ্গিত। (বাঙ্গালাদেশের বাহিরে লেখা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আত্মভাবনা কেমন যেন তলাইয়া যায়, বাঙ্গালার মাটিতে পৌঁছিয়া আবার যেন জাগ্রত হইয়া উঠে।)

নূতনের আহ্বান ও আসন্ন সংঘর্ষের স্বীকৃতি পর্যায়ে পড়ে নয়টি কবিতা।[১] স্মৃতি-গৌরব পর্যায়ে ছয়টি।[২] সৃষ্টিপ্রবাহ পর্যায়ে চারটি।[৩] দৃষ্টিরস-মনকেমন পর্যায়ে পাঁচটি।[৪] বাকি একটি কবিতা বিবিধ পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। তিনটিকে গান বলা যায় (১৫, ২০, ৩৫)।

কয়েকটি কবিতায় বিবিধ রূপকের ইঙ্গিতে জীবনদেবতার সর্বাধিকার সূচিত। জীবনদেবতাই যেন এখন অভিসরণশীল, কবিচিত্ত নয়।

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে।
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌চে তরী বেয়ে। ('গাড়ি', ৫)

যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে, স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে। ('রাজা', ২৭)

---

১ কবিতাগুলি প্রথমে এই নামে বাহির হইয়াছিল—'সবুজের অভিযান' (১), 'সর্বনেশে' (২), 'আহ্বান' (৩), 'শঙ্খ' (৪), 'বিচার' (১২), 'যাত্রা' (১৮), 'মুক্তি' (২২), 'যৌবন' (৪৪), 'নববর্ষের আশীর্বাদ' (৪৫)।

২ 'ছবি' (৬), 'তাজমহল' (পরে 'শা-জাহান', ৭), 'তাজমহল' (৯), 'যৌবনের পত্র' (৩৩), 'প্রেমের পরশ' (৩৭), 'চেয়ে দেখা' (৪০)।

৩ 'চঞ্চলা' (৮), 'রূপ' (১৬), 'বলাকা' (১৬), 'ঝড়ের-খেয়া' (১৭)।

৪ 'জীবনমরণ' (১৯), 'স্বর্গ' (২৪), 'এবার' (২৫), 'আবার' (২৬), 'যে কথা-বলিতে-চাই' (৪১)।

কবিসত্তায় জীবনদেবতারই আত্মরসাস্বাদ, স্বানুভব।

আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল। ('তুমি আমি', ২৯)

এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়। ('পূর্ণের অভাব', ৩১)

এ কথা আগেই শোনা গিয়াছে গীতাঞ্জলিতে, তবে এতটা চাপাভাবে নয়।

(এইখানে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় স্বরূপদামোদর কথিত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-সমর্থিত চৈতন্য-অবতার রহস্য।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

'শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন, ইঁহার আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মাধুর্যই বা কেমন, আমার উপভোগ হইতে ইনি কি সুখই বা লাভ করেন,—এই লোভে সেই (রাধার) ভাবধনে ধনী হইয়া হরি যেন চন্দ্ররূপে শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে জন্ম লইলেন।')

৩

কাব্যনাম ধরিয়া বিচার করিলে বলাকার কেন্দ্রীয় কবিতা 'বলাকা' (৩৬)। "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি" ঝিলমের বক্ষে সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনাইয়া আসিতেছে তখন গিরিতটতলে অস্পষ্ট অন্ধকারে দেওদার তরুশ্রেণীর মূক আকুলতা কবি-হৃদয়ের গূঢ় অনুভবে সাড়া জাগাইয়াছিল।

মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে মরিছে গুমরি।

এমন সময় অকস্মাৎ গগনে বলাকাপক্ষস্পন্দনে যেন জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির বন্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। বিধুর সন্ধ্যার বিজন স্তব্ধতার মধ্যে হংসদূতের বাণী আগেও কবিচিত্তে আঘাত হানিয়াছিল কিন্তু তখন সাড়া জাগে নাই।[১] এখন চিত্তে জীবনশেষের বৈরাগ্য রঙ ধরিতে লাগিয়াছে, উপরন্তু আহ্বানও তীব্র।

---

[১] "রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।" (খেয়া 'দীঘি')।
"দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে।" (গীতিমাল্য ৪)।

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূর দূরান্তরে।···
ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

মূঢ় বিশ্বপ্রকৃতির যে ব্যাকুলতা নৈঃশব্দ্যের অতলে স্তব্ধতার আবরণে ঢাকা ছিল তাহা মুহূর্তের তরে বাজিয়া উঠিল।

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন খানে।"

সৃষ্টির জঙ্গমতার তাৎপর্য চরম পরিণতির অভিমুখে নিরুদ্দিষ্ট অভিসার,—হংস-দূতের এই অকথিত বাণী কবির হৃদয়ে ধ্বনিত হইল। আপন অন্তর দিয়া তিনি সৃষ্টির গূঢ় প্রকাশবেদনা অনুভব করিলেন।

তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

কবির নিজের তরফে বলাকার বিশিষ্ট ভাবানুভূতি দেখা দিল 'ছবি'তে (৬)।[১] কবির জীবনাবর্তের কেন্দ্রস্থলে যে ধ্রুববস্তুটি বিরাজমান সে তাঁহারি কিশোরপ্রেম, প্রাণের অন্তরতম সুর, কবিত্বের উৎস, সব ভাবনার বীজ।

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

বিশ্বজগতের স্থিতিকেন্দ্রিক গতিপ্রবাহ কবিভাবনায় যেভাবে প্রতিহত ও আবর্তিত হইত তাহার প্রথম পরিচয় এই কবিতায়। মরণের কিঙ্কিণী বাজাইয়া যে দুরন্ত প্রাণনির্ঝরিণী সহস্রধারায় ছুটিতেছে তাহার তলে তলে একটি অচঞ্চল আনন্দস্রোত প্রবহমাণ। পথের প্রেমে মাতিয়া কবি জীবনপ্রবাহ বাহিয়া চলিয়াছেন, আর তাঁহার কিশোরপ্রেমের আলম্বন জীবনপথ হইতে কোন্ দিন নামিয়া গিয়া মৃত্যুর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—আছে শুধু "স্থির রেখার বন্ধনে" আবদ্ধ একটি ছবি। কিন্তু এ কথা বাহিরে যতই সত্য হোক অন্তরে তা

১ রচনা ৩ কার্তিক ১৩২১।

মিথ্যা। সে-প্রেম চিত্তে যে দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহারি আলোকে কবি চিরজীবনের অভিসারপথে পথ বাহিতেছেন, পুরানো প্রেম নবনব রূপে-রসে অনুভব করিতে করিতে।

মহাভিনিষ্ক্রমণপথে মানবাত্মাকে সব টানই ছিঁড়িয়া যাইতে হয়, এমন কি প্রেমেরও। কিন্তু প্রেমের মধ্যে অমরতা আছে। প্রেম জীবনের পথে জঞ্জাল নয়, সে দীপ। কিশোর প্রেম কবির অন্তরে যে আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিল তাহা তিনি কাব্যে-গানে অনির্বাণ রাখিতে প্রয়াস করিয়াছেন। এখন তাজমহল দেখিয়া তাঁহার মনে হইল সম্রাট্ শাজাহানও নিজের প্রেমস্মৃতিকে কালজয়ী স্থাপত্য-রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন এই প্রাসাদে।[1] কিন্তু কবির প্রেম, তাঁহার অন্তরের ধন, জীবনের মূলে বাসা লইয়াছে। তাহাকে বাহিরে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া যায় না, অথচ তাহা ভুলিবার নহে।

অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল।
ভুলিনে কি তারা।
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।[2]

কিন্তু শাজাহান কবি নন। তিনি সম্রাট্, তাঁহার নাই

বিলাপের অবকাশ
বারোমাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।[3]

কবির কাছে "ছবি"র যে মূল্য শাজাহানের কাছে তাজমহলের মূল্য তাহার চেয়ে বেশি। ইহা শুধুই প্রেমের স্মারক নয়, প্রেমের পুষ্পাঞ্জলিও। শিল্পের মহিমামণ্ডিত এই প্রেমপুষ্পাঞ্জলি আজ দেশকালের অতীত হইয়া নিখিল নরনারীর প্রেমের স্মারক হইয়াছে।

আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।[4]

শাজাহানের ঐশ্বর্যবিলাসের মধ্যে কোন একদিন তাঁহার চিত্তে ক্ষণকালের জন্য প্রেমের দীপটি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

---

[1] 'শা-জাহান' (৭, 'তাজমহল'; সবুজপত্র অগ্রহায়ণ ১৩২১)।
[2] 'ছবি' (৬)। [3] 'তাজমহল' (৯)। [4] শা-জাহান' (৭)।

কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।[১]

তাঁহার সেই প্রেম বাহিরে রূপলাভ করিয়াছিল তাজমহলে, অমর প্রেমের অটুট স্মৃতিতে। তাজমহল শাজাহানের শুধু স্থাপত্যকীর্তি নয়, তাঁহার প্রেমের স্মৃতিচিহ্নমাত্রও নয়। ইহা সেই নির্বন্ধন মানবাত্মার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে পরিত্যক্ত পান্থশালাও।

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্ব্বত।…
স্মৃতি-ভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

কবির সৃষ্টি কিন্তু শাজাহানের সৃষ্টির মতো অচল নয়।

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করেনি অচল।

কবির অন্তরের ধ্যানোপলব্ধিতে যাহা ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হইয়া উঠে সেই আনন্দরস মাটির বুকে ফুলের মতো সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবিতায় গানে।

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিতনূপুরে।[২]

সম্রাট্ শাজাহানের পিছুটান, তাঁহার প্রেমের বিরহানন্দ, "সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে" অচল রূপ প্রাপ্ত। কিন্তু কবির প্রেম তাঁহাকে পশ্চাতের দিকে টানে নাই, জীবনের পথে আগ বাড়াইয়া দিতেছে। তাই যুগে যুগে "অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে ঢাকা" ধরণীর আনন্দচ্ছবি "কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে" ফোটা মাধবী ফুলের মতো কবির প্রেমস্মৃতি

কোনো দূর যুগান্তরে বসন্ত-কাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।[৩]

---

১ 'আমার গান' (১৫)।
২ 'উপহার' (১০)।
৩ 'মাধবী' (১৪)।

'ক্ষণিকা'র পথ 'খেয়া'-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেখানে বসিয়া কবিচিত্ত-দময়ন্তী যেন বলাকাদূতের পক্ষস্পন্দনে প্রিয়ের উদ্দেশ পাইয়াছিল। কবির জীবননাবিক, তাঁহার অন্তরতম প্রিয়, বুঝি তাঁহার দিকে নৌকা বাহিয়া আগাইয়া আসিতেছেন।[১] কবিচিত্ত-বধূও গরঠিকানা প্রিয়ভবনের উদ্দেশে অভিসারে অগ্রসর।

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি
এবার তবে ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলে ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।[২]

কিন্তু আনন্দের সুর তো চিত্তে সব ক্ষণ বাজে না, ধ্যানও ভাঙ্গিয়া যায়। তাই দেহতরী বাহিতে বাহিতে ওপারের ভাবনা মনে দোলা লাগায়, কখনো সংশয়ের কখনো ভরসার।

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার কী যে খবর ধারিনে তার ধার গো
তার পরে সে কেমন আলো কেমন অন্ধকার গো।[৩]

৪

মানবজীবনের একটি মৌলিক সমস্যা বলাকায় স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। জীবনরসের রসিক কবি, ধরণীর রূপরসে তাঁহার জীবন পাকে পাকে জড়ানো। ("এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর আমার ভুবন"।) এখন যৌবনের সীমান্ত পার হইয়া কবিজীবন অস্তাচলের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে, তাই শব্দ-স্পর্শরূপরসের ধরাতল ছাড়িয়া যাইবার দিন আসন্নতর বুঝিয়া এই মনোবেদনা মাথা তুলিতেছে।

মোর বাণী
এক দিন এ বাতাসে ফুটিবে না
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,...
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।[৪]

---

[১] 'পাড়ি' (৫)। [২] 'যাত্রাগান' (২০)। [৩] 'অজানা' (৩০)।
[৪] 'জীবন মরণ' (১৯)।

এই বেদনা মৃত্যুভয়জনিত নয়। মৃত্যুর সঙ্গে তো বোঝাপড়া অনেকদিন অনেকবার হইয়া গিয়াছে। এ যেন পতিগৃহগমন আসন্ন হইলে নববধূর পিতৃ-গৃহের স্নেহনীড় পরিত্যাগের বিদায়ব্যথা। পতিগৃহের প্রতি যতই আগ্রহ ঔৎসুক্য থাকুক তাহা এখনো অজানা, তবে ভরসা এই যে সেখানে সান্ত্বনার অতিরিক্ত চরিতার্থতা প্রত্যাশিত। অর্থাৎ, যে ভাবেই হোক নূতন জন্ম হইবে এবং তাহাতে জীবনের চরিতার্থতার পথে অগ্রসরণ ঘটিবে। "উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে" জীবনদেবতার এমন আশ্বাস বহন করিয়া আমন্ত্রণ লিপি আসিয়াছে

ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।[১]

তবুও এপারের বন্ধন ছেদের কথা ভাবিলে ব্যথা লাগে।

যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সে-ও প্রেমের-কাঁদন-ভরা
চির নিরুদ্দেশ।[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসতাণ্ডবের ডিণ্ডিমে কবি যেন অমোঘ মৃত্যু-আহ্বানেরই প্রতিধ্বনি শুনিলেন। মৃত্যু জীবনের পরীক্ষাস্থল, বিচারভূমি এবং সংশোধন ক্ষেত্র। মৃত্যুবেদনার মধ্য দিয়াই খণ্ড জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিশোধ হয় ও বৃহৎ জীবনের আশ্বাস লাভ করা যায়, তা সে সমষ্টিরই হোক বা ব্যষ্টিরই হোক। বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায় কবি রুদ্রের আসন্ন মার্জনাদণ্ডপাত লক্ষ্য করিলেন।[৩] তাঁহার বিশ্বাস, এই যে আত্মত্যাগ এই যে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা, —এ তপস্যার মূল্যে স্বর্গও কেনা যায়। সুতরাং

বিশ্বের কাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?[৪]

---

১ 'যৌবনের পত্র' (১৩)।
২ 'পথের প্রেম' (৪৩)।
৩ 'বিচার' (১১)।
৪ 'ঝড়ের খেয়া' (৩৭)।

৫

বলাকার পঁয়তাল্লিশটি কবিতার মধ্যে বত্রিশটি নূতন ছন্দে লেখা। এ ছন্দের ঠাট পয়ারেরই, তবে চরণে পর্বসংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। এই ছন্দে অ-সমসংখ্যক পর্বের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভাবের বাক্-সঞ্চরণ নির্বাধ এবং যথেচ্ছ হইল—সঙ্গীতে গমকের মতো। ইহার ফলে কবিতার ক্ষেত্রপরিধি বাড়িল, এবং পদ্যবন্ধ আরও জোরালো ও ভারবহনসমর্থ হইল ॥

৬

'পলাতকা' (১৯১৮) বলাকারই উপসংহার। উদাহরণমালাময় ভাষ্য রূপেও ধরা যাইতে পারে। জ্যেষ্ঠ কন্যার মৃত্যু (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) কবিদৃষ্টিকে বিশেষভাবে যেন পলাতকা বলাকার দিকে নিবিষ্ট করিয়াছিল। ভাষায় যেন নদীর নিস্তরঙ্গ প্রবাহ। ছন্দে মৃদঙ্গনির্ঘোষ নয়, যেন একতারার গুঞ্জন। বলাকাদূতের দূরযাত্রার আহ্বানে মানবাত্মা "সবাই যেন পলাতকা মন টেকে না কাছের বাসায়"। এই অজানা সুদূরের অভিসার শুধু মরণের মধ্য দিয়াই নয়, মরণাধিক জীবন্মরণ—মুক্ত প্রাণের তিলে তিলে নিষ্পেষণ, মানবাত্মার নিষ্ঠুর নিপীড়ন—তাহার ভিতর দিয়াও পূর্ণ পরিণতির পথ প্রসারিত। চৈতালির 'অনন্ত পথ' পলাতকার প্রসঙ্গে পঠনীয়। পলাতকার কাহিনীগুলিকে আশ্রয় করিয়া পিঞ্জর-মুক্ত ক্লিষ্ট মানবাত্মার উদ্দেশে জীবনধাত্রীর বাহুবন্ধনব্যাকুলতা যেন বেদনাশ্রুতে গলিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। গভীরতর সংবেদনায় জীবনের এপার-ওপারের বোঝাপড়ার চেষ্টা।

> যে-কথাটা কান্না হয়ে বোবার মত ঘুরে বেড়ায় বুকে
> উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
> বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
> যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।[১]

পলাতকার গল্পাভাসগুলি করুণ কোমল ভঙ্গুর মানবজীবনের ব্যর্থতাকে মনকেমনের নায়ে চড়াইয়া চরিতার্থতার ওপারে উত্তীর্ণ করিয়াছে। সোনার-তরীর পালায় লেখা একটি গানে ব্যর্থ মানবজীবনের যে সাবিত্রীমন্ত্র শুনিয়া-ছিলাম তাহারি যেন ভাষ্য পলাতকায় উদ্গীত।

---

১ 'কালো-মেয়ে'।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা॥

পলাতকায় ভাব অস্ফুট নয়, ভাষাও "ভাঙা" নয়। তবে হৃদয়ে হৃদয়ে পরিচয় নাই, আধখানি কথা কহিবার অবকাশ কই॥

৭

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে (১৩২৯) কবি যেন কাজের ভিড়ের জগতের কারা-বেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইয়া দ্বিতীয় শৈশবের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ছুটি পাইয়াছেন। ("আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।...প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকলোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"[১]) 'শিশু' রচনাকালে কবিকল্পনার যে রকম বাস্তবভূমিকা ছিল, 'শিশু ভোলানাথ' রচনাকালে ঠিক সে রকম কিছু ছিল না। তাই শিশু-ভোলানাথে শিশুমানবিকতা কতকটা তির্যক্‌ভাবের। কাব্যনামে "ভোলানাথ" কথাটির এইখানেই সার্থকতা। সব কবিতায় শিশুর দেখা হয়ত মেলে না কিন্তু সর্বত্র শিশুত্বের স্বরূপ টের পাওয়া যায়।[২] এমন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই বেশি স্মরণ করিয়াছেন।

[১] 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। [২] যেমন 'শিশু ভোলানাথ', 'শিশুর জীবন', 'দূর', 'দুই আমি' ইত্যাদি।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন,
বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।[১]

'বাউল' কবিতায় বাউল-দরবেশদের গৃহবন্ধনহীন জীবন উন্মুক্ত সুদূরের প্রতি হৃদয়কে টানিয়াছে।

অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ
যখন তোমায় দেখি পথে।

কয়েকটি কবিতায় শিশুহৃদয়ের কল্পনা প্রগাঢ় মানবিকতার অবতারণা করিয়াছে। এই ধরণের কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'মর্ত্যবাসী'। জীবনরসের পরম রসিক কবিমনের গোপন কথাটি চিরকালের শিশুমনের বাসনায় প্রকাশিত।

তোমরা বলো, স্বর্গ ভালো সেথায় আলো রঙে রঙে আকাশ রাঙায়
সারা বেলা ফুলের খেলা পারুলডাঙ্গায়!
হোক্‌না ভালো যত ইচ্ছে কেড়ে নিচ্ছে কেই বা তাকে বলো, কাকী?
যেমন আছি তোমার কাছেই তেমনি থাকি।

৮

অনেকদিন পরে আবার শিল্পের দিকে একটু ঝোঁক দেখা গেল—'পূরবী' কাব্যে (১৯২৫, দ্বি-স ১৯৩১)। কাব্যটির দুই অংশ 'পূরবী' ও 'পথিক'।[২] 'পথিক' অংশেই 'পূরবী'র সুর বাজিয়াছে।

সবশুদ্ধ কবিতাসংখ্যা (দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে) সাতাত্তর। পূরবী অংশে যে কয়টি কবিতা আছে তাহার অধিকাংশ ১৩৩০ সালে লেখা। বাকিগুলি ১৩২৪, ১৩২৮ ও ১৩২৯ সালের রচনা। এই অংশে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'[৩] নামে যে কবিতাটি আছে তাহা—স্মরণের কবিতাগুলি বাদে—রবীন্দ্রনাথের লেখা সবচেয়ে উজ্জ্বল "শোচক" কবিতা। 'তপোভঙ্গ' কবিতায়[৪] কালিদাসের কুমারসম্ভবের মর্মবাণী চিত্রাঙ্কিত। কল্পনার 'বৈশাখ' কবিতার পরিপূরক এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের বাণী-শিল্পের এক বর্ণাঢ্য সমুজ্জ্বল প্রকাশ। সন্ন্যাসী শিব

[১] 'শিশুর জীবন'।

[২] প্রথম সংস্করণে আরও একটি অংশ ছিল 'সঞ্চিতা'। এগুলি বহুপূর্বে রচিত কিন্তু কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

[৩] রচনা আষাঢ় ১৩২৯। [৪] রচনা ১৩৩০, প্রকাশ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩০।

পঞ্চশরকে ভস্ম করিয়াছিলেন, শেষে বাঁচাইয়াও ছিলেন। আসলে পঞ্চশরের সঙ্গে কবিরও প্রয়াস ছিল বলিয়াই পরিণামে সুন্দরের জয় হইয়াছিল। এ ব্যাপার সংসারে বারবার ঘটিতেছে।

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

'ভাঙা মন্দির' কবিতাটির[১] সঙ্গে কল্পনার 'ভগ্ন মন্দির' কবিতা মিলাইয়া পড়িলে কবিদৃষ্টির কালব্যবচ্ছিন্ন দুই কোণের পরিচয় পাই। পূরবীর কবিতায় ভাঙা মন্দির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। জীর্ণ দীর্ণ দেবতাহীন দেবতালয়ের গায়ে ও আশে-পাশে যে সবুজ প্রাণের বন্যা ও বর্ণগন্ধের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত তাহাতেই তো বিশ্বদেবতার পূজা আরতি চলিতেছে। কল্পনার কবিতায় কবিদৃষ্টি ভগ্নমন্দিরে উপেক্ষিত দেবতার প্রতি নিবদ্ধ। আশেপাশে বনফুল ফুটিয়াছে ও তাহার গন্ধ ছুটিয়াছে, কিন্তু সে আয়োজন, কবির অনুভবে, দেবতাকে স্পর্শ করিতেছে না।

'পথিক' পূরবীর মুখ্য অংশ। এই অংশের কবিতাগুলি লেখা হইয়াছিল জলে—সিংহল হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় গমন ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন পথে জাহাজে, এবং স্থলে—দক্ষিণ আমেরিকায়। শেষ কবিতাটির রচনাস্থান মিলান (ইটালি)। ইতিপূর্বে সমুদ্রবক্ষে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের এমন কবিতাস্ফূর্তি কখনো দেখা যায় নাই।

> এবার প্রগাঢ় সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন এল্‌ম্‌হর্‌ষ্ট, বাংলা ভাষায় তাঁর কান ছিল না। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হল অসুস্থ, তাতে করেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে সরিয়ে দিলে। বহু বৎসর পরে তাই ছুটি পাওয়া গেল, অল্প বয়সের হাল্কা জীবনের ছুটি। অমনি কলম আপনি ছুটল কবিতার লেখা রাস্তায়। ক্যাবিনে বসেও কবিতা লেখা চলে এই বারে তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের খাঁচা সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি মনের মধ্যে পর্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে তার হাওয়া ছুটে আসে। সেদিন শুধু কাব্য লিখিনি গদ্যও লিখেছি, সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।[২]

কলম্বো হইতে হারুনা-মারু জাহাজে চড়িয়াই (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) সাগরের বুকে মেঘমেদুর পূর্বদিগন্তে ম্লান সূর্যালোকে অকস্মাৎ কবির অন্তরে সৃষ্টিপ্রেরণা

---

১ রচনা মাঘ ১৩৩০।

২ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠি (১২ সেপ্‌টেম্বর ১৯২৭)।

জাগিয়াছিল।[১] কবি যেন নূতন করিয়া সাবিত্রীদীক্ষা লাভ করিলেন, যে-দীক্ষা তিনি প্রথম পাইয়াছিলেন জন্মদিনের ব্রাহ্মমুহূর্তে। তবে পূরবীর মূল সুরটি ইহার আগেই বাজিয়াছিল 'শেষ অর্ঘ্য' কবিতায়। যে-কবিতায় বলাকার পূর্বাভাস সেই 'ছবি'র যেন অনুবৃত্তি। এখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কিশোর প্রেম-স্মৃতিই গুঞ্জরিত। যে সুন্দরী আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ালোকে "ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায় প্রাণের প্রাঙ্গণে" আনিয়া দিয়াছিল তাহারি সন্ধানে কবিচিত্ত বাহির হইয়া পড়িতে ব্যাকুল। বলাকার অব্যক্ত নিরুদ্দিষ্ট উৎকণ্ঠা যেন পূরবীর তানে আসন্ন বিচ্ছেদব্যাকুলতার অশ্রুধারায় বিগলিত। একদিকে জীবনের ক্লান্তি,

ক্লান্ত আমি তার লাগি', অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলা-ভরা মুক্তির অমৃত।[২]

অপরদিকে

নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি' পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।[৩]—

এ আকাশ এ ভুবন ছাড়িয়া যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া মনোবেদনা,—"ইমনে আজ বাঁশী বাজে মন যে কেমন করে"। তাই আজ সুদূর বিদেশে পৃথিবীর অপর পারে প্রবাসী কবিচিত্তে পরিচিত-অপরিচিত সামান্যতম বস্তুও পরম মহার্ঘ্যতার দীপ্তিতে রমণীয়। কোন্ এক বিস্মৃত দিনের সন্ধ্যাবেলায় ভুবনডাঙার মাঠে তুচ্ছ আকন্দ ফুলের করুণ ভীরু গন্ধ পল্লীর কণ্ঠে বিনা ভাষার বাণী বাতাসে বাজাইয়া দিয়া আনমনা কবিকে হয়ত ক্ষণিকের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, বহুকাল পরে

সেই কথা আজ প'ড়্‌লো মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগর-পারের দেশে,—
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে'
তারি মধ্যে বাজ্‌লো করুণ সুরে।

তখন "কাব্যের দুয়োরাণীর" উদ্দেশ্যে কবি তাঁহার অবেলার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণভার লঘু করিলেন।

---

১ 'সাবিত্রী'। ২ 'শেষ'। ৩ 'পঁচিশে বৈশাখ'।

অবজ্ঞায় নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি',
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদুমন্দ,
নম্র-হাসি উদাসী আকন্দ![১]

'লিপি' কবিতায় ধরণীর ভাবনায় কবিহৃদয়বিরহিণী যেন নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতেছে। যৌবনসাধনার দিনে জীবনরসে উপচীয়মান কবির চিত্ত বসুন্ধরাকে আদিজননীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার বিরাট্ প্রাণের মাঝে নিজের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিল। কবির চিত্ত এখন আর ধরণীর একদেশ নয় প্রায় সব দেশ ব্যাপিয়াছে। এবং ধরণীও এখন আর মাতৃরূপিণী নয়। এখন সে যেন পিতৃগৃহ-প্রবাসিনী বিরহিণী বধূ। প্রিয়প্রেমলিপির উত্তর সে কিছুতেই মনের মতো করিয়া লিখিতে পারিতেছে না। মাটির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রদোলায় দুলিতে দুলিতে কবি ধরণীর সহিত একাত্মতা অনুভব করিতেছেন।

তোমারি মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।

'মুক্তি' কবিতায় কবিচিত্তে মুক্তিরসোপলব্ধির কল্পনা। পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দসঙ্গীতের মধ্য দিয়াই অনুভূত হয় কবিচিত্তে। সুরের সুরলোকে কবি-চিত্ত পরিপূর্ণতার সুধা পান করে।

সেথা আমি খেলা-ক্ষ্যাপা বালকের মত লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা আমি চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

যেদিন কবির গান চিরন্তনশেষের সুরে একতানে মিলিয়া যাইবে বিশ্বনাটের তালে, সেদিন মুক্তির প্রয়াগতীর্থে তাঁহার সাধনা শেষ সিদ্ধিলাভ করিবে। সেদিন

নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীতপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

---

১ 'আকন্দ'।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশ-যাত্রীর
আলোক-বেণুর।...

যে-উপলব্ধি হইতে বেদের ঋষি-কবির বাণী উদ্গীত হইয়াছিল, "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" তেমনি উপলব্ধি হইতেই রবীন্দ্রনাথ অতিমৃত্যু জীবনের জয়গান করিয়াছেন।

ভেবেছি জেনেছি যাহা, ব'লেছি শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধ'রেনি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে;
যা পেয়েছি, যা ক'রেছি দান
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ?...
আমি যে-রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।[১]

১০

ষাটের ঘরে পা দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা যেন নব শিশুজন্ম লাভ করিল। যৌবনমধ্যাহ্ন পার হইবার পর হইতেই কবিসত্তার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে চলিতে শুরু করিয়াছিল। ইহার প্রথম পরিচয় শিশু-ভোলানাথে। দ্বিতীয় পরিচয় গানে-সুরে। এই সময়ের বিশিষ্ট গানগুলির সঙ্কলন 'প্রবাহিনী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২)।[২] তৃতীয় এবং অপূর্ব পরিচয় ছবি আঁকায়।

বুডাপেস্টে কবির স্বহস্তলিপিতে লিথো ছাপা হইয়া বাহির হইল 'লেখন' (১৯২৭)। এটি জাপানে চীনে ও অন্যত্র অটোগ্রাফ হিসাবে দেওয়া বাঙ্গালা ও ইংরেজি কবিতা-কণিকার সঙ্কলন। কবিতা-কণিকাগুলিতে রবিরশ্মি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। যেমন

ভারি কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন্ ডোবে আপন ভারে!
তার চেয়ে মোর এই ক'খানা হাল্কা কথার গান
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান॥

---

[১] 'কঙ্কাল'। [২] অল্প কিছু পুরানো গানও আছে।

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বলে ॥

আকাশের নীল বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার হাওয়া করে হায় হায় ॥

কবির তিরোধানের পরে আর একটি এমনি কবিতা-কণিকার সংকলন 'স্ফুলিঙ্গ' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু ॥[১]

---

১ শান্তিনিকেতনে রচিত (৭ পৌষ ১৩৩৬)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রঙে রেখায়

(১৯২৮-১৯৩২)

"কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি"

১

আয়ুঃষষ্টিপর নব শিশুজন্মলাভের পরে কবিসত্তার আত্মপ্রকাশের একটি সম্পূর্ণ নূতন দিক্ খুলিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে মন দিলেন। কি করিয়া যে অদীক্ষিত "আনাড়ি" হইয়াও চিত্রকর্মে তাঁহার মন গেল সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

> তোমাদের বলি, কেমন করে আমি আঁকা শুরু করলুম। কবিতা লিখতে কাটাকুটি করতুম সেই কাটাকাটিগুলো যেন রূপ নিতে চাইতো, তারা হতে চাইতো, জন্ম নিতে চাইতো, তাদের সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করতে পারতুম না। প'ড়ে থাকতো লেখা, সেই কাটাকাটি-গুলোকে রূপে ফলাতুম, পারতুম না তাদের প্রেতলোকে ফেলে রাখতে। এইভাবে আমার ছবি শুরু।[১]

কিন্তু ইহারও অনেক অনেক কাল আগে হইতেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রভাবনার আরম্ভ। বলা যায়, সাহিত্যভাবনারও আগে, নিতান্ত শিশুকালে চিত্রভাবনা মনের কোণে উঁকি দিয়াছিল। ছেলেবেলায় তিন সঙ্গী—রবীন্দ্রনাথ, অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ রাত্রিতে একঘরে এক শয্যায় শুইতেন। দাসী আসিয়া শিয়রে বসিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য রূপকথা বলিত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত;—দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেওয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকারের রেখাপাত হইয়াছে; সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম,—

বেশি বয়সে কাটাকুটির মধ্য দিয়া অথবা এমনিই তাঁহার কলমে এবং পরে কলমে ও তুলিতে, রেখাচিত্রে ও বর্ণচিত্রে আঁকা যে বিচিত্র ছবি আমরা পাইয়াছি তাহার বীজ ছেলেবেলার এই "চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো" কল্পনার মধ্যে উপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু কাটাকুটির পথে নয়, ছবি বলিয়াই ছবি আঁকিবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের মধ্যযৌবনে একবার দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন

[১] প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮ পৃ ৩৬৫।

মনে পড়ে, দুপুর বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে-যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।…আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো ঘর-বানানো শরৎ।[১]

রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের ও চিত্রশিল্পের সৃষ্টিপ্রণালী বিপরীতমুখী। বাণী-শিল্পে কবির প্রেরণা প্রথমে আইডিয়া হইয়া মনে আসিত, তাহার পর কলমের মুখে তাহা সম্পূর্ণ রূপ ধরিত। চিত্রশিল্পে তুলি-কলমের টান অনুসরণে আইডিয়া জাগিত। ("রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তারপর যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে।"[১]) এই রঙে-রেখায় রূপসৃষ্টির প্রযতি কবিহৃদয়ের অবচেতন উৎস হইতে উৎসারিত।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।[২]

তাই রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তাঁহার মনোগহনে কোন্‌-কালে তলাইয়া-যাওয়া শিশুচিন্তার ও স্বপ্নের প্রকাশ অসুলভ নয়। শৈশবে রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া প্রদীপশিখার ম্লান আলোকে ঘরের দেওয়ালের গায়ে দাগ ছোপ অবলম্বনে যে অদ্ভুত উদ্ভট বিচিত্র মূর্তি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন আর যে সব ছবির টুকরা এলোমেলো স্বপ্নের মধ্যে জোড়-বিজোড়ে বিচিত্র ক্ষণভঙ্গুর রূপ বুনিয়া চলিত তাহা সুদীর্ঘকাল পরে তাঁহার ছবিতে স্থায়িত্ব খুঁজিয়াছে। এইসব স্বপ্নছবির সবই যে কবির বাণীশিল্পে একেবারে উপেক্ষিত হইয়াছে তাহা নয়। স্বপ্নলব্ধ বস্তু অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গল্প দুই-ই লিখিয়াছেন। তবে একটি ছাড়া[৩] আর কোথাও স্বপ্নলোকের অবাস্তব কুহেলিকাময় পরিবেশ বর্ণিত হয় নাই। এমন স্বপ্নভাবনার টুকরা কবির ঘন যৌবনের দিনে মনের আকাশেও ভাসিয়া বেড়াইত। সাধনার পালায় লেখা অনেক চিঠিতে তাহার আভাস-ইঙ্গিত আছে। এই ভাবনাগুলি কিছু কিছু শেষ বয়সে রেখায় রঙে ফুটিয়াছে, এবং কবিচেতনার যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন ও সর্বদা গুপ্ত ছিল সেই অংশ আর যে জগৎ গভীররাতের, স্বপ্নের, অপ্রকাশের, সেই জগৎ একটু যেন তিরস্করিণীমুক্ত করিয়াছে। ছিন্নপত্রের এই টুকরাগুলির সঙ্গে

১ চিঠি (নভেম্বর ১৯২৮), 'পথে ও পথের প্রান্তে' দ্রষ্টব্য।
২ 'সে'র উৎসর্গ। ৩ 'সিন্ধু পারে'।

মিলাইয়া লইলে রবীন্দ্রনাথের অনেক তথাকথিত দুর্বোধ্য, অবোধ্য বা "ছেলেমানুষি" ছবির রহস্যঘন নিগূঢ় তাৎপর্যটুকু বোঝা যাইবে।

> ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল…সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপ্‌সা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল—তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার অপরূপ জগৎ…প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিপূর্ণ ছম্‌ছম্‌ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন…এ যেন তখনকার সেই-অতি সুদূরবর্ত্তী অর্দ্ধ-চেতনার মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর এবং…আমি সেই রাজপুত্র—একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—[১]

এই উক্তির সহিত মিলাইয়া দ্রষ্টব্য 'চিত্রলিপি ২' ১৫।

> মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্চে—…মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে,…আমি যেন সেই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মত আস্তে আস্তে চলছিলুম। অপর সকল ছিল আর এক পারে, জীবনের পারে—[২]

তুলনীয় 'চিত্রলিপি' সংখ্যা ১৬।

> একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে—যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি শাদা কাপড়পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্চ্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।[৩]

তুলনীয় 'চিত্রলিপি' সংখ্যা ৮।

> কোথাও কিছু গতি নেই শব্দ নেই বৈচিত্র্য নেই প্রাণ নেই—ভারি একটা মৃত উদাস শূন্যতা—চলবার মধ্যে কেবল একপ্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলচি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্চে।[৪]

তুলনীয় 'চিত্রলিপি' সংখ্যা ৪।

> কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা,—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেচে…[৫]

তুলনীয় 'বিচিত্রিতা' একাকিনী, 'চিত্রলিপি' সংখ্যা ১৫, 'চিত্রলিপি ২' সংখ্যা ১০।

কালি-কলমে আঁকা চিত্রগুলি বেশ বলিষ্ঠ। এগুলিতে শক্তির প্রকাশ আছে, পাশব ও দানব শক্তিরও। যেমন মোষের ছবিটি। জন্তুটি কতকটা পরিচিত "পুঁটুরাণী" কতকটা প্রাগৈতিহাসিক ম্যাস্টোডন। লম্বা মুখে অবোধ ক্ষুধার দ্যোতনা, চওড়া পাছায় উদাসীন নিষ্ঠুরতার, মোটা পায়ের গোছে অন্ধ শক্তির।

---

১ লিপিকাল ১৬ জুন ১৮৯১। ২ ঐ ৩ কার্তিক, বর্ষ অনুল্লিখিত। ৩ ঐ ১৯ মার্চ ১৮৯৪
৪ ঐ ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫। ৫ ঐ মে ১৮৯৩।

সবশুদ্ধ ছবিটিতে রবীন্দ্রশিল্পে, যাহাকে ইংরেজিতে বলে নিছক ঈভ্‌ল, তাহার একমাত্র উজ্জ্বল প্রকাশ। এই ছবিটির প্রাক্‌-ইতিহাস পাই শিলাইদহে লেখা একটি চিঠিতে মোষের প্রসঙ্গে, "বড়ত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে একরকম শ্রীহীনত্ব আছে —তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে।" আরও কোন কোন ছবিতে এমন শ্রীহীন বড়ত্ব লক্ষ্য করা যায়।

মানব-মূর্তিগুলিতে কাঠের পুতুলের খাড়া ও প্রবল ভঙ্গির প্রকাশ। মুখের স্থির গাম্ভীর্যে ও দেহের ঋজু দীর্ঘতায় মনে হয় যেন ছবিগুলি রঙিন কাচের ভিতর দিয়া দেখা অথবা আধ-ঘুমন্ত স্বপ্নে অনুভূত। (যৌবনের উপক্রমে চন্দননগরে মোরান সাহেবের কুঠিতে সার্সির কাঁচের রঙীন ছবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে যে কতটা নাড়া দিত জীবনস্মৃতিতে তার সাক্ষ্য আছে।) রবীন্দ্রনাথের রঙিন ছবিতে বাহিরের সূর্যালোকিত জগতের নিত্যপরিচিত রঙ কমই আছে। যে রঙ বেশি আছে তাহাতে যেন পরপারের, মৃত্যুগহ্বরের, ভূমিগর্ভের, দেহ-অভ্যন্তরের, মনোগহনের, দুঃস্বপ্নের, বিশেষ করিয়া প্রগাঢ় সন্ধ্যার কালো ছায়া মাড়া।

রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পে ছেলেমানুষি ফ্যান্‌টাসি ছাড়া অন্ত অদ্ভুত-উৎকটের প্রকাশ নাই। সে প্রকাশ এখন তাঁহার চিত্রশিল্পে ঘটিল। ছবিতে কবিতা-কল্পনার কোন রকম আদল ধরা পড়ে নাই অথবা সে কল্পনা কোন ইন্‌হিবিশনের দ্বারা রঞ্জিত নয়। তাই এখানে স্বপ্নজাগরণের মায়াময় এবং রূঢ় কঠিনতা প্রকাশিত। বাণী- ও ধ্বনি-শিল্পে রূপের যে পিঠটা অপ্রকাশিত ছিল সেই দিক এখন রঙে-রেখায় আঁকা পড়িল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সাধারণভাবে সমালোচনার বাহিরে, কেন না ইহা প্রধানত কবিচেতনার অনালোকিত পৃষ্ঠের মানচিত্র।

> জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
> সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক একটি রূপ,
> অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
> সে প্রতিরূপ নয়।[১]

এইখানেই রবীন্দ্র-শিল্পের ইতিহাসে তাঁহার চিত্রের বিশেষ মূল্য॥

২

বিবাহে প্রীতিউপহাররূপে বই দেওয়ার রেওয়াজ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গ্রন্থের কাটতি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কোন কোন পরামর্শদাতা তাঁহাকে উপযুক্ত

---

১ শেষ সপ্তক, পনেরো।

একটি কবিতার বই প্রস্তুত করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তাই 'মহুয়া' (১৯২৯) বাহির হইলে তাহার 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে, আর তাঁরই দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা প্রচ্ছদপট মহুয়া কাব্যের লোভনীয়তা বাড়াইয়াছিল। কাব্যটির নাম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন

কবিতার অনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছে করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে…মহুয়া বসন্তেরই অনুভব, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।

'মহুয়া' নামক কবিতায়[১] কবি বলিয়াছেন

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি।
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতিখ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।…

অনেকটা এই ভাব লইয়াই কয়েক বছর পূর্বে তিনি সুদূর বিদেশে থাকিয়া কবির মনোমন্দিরে আকন্দের আসন পাতিয়া দিয়াছিলেন।[২] অবজ্ঞাত উপেক্ষিত আকন্দ তাহার বৈভব গোপনে রাখিয়াছে। তাহার গুণ জানে দেবতা আর জানে মৌমাছি। তবে মহুয়ার দাক্ষিণ্য সকলের জন্যই অবারিত।

অনাবৃষ্টি ক্লিষ্ট দিনে
বিশীর্ণ বিপিনে
বন্যবুভুক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে।…
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্যমত্ততারি।…
কানে কানে কহি তোরে,
বধূরে যেদিন পাব ডাকিব 'মহুয়া' নাম ধরে।

মহুয়া রবীন্দ্রনাথের বোধ করি সব চেয়ে বড় কবিতার বই। কবিতার সংখ্যা চুরাশি, দুইটি ১৩৩৩ সালে, ছয়টি ১৩৩৬ সালে, তিনটি ১৩৩৪ সালে, বাকি সব ১৩৩৫ সালে লেখা। কতকগুলি কবিতা প্রেমভাবিত। এগুলি 'শেষের কবিতা' উপন্যাস রচনাকালে এবং সে উপন্যাসকাহিনীর ভাবপ্রেরণা বশে লেখা। প্রবাসী পত্রিকায় শেষের কবিতা যখন ধারাবাহিকভাবে বাহির হয়

[১] রচনা ১৮ ভাদ্র ১৩৩৫। [২] পূর্বে পৃ ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

তখন এগুলির অধিকাংশই তাহাতে ছিল। পরে দুই-চারিটি ছাড়া সে কবিতাগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। শেষের-কবিতায় অবর্জিত কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাসরঘর'[১] এবং 'বিদায়'[২]। বাসরঘর একরাত্রির মিলন-আসর। কিন্তু তাহা নরনারীর ক্ষণিক প্রেমের অমরতার প্রতীক।

হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ঙ্কর।…
হে বাসরঘর,
বিশ্বের প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

বাসরঘরের বাহিরে বিরাট বিচ্ছেদের আহ্বান 'বিদায়' কবিতায় ধ্বনিত। পুরাতন প্রেম বলিতে আসলে কিছু নাই। প্রেম পুরাতন হয় না। সে নিত্য-নবীন। মহাকালের যাত্রা নব নব প্রেমের উদ্দেশে অর্থাৎ প্রেমের নব নব অনুভবের জন্য কালের শোভাযাত্রা।

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।

মহুয়ায় ঋতু-উৎসব পর্যায়ের যে কয়টি কবিতা আছে তাহার মধ্যে 'লগ্ন'[৩] বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ঋতুসংহার বলিতে পারি।

বিরহের প্রত্যাশায় নয়, মিলনের মত্ততায়ও নয়, ত্যাগের অমৃতেই মিলনের পাত্রের পূর্ণতা। সে মিলনের যোগ্য ঋতু বর্ষা নয়, বসন্ত নয়—শরৎ।

রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,…
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

'নাম্নী' শীর্ষক গুচ্ছে (সতেরোটি কবিতায়) বিভিন্ন নারীপ্রকৃতির বিচিত্র

---

১ রচনা বাঙ্গালোরে, আষাঢ় ১৩৩৫। ২ ঐ, ২৫ জুন ১৯২৮।
৩ ৩ ভাদ্র ১৩৩৫।

মাধুর্যের ও নারীহৃদয়-লাবণ্যের বর্ণচ্ছত্র বিস্তারিত। এ কবিতাগুলিকে চিরকালের নায়িকারত্নমালা বলিতে পারি। যেমন

'শ্যামলী'

সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁথে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি—
নাম কি শ্যামলী।

'কাজলী'

কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে
স্তব্ধ ছায়া পাতি
হাসির খেলার সাথী…
নাম কি কাজলী।

'হেঁয়ালি'

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।…
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে…
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি—
নাম কি হেঁয়ালি।

'নববধূ'[১] অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক স্মরণ করায়।

উৎসবের বাঁশিখানি কেন যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,
তোমারে পরালো সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল।

[১] ১৯ আশ্বিন ১৩৩৫। কবিতাটি 'বিচিত্রিতা'য় প্রথম সংকলিত হইয়াছিল।

নববধূকে আশীর্বাদ উপলক্ষ্যে কবি বলিয়াছেন

প্রাণ দিয়ে যে ভরেছে বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ
যদি বল এই কথা 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো'।

মহুয়ার 'বিদায় সম্বল'[১] সোনার-তরীর 'যেতে নাহি দিব' কবিতার পরিপূরক।

যাবার দিনের পথিক সে বোঝে—
যে যায় সে যায় চ'লে ;
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে,
"ভুলিব না কভু" বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে।

৩

'বন-বাণী' (১৯৩১) কাব্যে চারটি বিভিন্ন অংশ,—'বন-বাণী', নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা',[২] 'বর্ষামঙ্গল' ও 'নবীন'। 'বন-বাণী' অংশটি যেন মহুয়ার পরিপোষক। মহুয়ায় প্রধানত নারীবন্দনা, যাহারা প্রকৃতির জঙ্গম প্রাণোচ্ছ্বাস বহন করে। বন-বাণীতে বৃক্ষলতার বন্দনা, যাহারা প্রকৃতির স্থাবর প্রাণোচ্ছ্বাস ধারণ করে। কবিতাগুলিতে পরিচিত কোন কোন বৃক্ষলতা কবিহৃদয়ের অর্ঘ্য পাইয়াছে। প্রত্যেক কবিতার আগে গদ্যে একটু উপক্রমণিকার মতো আছে। তাহাতে বিশেষ সেই উদ্ভিদের সঙ্গে কবির পরিচয়ের সূত্রটুকু উদ্‌ঘাটিত।

---

[১] সিঙাপুর, ৩ ভাদ্র ১৩৩৪।
[২] বিচিত্রা আষাঢ় ১৩৩৪। ১৩৩৪ সালে দোলপূর্ণিমার রাত্রে নৃত্য গীত ও আবৃত্তির যোগে অভিনীত হইয়াছিল।

'শাল' কবিতাটিও (৭ ফাল্গুন ১৩৩৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রায় ত্রিশ বছর হ'লো শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সেদিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে (!) পায়চারী ক'রেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রম-বাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে।…যেমন অতীতের কথা ভাবচি—তেমনি ঐ শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসচে।

বন-বাণীর মানুষের কাছে বৃহৎ তাৎপর্য, সে মানবসংসারের চিরকালের ধাত্রী, মাতা ও বন্ধু। এইটিই বন-বাণীর প্রথম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবিতা।[১]

তব প্রাণে প্রাণবান্,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান্,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হ'য়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশীর তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী॥

দুইটি কবিতার বিষয় লতাবিতান ও বৃক্ষবিহারী দুই পাখির বিষয়ে, একটি বৃক্ষতলবাসী ব্যক্তির বিষয়ে।

'বন-বাণী' কাব্যের দ্বিতীয় অংশ 'নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা' (শান্তিনিকেতনে ১৩৩৪ সালে দোলপূর্ণিমায় নৃত্য-গীত-আবৃত্তি যোগে অভিনীত) ঋতুচক্রের আবর্তন পালা-গান। গানগুলি বিশিষ্ট রচনা, সেগুলিকে সংযোজন করিয়াছে ছোটবড় কয়েকটি কবিতা।

অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালা-গানের এই মর্ম।

প্রথমেই কবিতা 'মুক্তি-তত্ত্ব', যাত্রার আসর ডাকা প্রস্তাবনার মতো।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রা-পথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

[১] রচনাকালের (৯ চৈত্র ১৩৩৩) হিসাবে কবিতাটি এই সংগ্রহের তারিখ-দেওয়া কবিতার মধ্যে সবচেয়ে আগে লেখা। ইহার পরে লেখা হইয়াছিল 'নীলমণিলতা' (ভরতপুর ১৭ চৈত্র ১৩৩৩)।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বল্‌লো আলো, বাজ্‌লো মৃদঙ,
নটরাজের নাট্যশালে ॥

তাহার পর 'উদ্বোধন' কবিতা। তাহার পর উদ্বোধন নৃত্য-গান, রবীন্দ্রনাথের বোধকরি দীর্ঘতম গান।[১]—"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।" অতঃপর বৈশাখের আবাহন গান, 'বৈশাখের প্রবেশ', 'সম্বোধন', কালবৈশাখীর আবাহন 'গান', কালবৈশাখীকে (মহাকালী রূপে নহে শিবগৃহিণী রূপে) লীলাসঙ্গিনী করিবার জন্য বৈশাখকে অনুরোধ 'কালবৈশাখী' কবিতায়। তাহার পর মাধুরীর ধ্যান—প্রথম দুই স্তবক গান শেষের চার স্তবক কবিতা।

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে
রাগিণী তার তাহারি কথা বলে।
ভূতলে খসি পড়িছে পাতাগুলি,
চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি,—
কৃষ্ণচূড়া রয়েছে খেলা ভুলি'
পথে তাহারে ছায়া দিবারি লাগি
তাহারি ধ্যান পরাণে আছে জাগি'।

তাহার পর 'ব্যঞ্জনা'—কালবৈশাখীর।

মুহূর্তে অম্বর-বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্‌বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন ॥

অতঃপর 'বর্ষার প্রবেশ,' পাঁচ ছত্রে বন্দনা এবং গানে অভ্যর্থনা 'প্রত্যাশা'—"তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে"। তাহার পর 'আষাঢ়'—আগমনের প্রস্তুতি, তাহার পর আষাঢ়ের 'লীলা'—গান। তাহার পর 'বর্ষা-মঙ্গল' কবিতা—আষাঢ়ের আরতি বন্দনা। অতঃপর 'শ্রাবণ-বিদায়'—গান এবং চোদ্দ ছত্র কবিতা।

১ কবিতা হইতে গানে রূপান্তরের উদাহরণ ইহার অপেক্ষা অনেক বড় আছে।

যায় রে শ্রাবণ-কবি রস-বর্ষা ক্ষান্ত করি তার,[১]...
আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্থন ॥

অতঃপর শেষ মিনতি—গান, "কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?" মাত্রাছন্দে তৎসম শব্দের তাল গানটিকে বিশেষ রমণীয় করিয়াছে।

কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্মর মুখরিল[২] মৃদু-পবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।

গানটির মাঝে তিন ছত্র ও চার ছত্র কবিতা আছে বিদায়ের পথে শ্রাবণের উক্তি।

মুক্ত আমি রুদ্ধদ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চ'লে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

গানের শেষে ষোল ছত্রে শ্রাবণের বিসর্জন। তাহার পর 'শরৎ'—আগমনী কবিতা।

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপ-কথা
নিত্যকালের বালক-বীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে, "চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো" সে।...

তাহার পর 'শান্তি'—গান এবং 'শরতের প্রবেশ'—বন্দনা (ছয় ছত্রে) ও কবিতা। অতঃপর 'শরতের ধ্যান'—গান, 'শরতের বিদায়'—কবিতা ও গান, এবং 'বিলাপ'—গান,

চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি'
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?

শরতের পালা চুকিয়া গেল, 'হেমন্তের প্রবেশ'—বন্দনা (তিন ছত্রে) ও কবিতা, 'গান', কবিতা

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।

---

[১] শেষ শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান স্মর্তব্য। তাঁহার আবির্ভাব বৈশাখে।

[২] পরে 'মুখরিত' হইয়াছে।

তাহার পর 'হেমন্ত'—দুইটি কবিতায় অভ্যর্থনা। তাহার 'দীপালি' গানে আরতি

হিমের রাতের ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা ক'র্‌লো গোপন আঁচল ঘিরে।...

অতঃপর তিনটি কবিতা 'শীতের উদ্বোধন', 'আসন্ন শীত', 'শীত'। তাহার পর 'নৃত্য'—গানে অভ্যর্থনা। তাহার পর 'শীতের প্রবেশ'—বন্দনা ও গান, 'স্তব' —গান এবং 'শীতের বিদায়' কবিতা। তাহার পর 'বসন্তের প্রবেশ'—বন্দনা ও কবিতা, বসন্তের 'আবাহন'—গান, 'বসন্ত'-প্রশস্তি কবিতা, 'রাগরঙ্গ' গান এবং 'বসন্তের বিদায়' (গান),

মুখখানি করো মলিন যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর রসের খেলা।...

তাহার পর প্রত্যাগমন 'প্রার্থনা'—গান, বসন্তের উত্তর 'অহৈতুক'—গান এবং ঋতুচক্রে ভ্রমণকারী রবি-কবি বসন্তের হইয়া নিজের কথা বলিয়াছেন।

সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া,
আজ এক হয়ে তা'রা,
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণা-রূপ ধরি'
এক গানে ফেলে ছায়া।

অতঃপর 'চঞ্চল' কবিতা, মূর্তিমান বসন্তের প্রজাপতির উদ্দেশে। তাহার পর 'উৎসব'—দোল-উৎসবে আহ্বান, গান 'শেষের রং' এবং কবিতা-গান 'দোল।'

তৃতীয় অংশের প্রথমে 'বর্ষা-মঙ্গল' গান। ভাষায় ছন্দে যেন মেঘডমরু বাজিয়াছে।

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর, হে গম্ভীর
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর
ঝঙ্কৃত তা'র ঝিল্লির মঞ্জীর।...

তাহার পর 'বৃক্ষ-রোপণ' বোধন। দুইটি গান এবং কবিতায় ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম বন্দনা। অতঃপর 'মাঙ্গলিক' কবিতা এবং 'বর্ষা-মঙ্গল'—চারটি গান।

'বন-বাণী'র চতুর্থ অংশ 'নবীন'[১] দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আছে চোদ্দটি গান ও দুই চারটি কবিতাছত্র, দ্বিতীয় পর্বে আছে আটটি গান ও চারটি কবিতা। গানের পর, গদ্যাংশে গানের তাৎপর্য। গানের মধ্য দিয়া নৃত্যাভিনয়ের যোগসূত্র গাঁথা আছে। রচনাটিতে নৃত্যগীতাত্মক অভিনয়ের সঙ্গে 'ভাণ' বা একোক্তিময় নাটকের সমন্বয় হইয়াছে॥

[১] অভিনয়ের প্রোগ্রামরূপে পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভালোবাসার নিছনি

(১৯৩২-১৯৩৭)

"কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে"

১

রঙে-রেখায় ছবি আঁকার ঝোঁক শেষ হইবার আগেই পদ্যে-গদ্যে ছবি আঁকার জোয়ার আসিল। এই ছবিতে কবিভাবনার সর্বময় প্রকাশ অবারিত। কবির ভাবনা এখন জীব (অর্থাৎ মানুষ), জগৎ (অর্থাৎ সমাজ) এবং আপনাকে (অর্থাৎ অতীত জীবন) লইয়া। এ ভাবনা অধ্যাত্মচিন্তা নয়, তত্ত্বকথা নয়, সমাজসমালোচনা নয়—কোনো রকমের জজমেন্টই নয়—এ হইল অখণ্ড ভালোলাগা।

—"আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা।"

ব্যথাও জাগে,

তারপরে !
এই ধূলি পড়ে রবে আমি শূন্য চিরকাল তরে।

এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য নয়টি বই,—'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'বিচিত্রিতা', 'শেষ-সপ্তক', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি'।

'পরিশেষ' (১৯৩২)[১] বইটিকে এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনস্মৃতি বলা যায়। প্রথম কবিতা 'প্রণাম' সুদীর্ঘ কবিজীবনসাধনার উদাত্ত ব্যাহৃতি। এই কবিতাটির মধ্যে এই কালের কবিচিন্তার একদিকের, আত্মানুধ্যানের, মর্মকথা নিহিত। জীবনের যাত্রারম্ভে কবি যে "নানাবর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি কুড়াইয়া" পাইয়াছিলেন, তাহাই সম্বল করিয়া

---

[১] প্রথম প্রকাশ ভাঁজকরা কাগজে ও জাপানি বাঁধাইয়ে। 'বনবাণী'ও প্রথম এইভাবে ছাপা ও বাঁধাই হইয়াছিল। পরিশেষের ছয়টি কবিতা—'খেলনার মুক্তি', 'পত্রলেখা', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি' ও 'ভীরু' দ্বিতীয় সংস্করণ পুনশ্চে যুক্ত হইয়াছে। এ কবিতাগুলির আলোচনা পুনশ্চের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

তিনি জনজীবনস্রোত হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। "দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বত" ও "দুস্তর সাগর" উত্তরণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, শুধু রাত্রিদিন "আনমনে পথ-চলা হোল অর্থহীন"।

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।...
যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক-বন্দনা-মন্ত্র জপে[১]

কবি আপন অন্তরে সেই বিরাটের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার নবযৌবনের ক্ষণিকা—"যে বন্দী গোপন গন্ধখানি কিশোর-কোরক মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি"—তাহারি বেদনা কবির কলস্বনিত বাঁশরীর গীতিতে উৎসারিত। শুধু আপনার অন্তরবেদনা নয় অনন্তের আনন্দবেদনাও কবির বীণার পীড়িত তারে, "আপন ছন্দের অন্তরালে," মুখরিত।

নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।

এখন জীবনসঙ্গীতে শমের কাছাকাছি আসিয়া কবি তাঁহার বিচিত্র কল-গানের অধিনেতা নিখিলমানবচিত্তমন্দিরের দেবতা অন্তরতমের পদপ্রান্তে সন্ধ্যা-বন্দনায় বাঁশিখানি বলিয়া নিজেকে মহানৈঃশব্দ্যে সমর্পণ করিয়া দিতেছেন।

একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম॥

পরিশেষে বাক্‌প্রৌঢ়িতে নূতনমাধুর্যের আবির্ভাব হইয়াছে, যেন বলাকার দৃঢ়তার সঙ্গে ক্ষণিকার ঋজুতার সমন্বয়। বাণীশিল্পে রসের ও রূপের এ এক অভিনব মিলন। যেমন

আমার স্মৃতি থাক্‌না গাঁথা আমার গীতিমাঝে,
সেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা মর্মরিয়া বাজে।

---

১ তুলনীয় লেখনে
ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা॥

সেখানে ঐ শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জলে,
ছায়া সেথা ঘুমে ঢলে কিরণ-কণা-মালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে ক'রে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়ে ভরে রূপের ডালি।[১]

পরিশেষে চৌদ্দটি কবিতা আছে মিলছুট বিষম পয়ার ছন্দে।[২] এগুলিকে কেহ কেহ "গদ্যকবিতা" বলেন কিন্তু আসলে গদ্যকবিতা নয়, কারণ এগুলির যতি মোটামুটি সমমাত্রিক, এবং ছন্দঃস্পন্দ অ-বিষম। বলাকা-পলাতকার ছন্দে মিল না থাকিলে যেমন হয় এই ছন্দ ঠিক তেমনই। যেমন

ধলেশ্বরী । নদীতীরে । পিসিদের । গ্রাম
তাঁর দেও । রের মেয়ে,
অভাগার । সাথে তার । বিবাহের । ছিল ঠিক । ঠাক

পরিশেষের কবিতাগুলি তুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কবিতা-সংখ্যা প্রথম সংস্করণে ৭৪ (দ্বিতীয় সংস্করণে ৬৮), দ্বিতীয় ভাগে ৮। দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলি ভারতবর্ষের বাহিরে ভ্রমণকালে লেখা এবং সেগুলির বিষয়ও তদুচিত।

পরিশেষের তুইটি কবিতা একটু অভিনব—'লেখা' ও 'আলেখ্য'। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ব্যবধানে লেখা। বিষয় নিজের রচনার সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে সংশয়। (কোন কোন নবীন লেখক তখন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে কালবারিত বলিতেছিলেন।) প্রথম কবিতাটি অনবদ্য।

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে।···
ধূলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা ॥

---

১ 'দিনাবসান'।

২ 'খেলনার মুক্তি', 'পত্রলেখা', 'অগোচর', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি', 'আগন্তুক', 'জয়ন্তী', 'প্রাণ', 'সাথী', 'বোবার বাণী', 'আঘাত', 'ভীরু', 'আতঙ্ক'। ছয়টি কবিতা পরে পুনশ্চ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয় কবিতাটি লেখার ও চিত্রের পক্ষে সমভাবে খাটে। এ কবিতাটির তাৎপর্য সুগভীর। তাঁহার সৃষ্টিকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,

অপেক্ষা করিয়াছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।···
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যালোকে
আনিয়াছি তোকে।···
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হোলো অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।

তাইও যদি হয়, ভয় নাই। প্রকাশের কোনো ভ্রম কখনো চিরদিন রহিবে না। এ সৃষ্টিও একদিন লুপ্ত হইবে। তখন

আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে॥

প্রৌঢ় যৌবনের দিন হইতেই রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রযতির মধ্যে এক পরোক্ষ সত্তা-ও-শক্তির অঙ্গুলি হেলন অনুভব করিতে থাকেন। চিত্রার 'অন্তর্যামী' ও 'চিত্রা' কবিতা দুইটিতে তাহার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিলাম। এখন পরিশেষের 'বিচিত্রা' কবিতাটিতে[১] তাহার এক শেষ প্রকাশ দেখিতেছি। চিত্রার কবিতা দুইটি যথাক্রমে ভাদ্র ১৩০১ এবং অগ্রহায়ণ ১৩০২ সালে লেখা, পরিশেষের কবিতাটির রচনাকাল বৈশাখ ১৩৩৪। এক শতাব্দের তৃতীয়াংশ কাল মধ্যে কবির মানসিকতায় যে স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার ইতিহাস 'বিচিত্রা'য় রহিয়াছে। প্রৌঢ় যৌবনে কবি যাঁহাকে অন্তরবাসিনী অন্তর্যামী রূপে অনুভব করিয়াছিলেন এবং যাহাকে বিশ্বসংসারের বহুবিচিত্ররূপিণী মোহিনী মহামায়া বলিয়া জানিয়াছিলেন এখন এই শেষ বয়সে তাঁহাকে নিজেরই ছলনাময়ী জাদুকরী প্রেয়সী বলিয়া বুঝিয়াছেন। এবং সে আর কেউ নয়, সে—এই যা কিছু সব, "যদিদং কিঞ্চ উপাসতে"। জাদুকরী ডাক দিয়াছিলেন অতি শিশুকালেই।

---

[১] নামটিতে ঈষৎ দ্ব্যর্থ আছে। 'বিচিত্রা' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা অধিকাংশই দখল করিয়াছিলেন। 'বিচিত্রা' কবিতাও এ পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল।

ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশি-বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।

তাহার পর অবোধ কালে,

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুর বেলা কাঁপন লাগে,
ইসারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তা'রা কে বলো তাহা জানে!

তাহার পর যৌবনে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া।

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।

মধ্যজীবনে,

গভীর গরবে হাঁকিয়া গেছ
"অলস থেকো না গো।"
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ "জাগো, জাগো।"

সমস্ত জীবন ভরিয়া

ফসল যত উঠেছে ফলি'
বক্ষ বিভেদিয়া
কণায়-কণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।

এই শেষ জীবনেও জাদুকরীর ছাড়ান নাই।

তবুও কেন এনেছ ডালি'
দিনের অবসানে।
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব করা দানে॥

গল্পিকাগুলি পরিশেষের বিশিষ্ট কবিতার অন্তর্গত। কতকগুলি গল্পিকায় বিশিষ্ট রস জমিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতার অবলম্বনে গড়া বলিয়া। যেমন 'স্পাই', 'পুরানো বই', 'উন্নতি', 'সাথী', 'আতঙ্ক'। 'বাঁশি' রবীন্দ্রনাথের পরিচিততম কবিতার একটি। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিশেষে এটি নাই, পুনশ্চে গিয়াছে॥

২

'পুনশ্চ' (আশ্বিন ১৩৩৯)[১], 'শেষ সপ্তক' (২৫ বৈশাখ ১৩৪২), 'পত্রপুট' (২৫ বৈশাখ ১৩৪৩) কাব্যের প্রায় সব রচনাই গদ্যকবিতা। (—নয়, যেমন শেষের তিনটি কবিতা, 'ছুটি', 'গানের বাসা' ও 'পয়লা আশ্বিন': রচনাকাল ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন ১৩৩৯)। গদ্যকবিতাগ্রন্থগুলিতে বিশেষ করিয়া, অতীত ও বর্তমান এক সমভূমিতে দেখা দিয়াছে। সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালির কবিতায় বর্তমান নাই—আছে অতীত এবং ভবিষ্যৎ। বয়সের দৃষ্টি এইভাবে যথোচিত পরিস্ফুট। গদ্যকবিতার মূল লক্ষণ—বিষমমাত্রিক যতি, অসম ছন্দঃস্পন্দ এবং গদ্যোচিত বাচনভঙ্গি—সবই এই কবিতাগুলিতে আছে।

এই প্রসঙ্গে কিছু অবান্তর কথা বলিতে হয়। গদ্যের সঙ্গে গদ্যকবিতার তফাৎ পঙ্‌ক্তি-সাজানোয় নয়, ছন্দের দোলায় আর বাচনরীতিতে। গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে গদ্যকবিতা। গদ্যের ছন্দ বাক্যার্থ অনুসরণ করে। সেখানে যতি পড়ে বাক্যের পর্বে যেখানে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসবায়ুর সাময়িক বিরাম, এবং সেখানে পর্বের মধ্যে তালের অথবা মাত্রাসমতার প্রশ্ন ওঠে না। পদ্যের ছন্দ অনুসরণ করে মাত্রার অথবা তালের সমতা। সেখানে নির্দিষ্ট মাত্রার অথবা তালপরিমাণের পর বিরাম। গদ্যকবিতার ছন্দে যতি পড়ে গদ্যছন্দের মতোই অর্থসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসবায়ুর স্বল্পবিরামে, উপরন্তু নির্দিষ্ট মাত্রাসমতা না থাকিলেও পর্বের মধ্যে তালের রেশ অনুভূত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে গদ্য অতিতাল, পদ্য সমতাল এবং গদ্যকবিতা বিষমতাল। যেমন

(ক) গদ্য

আজি ঐ বাঁশি শুনিয়া | প্রাণের একজায়গা | কোথায় হাহাকার করিতেছে। | এখন কেবল মনে হয়, | বাঁশি বাজাইয়া | যে-সব উৎসব আরম্ভ হয় | সে-সব উৎসবও | একদিন | শেষ

[১] প্রথম সংস্করণে কবিতাসংখ্যা ৩৭, দ্বিতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৪৯-৫০) এই অতিরিক্ত তেরোটি কবিতার মধ্যে ছয়টি 'পরিশেষ' থেকে নেওয়া।

হইয়া যায়।। তখন আর বাঁশি বাজে না।। ...বাঁশির গানের মধ্যে, | হাসির মধ্যে,— লোকজনের আনন্দের মধ্যে, | চারিদিকের ফুলের মালা | ও দীপের আলোর মধ্যে | সেই ছোট মেয়েটি | গলায় হার পরিয়া | পায়ে দুগাছি মল পরিয়া | বিরাজ করিতেছিল।। [1]

(খ) পদ্য

হঠাৎ | সন্ধ্যায়।
সিন্ধু বারো | য়াঁয় লাগে | তান— |
সমস্ত আ | কাশে বাজে
অনাদি কা | লের— | বিরহ বে | দনা— | ...
হঠাৎ— | খবর পাই | মনে— |
আকবর | বাদশার | সঙ্গে |
হরিপদ | কেরাণীর | কোন ভেদ | নেই—।।
বাঁশির— | করুণ ডাক | বেয়ে— |
ছেঁড়া ছাতা | রাজছত্র | মিলে চলে | গেছে— |
এক বৈকু | ণ্ঠের দিকে।। [2]

(গ) গদ্যকবিতা (গদ্যের মতো সাজানো)

বাঁশির বাণী | চিরদিনের বাণী। | শিবের জটা থেকে | গঙ্গার ধারা— | প্রতিদিনের মাটির | বুক বেয়ে চলেচে ; | অমরাবতীর শিশু | নেমে এল | ধুলি নিয়ে | স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে। | ...যখন সেখানকার | মালাবদলের গান | বাঁশিতে— | বেজে উঠল | তখন এখানকার | এই কনেটির দিকে | চেয়ে দেখলেম, | তার গলায় | সোনার হার, | তার পায়ে | দু'গাছি মল, | সে যেন | কান্নার সরোবরে | আনন্দের | পদ্মটির উপরে | দাঁড়িয়ে।। [3]

(ঘ) গদ্যকবিতা (পদ্যের মতো সাজানো)

বাঁশিওয়ালা, |
বেজে ওঠে | তোমার বাঁশি, |
ডাক পড়ে—অমর্ত্যলোকে ; |
সেখানে— | আপন গরিমায় |
উপরে উঠেছে | আমার মাথা।।
সেখানে—কুয়াশার | পর্দা-ছেঁড়া |
তরুণ-সূর্য | আমার জীবন।। [4]

---

১ 'পুষ্পাঞ্জলি', ভারতী বৈশাখ ১২৯২ পৃ ৯।
২ 'বাঁশি', শেষ সপ্তক। ৩ 'বাঁশি', লিপিকা। ৪ 'বাঁশিওয়ালা', শ্যামলী।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতারচনার প্রথমপ্রয়াসের পরিচয় আছে 'লিপিকা'র প্রথম অংশে। পদ্যের মতো পঙ্‌ক্তি ভাঙ্গিয়া ছাপা না হইলেও এগুলির মধ্যে যে আসল গদ্যকবিতার ঝঙ্কার আছে তাহা উপরের উদ্ধৃতি হইতে বোঝা যাইবে। "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"[১] গদ্যকবিতার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু খাঁটি কথা বলিয়াছেন পুনশ্চের ভূমিকায়।

> গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হোতে পারে। অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ঠিকই, তাঁহার গদ্যকবিতায় বাঙ্গালা-কাব্যশিল্পের পরিধি দূরপ্রসারিত হইয়াছে। পুনশ্চের গদ্যকবিতাগুলিতে রেখার যে সূক্ষ্মতা ও ভাবের যে বলিষ্ঠতা প্রস্ফুটিত তাহা গদ্যকবিতায় হইলে ছন্দের তরঙ্গে ও বাচনের বর্ণচ্ছত্রাবলীতে নিশ্চয়ই অনেকটা শ্লথ ও ম্লান হইয়া পড়িত।[২] পদ্য-কবিতায় হইল 'বাঁশি' বাজিত প্যানপ্যান করিয়া, লক্ষ্মীছাড়া 'ছেলেটা'র কোনই ছিরি থাকিত না এবং ব্যাঙের খাঁটি কথাটি আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডির আঁচটুকুও পাইতাম না॥

পুনশ্চের গদ্যকবিতাগুলির প্রায় সবই গল্পিকা। সেগুলির তুলনা চলে লিপিকার সঙ্গে। তবে লিপিকার গল্পিকায় যেমন উপহাস-কণ্টকের খোঁচা আছে এগুলিতে তেমন নয়। ইমোশনের আর্দ্রতাও এখানে নাই। কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে মানুষ। শৈশবস্মৃতিও বিষয়বস্তুর যোগান দিয়াছে। 'ছেলেটা', 'শেষ চিঠি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি' ইত্যাদি কবিতাগুলি নিপুণ নিটোল হৃদয়ভেদী রচনা। 'শিশুতীর্থ' উদাত্ত কবিতা, মহাকাব্যের সমুন্নতিময়॥

৩

'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ ১৩৪০) গদ্যকবিতা-বর্জিত। বইটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে অনন্য। কবিতাগুলি যেন কবির নিজের মনের ফরমায়েসি। তাঁহার

---

[১] ভূমিকা, পুনশ্চ।

[২] শেষ-সপ্তক বিশ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য।



শ্যামলা
('বিচিত্রিতা')

স্নেহভাজন কয়েকজন শিল্পীর আঁকা একত্রিশটি (—এবং নিজেরও আঁকা সাতটি) ছবি ও তদবলম্বনে রচিত একত্রিশটি কবিতা এবং অতিরিক্ত 'আশীর্বাদ' কবিতাটি[১] লইয়া বিচিত্রিতা বাহির হইয়াছিল। বিচিত্রিতার কবিতাগুলি যেন ছবির চিত্রণ (illustration), কবিতার নয়। ছবিগুলির অধিকাংশই নারীকে লইয়া। কবিতাগুলিও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চিন্তায় নারী-ভাবনা এসময়ে যে রূপ লইয়াছিল তাহার পরিচয় এখানে আছে। বিচিত্রিতার 'পসারিণী' কবিতার সঙ্গে কল্পনার 'পসারিণী' কবিতা মিলাইয়া পড়িলে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের দুই প্রান্তের দৃষ্টি-বিভেদ বোঝা যায়। কল্পনার পসারিণী হাট-যাত্রী কবির মন। হাটমুখো সে চলিয়াছে পসরা লইয়া। তাহার থামিবার প্রয়োজন হয়ত আছে, কিন্তু অবকাশ নাই, চারদিক তাহাকে বিশ্রামের লোভ দেখাইয়া টানে। বিচিত্রিতার পসারিণী হাটফেরতা, পসরা বেচিয়া সে কড়ি লইয়া ফিরিতেছে। গাছের তলায় তাহার বিশ্রাম কোন কিছুর টানে নয়, নিজেরই শ্রান্তিভরে। হাট-যাত্রী পসারিণীর মন বেচাকেনার দিকে, তাই অন্য আকর্ষণ তাহার মনে সাড়া জাগায় নাই।

থাক্ তব বিকি-কিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

হাটফেরতা পসারিণীর কাছে বেচাকেনার আর প্রয়োজন নাই, ঘরের টানও নাই।

লাভের জমানো কড়ি
ডালায় রহিল পড়ি,
ভাবনা কোথায় ধেয়ে চলে।

যাইবার মুখে ডাক ছিল বাহিরের। ফিরিবার মুখে জলস্থল-আকাশ তাহার মন পিছু পানে টানিতেছে।

এই মাঠে, এই রাঙা ধুলি
অঘ্রাণের রৌদ্রলাগা চিক্কণ কাঁঠাল-পাতাগুলি,
শীতবাতাসের শ্বাসে
এই শিহরণ ঘাসে,
কী কথা কহিল তোর কানে।...

রবীন্দ্রনাথের নিজের ছবি লইয়া আঁকা কবিতাগুলির মধ্যে চারটি বিশেষ

---

১ নন্দলাল বসু মহাশয়ের প্রতি। বইটি তাঁহাকেই উপহৃত।

ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পুষ্প', 'একাকিনী' ও 'বিদায়'—তিনটি কিশোর প্রেমের নবমঞ্জরী।

কী যে বলে সেই সুর, কোন্‌দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা
আজ সখি, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

বরবধূ ও বিবাহ কয়েকটি ছবি ও কবিতার বিষয়। এমন কবিতার মধ্যে 'সাজ' উল্লেখযোগ্য। কন্যাকে নববধূর সাজ পরানো হইতেছে—এই হইল ছবি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা মেয়েটির জীবনসূত্র অনুসরণ করিয়া শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছে। কন্যা ছেলেবেলায় পুতুল খেলিয়াছে, এখন তাহাকে লইয়া বিশ্বখেলোয়াড় পুতুল খেলিতেছে। কাল সে শ্বশুরবাড়ীতে তাহার খেলার পুতুল সঙ্গে লইয়া যাইবে, কিন্তু সব শেষের পালায়?

তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না,
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।
তার পরেতে জিতবে ধুলো,
ভাঙা খেলার চিহ্নগুলো
সঙ্গে লবে না।

এ তো রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাবনা।

'কন্যাবিদায়' কবিতাটি তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, অনবদ্য।

এ-জন্মের আরম্ভভূমিকা—সংকীর্ণ সে
প্রথম উষার মতো—ক্ষণিক প্রদোষে
মিলাইল লয়ে তার স্বর্ণকুহেলিকা।
বাল্যে পরেছিলে শুভ্র মাঙ্গল্যের টিকা,
সিন্দুররেখায় হল লীন।
সে রেখাটি
জীবনের পূর্বভাগ দিল যেন কাটি।
আজ সেই ছিন্নখণ্ড ফিরে এল শেষে
তোমার কন্যার মাঝে অশ্রুর আবেশে।

৪

১৯৩১-৩৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা যে অ-গদ্য কবিতা (এবং গান) অন্যত্র সংকলিত হয় নাই সেগুলি 'বীথিকা' (ভাদ্র ১৩৪২) নামে সংকলিত হইল। কবিতা (ও গান) সংখ্যায় আটাত্তর। প্রথম কবিতা 'অতীতের ছায়া'য়[১] কাব্যটির মর্মকথা প্রকাশিত। "নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে" সেখানে মহা অতীত "গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালো কেশে,"

যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা।

সেখানে কবিচিত্ত "কাজ ভুলে' অস্তাচলমূলে ছায়া-বীথিকায়" বসিয়া আছে। ভাবনা,

আজি আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছে সেথা যেথা আছে মহা অগোচর।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।

'নিমন্ত্রণ' কবিতায় বাচনলঘুতার সঙ্গে ভাবগভীরতার মিলন হইয়াছে, যেমন 'ক্ষণিকা'য় দেখা গিয়াছিল।

যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে,
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

ক্ষণিকার 'অন্তরতম' কবিতায় আসন্নমিলনের সলাজ সঙ্কোচ, বীথিকার 'অন্তরতম' কবিতায় আসন্নবিরহের নিবিড় ব্যাকুলতা।

সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে,
এই যা দান গিয়েছে মিশে' গভীরতার প্রাণে,
করিনি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধিনি কোন বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার যায় না দেখা যারে
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

[১] রচনাকাল ১৩ জুলাই—২ আগস্ট ১৯৩৫।

বীথিকার দুই একটি কবিতা যেন মানসীর কোন কোন কবিতার পরিপূরক অথবা প্রত্যুত্তর। 'ভুল' (কবিতা) ও 'বাদল সন্ধ্যা' (গান) মানসীর 'ভুলে'র সঙ্গে তুলনীয়। 'অপরাধিনী' মানসীর 'নারীর উক্তি'র উপসংহার। 'ছবি'তে (—পরে কবি ইহাতে সুর দিয়াছেন—) যেন দুষ্মন্ত শকুন্তলার ছবি আঁকিতেছে।

কল্পনার 'মানসপ্রতিমা' গানটিতে কবি বাসনালক্ষ্মীকে সন্ধ্যার মেঘমালার রূপে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম বিজনগগনবিহারী।[১]

বীথিকার 'মেঘমালা'য় দাক্ষিণ্যের কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

উদার দাক্ষিণ্য তার বিগলিত নির্ঝরে বরষে,
গায় কলোচ্ছল গান।

বিরোধ দ্বন্দ্ব ও অসম্পূর্ণতাই সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছে।

বহুভাগ্য সেই
জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।[২]

'ভীষণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন বৈদিক কবির অনুভবে এবং নিজের শৈশবভাবনায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু, আজিও সে-কথা মনে হয়।
বটের জটিল মূল আঁকাবাঁকা নেমে গেছে জলে।
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে গেছে ভয়ের কৌতুকে,
দুরুদুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তখনি।
যে-মূর্তি দেখেছি সেথা, শুনেছি যে-ধ্বনি
সে তো নহে আজিকার।
বহু লক্ষ বর্ষ আগে সৃষ্টি যে তোমার।

---

[১] ভারতীতে (আষাঢ় ১৩০৬) প্রকাশিত প্রথম স্তবকের প্রথম দুই ছত্র। পরে পাঠ পরিবর্তিত হইয়াছে, "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর···"। [২] 'বিরোধ'।

হে ভীষণ বনস্পতি,
সেদিন যে-নতি
মন্ত্র পড়ি দিয়েছি তোমারে
আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে একধারে।

'উদাসীন' কবিতার মিল অভিনব।

৫

'শেষ-সপ্তক' (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) গ্রন্থে কবিতাসংখ্যা ছেচল্লিশ। এখানে কবিদৃষ্টি পুনরায় অন্তর্মুখীন। কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছে প্রকৃতি[১] এবং শৈশবস্মৃতিকে ছাপাইয়া কিশোরপ্রেমস্মৃতি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।[২] ইতিমধ্যে (১৩৩৯ সালের শেষার্ধে) রবীন্দ্রনাথ নিজের নামের আগে "শ্রী" লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই "শ্রী"-বর্জনে এবং শেষ-সপ্তকের কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায় কবির অন্তর-বাহিরের সংস্কারমোচনের বাসনা অভিব্যক্ত।[৩]

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।[৪]

শেষ-সপ্তকে এই সুরেরই মীড়।

দুইটি গল্পিকা[৫], পাঁচটি পত্রিকা[৬]। বাকি কবিতাগুলিকে আত্মচিন্তা ও তত্ত্বভাবনা পর্যায়ে ফেলিতে পারি। কবিকে এই ভাবনাই আঁকড়িয়া আছে

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের যাত্রাকে বহন ক'রে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।[৭]

---

১ পাঁচ, এগারো, চব্বিশ, পঁচিশ। ২ এক, দুই, তিন, তেরো, চোদ্দ, পনেরো, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ। ৩ চার, আট, নয়, বাইশ, তেইশ, পঁয়ত্রিশ। ৪ পঁয়ত্রিশ। ৫ বত্রিশ, তেত্রিশ। ৬ পনেরো, ষোল, সতেরো, আঠারো, বিয়াল্লিশ। ৭ তেতাল্লিশ।

৬

'পত্রপুট' (২৫ বৈশাখ ১৩৪৩, দ্বি-স কার্তিক ১৩৪৫) ছোট বই। প্রথম সংস্করণে ষোলটি কবিতা ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে আর দুইটি যুক্ত হইয়াছে। দুইটি ছাড়া সবই ১৩৪৩ সালের বৈশাখ হইতে মাঘ মাসের মধ্যে লেখা।

পত্রপুটের বিশিষ্ট কবিতাগুলির মর্মবাণী,—"সব জড়িয়ে মন ভুলেছে"। বৈদিক কবির কথায়—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। কিন্তু সেই সঙ্গে বিদায়-দিনের বিষণ্ণতাও যেন একটু জড়াইয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ তিনের[১] কবিতাটিকে ধরিতে পারি। কবিতাটির নাম দেওয়া যায় "পৃথিবী"। সোনার-তরীর 'বসুন্ধরা'র সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে বত্রিশ বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চুয়াত্তর বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনার মধ্যে তফাৎটুকু ধরা পড়ে। ১৩০০ সালে কবি পৃথিবীর বক্ষঃস্পন্দ নিজের নাড়ীতে অনুভব করিয়াছিলেন। তখন পৃথিবীর বিচিত্র রূপরসগন্ধস্পর্শময় জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ পাইবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য।

এখনো মেটেনি আশা ;
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি,

১৩৪২ সালে ধরাবক্ষ হইতে বিদায় লইবার দিন নিকটতর হইয়াছে। জীবধাত্রীকে এখন তিনি খেয়ালী নারীর সৌম্য ও রুদ্র দুই সাজেই লক্ষ্য করিতেছেন। সোনার-তরীতে পৃথিবী বসুন্ধরা সৃষ্টিপালিনী গৃহিণী। পত্রপুটে পৃথিবী—পুরানো কবির ভাষায় "থাকিনী", তাহার আদিম বর্বরতাময় ও শক্তিমানের কাছে পোষমানা—এই দুই রূপেই প্রতিভাত। অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত পৃথিবীর যে বিভিন্ন রূপ ও মেজাজ তাহাই অভিব্যক্ত। এখানে একসঙ্গে প্রাণের ও মৃত্যুর বন্দনা।

বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়…
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,

[১] ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫।

কবি নিজের জীবনের হিসাব মিলাইয়া যে অপূর্ণতা অনুভব করিতেছেন তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বারো[1] সংখ্যক কবিতায়।

গান যে-মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ;
যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলেনি তার।...
মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

হিসাবের অন্যদিকটার উল্লেখ রহিয়াছে তেরো[2] সংখ্যক কবিতায়। এ কবিতা হইতে কাব্যনামটির ইশারা মেলে।

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে,
আমার চারিদিকে চিরকাল ধরে,
বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।
আজ আমার এই পত্রপুষ্পের
ঝরবার দিন এল জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্যে গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,

পনেরো[3] সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের অধ্যাত্মভাবনার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

[1] ১ বৈশাখ ১৩৪৩ [2] ১০ বৈশাখ ১৩৪৩। [3] ১৮ বৈশাখ ১৩৪৩।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

৭

উৎসর্গ ছাড়া 'শ্যামলী'তে (ভাদ্র ১৩৪৩) কুড়িটি মাত্র কবিতা। কবিতাগুলি ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে লেখা। 'কণি', 'হঠাৎ-দেখা', 'অমৃত', 'দুর্বোধ' ও 'বঞ্চিত' এই পাঁচটিকে গদ্যকবিতায় ছোটগল্প বলা যাইতে পারে। 'শেষ পহরে', 'সম্ভাষণ' ও 'অকাল ঘুম' এই তিনটি গল্পিকা। বাকি কবিতাগুলিতে পুরানো স্মৃতি অথবা বর্তমানের পারিপার্শ্বিক উপলক্ষ্য করিয়া কবি গভীর ভাবনাকে ছবির পর ছবি আঁকিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

আত্মচিন্তার মধ্যে 'আমি' কবিতাটি খুব উল্লেখযোগ্য। যে দৈবী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বৈদিক কবি বলিয়াছিলেন

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি

সেইমতো কোনো ভাবনার বশেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

আমারি চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ,
চুনি উঠ্‌ল রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।

কিন্তু বৈদিক কবির ভাবনায় যে ভাব অনপেক্ষিত অতএব অনুপস্থিত তাহাও রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়াছেন

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।...

তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর"
"আমি ভালোবাসি"।[১]

কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি কালিদাসের কালে উজ্জয়িনীতে অভিসারে গিয়াছিলেন, ক্ষণিকার 'সেকাল' কবিতায় কালিদাসের নায়িকাদের বর্তমান-কালের সাজবদলে দেখিয়াছিলেন, শ্যামলীর 'স্বপ্ন' কবিতায় তিন-শো বছর আগেকার বৈষ্ণব-কবির নায়িকাকে আধুনিকার মধ্যে প্রত্যক্ষ না করিলেও অন্তরে অন্তরে চিনিয়াছেন।

'বাঁশিওয়ালা' জীবনবন্দিনী নারীর বন্দনা। বুক-মোচড়ানো কবিতা। পরিশেষ-পুনশ্চর 'বাঁশি' কবিতার পরিপূরক।

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ করে গড়তে,
রেখেছেন আধাআধি ক'রে।…
ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে;
সবাই বলে ভালো।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,……
কঠিন হ'য়ে জানিনে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।…
বাঁশিওয়ালা,
হয়ত আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানিনে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন্,
চিনবে কেমন ক'রে।…
ওগো বাঁশিওয়ালা,—
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

পত্রপুটে পাতাঝরানোর—মৃত্যুর—কথাটাই বেশি করিয়া জাগিয়াছে, আর

[১] বিচিত্রিতার 'পুষ্প' কবিতার শেষ ছত্রগুলি স্মরণীয়।

শ্যামলীতে স্নিগ্ধ শ্যামকান্ত বাঙ্গালী মেয়ের—নিত্যকালের স্নিগ্ধ জীবনের—রূপটিই দৃষ্টি অধিকার করিয়াছে। তাই কাব্যটির 'শ্যামলী' নাম। তাই তখন এই নামে মাটির ঘরে কবি বাসা বাঁধিয়াছিলেন।

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ-ক'রে থাকা বাঙালী মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো ;···
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণ ধারায়।
যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায় দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চ'লে।[১]

৮

ছেলেভুলানো ছড়া রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় এবং কাব্যশিল্পে যে কতখানি অন্তরঙ্গ ছিল সে কথা আগে বলিয়াছি। প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাবনায় ছেলেভুলানো ছড়ার ও গল্পের রঙ পাকা হইয়া লাগিয়াছিল। সেকথাও অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। শেষবয়সে কবি খাঁটি ছড়ার শৈলীতে কবিতা লিখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এখানে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখা যায়। বাহত ছেলেদের জন্য লেখা হইলেও রবীন্দ্রনাথের ছড়া-কবিতার রস পরিণতমনেরই বেশি উপভোগ্য। যেগুলির ভাব ও ভাষা অত্যন্ত সহজ সেগুলির মধ্যেও ছন্দের বৈচিত্র্য ও কল্পনার উদ্ভটতা বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেইজন্য ছেলে-বুড়ো সকলেরই উপাদেয়। 'খাপছাড়া'র (১৯৩৭) ছোট ছোট ছড়া-কবিতাগুলিতে অদ্ভুত-কৌতুকরস উচ্ছলিত। উদাহরণরূপে প্রথমেই "ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির" কালনা-নিবাসিনী পঞ্চভগিনীর নিতান্ত অসঙ্গত অথচ প্রবল যুক্তিযুক্ত আচরণের উল্লেখ করিতে পারি।

[১] শ্যামলীর শেষ কবিতার রচনাকাল ৬ আগস্ট ১৯৩৬। পাঁচ বছর পরে প্রায় এই দিনেই রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব ঘটে।

কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়।

কিংবা বিশ্বের টেরিটি-বাজারে যাহার সন্ধান পাওয়া আকস্মিক হইলেও অসম্ভাবিত নয় সেই "গোরা-বোষ্টমবাবা"র আদর্শ সাত্ত্বিক ব্যবহার, কঠোর সংযম ও অতুলনীয় ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয়।

শুদ্ধ নিয়ম মতে মুর্‌গিরে পালিয়া
গঙ্গাজলের যোগে রাঁধে তার কালিয়া;
মুখে জল আসে তার চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায় বেচে পদরেণু।

'ছড়ার ছবি'র (১৯৩৭) কবিতাগুলি সবই ছড়া-কবিতা নয়। ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।"

ছড়ার-ছবির কবিতাচিত্রের অনেকগুলিতে কবির বাল্য ও যৌবন স্মৃতি প্রতিফলিত।[১] কয়েকটি কবিতার ব্যঞ্জনা গভীরতর। 'পিস্‌নি'তে মানব-জীবনসন্ধ্যার আলো-আঁধারির যে উদাস ছবি ফুটিয়াছে তাহা মনকে ব্যথিত করে। অসম্ভবের আশাকে মনে আলগা ধরিয়া নিঃসঙ্গ পিস্‌নি বুড়ি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া সুদূরের ডাকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিতে চাহিল। তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতিবিস্মৃতির ঢেউ খেলিয়া যায়। দূরপ্রবাসী আত্মীয় যাহারা, তাহারা তাহার সহিত স্নেহসম্পর্ক বহুদিন চুকাইয়া দিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম কখনো বুড়ীর মনে পড়ে কখনো পড়ে না। মানবমনের জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এই বৈতরণীগামিনী বৃদ্ধার করুণ আলেখ্যে দীর্ঘ আয়ুর পরিণামে গভীর অবোধ বেদনার নির্দেশ আছে।

---

১ 'কাঠের সিঙ্গি', 'প্রবাসে', 'পদ্মায়', 'বালক', 'আতার বিচি', 'আকাশ'।

গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি,
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি',
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে!
গভীর নিশাস ফেলে
চুপটি ক'রে ভাবে
এমন ক'রে আর কতদিন যাবে।

'পিছু ডাকা'য় অস্তাচলগামী রবির অনুরাগ ধরণীর তুচ্ছতাকে দুর্লভতায় রঙিনতর করিয়াছে।

কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুক্‌নো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁটি মাথায়,
তখন মনে এই বেদনাই বাজে
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।
ঐ যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শেষ পালা

(১৯৩৭ - ১৯৪১)

"দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম,"

১

জীবনে প্রথম কঠিন রোগে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মুখোমুখি হইলেন (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)। সুস্থ হইলে পর তাঁহার এই দুঃস্বপ্নময় নিশ্চেতন নূতন অভিজ্ঞতা কাব্যে পালা-বদলের সূচনা করিল। বলাকার পর হইতেই কবি-ভাবনায় ভক্তির রঙ ফিকা হইয়া আসিতেছিল। এ অভিজ্ঞতার আগেই তাহা মুছিয়া যায়। যে বিশ্বাস লইয়া রবীন্দ্রনাথ জীবন-চিন্তা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কখনো কোনো ধর্মমত তাঁহার মন জড়াইয়া ধরে নাই। তবুও সে চিন্তায় যেটুকু "মত"-এর মতো ছিল তাহাও ক্রমশ ঝরিয়া যায়। যাহা তিনি আগে "ঈশ্বর", "তুমি" ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করিতেন তাহা এখনকার কবিতায় নিখিলের জীবনপ্রবাহ, অস্তিত্বের আনন্দ-সংবেদন ইত্যাদি বিবিধ ব্যঞ্জনা পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এই প্রসর্পণ হইতে বুঝিতে পারি যে তিনি সর্বথা কালের সহযাত্রী ছিলেন এবং তাঁহার অধ্যাত্ম-এষণা অর্থাৎ গভীর জীবনচিন্তা কোন "মত" মধ্যে—তা সে যতই উদার হোক না কেন—ধরা দেয় নাই। কিন্তু তাহা সমকালীন বিজ্ঞান-চিন্তার সঙ্গে সমতালে চলিয়াছিল। অথচ তাঁহার চিন্তার প্রসর্পণে পূর্ব-পশ্চাতের কোন বিরোধ নাই। "যে গান কানে যায় না শোনা" সে গান শেষ পর্যন্ত তিনি শুনিতে পাইয়াছেন। (আগে "সে গান যেথায় নিত্য বাজে" সেই সভার অধিপতির ভাবনা জাগিত।) এখন উপলব্ধি করিয়াছেন যে তাঁহার (অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার) শোনাতেই এই বিশ্বগানের নিত্যতা তাহার বাহিরে কিছু আছে কি নাই তাহা বুঝিবার যো নাই। ধর্মে অবিশ্বাস এ নয়, জীবনের স্বীকৃত মূল্য অস্বীকারও এ নয়। এ হইল ভালোমন্দ লইয়া জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিবার চেষ্টা এবং যে-কোন মানুষের কল্পিত বা মানব-সমষ্টির উপহিত বিধিবদ্ধ উচিত-অনুচিত না ভাবিয়া জীবনকে সমগ্রভাবে এবং

সাধ্যমত সানন্দে স্বীকার। এ স্বীকারে মৃত্যু উপেক্ষিত নয়। মৃত্যু তো নব জীবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন, পুরাতন জীবনের জীর্ণ ত্বক্‌ মোচন। (ইহার মধ্যে পুনর্জন্মবাদের প্রশ্ন উঠে না। জীবন হইতে জীবনে প্রবাহ প্রত্যক্ষগোচর।) এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সর্বাধুনিকত্ব অপিচ চিরন্তনত্ব।

জীবনের যাহা জেনেছি, অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক্‌, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।

২

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া অজ্ঞান অবস্থায় কবিসত্ত্বের অবচেতনায় আলখা আলোয় যে অসংলগ্ন ছবি ফুটিয়াছিল সজ্ঞান হইলে পর সেই দ্রুতপলাতক চেতনা-চেতনের আলো-আঁধারি অনুভাবের বিচিত্র আলিম্পন স্বল্পকায় 'প্রান্তিক' বইটির কবিতাগুলিতে (জানুয়ারি ১৯৩৮) আধৃত। কবিতা-সংখ্যা আঠারো। জীবনমরণের সীমানাভূমিতে দাঁড়াইয়া উপলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুভাব আশ্রিত বলিয়া এই নাম। প্রথম তিনটি কবিতা সেপ্টেম্বর মাসে লেখা। তাহার পরের পাঁচটি অকটোবর মাসে, সাতটি ডিসেম্বর মাসে। তিনটির (১৪, ১৫, ১৬) তারিখ দেওয়া নাই। শেষের কবিতাদ্বয় বড়দিনে রচিত। রচনাস্থান শান্তি-নিকেতন। শেষেরটি ছাড়া সর্বত্র ছন্দ দীর্ঘায়িত পয়ার।

চেতনা যখন ধীরে ধীরে নিশ্চেতনার মাঝে মিলাইয়া আসিতেছে তখনকার অনুভাব,

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্রকরা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।

দেহ হইতে বিয়োগের আশঙ্কিত আসন্ন মুহূর্তে অতীতের বাসনা ও বর্তমানের কামনা যেন প্রেতমূর্তি ধরিয়া পিছু লইয়াছে।

পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুনগুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে।

এতদিন ধরিয়া জগৎলক্ষ্মী যে পূর্ণতার আনন্দ পরিবেশন করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে যেন তৃপ্তি হইয়াও হয় নাই। বিকাররোগীর পিপাসার মতো কবি-চিত্তগহনের ব্যাকুলতা

হে সংসার
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।

কিন্তু পরক্ষণেই ঘোর কাটিয়া গিয়াছে।

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে
বিকারের রোগী সম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।

মৃত্যুর দেহলীপ্রান্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত কবিসত্ত্ব যেন আনন্দলোকে নবাবতীর্ণ হইলেন।

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে,…
সদ্য গেছে নামি।
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

জীবনমৃত্যু এক হইয়া গিয়া চিত্তে মুক্তির প্রশান্তি অবতীর্ণ।

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম।

শেষের কবিতা দুইটি অন্য সুরের, যেন পরবর্তী রচনার নান্দী। মানুষের জগতে কবি যেন সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছেন।

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে ॥

৩

'সেঁজুতি'[১] (ভাদ্র ১৩৩৫) বইটির উৎসর্গ বাদে বাইশটি ছোটবড় কবিতার মধ্যে শুধু পাঁচট প্রান্তিকের পরে লেখা।[২] বারোটি অক্টোবর ১৯৩৭ হইতে মে ১৯৩৮ মধ্যে লেখা। পাঁচটির রচনাকাল জানা নাই।[৩]

মৃত্যুর ছায়ামুক্ত কবিচিত্ত যেন আপন স্বরূপ নূতন করিয়া দেখিতেছে। সেই কথাই উৎসর্গে শুনি (রচনাকাল ১ শ্রাবণ ১৩৪৫)।

অন্ধতামস গহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।

'জন্মদিন' নামে দুইটি কবিতা আছে। প্রথমটি ১৩৪৪ সালের ও দ্বিতীয়টি ১৩৪৫ সালের জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা। দুই জন্মদিনের মাঝখানে মৃত্যুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) হইলে পর কবিভাবনায় যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহা কবিতা দুইটিকে তুলনা করিলে বোঝা সহজ হয়। প্রথম (১৩৪৪ সালের) 'জন্মদিন'এ কবি মরণকে "তুহু মম শ্যাম সমান" ভাবিয়া অভ্যর্থনা দূরে থাক আমন্ত্রণই দিতেছেন না। জীবনে সহজ আনন্দের ভোজে অধিকার তখনও অবিনষ্ট। যেটুকু আছে তাহাই যথেষ্ট। মরণে শঙ্কা নাই, কীর্তির জন্য পিছুফেরা নাই।

---

[১] এখন অপ্রচলিত এই শব্দটি একদা গৃহস্থঘরে প্রাত্যহিক সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইবার অনুষ্ঠান বুঝাইত। অনুষ্ঠানের মর্ম—দিনের বিদায়, রাত্রির স্বাগত। অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল দীপ জ্বালাইয়া ঘরে ঘরে দেখানো এবং শেষে তুলসীতলায় বসাইয়া দেওয়া। শব্দটি সংস্কৃত "সন্ধ্যাজ্যোতিঃ" অথবা "সন্ধ্যাবর্তিকা" হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করি।

[২] রচনাকালানুক্রমে—'প্রাণের দান', 'নিঃশেষ', 'জন্মদিন' (প্রথম কবিতা), 'পত্রোত্তর' ও 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

৩ 'স্মরণ', 'চল্‌তি ছবি', 'পালের নৌকো', 'চলাচল', 'মায়া' ও 'ছুটি'।

সেই সে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল, হয় যদি হোক মিছে ;
না হয় যদি নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

দ্বিতীয় (১৩৪৫) 'জন্মদিন'এ মৃত্যুর উপস্থিতি যেন প্রত্যক্ষগোচর। শুধু তাই নয়, দেহের জীর্ণতা জীবনের সহজ-আনন্দ গ্রহণ-শক্তিকে দিন দিন সঙ্কুচিত করিতেছে। তাই ক্ষোভ সব-কিছু ভালোলাগার আসক্তির জন্য।

ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্দ্র চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

কিন্তু সেই ভালোলাগাই তো সত্য নিত্য ও অমৃতত্ব। এবং তাঁহার রচনায় সে সত্যের নিত্যের ও অমৃতত্বের পরিচয় আছে।

আমার সে ভালবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট র'বে ; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে

কবিতাটিতে যেটুকু তিক্ততার স্পর্শ আছে তাহা তিলে তিলে মরণাভিমুখিতার জন্য নয়। সমসাময়িক সভ্য মানুষের দুর্দম লোভ ও হিংসার অনাবৃত প্রকাশ দেখিয়াই তাঁহার হতাশা। কিন্তু কোন তিক্ততাকে কবি কিছুতেই প্রশ্রয় দিবেন না।

শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি'।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দম্ভের অত্যাচারে
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।

সব শেষে বিদায়বাণী। পরিত্যক্ত পাথেয়।

আর র'বে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই ; আর র'বে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালবাসা, বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

কবিতাটি লেখা সংসারকে উদ্দেশ করিয়া। এই জন্মদিনেই আর একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিজের উদ্দেশে।[১] এ কবিতায় সুর ক্ষান্তির, শান্তির, নব-জীবনের।

এসো এসো সেই নব-সৃষ্টির কবি
নব-জাগরণ যুগ-প্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে...
সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনী-সংগীতে
যে মাথায় চোখে নূতন দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বন-নীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।

'পত্রোত্তর' কবিতায় (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধের (অর্থাৎ গভীরতর জীবনচিন্তার) নির্দেশ রহিয়াছে। এ চিন্তা আস্তিকেরও নয়, নাস্তিকেরও নয়।

যাহা জানিবার কোনোকালে তার জেনেছি যে কোনো কিছু
—কে তাহা বলিতে পারে।
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠিছে মেতে।
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

পরজন্ম আছে কি নাই তা বিশ্বাসের ব্যাপার, প্রমাণসাপেক্ষ নয়। রবীন্দ্রনাথ কখনো পরজন্মে বিশ্বাসী ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে। এখন কিন্তু তিনি সে-বিশ্বাসমুক্ত। তাই পত্রোত্তরে আরম্ভে লিখিতেছেন

চিরপ্রশ্নের বেদী-সম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,

মৃত্যুর পরে নিজের নিগূঢ় সত্তার (অর্থাৎ আত্মার) কোনরকম স্বতন্ত্র সত্তা

[১] নাম 'উদ্বোধন', নবজাতকে সংকলিত।

থাকিবে কিনা সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনোই মাথা ঘামান নাই। তিনি একদা লিখিয়াছিলেন

আস্‌ব যাব চিরদিনের সেই আমি,

এখন লিখিতেছেন

মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

দুটি উক্তিতে কোন বিরোধ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, জীবনস্রোতের মৃত্যু নাই। সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ হইতে যে জীবনস্রোতের উৎসার তাহা বিচিত্র ধারায় বিচিত্র পথে বিচিত্র ভঙ্গিতে বিচিত্ররূপে চলিয়াছে চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। জীব অর্থাৎ খণ্ডপ্রাণ এই জীবনপ্রবাহের বুদ্‌বুদ্ অথবা তরঙ্গভঙ্গের মতো। উৎপাদ ও ভঙ্গ তাহার ধর্ম। কিন্তু জীবনপ্রবাহের খণ্ডন বা বিনাশ নাই। অহেতু আনন্দ-উপলব্ধিতেই জীবের নিত্যত্ব সত্যত্ব ও অমরত্ব, কেননা তাহাই জীবনপ্রবাহের টান। সেই টানের বেগেই চিরদিনের আমিত্ববোধ। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই অনাদ্যন্ত-জীবনবাদের দিকে আধুনিক বিজ্ঞানও অগ্রসর হইতেছে।

সেঁজুতির অন্যান্য কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'যাবার মুখে', 'তীর্থযাত্রিণী', 'নতুন কাল', 'চল্‌তি ছবি' ও 'ঘর ছাড়া'। যাবার-মুখের[১] প্রথম কয় ছত্রের ছন্দঃস্পন্দ অভিনব।

যাক্ এ জীবন,
যাক্ নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
জুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি 'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক!

এ ছত্রগুলি স্বচ্ছন্দে এইভাবে বিন্যাস করিয়া মিল রাখা যাইত

যাক্ এ জীবন,
যাক্ নিয়ে যাহা টুটে যায়,
যাহা ছুটে যায়,
যাহা ধূলি হয়ে লোটে ধূলি 'পরে,
চোরা মৃত্যুই যার অন্তরে.
যাহা রেখে যায় শুধু ফাঁক।

---

১ রচনা ২২ মাঘ ১৩৪৩।

ইহাতে পদবিন্যাস সুগম হইত, কিন্তু স্বাদ কমিত। ছন্দের লালিত্য বর্জন করায় এখানে ব্যঞ্জনার জোর বাড়িয়াছে।

তীর্থযাত্রিণী ও চল্‌তি-ছবি[১] এবং ঘরছাড়া[২] গল্পগর্ভ ছবি-কবিতা, পুনশ্চে স্থান পাইবার উপযুক্ত ॥

৪

'প্রবাহিনী' (পৌষ ১৩৪৫) গানের বই। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে রচনাগুলি গান বলিয়া কোন কোন পদে ছন্দের বাঁধন নাই। "তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতিকাব্যরূপে পড়া যাইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" রচনাগুলি সংখ্যায় ২৩৫, ছয় শীর্ষকে বিভক্ত—'গীতগান' (৩৫), 'প্রত্যাশা' (৩৩), 'পূজা' (৩০), 'অবসান' (২১), 'বিবিধ' (৩৩), এবং 'ঋতুচক্র' (৮৩)। কোন কোন গান পূর্বপ্রকাশিত (বিশেষ করিয়া প্রথম অংশে)। তাহার মধ্যে গীতালির গানও আছে ("কূল থেকে মোর গানের তরী")।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অত্যন্ত বিশিষ্ট রচনা ও তাৎপর্যপূর্ণ গান প্রবাহিনীতে আছে। যেমন, গীতগান অংশের তিন নম্বর।

নীল আকাশের আলোর ধারা
পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দুচোখ পূরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে ॥
দূরে যাবার খেয়াল হ'লে সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজ্‌নে-ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।
এই-যে এসব ছোটো-খাটো পাইনি এদের কূল কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা ॥
লাগলো ভালো মন ভোলানো এই কথাটাই
গেয়ে বেড়াই,…

৫

'প্রহাসিনী' (পৌষ ১৩৪৫) বইটির কবিতাগুলি সবই হাল্‌কাছাঁদের। 'আকাশ-প্রদীপ' (বৈশাখ ১৩৪৬)[৩] বইটিতে কবিতাসংখ্যা বাইশ। একটি কবিতা ১৯৩৭ সালে, বারোটি ১৯৩৮ সালে আর ছয়টি ১৯৩৯ সালে লেখা। তিনটির

[১] কবিতা দুইটি আলমোড়ায় লেখা (মে ১৯৩৭)। [২] রচনা ২২ নভেম্বর ১৯৩৬।
[৩] প্রথম সংস্করণে আছে "১৩৪৫"। মুদ্রণপ্রমাদ।

রচনাকাল অনুল্লিখিত, সম্ভবত ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে লেখা। শেষের দুইটি গদ্য-কবিতা।[১] অনেকগুলি কবিতায়[২] জীবনস্মৃতির খেই রহিয়াছে। এদিক দিয়া কাব্যনামের সার্থকতা বোঝা যায়। কাব্যনামের ইঙ্গিত রহিয়াছে নাম-কবিতায়।

গোধূলিতে নামল আঁধার
ফুরিয়ে এল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হোলো
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।

'ভূমিকা'য় (১৬ মার্চ ১৯৩৯) রবীন্দ্রনাথ কবিতায় স্মৃতিচিত্রণের অর্থ খুঁজিয়াছেন।

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।

আপনাকে কবি নিজের রচনায় আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সৃষ্টি-মধ্যে ছড়ানো কবিকে চেনা গেলে তবেই তাঁহার বাঁচিয়া থাকা।

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয় দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা বলে জানি।

আকাশ-প্রদীপে ভাষা আগেকার চেয়েও সরল এবং আরও আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিমান ব্যবহারে সংবেদনা অভিনব। প্রথমেই ধরি 'ধ্বনি' (৯ জুন ১৯৩৭)।

ফেরিওয়ালাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে সকল অলি গলি
জানিনি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগদাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি'।…

---

১ 'ময়ূরের দৃষ্টি' ও 'কাঁচা আম'।
২ 'যাত্রাপথ', 'স্কুল-পালানে', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'শ্যামা', 'পঞ্চমী' ও 'কাঁচা আম'।

বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র-খেয়ায় ডিঙা
বাজাইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্ত শব্দের অশ্বারোহী।

'শ্যামা'য় (৩১ অক্টোবর ১৯৩৮)

কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকণে নিরেট রোদ
দুহাতে পড়েছে বাঁধা।

'পঞ্চমী'তে (২৯ নভেম্বর ১৯৩৮)

দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

'যাত্রা'য় (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯)

সরকারী যা আইন কানুন তাহার যাথাযথ্য
অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক্ বিশেষত্ব
রুদ্ধদুয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা,
এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাকা
ভিন্ন ভিন্ন চাল।

'ময়ূরের দৃষ্টি'তে

লিখতে বসি,
কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস।

'কাঁচা আম'এ

পুরানো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।

শ্যামা কবিতায় কিশোর প্রেমের স্মৃতিমন্থন। শেষে চিরকালের আশ্বাস।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

অবশেষে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন।

পুলকে বিষাদে মেলা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই।

'প্রশ্ন' ছোট কবিতা। ভাবে ও ভাষায় কবিতাটি যেন ক্ষণিকা-খেয়ায় পাণ্ডুলিপিভ্রষ্ট। কেবল শেষ তিন ছত্রে এখনকার ভাব ও ভাষা।

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম ঘাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল···
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।

'সময়হারা' কবিতাটি (১ জানুয়ারি ১৯৩৯) অনেক দিক দিয়া অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনা। সমসাময়িক একদল (—প্রধানত তরুণ, তবে কিছু অতরুণও দলের পিছনে ছিল—) রবীন্দ্রনাথের রচনা উপস্থিত কালের প্রগতিমান্ কাব্যচিন্তার ও কবিতাশিল্পের অনুপযোগী বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্র-কাব্যসৃষ্টিকে কালবারিত বলিয়া ধার্য করিয়াছিল। আত্মপরিহাসচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রতি কিছু অকরুণ তবে ন্যায্য কটাক্ষপাত করিয়াছেন। প্রাচীন কবিতার ইঙ্গিতবহ ও ছড়ার বুকনি-বিজড়িত 'সময়হারা' অত্যন্ত উপভোগ্য pastiche, ধরনের কবিতা। প্রাচীন কবির দুঃখপ্রকাশ এবং আধুনিক কবির দুঃখবিলাস এই দুইয়ের উপর রবীন্দ্রনাথ দোহাতিয়া বাড়ি মারিয়াছেন।

আধপেটা খাই শালুকপোড়া, একলা কঠিন ভুঁয়ে
চ্যাটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন মনে—
"উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।"

কবির বেশ বয়স হইয়াছে। তাঁহার শিল্পের পসার নষ্ট। তাঁহার মালের কাটতি

নাই। তাই পুতুলগড়ার বদলে এখন খেয়ালগড়া চলিতেছে। এবং অবকাশ তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে না।

সজনে গাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে,[১]
গোধূলিতে সুর্যি মামার বিয়ে;[১]
মামি থাকেন সোনার বরণ ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।...
সময় আমার গেছে বলেই জানার সুযোগ হোলো,
"কলুদ ফুল"[১] যে কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।

আশেপাশে প্রত্যহের ছন্নছাড়া দৈন্যের আয়োজন রাশীভূত।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার।
কালের অলস চরণপাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আমার বাঁকা গলিটাতে।

সন্ধ্যায় তন্দ্রায় স্বপ্নের ঘোরে আশা জাগে।

সন্ধে নামে পাতা-ঝরা শিমূল গাছের আগায়
আধ ঘুমে আধ জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্টারিটির পথে
স্বপ্ন মনোরথে ;
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,
"ওরে পুতুল-ওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,...
ঐ যে বলিস, বিছানা তোর ভূঁয়ে চ্যাটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা,
ঐ যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি,
এটা নেহাৎ স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি।

---

১ ছেলেভুলানো ছড়ায়

'কমলাপুলির টিয়েটা। সুয্যি মামার বিয়েটা।...
হলুদ বনে কলুদ ফুল। মামীর মাথায় টগর ফুল।'

পাসনি খবর বাহান্নজন কাহার
পালকি আনে, শব্দ কি পাস তাহার।
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে[১],
সখীর সঙ্গে আস্‌ছে রাজার মেয়ে।

'নামকরণ'এর (চৈত্র পূর্ণিমা ১৩৪৫) ভাষাছাঁদ সংযত, গম্ভীর। কবির সৃষ্টিরহস্য এই কয়ছত্রে ঈষৎ-উদ্‌ঘাটিত।

উপমা তুলনা যত ভিড় ক'রে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে
কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ ওঠে জেগে জেগে।

নারীকে পুরুষ যেভাবে চায় পুরুষকে নারী ঠিক সেভাবে চায় কিনা—এই সমস্যা 'তর্ক' কবিতায় উপস্থাপিত। কবিতাটি 'নামকরণ'এর জুড়ি। সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে লেখা।

সৌন্দর্যের অস্পষ্টতা ও দূরত্ব অপূর্ণকে পূর্ণতার দিকে টানে। ইহাকে মোহ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিছু নয়।

এড়ায়ে নদীর টান যে চাহে নদীরে
পড়ে থাকে তীরে।

ভাবের বিলাসী যে পুরুষ সে মোহতরী বাহিয়া সুধাসাগরের প্রান্তে আসিয়া

আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া,
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।

৬

'নবজাতক'এর (বৈশাখ ১৩৪৭) কবিতাসংখ্যা পঁয়ত্রিশ। একটি ১৯৩২ সালে[১], একটি ১৯৩৫ সালে[২], দুইটি ১৯৩৭ সালে[৩], দশটি ১৯৩৮ সালে[৪], সাতটি

---

১ ছেলেভুলানো ছড়ায়
'বর আসছে বাঘনাপাড়া। বড়বউ গো রান্না চড়া॥'

২ 'পক্ষী মানব' (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮)। ৩ 'অবিজিত' (৫ জুন ১৯৩৫)।

৪ 'হিন্দুস্থান' (১৯ এপ্রিল ১৯৩৭) ও 'ক্যাণ্ডীয় নাচ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)।

৫ 'নবজাতক', 'উদ্‌বোধন', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বুদ্ধভক্তি', 'কেন', 'রাজপুতানা', 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন', 'মংপু পাহাড়ে', 'ইস্‌টেশন' ও 'প্রশ্ন'।

১৯৩৯ সালে[১], সাতটি ১৯৪০ সালে[২] লেখা। সাতটির রচনাকাল উল্লিখিত নাই।[৩] রচনাকাল, বিষয় ও মেজাজ অনুসারে নবজাতকের কবিতাগুলি বৈচিত্র্য-পূর্ণ। কবির দৃষ্টি সর্বত্র আত্মমুখীন নয়। ১৯৩৮ সালে লেখা 'পক্ষী মানব' কবিতাটিকে উপেক্ষা করা সহজ। কিন্তু ইহার মধ্যে বিজ্ঞান-অনুশীলিত যন্ত্র-সভ্যতার পরিণাম সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশিত তাহা যে ফলিতে চলিয়াছে সেকথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও ভয়াবহ যে অবস্থা, ক্রমবর্ধমান জনপিণ্ডের চাপে ও দুর্দম লোভের আকর্ষণে অমানব প্রকৃতির নিষ্পেষণ ও ধ্বংস সংঘটিত হইতে চলিয়াছে, সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়াছেন।

দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

জীবনের কবি তিনি, তাই তবু আশা ছাড়িবেন না।

আর্তধরার এই প্রার্থনা শুন
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।

জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা দুইটি কবিতা নবজাতকে আছে। একটি ১৩৪৫ সালের, নাম 'উদ্বোধন'। এই তারিখে লেখা 'জন্মদিন' নামে কবিতাটির প্রসঙ্গে আকাশ-প্রদীপের আলোচনায় উদ্বোধনের বিচার করিয়াছি। নব-জাতকের 'জন্মদিন' ১৩৪৬ সালের জন্মদিনে লেখা। রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে ছিলেন। তাই কালসমুদ্র-তীর এবং কালরথ-চক্র প্রতিমানরূপে দেখা দিয়াছে।

কয়েকটি কবিতায় দেশের ও বিদেশের (সমসাময়িক) বিকৃতির ও জিঘাংসার

---

১ 'আহ্বান', 'এপারে-ওপারে', 'সাড়ে নটা', 'জন্মদিন', 'জয়ধ্বনি', 'প্রজাপতি' ও 'রাত্রি'।

২ 'শেষ দৃষ্টি', 'রাতের গাড়ি', অস্পষ্ট', 'জবাবদিহি', 'শেষ বেলা', 'রূপ-বিরূপ' ও 'শেষ কথা' (৪ এপ্রিল ১৯৪০)।

৩ 'ভাগ্যরাজা', 'ভূমিকম্প', 'প্রবাসী', 'রোমান্টিক', 'শেষ হিসাব', 'নক্সা' ও 'প্রবীণ'।

বিরুদ্ধে কঠিন ভর্ৎসনা আছে। 'ভূমিকম্প'এ উপলক্ষ্য ১৩৪০ সালের মাঘ মাসে বিহার-বিধ্বংসী দৈবদুর্যোগে ভাঙা-গড়ার দোলায় চাপিয়া কবি সত্যশক্তি আর অপশক্তির হারজিতের পালা দেখিলেন।

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতাল দেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়েছিল ছদ্মবেশে···
উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রী সুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে।···
অন্তরে তোর গুপ্ত যে পাপ রাখলি চেপে
তার ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠল কেঁপে।
যে বিশ্বাসের আবাসখানি
ধ্রুব ব'লেই সবাই জানি
এক নিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,

'হিন্দুস্থান'এ কবি ভারতবর্ষের ইতিহাসের চিরন্তন দ্যূতক্রীড়া ও তাহার পরিণাম উপলব্ধি করিয়াছেন।

পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি, সাদায় কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর।

ইংরেজ-শাসনের দিনে রাজপুতানার রাজাদের নিজ অধিকারে প্রজাদের উপরে আধিপত্যে কোন বাধা ছিল না। সার্বভৌম ইংরেজশক্তির মিত্রশক্তি বলিয়া তাঁহারা গণ্য হইতেন। যে রাজপুতানার সঙ্গে টডের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমাদের পরিচয় সেই রাজপুতানার সঙ্গে নাবালক-শাসিত সমসাময়িক রাজপুতানার তুলনা হইতে কবির মনে যে ব্যথা জাগিয়াছিল তাহাই 'রাজপুতানা' কবিতায় অভিব্যক্ত।

আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা দুঃসহ দুর্গতি।

সাম্রাজ্যলোভী জাপানের চীন আক্রমণ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। জাপানের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা দীর্ঘকালের। এখন তিনি সে শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতেছেন না। 'বুদ্ধভক্তি'তে কবির উষ্মা প্রকটিত। 'প্রায়শ্চিত্ত'এ জাপানের চীন আক্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া ক্ষমতালোভী হিংস্র রাষ্ট্রের ও আধুনিক পাশ্চাত্য "সভ্যতা"র ভণ্ডামি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কবিতাটি অত্যন্ত জোরালো।

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভুরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।···
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিতার কাছে জ্যোতিষ (astronomy) পড়িয়াছিলেন। গৃহশিক্ষকের কাছেও বিজ্ঞানের পাঠ লইয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বরাবর কৌতূহল ছিল। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে তিনি ঔৎসুক্য পোষণ করিতেন। আইনস্টাইন-প্লান্‌কের আপেক্ষিকবাদ ও আণবিক গণিত-জ্যোতিষবিদ্যার প্রসার অনেক দূর বাড়াইয়া দিলে রবীন্দ্রনাথেরও কৌতূহল বেশি করিয়া জাগিয়াছিল। নিজের লব্ধ জ্ঞানটুকু তিনি সাধারণ পাঠককে দিবার জন্য 'বিশ্বপরিচয়' লিখিলেন (আশ্বিন ১৩৪৪)।

আধুনিকতম বিজ্ঞান-চিন্তা তাঁহার জীবনভাবনায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক স্থিতিভূমি বিচলিত হয় নাই। তাহার কারণ, তাঁহার জীবনচিন্তা কোন "বিশ্বাস" (dogma) হইতে উৎসারিত নহে। তাই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাঁহার জীবনদৃষ্টির ও অধ্যাত্মভাবনার পরিপন্থী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মন যে কতটা সচল ছিল তাহার একটা প্রমাণ পাই সমসাময়িক কবিতায় বৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রতিবিম্বনে। নবজাতকের দুইটি কবিতা—'কেন' ও 'প্রশ্ন'—ইহার উদাহরণ।

সৃষ্টির অজ্ঞাত কেন্দ্রমূল হইতে যে তেজ দূর হইতে দূরান্তরে অপস্রিয়মাণ অনন্থমেয় নক্ষত্রময় নীহারিকাবেষ্টনী-মধ্যস্থিত কোটি কোটি সূর্যগ্রহকে দীপ্তিমান্ করিয়া দৃশ্য-অদৃশ্য আলোকস্রোত চারিদিকে বিচ্ছুরিত করিতেছে তাহার কণামাত্র লইয়া আমাদের পৃথিবীর ক্ষুদ্র পিণ্ডে জীবনসঞ্চার হইয়াছে। আর

অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।

কবিও পৃথিবীর মতো সৃষ্টিধারণ করিয়াছেন।

বহু যুগযুগান্তরের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

গ্রহনক্ষত্র জীবনান্তে মৃৎপিণ্ডে পর্যবসিত হইয়া পরিশেষে পরস্পর সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং জ্যোতির্বাষ্প সৃষ্টি করে। কবি ভাবিতেছেন, তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার বাণীমূর্তির ও তাঁহার নিগূঢ় সত্তার তেমন দশা হইবে কিনা।

প্রশ্ন মনে জাগে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার,
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন।
কিন্তু কেন।[1]

'প্রশ্ন' কবিতায়[2] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে মানুষের "আমি"ত্ব রহস্য মিলাইয়া দিয়াছেন।

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।…
বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি বিস্তার,
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
"আমি" উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্রমাঝে অসংখ্য বৎসরে।

সৃষ্টি-বীজের বিনাশ নাই। কিন্তু আত্মা-বীজের কী? এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি "আমি" অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাব নাবি'।…
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

পরিশেষের 'অপূর্ণ' কবিতায় এই সংশয়ের ছোঁওয়া পাইয়াছিলাম।

---

১ 'কেন'। রচনা ১২ অক্টোবর ১৯৩৮। ২ রচনা ৭ ডিসেম্বর ১৯৩৮।

'এপারে-ওপারে'[১] কবিতায় কবি যেন জীবনসমুদ্রের তীরে বসিয়া তরঙ্গভঙ্গ দেখিতেছেন। মন টানিতেছে, কিন্তু ঝাঁপ দিয়া পড়িবার উপায় নাই। রাস্তার ওপারে "ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা" দিনেরাতে "এলেমেলো আঘাতে সংঘাতে" অবিরাম নানাধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহার কিছুই দীর্ঘকাল টিকে না।

মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল
ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।

সেই তাল-ফেরতায় কবির চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে ব্যগ্র হইয়া উঠে "সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি"। কিন্তু

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

বেতারে "বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে" শুনিয়া কবির চিত্ত উধাও হইয়া মেঘদূতের যক্ষের সঙ্গ লইয়াছে 'সাড়ে নটা' কবিতায়।[২] আকাশে ভাসিয়া আসা অমূর্ত কণ্ঠের গান

রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার।
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সঙ্গীতের ধারা।

এমনি অদ্ভুত মেঘদূতও।

বাণীমূর্তি সেও একা
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।

নিজের জীবনের অপূর্ণতা বলিয়া কবি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন 'জয়ধ্বনি'তে।

বার বার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত ;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।

---

[১] রচনা পুরী, ২০ বৈশাখ ১৩৪৬। [২] রচনা ৮ জুন ১৯৩৬

মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

চারদিকে সারাক্ষণ অপূর্ণ শক্তির অপব্যয় ও বিকৃতি দেখিয়াছেন, তবুও কবি মানব-জীবনের শাশ্বত মহিমায় বিশ্বাস হারান নাই। সে মহিমা তিনি বারে বারে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

৭

'সানাই' বইটিতে (আষাঢ় ১৩৪৭) কবিতা-সংখ্যা ষাট। অনেকগুলি কবিতাই আকারে ছোট। কয়েকটি ছোট কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সুর লাগাইয়া গানে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। একটি কবিতা ('নতুন রঙ') অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া পরে দুইটি গানে পরিণত।[১] কবিতা ও গান দুই হিসাবেই 'রূপকথায়' অত্যন্ত চমৎকার।

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।

সানাইয়ের তেইশটি কবিতার রচনাকাল দেওয়া নাই। বাইশটি ১৯৪০ সালে, ছয়টি ১৯৩৯ সালে, সাতটি ১৯৩৮ সালে এবং একটি করিয়া ১৯৩৮ ও ১৯৩৭ সালে লেখা। একটি ('বাসা বদল')[২] পুরাপুরি গল্প-কবিতা। দুইটিতে[৩] গল্পের আভাস আছে। নাম-কবিতাটি ৪ জানুয়ারি ১৯৩০ রচিত কবিতাটি কিন্তু বইয়ের গোড়াতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, ইহা লক্ষণীয়। মর্মকথা

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।

---

১ 'গীতবিতান' প্রেম ২০৯ ও ২২৯।

২ রচনাকাল অনুল্লিখিত।

৩ 'পরিচয়' (১৩ জুন ১৯৩৯) ও 'অনসূয়া' (২০ মার্চ ১৯৪০)।

এ সানাইয়ের তান কবি শুনিতেছেন। তাই বলিয়াছেন,

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমাণ্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে-পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণ বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় সে পথের অলক্ষ্য আকাশে। ('অনসূয়া')

'মানসী' নামে দুইটি কবিতা আছে, প্রথমটির প্রায় এক বৎসর পরে দ্বিতীয়টি লেখা। প্রথম কবিতায়[১] কবি যৌবনের মানসীকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করিয়াছেন।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সঙ্গে কথা কহি।
ম্লান রৌদ্র অপরাহ্ণবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা
অনাগত সৃজনের বিশ্বকর্তা সম।...
বাহিরেতে বাণী মোর হোলো শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ।...
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী।

দ্বিতীয় 'মানসী'র[২] ভাষা ও ছন্দ হালকা। কবির কল্পনা প্রসন্ন, উৎসুক। আবার যেন পদাবলীর দিন ফিরিয়া আসিয়াছে।

নীপবন হতে সৌরভ আসে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।
জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।
সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া
রিমিঝিমি বারি বর্ষে
মনে মনে ভাবি কোন্ পালঙ্কে
কে নিদ্রা দেয় হর্ষে।...
বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।

---

[১] রচনা ৯ জুন ১৯৩৯। [২] রচনা ২২ মে ১৯৪০।

'অপঘাত'[১] সানাইয়ের বোধ করি সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট কবিতা। কল্পনার জালবুনানি নাই, কেবল ছবির পর ছবি গাঁথা। উপসংহারে দুইটি মাত্র ছত্রে লক্ষ্যভেদ।

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি বাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশী পাড়ার কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ ব'সে আছে ছিপ ফেলে।...
কেটে নেওয়া ইক্ষুক্ষেত, তারি ধারে ধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে...
নববিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে পাশে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হোলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে॥

৮

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনখানি কবিতাগ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলির কোন নাম দেওয়া নাই। ছন্দের বৈচিত্র্যও নাই।

'রোগশয্যায়' (পৌষ ১৩৪৭) বইটিতে কবিতাসংখ্যা চল্লিশ (উৎসর্গ

১ রচনা ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।

সমেত)। তাহার মধ্যে আটাশটি ১৯৪০ সালের নভেম্বরে লেখা, নয়টি ডিসেম্বরে, একটি অক্টোবরে। দুইটির রচনাকাল দেওয়া নাই।

শরীরের অপটুতায় ও ব্যাধির আক্রমণে কবির চিত্ত যেন রোগীর কক্ষে শ্বাসরুদ্ধ। (রোগের ছায়াচ্ছন্নতা থাকায় 'রোগশয্যায়' প্রান্তিকের সঙ্গে তুলনীয়।) "অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা" বলিয়া কবিতাগুলিকে উৎসর্গ-চিহ্নিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকাশের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন প্রথম কবিতায়। সুরসভায় উর্বশীর তালভঙ্গ হইলে তাহার উপর মহেন্দ্রের অভিশাপ পড়িয়াছিল। সে ভয় রবীন্দ্রের উরুবশী কাব্যকলাবতীরও আছে।

মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্যকলা হয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ-তলে।

মানবের সভাঙ্গনে খ্যাতির বোঝা নামাইয়া দিয়া ছুটি চাহিতেছেন কবি।

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি' সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;

কয়েকটি কবিতায় অনিঃশেষ প্রাণপ্রবাহ পূর্ণজীবন বলিয়া প্রতীক্ষিত।

মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি,
তবুও সে ফাঁকি নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি,
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া,...
চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।...
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে। ('২')

পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেইমতো ভেসে যাবে সেবার বানাটি
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টা দিন। ('১৪')

মানুষের সুখ আছে দুঃখ আছে, কিন্তু সুখের চেয়ে দুঃখ প্রত্যক্ষতর। দুঃসহ দুঃখ বেড়াজালের মতো মানবসংসার ঘিরিয়া আছে। মানুষের দুঃখের উৎপত্তি তাহার মূঢ়তায়, তাহার "রিপুর প্রশ্রয়ে"।—তত্ত্বজ্ঞানীর এই কথায় মন আশ্বাস মানে না। কিন্তু যখন মনে জানি যে মানবচিত্তের সাধনায় যে-সত্যের রূপ গূঢ় হইয়া আছে "সেই সত্য সুখ দুঃখ সবার অতীত",

তখন বুঝিতে পারি
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তা'রে
তারাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির ;
একমাত্র তারা আছে আর কেহ নাই ; ('২৯')

একদা যৌবনে কবি যেন জীবধাত্রী বসুন্ধরার গর্ভশয্যায় শুইয়া তৃণাঙ্কুর উদ্ভেদের রহস্য অনুভব করিয়াছিলেন, এখন বার্ধক্যে কবি রোগশয্যায় শুইয়া যেন শক্তির অপব্যয়রূপ পাপের প্রতি পৃথিবীর সংহারিণী মূর্তিও উপলব্ধি করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে প্রচণ্ড শক্তিমান্ মহাকায় জীব উৎপন্ন হইয়াছিল। সে-সব জীব বসুন্ধরা বাঁচাইয়া রাখেন নাই। তাহাদের শক্তিভার পৃথিবী সহ্য করে নাই। তাহাদের প্রতি পৃথিবীর "অক্ষমা"[১]।

প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে
সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত ক'রে দেয় মহাভার।
কেহ নাহি জানে
এ বিশ্বের কোন্‌খানে
প্রতিক্ষণে জমা
দারুণ অক্ষমা।...
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা, ('১১')

সাহিত্যে অভিনবত্বের নামে, বিদেশের প্রভাবে অথবা অন্য যে-কোনো কারণে, নৈরাশ্যের ও বিকৃতির আমদানির পসরা দেখিয়া কবি কঠিন রায় দিয়াছেন চতুর্বিংশ কবিতায়। কবির ছাড়পত্র মাঙ্গলিকের জন্য।

---

১ শব্দটির ব্যবহারে নিপুণ শ্লেষ আছে। "ক্ষমা" পৃথিবীর সমার্থক শব্দ

সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদরূপে
চির নৈরাশ্যের দূত ;
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝঙ্কারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে
তবে তার কোন্ আবশ্যক।
শস্যক্ষেত্রে কাঁটাগাছ এসে
অপমান করে কেন মানুষের অন্নের ক্ষুধারে।...
মানুষের কবিত্বই
হবে শেষে কলঙ্কভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি'
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোষের নির্লজ্জ নকলে।

৯

'রোগশয্যায়'এর পরে 'আরোগ্য' (ফাল্গুন ১৩৪৭)। ইহাতে কবিতা-সংখ্যা (উৎসর্গ লইয়া) চৌত্রিশ। দুইটি ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে লেখা, ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে সতেরোটি আর ফেব্রুয়ারি মাসে বারোটি লেখা। তিনটির রচনাকাল দেওয়া নাই। চার-পাঁচটি কবিতা ক্ষুদ্রকায়।

৩১ জানুয়ারির বিকালে ('৪') ও ফেব্রুয়ারির দুপুরে ('৩') লেখা কবিতা দুইটিতে অতীত দিনের স্মৃতি-অবগাহিনী চিত্রাবলীর উদয়ে "আমিত্ব"হীন কবির চিত্তের বেদনভারাক্রান্ত প্রসন্ন কৃতজ্ঞতা নিবেদিত। চিত্রগুলি যেন নদীর স্রোতোবাহিত। প্রথম কবিতায় চিত্রাবলী।

আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

প্রথমে পদ্মাতীরের চলৎছবি।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।...
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি—
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর
ভিড় করে মাছি।

রাস্তায় উপুড়-মুখো গাড়ি,
পাটের বোঝাই ভরা—
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ভজন
আড়তের আঙিনায়।…

তাহার পর যৌবনে গঙ্গা-বক্ষে জ্যোৎস্নারাতের আলেখ্য।

দু'পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।…
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ,…

তাহার পর গাজিপুরের দিন।

পশ্চিমের গঙ্গাতীরে, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজ্‌রার খেতে;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।…
এই-সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে। ('৪')

দ্বিতীয় কবিতায় দ্রষ্টা ও দৃষ্টির স্থিরচিত্র। পদ্মাতীরের প্রশান্তির।

নির্জন রোগীর ঘর
খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্ন-তাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।…

তাঁহার কল্পনাদৃষ্টিতে ভাসিতেছে পদ্মাতীরের প্রশান্তির ছবি।

স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট শুভ্রমেঘ প'ড়ে থাকে আকাশের কোণে
আলোকে ঝিকিয়া-ওঠা-ঘট-কাঁখে পল্লীমেয়েদের
ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলাপে,
গুঞ্জরিত বাঁকা পথে, আম্রবনচ্ছায়ে
কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভৃত শাখায়—
ছায়ায় কুণ্ঠিত পল্লীজীবনযাত্রার
রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।

কবির আনন্দদৃষ্টিতে সেই সবিতারই বন্দনা

যাঁর জ্যোতি রূপে প্রথম মানুষ
মর্ত্যের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।

বেদের যুগে কবির জন্ম হয় নাই। হইলে বৈদিক মন্ত্রে

মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।

আনন্দের বন্দনার উপযুক্ত "ভাষা নাই, ভাষা নাই" বলিয়া

চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে। ('৩')

১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে দশম কবিতাটি লেখা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বাহিয়া কবির চিন্তা বর্তমানে পৌঁছিয়া ভবিষ্যতের ইশারা করিয়াছে।

প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।

সামান্য মানুষের জনতা, চিরকাল যাহার একই রূপ, যাহার প্রয়োজন জীবনের সর্বত্র এবং সর্বকালে, ইতিহাসের গণনায় তাহারা উপেক্ষিত। সে জনতার জীবন-স্রোতের ধারা। সে ধারার অবলুপ্তি নাই।

রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে—

রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

দুপুর বেলায় লিখিলেন একাদশ কবিতাটি। কবির ভাবনা-শ্লেটে ইতিহাসের কথা মুছিয়া গিয়াছে। সামনে পলাশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে। তাই দেখিয়া কবির মন উঠিয়াছে ভরিয়া।

পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুন দিনের
আজ এই সম্মানহীনের
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা
যেথা আমি সাথিহীন একা

একটি অবাঞ্ছিত লাঞ্ছিত পাড়ার কুকুর প্রত্যহ রবীন্দ্রনাথের কাছে আসিত। পরিচারকেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিত। জানিতে পারিয়া কবি তাহাদের তিরস্কার করিয়াছিলেন। এই কুকুরটিকে লইয়া চতুর্দশ কবিতাটি লেখা (৭ পৌষ ১৩৪৭ সকাল)।

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।
বাক্যহীন প্রাণিলোক-মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে—···
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার।
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না—
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানুষের সত্য পরিচয়।

সপ্তদশ কবিতাটিও অপূর্ব এবং অভিনব। যে মা তাঁহার কাব্যে স্থান পান নাই বলিয়া কবি প্রৌঢ় বয়সে একদা দুঃখ করিয়াছিলেন এখন রোগ-শুশ্রূষার মধ্যে সেই মায়ের স্পর্শ অনুভব করিতেছেন।

যৌবন এ জীর্ণ নীড় পিছে ফেলে দিয়ে যায় ফাঁকি
কেবল শৈশব থাকে বাকি।
বদ্ধ ঘরে কর্মক্লান্ত-সংসার বাহিরে
অশক্ত সে শিশুচিত্ত মা খুঁজিয়া ফিরে।···
যার আবির্ভাব
ক্ষীণজীবিতেরে করে দান
জীবনের প্রথম সম্মান।
'থাকো তুমি' মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়া
কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিখিলের দাওয়া
শুধু বেঁচে থাকিবার।

রচনাকালের দিক দিয়া দেখিলে পঞ্চবিংশ কবিতাটি আরোগ্যের প্রথম রচনা (৫ ডিসেম্বর ১৯৩০)। কবিতাটি ছোট। ইহাতে কবি আপন সৃষ্টি-রহস্যের গভীরতার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা সম।
সে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনা-কক্ষপথে।

১০

'জন্মদিনে' (১ বৈশাখ ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁহার শেষ কবিতার বই। কবিতা-সংখ্যা উনত্রিশ। একটি ১৯৩৯ সালে, দশটি ১৯৪০ সালে আর বারোটি ১৯৪১ সালে (জানুয়ারি হইতে মার্চের মধ্যে) রচিত। ছয়টির রচনাকাল অনুল্লিখিত।

জন্মদিনের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন প্রত্যহই নবজীবনের নবীন আনন্দবিস্ময় দৃষ্টিতে সব-কিছু দেখিতেছেন। এই প্রাত্যহিক নবজন্মের আনন্দ পরলোকে নবজন্মসম্ভাবনার বেদনা ভুলাইয়া দিয়াছে।

বহু জন্মদিনের গাঁঠবাঁধা নিজ জীবনসূত্রকে কবি যেন সৃষ্টির আদিকাল হইতে স্মরণ করিতেছেন।[১]

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—…
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।

তাহার পর দীর্ঘ যুগ ধরিয়া "অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া" পশুলোক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, "কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়"।

অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে,
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী, …
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,—
এ আমার পরম বিস্ময়।

দশম কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন নিজের সৃষ্টির সংকীর্ণতার ও অসম্পূর্ণতার জন্য কুণ্ঠিত ও লজ্জিত।

---

১ '৫' (বৈশাখ ১৩৪৭), '২' (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।…
বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মোর মন জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণে। …
আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।

কিন্তু সর্বত্র প্রবেশের পথ তো নাই। প্রবেশকারীর পক্ষেও দ্বারের বাধা আছে।

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

সামান্য মানুষের জীবনের অন্তঃপুর সে মানুষের সমান চালের ও সমান চিন্তার মানুষের কাছেই উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। তাই কবি বলিতেছেন

সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি—সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

কবি সে চেষ্টাও করেন নাই। কেননা

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

তিনি জানেন যে, তাঁহার কবিতা

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

ইহাও তিনি জানেন যে এখনও সর্বত্রগামী কবিতার কবি অনাগত।

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

জনগণের মনের তলায় পৌঁছিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা দাবি করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের চেষ্টাকে শুধু ভঙ্গি দিয়া চোখ ভুলাইবার ফন্দি ও "সৌখিন মজদুরি" বলিয়া মৃদু ভৎ র্সনা করিয়া ভবিষ্যকবিকে স্বাগত জানাইয়াছেন।

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের।
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

উনবিংশ কবিতায় বাল্যস্মৃতির আলোড়ন। রচনাকাল অনুল্লিখিত। আগেকার রচনা হইতে পারে।

বিংশ কবিতায় কবিকল্পনার বলিষ্ঠতা আশ্চর্য। এখানে কবিকল্পনা বিজ্ঞানের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে।

মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী

শব্দেরা বাক্যের শাসন লঙ্ঘন করিয়া

নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।...
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদি কাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।

বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাইয়া মানুষ দিগ্‌বিজয় করিয়াছে। আদিম শব্দকেও সে তেমনি বশ করিয়া জটিল নিয়মসূত্রজালে বাঁধিয়া দূর-দেশে অনাগত কালে বার্তাবহনের কাজে লাগাইয়াছে।

বল্গাবদ্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।

কবি ভাবিতেছেন স্বপ্নের জাল যেমন দেশ-কাল কার্য-কারণ সংগতি-অসংগতি ইত্যাদির ধার না ধারিয়া আপনা-আপনি বোনা পড়ে তেমনি বেপরোয়া শব্দেরাও

ঘুমের ভাঁটার জলে
নাহি পায় বাধা—
যাহা তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা।
তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে যেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল

তখন সে শিল্পের কাজ কেমন লাগিবে তাহা কবি অদ্ভুত সুন্দর প্রতিমান দিয়া বুঝাইয়াছেন।

যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা,
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়,
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়,
সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।

সারা বেলা ধরিয়া কবি মনে মনে দেখিতেছেন,

দলে দলে স্বপ্ন ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।

শেষ কবিতায়—রচনাকালের দিক দিয়াও (৯ মার্চ ১৯৪১)—কবি যেন শেষ আভাষণ দিতেছেন।

যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিব দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি ॥

১১

তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগ্রন্থগুলি বাহির হইয়াছে,—'ছড়া' (ভাদ্র ১৩৪৮), 'শেষ লেখা' (ঐ), 'স্ফুলিঙ্গ' (২৫ বৈশাখ ১৩৫২), 'বৈকালী' (৭ পৌষ ১৩৫৮) ও 'চিত্রবিচিত্র' (শ্রাবণ ১৩৬১)। 'বৈকালী' লেখনের মতো কবির হস্তাক্ষরে লিথো ছাপা। লেখনের সঙ্গেই বুডাপেস্টে লিথো-প্লেটগুলি তৈয়ারি হইয়াছিল কিন্তু কোন কারণে ছাপা হয় নাই; কতকগুলি প্লেট হারাইয়া যাওয়ায় 'বৈকালী' পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই। বিদেশে রচিত কয়েকটি ভালো গান বৈকালীতে আছে॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নাটক ঃ প্রকৃতি প্রতিযোগী ব্যক্তি

(১৮৮১-১৮৮৮)

১

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখনও কলিকাতার সৌখিন বড়লোকদের বাড়িতে সঙ্গীতের (ও বাইনাচের) আসর, মর্যাদা ও বাহাদুরি দুইদিক দিয়াই, জমজমাট ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতজ্ঞ গুণীর মর্যাদা বুঝিতেন এবং সামাজিক ধর্ম-অনুষ্ঠানের (ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার) অঙ্গ বলিয়া সঙ্গীতের চর্চায় ছেলেমেয়েদের অনুরাগী রাখিতে উৎসাহী ছিলেন। ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়িতে ওস্তাদ গাইয়ের কাছে গান শিখিত, রবীন্দ্রনাথও শিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দুই দাদা, বড় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও চতুর্থ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশি ও বিলাতি যন্ত্রসঙ্গীতে—হার্মোনিয়ম, বেহালা, বাঁশি, পিয়ানো ইত্যাদি বাজনায়—পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুরা এবং তাঁহাদের খুল্লতাত-পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। আসলে গণেন্দ্রনাথই জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি নাটকপ্রহসনের রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহাদেরই উৎসাহে 'নবনাটক' রচনা করিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যসম্প্রদায় জোড়াসাঁকো থিয়েটার নামে খ্যাত ছিল। (পাথুরিয়াঘাটায় যে ঠাকুরবাড়ি ছিল সেখানে যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে যে অভিনয়পরম্পরা ঘটিয়াছিল তাহা পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার বলা যায়। যতীন্দ্রমোহন অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন।) রামনারায়ণ তাঁহারও পোষকতা পাইতেন। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের কালে রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ দুইটি নাটকের রচনাকালে তিনি শৈশব উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং অগ্রজের সাহিত্য-সঙ্গীতের

[১] গণেন্দ্রনাথ কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন (১২৭৫)। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ) পৃ ৬৪ দ্রষ্টব্য। পিতা গিরীন্দ্রনাথও একটি ছোট নাটক অথবা প্রহসন লিখিয়াছিলেন। তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বৈঠকে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে। সরোজিনী, অশ্রুমতী ও স্বপ্নময়ী (১৮৮২)—এই তিনটি নাটকের কোন কোন গান রবীন্দ্রনাথের রচনা।[১] শেষ নাটকটির পরিকল্পনায় ও সংশোধনে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল ॥

২

প্রথমবার বিলাতে গিয়া সেখানকার গৃহসংসারের পরিমণ্ডলে গীত ও অভিনয়ে আনন্দচর্চার আস্বাদ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের পরিবারে সেই আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্টি করিতে মন করিলেন। এই সূত্রেই তাঁহার নাট্যরচনার আরম্ভ। পারিবারিক পরিমণ্ডলে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত ও প্রকাশিত (ফাল্গুন ১২৮৭) এবং "বিদ্বজ্জন-সমাগম" উপলক্ষ্যে প্রকাশ্যে অভিনীত হইয়াছিল (১৬ই ফাল্গুন শনিবার)। এই অভিনয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শনার্থে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিছু টিকিট বিক্রয়ও হইয়াছিল।

অন্যান্য কৈশোরক কাব্যের মতো কারুণ্যস্নেহ বাল্মীকি-প্রতিভার মুখ্য রস। বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল কাব্যের প্রভাব শেষের দিকে স্পষ্ট।

> বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুইস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।[২]

"(আমার) কোথায় সে উষারাণী প্রতিমা!" এবং "হৃদয়ে রাখ গো চরণ তোমার।" —এই দুইটি গানে সারদামঙ্গল হইতে যথাক্রমে তিন ও পাঁচ ছত্র গৃহীত হইয়াছে। আরও দুইটি গানে সারদামঙ্গলের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "একি এ, একি এ স্থির চপলা!" —এই গানের প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে সারদামঙ্গলের এই তিন ছত্র তুলনীয়

> কিরণে কিরণময়
> বিচিত্র আলোকোদয়,
> ম্রিয়মাণ রবি ছবি ভুবন উজিল!

"এই যে হেরি গো দেবী আমারি!"—এই গানে সারদামঙ্গলের আরম্ভ-সঙ্গীতের রেশ আছে। রচনাভঙ্গি অনুসারে "এখন কর্ব্ব' কি বল!", "তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়," এবং "কালী কালী বলো রে আজ"—এই তিনটি গান অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলিয়া মনে করি।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ) পৃ ২৯৩, ২৯৮, ৩০০-৩০১ দ্রষ্টব্য।

২ জীবনস্মৃতি।

বাল্মীকি-প্রতিভায় গীতিনাট্যের নূতন রূপ দেখা গেল। গান এখানে সংলাপের প্রতিধ্বনি নয়। গান ও সংলাপে মিলিয়া নাট্যরস জমিয়াছে।

'কাল-মৃগয়া' (অগ্রহায়ণ ১২৮৯)[১] প্রভাত-সঙ্গীতের সমসাময়িক। ইহারও মূল সুর কারুণ্য-স্নেহ। অধিকন্তু এখানে শোকদহনের ভিতর দিয়া ক্ষমা-সংযমের আদর্শ দেখানো হইয়াছে। কাল-মৃগয়াও "বিদ্বজ্জনসমাগম" উপলক্ষ্যে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ইহার গানগুলির রচনায় দৃঢ়তা দেখা দিয়াছে। প্রথম দৃশ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এর পূর্বাভাস আছে। পঞ্চম দৃশ্যে বনদেবীদের গানে একটি বৈষ্ণব-পদের ("হামারি দুখের নাহি ওর") অনুসরণ আছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোন রচনায় রামায়ণ হইতে কোন কাহিনী গৃহীত হয় নাই। তবে কোন কোন গানে ও কবিতায় অহল্যার উপাখ্যানের উল্লেখ অথবা ইঙ্গিত আছে॥

৩

১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ দুইখানি ছোট নাট্যরচনা লিখিয়াছিলেন। একখানি প্রধানত পদ্যে, আর একখানি গদ্যে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রধানত পদ্যে লেখা নাট্যকাব্য, ষোল দৃশ্যে গাঁথা। গদ্য অংশগুলি প্রায় সবই কাহিনীর ভারহরণের উদ্দেশ্যে সংযোজিত। মূল অংশ কর্ণাটকে সমুদ্রকূলে কারোয়ারে থাকিতে লেখা হইয়াছিল। কয়েকটি গান কারোয়ার হইতে জলপথে বোম্বাই ফিরিবার সময়ে স্টীমারে রচিত। নাট্য-কাহিনীর ভূসংস্থান কারোয়ারকে মনে পড়াইয়া দেয়।

পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে ;
নিম্নে বনভূমি মাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণছায়া উপরে পড়েছে ;
চারিদিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে স্তব্ধতার গান।
বামে দূরে দেখা যায় শৈল-পদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ। (সপ্তম দৃশ্য)

[১] বইটি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার অনেকগুলি গান দ্বিতীয় সংস্করণ (ফাল্গুন ১২৯২) বাল্মীকি-প্রতিভার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

নাট্যের পাত্র দুইজন, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী ও এক ঘৃণিত মৃতব্যক্তির অনাথ বালিকা কন্যা। আর সব স্ত্রীপুরুষ নামহীন জনতার সামিল। বাসনা-বহ্নির জ্বালায় দগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার মানবপ্রকৃতিকে অর্থাৎ সমস্ত কোমল মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া সে প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ লইবে।

কি কষ্ট না দিয়েছিস্ রাক্ষসি প্রকৃতি
একদিন—একদিন নেব প্রতিশোধ।

সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহায় দীর্ঘ রাত্রিদিন ধরিয়া তপস্যায় বসিয়াছিল। অবশেষে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে মনে করিয়া গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কি আনন্দ আজি।
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষদের মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়-গুরুবর্গকে দেখিয়া অর্জুন যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে বলিয়াছিল, আমার যুদ্ধে কাজ নাই, যুদ্ধ আমি করিব না। কৃষ্ণ যুদ্ধ করিবার পক্ষে অনেক যুক্তি দেখাইয়া শেষে নির্ঘাত মন্তব্য করিয়াছিলেন।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥

'যদি নিজের সাময়িক মনোভাব আশ্রয় করিয়া মনে কর, "আমি যুদ্ধ করিব না।" বৃথাই তোমার সে নির্বন্ধ। তোমার স্বভাব তোমাকে (সে কাজে) নিয়োগ করিবেই।'

সন্ন্যাসীর বেলায়ও তাই হইল। প্রকৃতি তাহার উপর প্রতিশোধ লইল। যে হৃদয়বৃত্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সন্ন্যাসী আত্মতৃপ্ত হইয়াছিল, অনাথা রঘু-দুহিতার ছদ্মবেশে প্রকৃতিই তাহার অন্তরের নিপীড়িত হৃদয়বৃত্তি উস্কাইয়া দিল। স্নেহ তাহার মনকে নরম করিল বটে কিন্তু পরিণামে ট্রাজেডি ঠেকানো গেল না।

বনফুল-কবিকাহিনী-ভগ্নহৃদয়-রুদ্রচণ্ডের পালা প্রকৃতির-প্রতিশোধে আসিয়া শেষ হইয়া গেল। এই পালার মধ্যে এই তত্ত্বকথাটুকু পরিস্ফুট আছে যে অন্তঃ-প্রকৃতি হোক আর বহিঃপ্রকৃতি হোক তাহাকে নিপীড়ন অথবা প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষ জীবনের দুঃখপরম্পরা এড়াইতে সমর্থ হয় না অথবা নিরপেক্ষ

স্বাধীনতা অথবা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যাহা "আমি" নই তাহার সহিত যাহা "আমি" তাহার পরিপূর্ণ আপোসেই মানুষের সত্যকার মুক্তি ॥

৪

'নলিনী' (১৮৮৪) গদ্যে লেখা। কাহিনী ভগ্নহৃদয় থেকে নেওয়া। দিশাহারা প্রেমের আত্মনিপীড়ন এবং দুঃখের তপস্যার অন্তে মিলন,—ইহাই কাহিনীর সার কথা। গান আছে চারটি।

'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)[১] নলিনীর গীতিনাট্য-রূপ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার-খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনা স্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।

মায়ার-খেলার সমাদর প্রথম অভিনয় হইতেই (জানুয়ারি ১৮৮৯)।[২] গানের ও সুরের জন্য গীতিনাট্যটির আকর্ষণ এখনও অটুট ॥

---

[১] বইটির বেশির ভাগ দার্জিলিঙে লেখা হইয়াছিল

[২] বেথুন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রীবর্গের মিলনমেলা সখী-সমিতির জন্য মায়ার-খেলা লেখা ও সেই উপলক্ষ্যে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নাটক : ব্যক্তি প্রতিযোগী ব্যক্তি

(১৮৮৯-১৮৯৬)

১

'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯)[১] রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং পরিচিত প্রথায় লেখা পঞ্চাঙ্ক নাটক। বইটি সোলাপুরে বিরচিত, একমাসের মধ্যে।[২] নাটকখানি প্রধানত পদ্যবন্ধে। গদ্যাংশ অল্পই, এবং তাহা নাট্যঘটনাবর্তে কিঞ্চিৎ বিরাম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই।

হৃদয়ের ধনকে দেহে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার বাসনা, "সমগ্র মানব"কে পাইবার দুর্বাসনা ও দুঃসাহস রাজা-ও-রাণীর ট্রাজেডির হেতু। বছর দেড়েক আগে লেখা, মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় এই নাটকটির বীজ মিলে। নায়ক বিক্রমদেবের অবুঝ প্রেমাবেগ আত্মপর-নিপীড়নের কারণ। সুমিত্রার প্রেম সাধারণ নারীসুলভ—শান্ত, সংযত, কর্তব্যপরায়ণ। বিক্রমের সর্বগ্রাসিতায় সে প্রেম থই পাইতেছে না। রাজকর্তব্যের অবহেলা সুমিত্রার প্রেমের প্রকাশকে লজ্জিত ও প্রতিহত করিয়াছে।

ছি ছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন ক'রে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব!…
আমারে দিও না লাজ;
আমারে বেস না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!

বিক্রম ভুল বুঝিয়াছিল। সে ভাবে

ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী রাজরাজেশ্বরী?

---

১ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০১। ইহাতে গান ও গদ্য অংশ কিছু বাদ যায় (দাসী, মে ১৮৯৬ পৃ ২৪৬; সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১১ পৃ ৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় সংস্করণে (কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩; এবং স্বতন্ত্র প্রকাশিত) পরিত্যক্ত গান ও গদ্য অংশ কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা (অগ্রহায়ণ ১৩০২) রবীন্দ্রনাথের চিঠি দ্রষ্টব্য।

সহধর্মিণী রূপে স্বামীর কর্তব্যে ত্রুটি শুধরাইবার ভার নিজের হাতে লইয়া সুমিত্রা ভবিতব্যতার জট আরও পাকাইয়াছিল। নিজেকে দূরে না রাখিলে বিক্রমের দৃষ্টিঘোর কাটিবে না মনে করিয়া রাণী অবশেষে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে চলিল। বিক্রমের ঘোর ছুটিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইল বিপরীত। নিরুদ্ধ আবেগের বিস্ফুরণ ঘটিল হিংসার তাণ্ডবে।

> এ প্রবল হিংসা ভাল ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে।
> প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ।
> হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
> সুখ।

কুমারসেন-সুমিত্রাকে ভস্ম করিয়া তবেই এই গরলানল নির্বাপিত হইয়াছিল।

কুমারসেন-ইলার প্রেমসম্পর্ক বিক্রম-সুমিত্রার ঠিক বিপরীত। কুমারসেনের প্রেম সুমিত্রার প্রেমের মতো স্থির কর্তব্যনিষ্ঠ। আর ইলার প্রেম বিক্রমের প্রেমের মতোই মত্ত অধীর। কুমারসেন-ইলার আখ্যায়িকা প্রধান নাট্য-কাহিনীকে খুব ব্যাহত করে নাই। বরং কিছু বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য দিয়াছে। তবে এই আখ্যায়িকার বহর একটু কম হইলে ভালো হইত। কুমারসেন-সুমিত্রার সৌহার্দ্য বৌঠাকুরাণীর-হাটের উদয়াদিত্য-বিভার সৌহার্দ্য মনে পড়ায়। দেবদত্ত মধ্যস্থ ভূমিকা। সে যেন রাজারই শুভবুদ্ধি। সংস্কৃত-নাটকের বিদূষক চরিত্রের এ যেন এক বিচিত্র পরিণতি। রেবতী-চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথের ছায়া আছে এবং স্বাভাবিকতার হানি নাই।

উপসংহার কিছু চমকপ্রদ হইলেও রাজা-ও-রাণীর নাট্যরস প্রগাঢ়। কাহিনীর পরিকল্পনা ও পরিণতি সুসঙ্গত। ভূমিকাগুলি সুপরিস্ফুট। রাজা-ও-রাণী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নাটক।

রাজা-ও-রাণী বাহির হইলে পর রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।[১] প্রকাশিত হইবার পর বৎসর পুরিতে না পুরিতেই নাটকটি গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে উজ্জ্বলভাবে অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটকের ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই অভিনয় সবিশেষ

[১] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্রা' সমালোচনা ('দাসী', মে ১৮৯৬ পৃ ২৪৬) দ্রষ্টব্য। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ইলা' কবিতা ('অপূর্ব নৈবেদ্য' গ্রন্থে সংকলিত) এই প্রসঙ্গে পঠনীয়।

উল্লেখযোগ্য।[১] ইতিপূর্বে বৌঠাকুরাণীর-হাটের কেদারনাথ চৌধুরী কৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্তরায়'[২] প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার ফলে রবীন্দ্রনাথের গান থিয়েটারভক্ত মহলে সমাদৃত এবং তাঁহার নাম অপ্রত্যাশিত অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়াছিল। রাজা-ও-রাণী অভিনয়ের পর নাট্যকার ও গীতিকার রূপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। রাজা-ও-রাণীর গানগুলি বটতলা-প্রকাশিত বিবিধ গানের বইয়ে দেখা যায়।

রাজা-ও-রাণী ভাঙ্গিয়া রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পরে 'তপতী'[৩] রচনা করিয়াছিলেন। তাহার আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য॥

২

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রথম স্তরে কারুণ্যস্নেহের আলোকে হৃদয়ারণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ সূচিত। দ্বিতীয় স্তরে কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের, রূপের সঙ্গে রসের, সংসারের সঙ্গে সত্যের সংঘর্ষ। রাজা-ও-রাণীতে (এবং তপতীতে) এই বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে আত্মবিসর্জনে। 'বিসর্জন' (১৮৯১) নাটকে শুধু আত্মবিসর্জন আছে, কিন্তু শুধু তাহাতেই সমস্যার সমাধান মিলে নাই, আরো উপরে কঠোরতর ত্যাগের মধ্য দিয়া বিরোধের অবসান মিলিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর-হাটে যেমন রাজা-ও-রাণীতে তেমনি প্রেমের নিপীড়ন সৌভ্রাত্র্যের ছায়ায় অপনোদিত। কিন্তু বিসর্জনে এবং রাজর্ষিতে শুষ্ক কর্তব্যের তৃষা বাৎসল্যের ধারাবর্ষণে মিটিয়াছে। বিসর্জনের সমস্যা,—"কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ"।

---

১ এই অভিনয়ের বিবরণ স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স বারো। কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তাঁহার মনে সেদিনের স্মৃতি ম্লান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিনয়ে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। রাজা সাজিয়াছিল মতিলাল সুর। রেবতীর ভূমিকায় ক্ষেত্রমণি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিল। সুমিত্রা সাজিয়াছিল "গুলফম" হরি। ইলার পার্ট লইয়াছিল "হাড়কাটা" কুসুম। কুমারের ভূমিকায় নামিয়াছিল মহেন্দ্রলাল বসু। "পণ্ডিত" হরিভূষণ ভট্টাচার্য চন্দ্রসেন সাজিয়াছিল।

এমারেল্ড থিয়েটারে বিসর্জনও অভিনীত হইয়াছিল।

২ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলীর কয়েকটি গান বসন্ত-রায়ে সংযোজিত হইয়াছিল। কতকগুলি গান কেদারনাথের রচনা। এমন কোন কোন গান বটতলার বইয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে সংকলিত আছে।

৩ তপতীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। নাটকটি দিন দশেকের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ('পথে ও পথের প্রান্তে' পৃ ৯৪ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ বইটির নাম প্রথমে দিয়াছিলেন 'সুমিত্রা'।

বিসর্জন রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট পরিচিত-ধরণের নাটক। অভিনয়ের দিক দিয়াও বিসর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। নাট্যরচনায়ও রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি নূতন নূতন ধাঁচ ও ছাঁচ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি তাঁহার কখনো রুচিকর ছিল না। কবিতায় ও গানে যেমন রচনার রূপটি প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে সুস্পষ্ট আকার লইত নাটকে সর্বদা তেমন নয়। কিন্তু বিসর্জনে ইহার ব্যতিক্রম পাই। তাই অভিনয়ে প্রয়োজন উপলক্ষ্যে ইহাতে পুনঃপুন পরিবর্তন ঘটিয়াছে।[১]

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ লইয়া বিসর্জনের আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত। রাজর্ষির নায়ক গোবিন্দমাণিক্য, বিসর্জনের নায়ক জয়সিংহ। তাই জয়সিংহের আত্মহত্যা নাট্যকাহিনীতে যবনিকাপাত করিয়াছে। প্রথম সংস্করণে রাজর্ষির সঙ্গে যোগ বেশি স্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে হাসির ও কেদারেশ্বরের ভূমিকা বাদ যাওয়ায় এই যোগ কতকটা অস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের আরো দুইটি ভূমিকা—অন্ধ বৃদ্ধ ও পরিচারিকা—দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ গিয়াছে। ধ্রুবর ও অপর্ণার ভূমিকাও ছোট হইয়াছে।

বিসর্জনে নাট্যরস জমিয়াছে অন্ধ সংস্কার, মূঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রান্ত অধিকার-বোধের সঙ্গে গভীর হৃদয়বৃত্তি, উদার জ্ঞান ও নিরাসক্ত জীবনবোধের সংঘর্ষে। এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি অনুভব করিয়াছে নায়ক জয়সিংহ। অন্যথা একপক্ষে রঘুপতি ও গুণবতী, অপর পক্ষে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা। গোবিন্দ-মাণিক্যের ও অপর্ণার মনে সংশয় নাই, তাহারা গভীর অনুভবের মধ্য দিয়া সত্যের আলোক পাইয়াছে। রঘুপতির চরিত্রদৃঢ়তার প্রতিষ্ঠা তাহার নিষ্ঠায়। গুণময়ীর চিত্ত বারে বারে দোল খাইয়াছে প্রেম ও সংস্কারের মধ্যে। সে সন্তানবিহীন, স্বামীর উপর কর্তৃত্বহানির আশঙ্কায় অভিমানিনী। তাহার এই অত্যন্ত স্বাভাবিক দৌর্বল্যের ছিদ্রপথেই কাহিনীটি নাটকীয় পরিণতির দিকে উৎসারিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণে অপর্ণার ভূমিকা ছিল দীর্ঘতর, তাহাতে জয়সিংহের সহিত তাহার সম্পর্কের একটা পশ্চাৎপটও ছিল। পরে তাহা ছাঁটিয়া ফেলায় কাহিনী আরও সংহত এবং নাট্যকৌতূহল আরও জমাট হইয়াছে। হাসির ভূমিকা বাদ

[১] আসল দ্বিতীয় সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩)। আষাঢ় ১৩০৬ সালের "দ্বিতীয় সংস্করণ" প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় সংস্করণ। ১৩৩৩ সালে আর এক সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণে প্রায় সব দৃশ্যই দীর্ঘতর ছিল।

যাওয়ায় আর ধ্রুবর ভূমিকা ছোট হওয়ায় গোবিন্দমাণিক্য-ভূমিকায় নাট্যোপযোগিতা বাড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষতিও হইয়াছে। গুণবতীর মানবিকতা কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার ট্রাজেডি কতকটা অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।

আবাল্য মাতাপিতৃহীন জয়সিংহ মানুষ হইয়াছে দেবীমন্দিরে রঘুপতির আশ্রয়ে। ব্রহ্মচারী তপস্বী পূজারী রঘুপতিকে অবলম্বন করিয়া তাহার শিশুহৃদয় বিকশিত। একটু বড় হইলে দেবীভক্তি তাহার মন অধিকার করিল। আরো বড় হইলে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রমাধুর্য তাহার মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিল।

মনে রেখো, দেবী আর গুরুদেব,
আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য, এ দাসের
তিনটি দেবতা।[১]

মন্দির-আশ্রমে প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেষ্টনে জয়সিংহের কিশোর মন বাড়িয়া উঠিয়াছে দেবীপ্রতিমার কল্পনায় ও অনুধ্যানে, সঙ্গী মূক তরুলতার মতোই সারল্যে ও নীরব নিষ্ঠায়। নবযৌবনের অবোধ বেদনা তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। মনের মধ্যে কিসের যেন অভাব ভক্তিরসের শান্ত সুষুপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধাইতেছে।

উদাসীন
বাতাসের মত, উতলা পরাণ, হুহু
চলে যায়—কোন্ ছায়ামুগ্ধ কুঞ্জবনে,
কোন্ স্বপ্নলোকে! যেন খেলাইতে ডাকে
কে আমার আপন বয়সী,[২]

অপর্ণার মর্মবেদনার ঢেউ আসিয়া জয়সিংহের হৃদয়ে চেতনার আঘাত করে।

তোমার হৃদয়ব্যথা আমার হৃদয়ে
এসে পেয়েছে চিরজীবন।[৩]

এই ব্যথার রাখী দুইটি হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য বন্ধন বাঁধিয়া দিল। জয়সিংহ এখন বুঝিল

শুধু ধরা দেও তুমি মানবের মাঝে,
মন্দিরের মাঝে নয়![৪]

গোবিন্দমাণিক্য দেবীপূজায় বলি নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়া জয়সিংহ হৃদয়ে

---

১ প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।
২ ঐ প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।
৩ ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।
৪ ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য।

প্রথম আঘাত পাইল। দেবীর প্রতি তাহার ভক্তি এবং রঘুপতির উপর নিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। তাহার

তিনটি দেবতা ছিল, এক গেল! শুধু
দুটি আছে বাকি![১]

কিন্তু মন তো যুক্তির বশ নয়। গোবিন্দমাণিক্য তাহার মনে যে শ্রদ্ধাপ্রীতির আলো জ্বালাইয়াছিল তাহা দেবীর মুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এখন সে দীপ নিভিয়া গেলে পর ভক্তির দীপ্তি কমিয়া আসিল; জয়সিংহের ভক্তি-বিশ্বাসে টোল পড়িল। জয়সিংহের মনে দ্বিতীয় এবং প্রচণ্ডতর আঘাত লাগিল রাজ-রক্তের জন্য রঘুপতির ভ্রাতৃহত্যাষড়যন্ত্রে। ইহাতে যুগপৎ দেবীর মাহাত্ম্য ও রঘুপতির অভ্রান্তত্বের প্রতি তাহার সংশয় জাগিল, সংস্কার ও সদ্‌বুদ্ধির দ্বন্দ্ব বাধিল। রঘুপতির উপর আস্থা জয়সিংহের জীবনের ভিত্তি। রঘুপতিকে সে ভ্রাতৃহত্যা-পাপের অংশভাগী হইতে দিবে না, রাজরক্ত সে নিজেই আনিয়া দিবে। আপাতত সংস্কারের কাছে সদ্‌বুদ্ধির পরাজয় ঘটল বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও উজ্জ্বলতর হইল গুরুভক্তি। তবে মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিল না। অপর্ণার গান তাহার মনে জীবনের সহজ আনন্দের সাড়া জাগায়, কিন্তু সে আনন্দ-আবেশ টুটাইয়া দিল রঘুপতি। তাহাকে অপর্ণা শাপ দিল।

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ! ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে![১]

রাজরক্তপাতের পূর্বমুহূর্তে গোবিন্দমাণিক্য যখন রঘুপতির ছলনা ধরাইয়া দিল তখন যেন জয়সিংহের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল। তাহার পর জীবনবিসর্জন ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

দেবীর নিষ্ঠাবান্ সেবক রঘুপতি। আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রে তাহার অপরিসীম আস্থা। ব্রাহ্মণের অধিকার সম্বন্ধে তাহার বোধ অত্যন্ত সচেতন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে দেবীপূজাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য। হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করিবার কোন সুযোগ সে পায় নাই। তদুপরি অন্ধ কর্তব্যের শুষ্ক কঠিন পথ অনুসরণ করিতে করিতে তাহার হৃদয়ের উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল।

---

[১] ঐ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য (পাঠান্তর "শূন্য নভঃস্থলে দুই লঘু")।

জয়সিংহের উপর তাহার স্নেহ দেবীপূজার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িয়া উঠিলেও জয়সিংহকে সে দেবীর ভক্ত-সেবক এবং আপনার অনুরক্ত পুত্র-শিষ্য বলিয়াই জানে। কর্তব্যের পাষাণচাপা খণ্ডস্রোত এই স্নেহের যে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও মূল্য আছে, একথা ভাবিবার কোন অবসর সে পায় নাই। মানবের বৃহত্তর কর্তব্যবোধ যে দেবপূজার প্রচলিত বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এ ধারণা তাহার পক্ষে অভাবনীয়। দেবতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থ ব্রাহ্মণের অধিকার হরণ,—ইহাই তাহার ধারণা। এই বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রঘুপতি-চরিত্রের মেরুদণ্ড। দেবীপূজায় জীববলি নিষিদ্ধ হইলে রঘুপতি রাজাকে বলিয়াছিল, "শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে!" গোবিন্দমাণিক্য শাস্ত্রের উপরে দেবীর আদেশের—অর্থাৎ তাঁহার দৈবী উপলব্ধির—দোহাই দিলে রঘুপতি যাহা বলিয়াছিল আসলে তাহা নিজের বেলাই খাটে।

একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?[১]

গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির দ্বন্দ্ব এক হিসাবে ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ শক্তির দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে, অন্তত রঘুপতির দিক্ দিয়া।

বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে?[২]

গুণবতীও তাই বুঝিয়াছে,

সেইমত আজ্ঞা
কর নাথ! ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ
অধিকার, দেবী নিজ পূজা,[৩]

গোবিন্দমাণিক্যের উপর রঘুপতির বিদ্বেষের গূঢ় কারণ ঈর্ষা, তা তাহার নিজেরও অজ্ঞাত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের আন্তরিক প্রীতি-ভক্তি আত্মসর্বস্ব রঘুপতি ভালোচোখে দেখে নাই। জয়সিংহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, জয়সিংহের হৃদয়বৃত্তির অংশমাত্রও অপরে পাইবে এ কল্পনা তাহার অসহ। এই কারণেই অপর্ণাও রঘুপতির বিষনেত্রে পড়িয়াছিল। অপর্ণা নারী, তাই ব্রাহ্মণের

---

১ প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

২ প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

৩ প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য (পাঠান্তর লক্ষণীয়)।

অন্তরের এই গূঢ়রহস্য তাহার অজ্ঞাত থাকে নাই। যে-বন্ধন ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া আসিতেছিল সে-বন্ধনের বেদনা রঘুপতির চিত্তে জাগিয়া উঠিল প্রথমে অপর্ণার শাপে। মর্মের গোপন স্থানে ঘা পড়ায় ব্রাহ্মণেরও হৃদয়ের কঠিন কপাট ক্ষণেকের জন্য উন্মুক্ত হইল।

আমি আজন্মের বন্ধু, দুদণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ![1]

রঘুপতির মর্মঘাত হইতেছে—

জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে![2]

রঘুপতি ক্ষমতাপ্রিয় প্রতিমাপূজক, প্রতারক নয়। নিজের কাছে সে খাঁটি। সে সত্যকে দেখিতে চায় নিজের বুদ্ধির দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টি শাস্ত্রের অনুশাসনে সংকীর্ণপ্রসর এবং সংস্কারের আবরণে ক্ষীণ। তাই দেশকালাতীত সহজ সত্যকে গ্রহণ করিতে সে অক্ষম। দেবীপ্রতিমার সাহায্যে প্রতারণাময় অভিনয় রঘুপতির কাছে মিথ্যাচার নয় পাপও নয়। তাহার বিশ্বাস

দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব? চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ! তোমার আমারি হাতে সত্য নাই।

অনতিবিলম্বেই অপর্ণার শাপের বীজ অঙ্কুরিত হইল। রঘুপতির অবচেতন মনে জয়সিংহের ভাবী বিরহ গাঢ় ছায়া ফেলিল, তাই উদ্‌ভ্রান্ত মনে ক্ষণে ক্ষণে জয়সিংহের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। রঘুপতির মনের হিমশিলা যে গলিতে শুরু করিয়াছে তাহা জানা গেল নিদ্রিত ধ্রুবকে দেখিয়া তাহার স্বগতোক্তিতে।

ওরে দেখে
তার সেই শিশুমুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।[3]

---

[1] প্রথম সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।
[2] প্রথম সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য।
[3] প্রথম সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য।

রাজার কাছে নতিস্বীকারের হীনতাজালায় রঘুপতি জয়সিংহের স্নেহের দোহাই দিয়া নাটকের ক্লাইমাক্সের সূচনা করিল। স্নেহের দাবি করিয়া সে স্নেহাস্পদেরই মৃত্যুবাণ হানিল।

কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তার কাছে নত হোক্ জানু! পুত্র
ভিক্ষা চাই আমি![1]

জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির অন্তরের অহঙ্কার-অভিমানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন জয়সিংহের প্রেমই মধ্যস্থ হইয়া রঘুপতি-অপর্ণার বিরোধের অবসান ঘটাইয়া দুই বিরহিহৃদয়কে স্নেহের নিবিড় বন্ধনে বাঁধিয়া দিল। জয়সিংহ মরিয়া গিয়া রঘুপতির অন্তর অধিকার করিয়া বসিল, আর অপর্ণা তাহার অসম্পন্ন কর্তব্যভার তুলিয়া লইল।

অপর্ণার ভূমিকা রাজর্ষিতে নাই, ইহা বিসর্জনে নূতন সৃষ্টি। জয়সিংহের হৃদয়বৃত্তির উদ্বোধনের জন্য এই ভূমিকাটি আবশ্যক। বাৎসল্যকারুণ্যের বন্ধন এই দুই মাতৃহারা কিশোরহৃদয়কে নিতান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। জয়সিংহের সদয় ব্যবহার ও অবুঝ ব্যবধান অপর্ণাকে নাড়া দিয়া তাহার প্রেম জাগ্রত করিল এবং কল্যাণময় পরিণতির দিকে চালাইল।

যেথা যাই শুধু দয়া
গৃহ আর নেই, শুধু দীর্ঘ রাজপথ।
তবে ভিক্ষা ভাল! জয়সিংহ,
আমি তব তরুলতা নহি। আমি নারী।[2]

জয়সিংহের অন্তর্বেদনা যখন অপর্ণা বুঝিতে পারিল তখন সে তাহার নারী-হৃদয়ের মান-অভিমান ভাসাইয়া দিয়া রঘুপতির আদেশ ও জয়সিংহের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। জয়সিংহের নিষ্ঠুর উত্তরে ক্ষুব্ধ না হইয়া অপর্ণা চক্রী রঘুপতিকে উদ্দেশ করিয়া অন্তরের জালাটুকু বাহির করিয়া দিল।

আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ-বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।[3]

---

১ প্রথম সংস্করণ পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য ; প্রচলিত সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

২ প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য।

৩ ঐ তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দিরে যে আসন্ন ট্রাজেডি ঘনাইয়া উঠিতেছে তাহা অপর্ণা অনুভব করিয়া কেবলি ব্যাকুলভাবে জয়সিংহকে ডাকিতে লাগিল।

এই বেলা এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই![1]

কিন্তু জয়সিংহের যাইবার স্থান কোথায়। যে রাজত্বে সে আজন্ম বাস করিয়াছে তাহার খাজনা শোধ না করিয়া যাইবার যো নাই।

শ্রাবণের সেই শেষ রজনীতে বহিঃপ্রকৃতির মতো অপর্ণার চিত্তও ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্ত। জয়সিংহের অন্বেষণে সে যখন মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার পূর্ব মুহূর্তে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, আর রঘুপতি জয়সিংহের দেহের উপরে পড়িয়া বিলাপ করিতেছে। শুষ্কচিত্ত রুক্ষমূর্তি ব্রাহ্মণের অন্তরের এই অমৃত-উৎস অপর্ণার হৃদয় স্পর্শ করিল। মুহূর্তে জয়সিংহের উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া অপর্ণা তাহার স্নেহসুধা সবটুকু ঢালিয়া বলিল, "পিতা, চলে এস।"

নাটকের ধ্রুব চরিত্র রাজা গোবিন্দমাণিক্য। তাঁহার মনে কোন দ্বন্দ্ব কোন সংশয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্য দিয়া নয়, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সাহায্যেও নয়, আপন নির্মল অন্তরের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের লেশ নাই। তাঁহার কর্তব্যের পথ কঠিন হইলেও পরিষ্কার। ক্ষোভ শুধু এই,

হায় মহারাণী, কর্তব্য কঠিন হয়ে
ওঠে—তোমরা ফিরালে মুখ![2]

ক্ষুব্ধ প্রেম যদি পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় সে বড় মর্মান্তিক। গোবিন্দমাণিক্যের ট্রাজেডি তাহাই।

রাজমহিষী গুণবতীর হৃদয়দ্বন্দ্ব একটু জটিল হইলেও বেশ স্বাভাবিক। রঘুপতির ও গুণবতীর সমস্যার মধ্যে মিল আছে। উভয়েই অধিকারলোপের অভিমানে ক্ষুব্ধ এবং উভয়েই স্নেহপাত্রের সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করে। সন্তানহীনতার আত্মধিকার গুণবতীকে মনে মনে রাজার কাছে দোষী করিয়া রাখিয়াছিল। হাসির ও ধ্রুবের প্রতি রাজার অহেতুক বাৎসল্যপ্রীতি এই হীনতাবোধের উপর ঈর্ষার উস্‌কানি দিয়াছিল।

---

[1] প্রথম সংস্করণ চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

[2] ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য; প্রচলিত সংস্করণ প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য। পাঠান্তর লক্ষণীয়।

মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?[১]

রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তোরা
নিলি প্রথম অঞ্জলি, কে তোরা পথের
ছেলে![২]

তৃতীয়ত দেবীপূজায় বলিনিষেধে সংস্কারে আঘাত এবং রঘুপতির ভীতিপ্রদর্শন ও সূক্ষ্ম চাটুবাণী।

দেবতা কৃতার্থ
হল তোমারি আদেশ বলে, ফিরে পেলে
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! তোমরাই ধন্য
এ যুগে যত দিন নাহি জাগে কল্কি-
অবতার![৩]

স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ এখন কঠিন রূপ ধরিল। স্বামীর কাছে রাজাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতে গিয়া যখন প্রত্যাখ্যাত হইল তখন গুণবতীর অভিমানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রাজা-ও-রাণীর মতো বিসর্জনেও স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ রাজকর্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া। রাণীর পূজা দ্বিতীয় বার ফিরাইয়া দেওয়ায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল।

মহামায়া তুই নারী
আমি নারী—দে আমারে তোর শক্তি-অংশ
স্নেহ মায়া দয়া ধরুক সংহারমূর্তি![৪]

এই বজ্রকঠিন অভিমান-অহঙ্কারের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা জাগিয়াছিল। তাই বিরোধের প্রত্যক্ষ হেতু দেবীমূর্তির অপসারণের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন অতি-সহজেই ঘটিয়া গেল॥

৩

'চিত্রাঙ্গদা'[৫] সোনার-তরীর সময়ের রচনা। ইহাতে পরিচিত নাটকের

---

[১] প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ; প্রচলিত সংস্করণ ঐ।

[২] প্রথম সংস্করণ প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য।

[৩] ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য ; প্রচলিত সংস্করণ প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য।

[৪] প্রথম সংস্করণ তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য।

[৫] প্রথম সংস্করণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী মণ্ডিত ছিল (১৮ ভাদ্র ১২৯৯)। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) চিত্রগুলি বাদ যায় ও 'বিদায়-অভিশাপ' যুক্ত হয়। তৃতীয় সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩)। চতুর্থ সংস্করণ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে (১৩১১)। ইহাতে অল্পস্বল্প পাঠপরিবর্তন আছে। চিত্রাঙ্গদার প্রথম দৃশ্য 'অনঙ্গ আশ্রম' শুরু হয় শিলাইদহে (জুন ১৮৯০)।

সামগ্রিকতা নাই কিন্তু নাটকীয়তা এবং গীতিকাব্যসুষমা সম্পূর্ণ আছে। নায়িকা চিত্রাঙ্গদাই নাট্যকাব্যটির পটভূমিকা আদ্যন্ত অধিকার করিয়া আছে। অর্জুন তাহার ইমোশনাল অভিব্যক্তির আলম্বন ও উদ্দীপন। কিশোরযোদ্ধার বেশধারিণী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন যখন প্রথম দেখিল তখন তাহার মনে শুধু কৌতুকের তরঙ্গ খেলিয়াছিল। চিত্রাঙ্গদা পূর্ব হইতেই অর্জুনের বীরখ্যাতিতে মুগ্ধ ছিল, সাক্ষাতে সে মনপ্রাণ হারাইল, তাহার বিস্মৃত নারীসংস্কার জাগিয়া উঠিল। অর্জুনকে ভুলাইতে সে মনোহর সাজ করিয়া যেন অভিসারে চলিল। ব্রহ্মচারিব্রতী তৃতীয় পাণ্ডবের কাছে রূপহীন কিশোরীর প্রণয়নিবেদন ব্যর্থ হইল। পার্বতী যেমন শিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এও যেন তেমনি। কালিদাসের পার্বতী ধিক্কার দিয়াছিলেন তাঁহার মেয়েলি রূপকে, কেন না "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।" রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ধিক্কার দিল নিজের পুরুষালি বিদ্যাকে। চিত্রাঙ্গদার রূপ নাই এবং তিলে তিলে অর্জুনের হৃদয় জয় করিবার অবকাশ ও ধৈর্যও নাই। তাহার চরিত্রে বেশ একটু পুরুষাংশ ছিল—অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারিতা। পার্বতী আশ্রয় করিয়াছিলেন তপস্যা, চিত্রাঙ্গদা সাধনা করিল রূপের। (কালিদাস বসন্তরাজকে ভস্ম করাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই উপর নির্ভর করিলেন।) তাহার যৌবনের দীপ্তির ফাঁদে অর্জুন ধরা পড়িল। তাহার পর শুরু হইল চিত্রাঙ্গদার অন্তর্দ্বন্দ্ব। রূপহার্য ক্ষণলব্ধ ভোগসুখের মধ্যে অরূপহার্য চিরন্তন প্রেমের পিপাসা জাগিয়া উঠিল। তাই অর্জুনের কাছে কুণ্ঠা তাহার ঘোচে না। যে-মিলন ছলনায় সাধিত তাহাতে তৃপ্তি না পাইয়া তাহার নারীহৃদয় উদ্যত হইয়াছে সত্যমিলনের জন্য, যাহা "বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু পাওয়া যায়"। রূপের অভিশাপ তাহাকে পলে পলে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু রূপেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। নারীরূপের দ্বারা তো প্রকৃতি নিজের কাজ সারিয়া লয়। তাহার পর

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

বর্ষশেষ হইবার পূর্বেই অর্জুনের রূপতৃষ্ণা মিটিয়া গেল, দেহের ভোগে ক্লান্তি আসিল। তাহার পর যখন চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয় পাইয়া অর্জুনের মনে শ্রদ্ধা জাগিল তখনি প্রেমের উদয় হইল। কোনরকম পিছুটান না রাখিয়া চিত্রাঙ্গদার প্রেম অনায়াসে অর্জুনকে মহত্তর কর্তব্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল। এইখানেই চিত্রাঙ্গদার সত্য পরিচয়॥

৪

'বিদায়-অভিশাপ'[১] কাব্যরসপ্রধান নাট্যকবিতা। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে বিদায়-অভিশাপের কিঞ্চিৎ বিষয়সাদৃশ্য আছে। চিত্রাঙ্গদায় অর্জুন অভিজ্ঞ প্রৌঢ়প্রণয়ী, এবং যশোগুণমুগ্ধ চিত্রাঙ্গদা তাহাকে দেখিবার অনেককাল পূর্ব হইতেই তাহার প্রতি অনুরাগিণী। বিদায়-অভিশাপের নায়ক-নায়িকা কচ-দেবযানীর প্রেম প্রতিদিনের সাহচর্যের মধ্য দিয়া নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। কচ ব্রাহ্মণ, দেবকুমার। সংযম তাহার স্বভাব, ক্ষমা তাহার ধর্ম। দেবযানীর প্রতি প্রেম তাহার অন্তরে বীজমন্ত্র, গোপন ধন; সে প্রেম তাহার জীবনের বৃহত্তর সার্থকতার পরিপন্থী হইতে পারে না। তাই ভালোবাসার খাতিরেই সে ভালোবাসার পাত্রকে ছাড়িয়া গেল।

দেবযানী অসুরকুমারী। তাহার স্বভাবধর্ম অভিমান, ক্ষমা নয়। নারী সে, তাহার কর্তব্যক্ষেত্র সংসারের বেড়ার মধ্যেই। নারীধর্মবশেই সে প্রণয়-নীড় রচনা করিয়া কচকে ধরিয়া রাখিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছে। কর্তব্য-পালনের গৌরবপ্রলেপে একদিন হয়ত কচের হৃদয়ক্ষত শুকাইয়া আসিবে, কিন্তু দেবযানীর সান্ত্বনা কোথায়। নিষ্ফল প্রণয়ের শূন্য বেদনামাত্র নয়, প্রত্যাখ্যানের দুর্বিষহ লজ্জাই তাহার জীবনের শান্তি এবং সংসারের মর্যাদা নষ্ট করিয়া দিবে। সুতরাং কচকে সে ক্ষমা করিতে পারে না। কচ কিন্তু দেবযানীর অভিশাপ পরিপূর্ণ ক্ষমার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল।

> আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
> ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

এইখানেই কচ-চরিত্রের উত্তুঙ্গতা।

বিদায়-অভিশাপে কবি অমিত্রাক্ষর ছাড়িয়া মিত্রাক্ষর অবলম্বন করিলেন। পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলিতে এই রীতিই অবলম্বিত॥

৫

'মালিনী'[২] চৈতালির সমসাময়িক রচনা। নাট্য এবং কাব্য একাধারে। মূল ব্যাপারটি লণ্ডনে (১৮৯০)[৩] স্বপ্নলব্ধ। উপস্থাপনে বৌদ্ধ সাহিত্যের এক

---

১ প্রকাশ সাধনা মাঘ ১৩০০। দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে প্রকাশিত (১৩০১)।

২ প্রকাশ কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩)।

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে 'সূচনা' দ্রষ্টব্য। শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত, 'মালিনী প্রসঙ্গে' (রবীন্দ্র-শতায়ন', বেথুন বিদ্যায়তন) পৃ ৭১-৭৮ দ্রষ্টব্য।

কাহিনীর অত্যন্ত ক্ষীণ অনুসরণ আছে।[১] বইটি লেখা হইয়াছিল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়ায়।

বিসর্জনের সঙ্গে মালিনীর কিছু মিল আছে। মালিনীর সঙ্গে অপর্ণার এবং সুপ্রিয়-ক্ষেমঙ্করের সঙ্গে জয়সিংহ-রঘুপতির ভাবগত ঐক্য আছে। কাহিনীর গঠনে ঋজুতা ও দৃঢ়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহাতে, এবং বিশেষ করিয়া উপসংহারে, গ্রীক ট্রাজেডির কথা স্মরণ করায়।

কাশ্যপের কাছে শিক্ষা পাইয়া রাজকন্যা (বৌদ্ধ কাহিনীতে কৃকি রাজার কন্যা) মালিনী বৌদ্ধধর্মের অনুরাগিণী হয়। মাতামহের ধর্মনিষ্ঠার ও ত্যাগ-প্রবণতার উত্তরাধিকারিণী সে। বৌদ্ধ-মতের অহিংসা ও সেবা-ধর্ম তাহার সুপ্ত অধ্যাত্মবৃত্তিকে জাগাইয়া দিলে পরে রাজান্তঃপুরে সুখের প্রাচীর "সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে আবদ্ধ ভ্রমরী"কে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বিপুল সংসারের বৃহৎ আহ্বান তাহাকে জনতার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

> শুনিয়াছি দুঃখময়
> বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
> তোমাদের সাথে।

সুপ্রিয়ের অনুরাগ মালিনীর সুপ্ত নারীত্বকে জাগাইয়া তুলিল। তাহার চিত্তে নবজাগ্রত প্রেমের ভীরুতা ও সংকোচ দেখা দিল।

> হায় বিপ্রবর,
> যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
> আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মত।

মালিনীর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। তাই চরম দুঃখের ও পরম পরীক্ষার মুহূর্তেও সে অহিংসা-ক্ষমাই আশ্রয় করিয়া রহিল।

ক্ষেমঙ্করের সখ্য ও আনুগত্য ছিল সুপ্রিয়ের জীবনের প্রধান অবলম্বন। সুপ্রিয় হৃদয়নিষ্ঠ, কোমলচিত্ত। ক্ষেমঙ্কর বুদ্ধিনিষ্ঠ, অটলচিত্ত। সুপ্রিয় শাস্ত্রকে গ্রহণ করে হৃদয়ের সঙ্গে মিলাইয়া, ক্ষেমঙ্কর হৃদয়কে পিষিয়া ফেলে শাস্ত্রের

---

[১] রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ-কাহিনীর ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (*Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থে (পৃ ১২১)। সেনার (Senart) সম্পাদিত 'মহাবস্তু' প্রথম খণ্ডও দ্রষ্টব্য।

যন্ত্রচক্রতলে। চরিত্রের এই বৈপরীত্যই তাহাদের দুইজনের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনের ডোর। সুপ্রিয় ভাবে

বন্ধু, ভাই,
প্রভু। সূর্য্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ। বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তার লৌহপাশ।

সুপ্রিয়ের প্রণয়ের প্রতি দুর্দম আকর্ষণ ক্ষেমঙ্করকে মারের মুখে আগাইয়া দিয়াছিল।

বন্ধু চিরন্তন,
তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন।

ইহাই সুপ্রিয়ের দুর্ভাগ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধিকাররক্ষায় সুপ্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে কখনই শাস্ত্রবচনের প্রতিধ্বনি তোলে নাই। শাস্ত্রবিচারে সংশয় থাকিলেও কর্মনিষ্ঠায় সে সবার অগ্রগণ্য। তাই তাহাকে ক্ষেমঙ্কর কিছুতে ছাড়িবে না। মালিনীকে দেখিয়া সুপ্রিয়ের সব সংশয় দূর হইয়া গেল, প্রেম ও ভক্তির দীপ তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল। মালিনীর দৃষ্টি দিয়া সুপ্রিয় নিজের অন্তরকে দেখিতে পাইল। তাই ক্ষেমঙ্করের ব্যঙ্গকণ্টকিত অভিযোগ সে অস্বীকার করিল না।

ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে,
ওই ধর্ম মোর।

এই যে-ধর্মের মুখ চাহিয়া সুপ্রিয় বন্ধুর বিশ্বাসহানি করিল, সে ধর্মের মর্যাদা তাহার জীবনের অপেক্ষা, তাহাদের আবাল্য সখ্যের অপেক্ষাও বড়। তাই তাহার কোন সংকোচ বা লজ্জা নাই। এ-ধর্মের কাছে সব-কিছুই বিসর্জন দেওয়া যায়।

বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণসখে, ধর্ম সে আমার।

সে-ধর্ম পরিত্যাগ ক্ষেমঙ্করের প্রাণ দেওয়ার চেয়েও অনেক কঠিন।

ক্ষেমঙ্কর, তুমি দিবে প্রাণ—
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস।

ক্ষেমঙ্করের ধর্মে হৃদয়বৃত্তির স্থান নাই। শাস্ত্রের বাঁধা পথ ছাড়া তাহার কাছে অন্য পথ নাই, অন্তত সর্বসাধারণের জন্য। ধর্মমতের বৈচিত্র্য একেবারে অস্বীকার না করিয়া সে সুপ্রিয়কে এই যুক্তি দিয়াছিল

তোমার অন্তরে
উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে,—
তাই বলে ভাগ্যহীন সর্বজন তরে
সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি,—
পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি;
বহুদিবসের প্রেমে সতত লালিত
সৌন্দর্যের শ্যামলতা, সযত্নপালিত
পুরাতন ছায়াতরুগুলি, পিতৃধর্ম,
প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির-আচরিত কর্ম
চিরপরিচিত নীতি?

ইহাও হৃদয়াবেগেরই দোহাই পাড়া, তবে উল্টা দিকে। ধর্মের ক্ষেত্রে হৃদয়-বৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া ক্ষেমঙ্কর দৌর্বল্য বলিয়া মনে করে।

বড় ভয়ঙ্কর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম হয়
আপন কল্পনা।

ক্ষেমঙ্করের আসল ট্রাজেডি রঘুপতির মতো, ভালোবাসা হারাইবার আশঙ্কা। বন্ধুর সঙ্গে প্রথম-বিচ্ছেদ ক্ষণে এই আশঙ্কাই তাহার মনে জাগিয়াছিল।

বল তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চ'লে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে?

৬

মালিনীর ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া কোন বিদগ্ধ ইংরেজ কবি ইহাতে গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখিয়াছিলেন।[১] গ্রীক নাটকের মতোই মালিনীর

[১] রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে 'সূচনা' দ্রষ্টব্য।

নাট্যরূপ "সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন"। গ্রীক ট্রাজেডির মতোই অভাবনীয়, অনিবার্য উপসংহার। বস্তুত, মালিনীর উপসংহার নাটকটিকে নিটোল, নিখুঁত করিয়াছে। রাজকন্যা ভিক্ষুশিষ্যা মালিনী যে অন্তরে অন্তরে পরিপূর্ণ নারী উপসংহারে তাহারই মূর্তি ক্ষণোদ্ঘাটিত। "মহারাজ! ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে।"—মালিনীর এই উক্তিতে নাটকের পরিসমাপ্তি। মালিনী কেন-যে ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিতে বলিল সেই রহস্য উহ্য থাকিয়া ট্রাজেডির তীক্ষ্ণতাকে নিশিত করিয়াছে। মালিনী কেন ও-কথা বলিল? সে কি ভিক্ষুশিষ্যার কর্তব্যবোধে? না ক্ষেমঙ্করের প্রতি সুপ্রিয়ের সৌহার্দ্যের ও ভালোবাসার মর্যাদায়? তবে কি ক্ষেমঙ্করের বীর্যবান্ ব্যক্তিত্ব মালিনীর মনের একটু কোণ অধিকার করিয়াছিল?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নাট্য ঃ কৌতুক

(১৮৮৫-১৯০১)

১

নাট্যরচনায় সংলাপের মধ্য দিয়া কৌতুকরসের সৃষ্টি প্রকৃতির-প্রতিশোধে দেখা গিয়াছিল। আসলে এই অংশগুলিতেই বইটির নাট্যরূপ বিশেষভাবে প্রকটিত। পরের বছরেই 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ছোট ছোট কৌতুক-নাট্য লিখিতে লাগিলেন। পরে এগুলি 'হাস্যকৌতুক' নামে সঙ্কলিত (১৩১৪)। কৌতুক নাট্যগুলির রস যৎসামান্য গল্পের আধারে, দুই একটি ভূমিকার অনাড়ম্বর চিত্রণে, সংলাপ নির্ভর করিয়া উজ্জ্বলভাবে জমিয়াছে। ব্যঙ্গ যেটুকু আছে তাহা নিপুণ ও নির্মল।

পরে সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি কৌতুক-রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিনটি কৌতুকনাট্যের মধ্যে পড়ে,—'বিনিপয়সার ভোজ', 'নূতন অবতার' এবং 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'।[1] সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় যাহাকে "ভাণ" বলে এগুলি সেইরকম একভাষিক (monologue) ক্ষুদ্র নাট্য॥

২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং বৃহত্তম কৌতুকনাটক (বা প্রহসন) 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)।[2] উনবিংশ শতাব্দের শেষের দিকে কলিকাতার ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবকদের চিন্তা ও আচরণের প্রতিফলন সরসতায় অত্যন্ত উপভোগ্য। গোড়ায়-গলদ অভিনয়ে খুব জমিত।[3]

গোড়ায়-গলদ ইংরেজীতে যাহাকে বলে period piece, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কালের পুতুল"। উনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে কলিকাতার ব্যবস্থা, আচার-বিচার বিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশকে অনেকটাই বদলাইয়া গিয়াছিল। বিশেষ

[1] 'ব্যঙ্গকৌতুক'এ সংকলিত (১৩১৪)। [2] দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৬। [3] সঙ্গীত-সমাজে গোড়ায়-গলদের অভিনয়ের বিবরণ অমৃতলাল বসুর একটি কবিতায় আছে ('অমৃত মদিরা'য় সংকলিত)। এই অভিনয়ের প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের (সাহিত্য আষাঢ় ১৩০৭ পৃ ১৪৮ দ্রষ্টব্য)।

করিয়া কলেজের পড়ুয়া ছেলেদের তো চেনাই যায় না।[১] এই কারণে বিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশকের জন্য শুধু নয়, দীর্ঘকালের জন্য অভিনয়যোগ্যতা দিবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ গোড়ায়-গলদ কাটছাঁট করিয়া 'শেষরক্ষা' লিখিলেন (১৯২৮)। শেষরক্ষা পাব্‌লিক স্টেজে অভিনীত হইয়া দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল। তবে ভূমিকাগুলি অনেকটা স্থানকাল-বর্জিত চাঁচাছোলা হওয়াতে প্রহসন হিসাবে কিছু যেন অন্তরঙ্গতা হারাইয়াছে। শেষরক্ষায় নারী-ভূমিকাগুলি সবই স্মার্ট। অর্থাৎ কালোচিত হইয়াছে। গোড়ায়-গলদের "নিমাই" শেষরক্ষায় হইয়াছে "গদাই"। এ নামপরিবর্তন সংগত মনে হয় না। (তবে কি কবি বৈষ্ণব-সমাজের আপত্তি আশঙ্কা করিয়াছিলেন ?)

গোড়ায়-গলদে একটিমাত্র গান আছে, শেষে। সেই ভরতবাক্য-গানেই প্রহসনের তত্ত্বকথা নিহিত।

যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো!

এইই রবীন্দ্রনাথের লেখা ও সুর দেওয়া প্রথম সুস্পষ্ট "বাউল" গান। শেষরক্ষায় আরও কয়েকটি গান যোগ করা হইয়াছে॥

৩

'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) আকারে অনেক ছোট। এবং অতিশয় উপভোগ্য। কোন গান নাই। বিষয়বস্তু এবং প্রধান ভূমিকাগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। বৈকুণ্ঠ বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি। বিপিনের কাণ্ড তাঁহার অভিজ্ঞতায় ঘটিয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ শিশু। শান্তিনিকেতন হইতে গুণেন্দ্রনাথকে (—"Never mind তারিখ, শুক্রবার"—) লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে বৈকুণ্ঠের খাতার কাহিনীবীজের উল্লেখ আছে।[২]

> ৪ দফা। বাটির সংবাদ কিরূপ, মা কেমন আছেন ? আর আর সকলে কেমন আছেন ? ব্যাঘ্র-হন্তারক, উৎস-উৎসারক, সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ টুনটুনির নারদ বাত রোগের গারদ··· এমন যে মহাত্মা তিনি কি অদ্যাপি আমার ঘরটির প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন ? বোধকরি জ্যোতি তাঁহাকে বলিয়াছেন, "বড়দাদা আসুন তিনি আপনার সঙ্গীতপুস্তক উদ্ধার করিবেন"। বরাহ অবতার রসাতলমগ্ন বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহা সত্য কিন্তু তাঁহার দন্ত ছিল, অর্থাভাবে আমার বিষদাঁত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে—সুতরাং আমাকে কে উদ্ধার করে তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা। তিনি বাটীতে যতদিন আছেন ততদিন আমি বাড়ি-মুখো হইতেছি না, ইহা নিশ্চিত জানিও।

---

১ "ইন্দু। —তুই হাস্‌চিস্ দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বল্‌চি, ঐ দাড়িমুখগুলো না হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না।" (গোড়ায়-গলদ তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য)—শেষরক্ষায় বাদ গিয়াছে।

২ ভারতী মাঘ ১৩৩২ পৃ ৩৬৫-৩৬৬।

৪

বৈকুণ্ঠের-খাতার পর কয়েকটি ছোট ছোট কৌতুক-নাট্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কোন রীতিমত প্রহসন লিখেন নাই। তবে প্রহসনের কাছাকাছি যায় এমন একটি বড় এবং একটি ছোট গল্প-নাট্য লিখিয়াছিলেন। "গল্প-নাট্য" বলিতেছি এইজন্য যে এই দুইটি রচনায় প্রধানত সংলাপ, কোন বর্ণনা নাই। গদ্য অংশ যৎসামান্য। প্রথম রচনাটি প্রহসনের মতো, কৌতুকময়। দ্বিতীয়টির কাহিনী সাধারণ নাটকের মতো।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (১৯০১)[১] বড় বই, কাহিনী ক্ষীণ হইলেও রচনাগুণে, বিশেষত সংলাপের দীপ্তিতে, অত্যন্ত সুখপাঠ্য। কয়েকটি ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের কোন কোন আত্মীয়বন্ধুর ছায়াপাত হইয়াছে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিয়াছিলেন[২]

> চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশাল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে।

সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অধিকারের পরিচয়ের মূল্যবান্ সাক্ষ্য প্রজাপতির-নির্বন্ধে পাই। বইটিকে উদ্‌ভট শ্লোকের আধুনিক রসভাষ্য বলিতে পারি। আদিরসময় সংস্কৃত উদ্‌ভট কবিতাও যে আধুনিক বিদগ্ধ রুচির অরুচিকর নয় তা এই বইটিতে দেখা গেল। তবে এখানে রোমান্সকল্পনা কতক অংশে রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। একটু উদাহরণ দিই।

> রসিক।…আপনার কাছে খুলে বলি হাসবেন না, শ্রীশবাবু, আমার একতলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানালা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে—শুক্লসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কি খবর পাঠালে গো। শুভ্র একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলচে—
>
> অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্
> বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গারচিকুরাম্।
> ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
> কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী॥
>
> শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার। কিন্তু ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

---

[১] প্রথম প্রকাশ 'চিরকুমার সভা' নামে ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে (১৩০৭-১৩০৮)।
[২] শিলাইদহ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০০ (বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ ১৩৫০ পৃ ৯৬)।

রসিক। বাঙ্‌লায় একটা তর্জমাও করেছি—পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয় তাই লুকিয়ে রেখেছি—শুনবেন শ্রীশবাবু?

কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর
কালিন্দী-কুসুমগন্ধ ছুটিবে সুন্দর ;
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তী বাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হায় হায়,
কিসলয় পাখাখানি দোলাইব গায়?

শ্রীশ। আহাহা রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দওয়ালা কুঞ্জকুটীরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রী হচ্ছে তাহলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কি শ্রীশবাবু! শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কি? সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ প্রজাপতির-নির্বন্ধকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী রূপ দিয়াছিলেন, 'চিরকুমার সভা' নামে (১৩৩২)। অভিনয়ে এখনও খুব জমে॥

৫

প্রজাপতির-নির্বন্ধের পর একটি খুব ছোট প্রহসন বা কৌতুক-নাট্য লেখা হইয়াছিল। নাম 'বশীকরণ'।[১] সাধনায় প্রকাশিত কৌতুক রচনাগুলির সঙ্গে এটি 'ব্যঙ্গকৌতুক'এ (১৯০৭) সংকলিত আছে॥

৬

প্রজাপতির-নির্বন্ধের মত প্রায় পুরাপুরি সংলাপ আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি গল্প লিখিয়াছিলেন 'কর্মফল' নামে (১৯০৩)।[২] এই গল্পটির আধারে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'শোধবোধ' নামে পাঁচটিমাত্র দৃশ্যে একটি ছোট নাটক রচনা করিয়াছিলেন (১৯২৬)। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বইটির অভিনয় শিক্ষিত দর্শকের আগ্রহ জাগাইয়াছিল॥

---

১ প্রকাশ বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১৩০৮।

২ 'কুন্তলীন পুরস্কার' রচনামালায় প্রকাশিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নাট্য : জীবন প্রতিযোগী জড়

(১৯০৮-১৯২৪)

১

রবীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তা যে সময়ে অধ্যাত্মমুখীন হইয়াছিল অর্থাৎ ব্যক্তি ছাড়াইয়া ব্যক্তির বৃহত্তর জীবনের দিকে কবিভাবনা ঝুঁকিয়াছিল তখন স্বভাবতই নাট্যরচনায় তাহার প্রতিফলন হইয়াছিল। এই সময়ের নাট্যরচনায় গানের পরিমাণ এবং নাট্যকাহিনীর মধ্যে গানের তাৎপর্য বাড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুযায়ী উদারচিত্ত ভাবুক অধ্যাত্মরসিক মধ্যস্থ ভূমিকায় দেখা দিল। ব্যক্তিচরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ-ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া কিছু যেন সিম্বলিক সাজ ধরিল।

একটি ছাড়া এই সময়ের সব নাট্যরচনাই গীতিনাট্য অথবা সঙ্গীতনাট্য। তবে এই গীতিনাট্যগুলি আগেকার অনুরূপ রচনা—বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া, মায়ার-খেলা—এগুলির মতো নয়। এখানে গান কাহিনীকে বহন করে না, কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাবটিকে প্রবাহিত রাখে॥

২

সিম্বলিক-জাতীয় প্রথম রচনা 'শারদোৎসব' (১৯০৮) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। সেখানে প্রথম অভিনয় হয় পূজার ছুটির মুখে (আশ্বিন ১৩১৫)।

শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যশিল্পে ধারাপরিবর্তন ঘটিল। রাজা-ও-রাণী বিসর্জন মালিনী প্রভৃতি নাটক-নাটিকায় ছিল মানুষের ব্যক্তিক হৃদয়দ্বন্দ্ব, তাহার জীবনের বিশেষ সমস্যা,—সংস্কারের সঙ্গে বিচারবুদ্ধির সংঘর্ষ, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে অহংকার-অভিমানের বিরোধ। গোড়ায়-গলদ ও বৈকুণ্ঠের-খাতা প্রভৃতি প্রহসনে পাইয়াছিলাম সংলাপাশ্রয়ী বিশ্রব্ধ কৌতুকরসদীপ্তি। শারদোৎসব হইতে দেখি যে কবিদৃষ্টি মানুষের হৃদয়বৃত্তি ছাড়াইয়া তাহার অনুভাবের সামর্থ্যের উপর পড়িয়াছে। এখানে ভূমিকাগুলি মানুষের অন্নময় শারীরসত্তার ছায়াবহ ততটা নয় যতটা তাহার আনন্দময় রসসত্ত্বের। এইভাবে দেখিলে শারদোৎসবে ও পরবর্তী অধিকাংশ নাট্যরচনায় আধ্যাত্মিক রূপকের ঝলক লাগিয়াছে।

শারদোৎসবের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। পরবর্তী কয়েকটি গীতাশ্রয়ী নাট্যরচনায়ও এইরকম দেখা যায়। অভিনয়ের জন্য কবি এই 'নান্দী' লিখিলেন।

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।

প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি,
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধহাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

প্রকৃতির ঋতুচক্রের মতো মানুষের নিগূঢ় ব্যক্তিত্বেও সর্বদা কান্নাহাসির পালাবদল চলিয়াছে। দুঃখবেদনাকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা না করিয়া দুঃখ-বেদনাকে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করিলে তবেই আনন্দের ক্ষেত্রে ছুটি পাওয়া যায়। সংসার-বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া নয়, তাহাকে জীবনের প্রতি-মুহূর্তে স্বীকার করিয়া লইয়া, দুঃখে সুখে নির্দ্বন্দ্ব সাধনাই মুক্তির পথ। শরৎকালে প্রকৃতির পটে এই সহজ আনন্দসাধনার রূপটি ফুটিয়া উঠে। বর্ষার কালো মেঘ ধরণীর বুকে ধারা বর্ষণ করিয়া দিয়া ভারমুক্ত সিতাভ্ররূপে দেবতাত্মার দিকে চলিয়া যায়। ইহাই শারদোৎসবের বাণী। শারদোৎসবের কেন্দ্রীয় পাত্র সন্ন্যাসী ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন ঠাকুরদাদাকে।

আমি অনেক দিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি—জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ ক'রছে। বড় সহজে ক'রচে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে ক'রছে। সেই জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই জন্যই এত সৌন্দর্য।

শারদোৎসব নামটি একটু শ্লিষ্ট। শারদ-উৎসব উপলক্ষ্যে, শারদপ্রসন্নতাকে উৎসবের মতো স্বীকার করিতে, বইটি লেখা। নামটির মধ্যে যে গভীরতার তাৎপর্য তা কাহিনীর মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে সহজে বোঝা যায় না। ঠিক বিশ বছর পরে একটি লেখাতে শারদোৎসবের মর্মবাণী গুঞ্জরিত।

দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী !···

৩

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাবলীর মধ্যে শারদোৎসবের একটি বিশেষ মূল্য আছে। প্রচলিত যাত্রার—বিশেষ করিয়া নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রার—ঠাট ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। (নীলকণ্ঠ বীরভূম-বর্ধমানের প্রান্তবাসী ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের বার্ষিক মেলায় অনেকবার গান করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সে যাত্রা-গান শুনিয়াছিলেন। শারদোৎসবের পরিবেশ শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ায়।) ঠাকুরদাদার দূতীয়ালিতে এবং ছেলেদের ভূমিকায় ও গানে কৃষ্ণ-যাত্রার আমেজ আছে।[১]

শারদোৎসবের আর একটি বিশিষ্টতা এই যে ইহার কাহিনীবীজ বাংলাদেশের প্রচলিত রূপকথা হইতে গৃহীত। নিঃসন্তান রাজা বাহির হইয়াছেন বৈরাগ্যবশে এবং উত্তরাধিকারীর সন্ধানে। তিনি যাহাকে লাভ করিলেন সে অজ্ঞাতকুলশীল। রূপকথার সঙ্গে সম্পর্ক এই পর্যন্ত।

শারদোৎসবের কিছুকাল পরে লেখা একটি গানে বইটির মর্মকথা নিহিত।

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা রে হৃদয় আনন্দ গান গা রে।...

৪

শারদোৎসবের সমধর্মী রচনা 'ফাল্গুনী' (১৯১৬)।[২] এ বইটিতে সংলাপের বদলে গানের প্রাধান্য বাড়িয়াছে। বস্তুত প্রত্যেক দৃশ্যের "গীতি-ভূমিকা" বা গানগুলিই

---

[১] 'রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব' (অমৃত ২৭ বৈশাখ ১৩৭৫) পৃ ১১-১২ দ্রষ্টব্য। ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতায় অভিনয়ের উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে 'সূচনা' লিখিয়াছিলেন তাহাতে যাত্রাপালার সঙ্গে শারদোৎসবের সম্পর্কের ইঙ্গিত মেলে।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বল্‌চ? তা তাঁর উপরে ত ভার ছিল উৎসব উপলক্ষ্যে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

... ...

মন্ত্রী। কবি বল্‌চেন, তিনি তাঁর মনের মত ছোট একটা পালা লিখেচেন।

[২] রচনা সমাপ্তি সুরুল (২০ ফাল্গুন ১৩২১)। কয়েকটি গান দুই একদিন পরে লেখা। সবুজপত্রে প্রকাশিত রচনার সহিত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত রচনার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সবুজপত্রে দৃশ্যবিভাগ নাই সংখ্যাবিভাগ আছে। চার সংখ্যার নাম যথাক্রমে 'সূত্রপাত', 'সন্ধান', 'সন্দেহ' ও 'সমাপ্তি'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ফাল্গুনীতে চার দৃশ্য এবং দৃশ্যগুলির উপনাম যথাক্রমে 'সূত্রপাত', 'সন্ধান', 'সন্দেহ' ও 'প্রকাশ'। প্রত্যেক দৃশ্যের আগে 'গীতিভূমিকা' নামে কয়েকটি করিয়া গান আছে। ইহা গ্রন্থে নূতন সংযোজন। শেষের গানটিও ("আয়রে ভবে মাতরে সবে আনন্দে") নূতন সংযোজন। প্রকাশ সবুজপত্রে (চৈত্র ১৩২১)।

মুখ্য, গদ্যাংশ যেন রূপকব্যাখ্যা। পরে লেখা "সূচনা"র একটি স্বতন্ত্র নাট্যরচনার মর্যাদা আছে।[১] সূচনার ক্ষীণ কথাবস্তু পালি মখাদেব-জাতকের মতো। (কেশ-প্রসাধনকারী—"কল্পক"—একদিন মিথিলার রাজা মখাদেবের মাথায় দুইগাছি পাকা চুল পায়। তাহা দেখিয়া রাজা মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।) জন্মমৃত্যুর সূত্রে দিবারাত্রির বেণীবন্ধনে যে-জীবলীলা চিরন্তন অগ্রসর ফাল্গুনীর ক্ষীণ আখ্যানভারহীন বস্তু সেই রূপকেরই উদাহরণের মতো। শারদোৎসবে সাধনা নবযৌবনের, ফাল্গুনীতে প্রৌঢ়যৌবনের। শারদোৎসবে বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমনী, ফাল্গুনীতে শীতের বিদায় ও বসন্তের আমন্ত্রণ, অর্থাৎ "কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাল্গুনের পালা"। মৃত্যুকে যখন শুধু সংহাররূপে দেখি তখন আমাদের সে মিথ্যাদৃষ্টি, কেননা সে দৃষ্টিতে মহাকালের খণ্ড রূপটুকুই গোচর হয়। আর যখন মৃত্যুকে দেখি নূতন জীবনের ধাত্রীরূপে তখন আমাদের দৃষ্টি কালের পটে নির্মুক্ত। ফাল্গুনীতে আদ্যিকালের বুড়োর (—অর্থাৎ শীতের জড়তার ও জরার জীর্ণতার—) রূপকে এই ইঙ্গিতই নিহিত। মানবজীবনের আরম্ভ জন্মে নয়, অবসানও মৃত্যুতে নয়। জীবন-মৃত্যু—দুই তোরণের ভিতর দিয়া জীবনের প্রবহমাণ পথ প্রসারিত,—ইহাই ফাল্গুনীর বাণী। "মনের ভিতর বল্‌চে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও ব'সে থাক্‌বো না। ফুল যাচ্চে, পাতা যাচ্চে, নদীর জল যাচ্চে—তার পিছন পিছন আমিও যাবো।" ফাল্গুনীকে বলাকার পরিপূরক বলিতে পারি।

কলিকাতায় অভিনয়ের পূর্বে[২] রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে ফাল্গুনীর সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন

> ফাল্গুনীর ভিতরের কথাটি অতি সরল। সে হচ্ছে এই যে জীবনটা অমর বলেই তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারে বারে নবীন করে নিতে হয়। পৃথিবীতে জরাটা হচ্ছে পিছনের দিক। ওর সামনের দিকটা যৌবন। ...ফাল্গুনীতে গীতিনাট্যাংশটুকু হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে নানা ঋতুর তোরণদ্বার দিয়ে একই পুরাতনের নবীন হওয়ার লীলা আর তারই সঙ্গে যে নাট্যটুকু

১ "সূচনা" অংশ পরে রচিত হইয়া ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা সবুজপত্রে 'বৈরাগ্য সাধনা' নামে বাহির হয়। ফাল্গুনীতে 'সূচনা'র শেষ অংশ ("তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব?"—পর হইতে) নূতন সংযোজন। এই অংশে ফাল্গুনীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা আছে। 'বৈরাগ্যসাধন' স্বাধীন রচনা। শারদোৎসব যখন সংক্ষিপ্ত ও গীতিবহুল আকারে কলিকাতায় অভিনীত হয় (ভাদ্র ১৩২৯) তখন ফাল্গুনীর সূচনার মতো একটি 'ভূমিকা'—প্রস্তাবনার মতো, রাজা ও মন্ত্রীর সংলাপময়—যুক্ত হইয়াছিল।

২ প্রথম অভিনয় শান্তিনিকেতনে (এপ্রিল ১৯১৫)। দ্বিতীয় অভিনয় কলিকাতায় (মাঘ ১৩২২)। কলিকাতায় অভিনয় ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আছে তার মধ্যে মানুষের যৌবন জরার অনুসরণ করতে গিয়ে কেমন করে মৃত্যুগুহার ভিতর দিয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয় সেই বর্ণনা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে লীলা শীতবসন্তে মানবপ্রকৃতিতে সেই লীলা জরাযৌবনে, জন্মমৃত্যুতে। এই কথাকেই গীতে এবং নাট্যে ফাল্গুনীতে প্রকাশ করা হয়েচে।

'বসন্ত' (১৯২৩) এক হিসাবে ফাল্গুনীর উপসংহার। ইহাতে বসন্তের দ্বিতীয় পালা—প্রকৃতির প্রৌঢ়যৌবনসমৃদ্ধির অভিনন্দন। এখানে গানেরই প্রাধান্য, গল্প বলিতে কিছুই নাই। যেটুকু আছে তাহা ফাল্গুনীর ভূমিকার অনুরূপ। সমৃদ্ধির সার্থকতা শুধু প্রাচুর্যে নয়, সেই সঙ্গে চাই ত্যাগের নিরাসক্তি।—ইহাই বসন্তের মর্মকথা।

ফল ফলাব বলে কোমর বেঁধে বস্‌লে ফল ফলে না, মনের আনন্দে ফল চাইনে বল্‌তে পারলে ফল আপনি ফ'লে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলে ফলেই ধরে,

৫

'শেষ বর্ষণ'এ (১৯২৫)[১] বর্ষার শেষ পালার—শারদীয় বর্ষণক্ষান্তির—উদ্বোধন। কথাবস্তু বলিয়া কিছু নাই। গদ্য সংলাপ গানগুলিকে গাঁথিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্য 'মুকুট' (১৩১৫) লেখা হয়। ইহা বালকে প্রকাশিত (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) 'মুকুট' গল্পের নাট্যরূপ। ক্ষুদ্র নাটকটির সংকীর্ণ পরিসরেও চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে॥

৬

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রচনা করিয়াছিলেন (১৮৮১-৮২)। উপন্যাস-কাহিনীতে নাটকীয় উপাদান প্রচুর থাকায় অবিলম্বে তাহা লইয়া এক সমসাময়িক নট-নাট্যকার কেদারনাথ চৌধুরী 'রাজা বসন্ত রায়' নাটক লিখিয়াছিলেন (১৮৮৬ ?)। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকটির অভিনয় বেশ জমিয়াছিল। বৌঠাকুরাণীর-হাটে যে গানগুলি ছিল সেগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত আরও কয়েকটি গান যোগ করা হইয়াছিল। এই গানগুলি লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে। 'রাজা বসন্ত রায়' ছাপা

[১] কলিকাতায় ৩ আশ্বিন ১৩৩২ তারিখে প্রথম অনুষ্ঠিত। সেই উপলক্ষ্যে গদ্যাংশবর্জিত 'শেষ বর্ষণ' প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩৩২)। সম্পূর্ণ বই 'ঋতু উৎসব'এ সংকলিত (১৩৩৩)।

হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এবং রচনায় রবীন্দ্রনাথের সংশোধন ছিল কিনা জানা নাই। ১৩১৬ সালে বৌঠাকুরাণীর-হাট কাহিনী লইয়া রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' বাহির হইয়াছিল।[১]

প্রায়শ্চিত্ত নাটকটিতে উপন্যাস-কাহিনীর কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। তাহা বৌঠাকুরাণীর-হাট প্রসঙ্গে পরে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

ধনঞ্জয়-চরিত্র মূল উপন্যাসে নাই। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় ভূমিকা বসন্ত রায়ের। নাটকে সে ভূমিকা ধনঞ্জয়ের, যদিও মূল ঘটনাবলীর সঙ্গে ধনঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ যোগ নাই। ধনঞ্জয় যেন মহাত্মা গান্ধীর পূর্বাবতার। তাহার কথায় টল্‌স্‌টয়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-নীতির প্রতিধ্বনি, তাহার আচরণে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিরূপ। অথচ সে আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে তখনো দশবারো বছর দেরি।

মাধবপুরের প্রজারা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। রাজস্ব মিটাইতে গেলে তাহাদের উপবাস করিতে হয়। ধনঞ্জয় বৈরাগীকে তাহারা গুরু বলিয়া মানে। ধনঞ্জয়কে নেতা করিয়া প্রজারা রাজার কাছে দরবার করিতে চলিয়াছে।

> তৃতীয়। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কি বল্‌ব?
>
> ধনঞ্জয়। বল্‌ব আমরা খাজনা দেব না।
>
> তৃতীয়। যদি শুধোয় কেন দিবি নে?
>
> ধনঞ্জয়। বল্‌ব ঘরের ছেলে-মেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্ন ঠাকুরের ভোগ হয়, তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।
>
> চতুর্থ। বাবা, একথা রাজা শুনবে না।
>
> ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। ...ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।
>
> পঞ্চম। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

---

১ প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরি। ১৩১৬ সালে বইটি কেন হিতবাদী লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হইল তা ভাবিবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক গান ইত্যাদি গ্রন্থের (১৩১০ সালের পূর্বে প্রকাশিত) গ্রন্থাবলী-স্বত্ব হিতবাদী লাইব্রেরিকে বিক্রয় করেন। এই গ্রন্থাবলী 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' নামে ১৩১১ সালে ছাপা হয়। প্রায়শ্চিত্ত ১৩১১ সালের আগে ছাপা হয় নাই, সুতরাং গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। ১৩১৪ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থ অন্য প্রকাশক ছাপিতেছিল, ইহা মনে রাখিতে হইবে। মুক্তধারার মুখবন্ধরূপে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে প্রায়শ্চিত্ত "এখন হইতে (বৈশাখ ১৩২৯) পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।" সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত ১৩১২-১৩১৩ সালে লেখা হইয়াছিল এবং লেখা সম্পূর্ণ হইবার আগেই তাহার স্বত্ব হিতবাদী লাইব্রেরিকে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায় তা জানিস্!

ষষ্ঠ। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায় ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্‌ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখ্‌লে ভাল হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনি শান্তি হয়।

সপ্তম। তোরা অত ভয় কর্‌ছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্চেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যাঁর ভরসায় চলেছে তাঁর নাম কর্‌। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্—পণ করে বসেছিস্ যে মরবি নে। কেন, মর্‌তে দোষ কি হয়েছে![১]

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ধনঞ্জয় প্রজাদের সামনে কোনরকম লাভলোভের চার ছড়ায় নাই, তাহাদের মনে যে স্বাভাবিক শুভবুদ্ধি ও সত্যবোধ আছে তাহাই জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

প্রতাপাদিত্য সাধারণ মানুষের মতো। তাহার উচ্চতর নীতিবোধ নাই তবে কর্তব্যবোধ আছে। অসতর্ক মুহূর্তে মন তাহারও নরম হয়। ধনঞ্জয়কে রাজা গারদে পুরিয়াছে। গারদে আগুন লাগিলে ধনঞ্জয় বাহিরে আসিল কিন্তু নিজেকে মুক্ত মনে করিতে পারিল না। রাজার কাছে আসিল মুক্তির হুকুম চাহিতে।

প্রতাপ। ক'দিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোনো ভাবনা ছিল না।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?...
এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও ত রাস্তা! চল্‌তে পারলেই হল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায় লাগি?

প্রতাপ। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি? যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?[২]

---

[১] দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য। (প্রায়শ্চিত্তে দৃশ্য শুধু সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট।)

[২] চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাউল-বৈষ্ণবের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছিলেন। এই সাধকদের সাধনার গভীরতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।[১] কাহারও কাহারও ব্যক্তিত্ব তাঁহার মনে দাগ কাটিয়াছিল। তাই অতঃপর রবীন্দ্র-নাট্যে ধনঞ্জয়ের মতো বাউলের কেন্দ্রীয় ভূমিকা অপরিহার্য হইয়াছে।

যে চরিত্রগুলি উপন্যাস ও নাটক দুইয়েতেই আছে সেগুলি নাটকে স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর হইয়াছে। তবে সুরমার ভূমিকা আরও অন্তরালবর্তিনী।

এখন প্রশ্ন হইতেছে :নাটকটির নাম 'প্রায়শ্চিত্ত' হইল কেন? প্রায়শ্চিত্ত কাহার হইয়া কে করিল? উত্তর কঠিন নয়। অন্যায়কারী দুইজন প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র। প্রতাপাদিত্যের প্রায়শ্চিত্ত করিল বসন্ত রায় ও সুরমা, রামচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত করিল বিভা।

প্রায়শ্চিত্তে তেইশটি গান আছে। তাহার মধ্যে দুইটি বৌঠাকুরাণীর-হাটেও ছিল॥

৭

প্রায়শ্চিত্তকে অদলবদল করিয়া রবীন্দ্রনাথ চার অঙ্কে 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)[২] রচনা করিলেন। মূল কাহিনী অব্যাহত আছে। ছোটখাটো ঘটনা অল্পস্বল্প পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তে বসন্ত রায় ও ধনঞ্জয় কখনো মুখোমুখি আসে নাই, পরিত্রাণে আসিয়াছে। বিভা পিতার সম্মুখীন হইয়াছে। পরিত্রাণে রামচন্দ্র উদয়ের সাহায্যেই পলাইতে পারিয়াছে। অর্থাৎ উদয় ও বিভা দুইটি চরিত্রই পরিত্রাণে বেশি সক্রিয়। রামচন্দ্রের সভার কোন কোন দৃশ্য বাদ গিয়াছে। রমাই ভাঁড়ের ভূমিকা বর্জিত হইয়াছে। গানের সংখ্যা পরিত্রাণে বাইশ। তাহার মধ্যে নয়টি নূতন।

'পরিত্রাণ' নাম সঙ্গততর। কাহিনীর পরিণতি, ভালো হোক মন্দ হোক, প্রধান সব ভূমিকারই স্বস্তি আনিয়াছে॥

৮

শারদোৎসবের প্রসন্নতায় বাৎসল্যের কোমলতা, প্রায়শ্চিত্তের বিক্ষোভে সৌহার্দ্যের স্বচ্ছতা। তাহার পর 'রাজা' (১৯১০)।[৩] রাজার সমস্যায় প্রেমের

১ দ্রষ্টব্য 'আত্মবোধ' (শান্তিনিকেতন ত্রয়োদশ খণ্ড)।

২ প্রকাশ বসুমতী শারদীয়া (বার্ষিক) সংখ্যা ১৩৩৪।

৩ প্রথম সংস্করণে রাজা "কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হইয়াছিল।" মূল রচনা অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ (ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ) প্রকাশিত হইয়াছিল।

দহন ও দীপ্তি। এই নাট্যরূপকের কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যের কুশ-জাতক অবলম্বনে পরিকল্পিত।[১] অঙ্ক-বিভাগ নাই। যা আছে তাহাকে দৃশ্য-বিভাগ বলা যায়। সবশুদ্ধ বিশ দৃশ্য। মল্লরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ কিন্তু অত্যন্ত কুরূপ। মদ্ররাজকন্যা অপূর্ব সুন্দরী প্রভাবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। দিবালোকে দেখিলে প্রভাবতী স্বামীকে ঘৃণা করিবে এই আশঙ্কায় কুশের মাতা পুত্র-পুত্রবধূকে দিনের বেলা মিলিতে দিত না। পুত্রের আগ্রহে অবশেষে রানী কোন ছলে প্রভাবতীকে দেখাইল। প্রভাবতী দেখিতে চাহিলে সুরূপ দেবরকে দেখাইয়া তাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকার বেশিদিন আটকানো গেল না। কুরূপ স্বামীকে দেখিবামাত্র প্রভাবতী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। কুশ তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছদ্মবেশে শ্বশুরালয়ে গিয়া নীচবৃত্তি করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের আক্রমণ হইতে শ্বশুরকে উদ্ধার করিয়া বীর্যশুল্কে পত্নীপ্রেম লাভ করিল।

রাজায় রূপক ও কাহিনী দুই অংশ ভারে সমান, যদিও নাট্যরসের পক্ষে রূপক অংশের মূল্য বেশি। নায়িকা সুদর্শনা রাজার অনতিচিরবিবাহিত মহিষী, কিন্তু তাহাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই। তাহাদের মিলনস্থান গর্ভগৃহের অন্ধকার কক্ষ। কিছুকাল পরে রানীর মনে সন্দেহ জাগিল, রাজা হয়ত দেখিতে সুন্দর নয় তাই দেখা দিতে এত সঙ্কোচ। (রাজা প্রজাদেরও দর্শন দেন না। তাহাদের মনেও এ সন্দেহ দেখা দিয়াছে।) দাসী সুরঙ্গমাকে প্রশ্ন করিলে সে রানীকে যা উত্তর দিল তাহাতে সংশয় বাড়িল। সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে আলোতে দেখিতে চাহিলে রাজা বলিল, "আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো!" উৎসবের জনতার মধ্যে নধর সুরূপ রাজবেশী সুবর্ণকে দেখিয়া সুদর্শনা তাহাকে রাজা মনে করিয়া মুগ্ধ হইল এবং সখীর হাতে ফুল উপহার পাঠাইল। সুবর্ণের পাশে ছিল কাঞ্চীর রাজা। সে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া সুবর্ণের গলার মুক্তাহার লইয়া সখীকে উপহার দিল। সুদর্শনা সখীর কাছে মালাটি চাহিয়া লইয়া লজ্জায় পুড়িতে লাগিল। অতঃপর কাঞ্চীর রাজা সুদর্শনাকে পাইবার জন্য সুবর্ণকে শিখণ্ডী খাড়া করিল। সেই উদ্দেশ্যে রানীর প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে আগুন লাগানো

[১] মহাবস্তুতে এবং পালি জাতকে কুশের কাহিনী আছে।

হইল। দেখিতে দেখিতে আগুন প্রাসাদ বেড়িয়া ফেলিল। সুদর্শনা সুবর্ণের কাছে আসিয়া বলিল, "রাজা রক্ষা কর! আগুনে ঘিরেছে।" সুবর্ণ বলিল "কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।" তখন সুদর্শনা লজ্জা রাখিবার ঠাঁই পাইল না। অপমানে ধিক্কারে আত্মবিসর্জন দিতে সে জ্বলন্ত প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। তখন রাজা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল। আগুনের দীপ্তিতে সুদর্শনা রাজার মুখ মুহূর্তের জন্য দেখিতে পাইল—ভয়ানক সে মুখ, কালো—"ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো" কালো, "ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।" কিন্তু তাহার নয়নে তখনো রূপের নেশা লাগিয়া আছে। রাজার ভীষণরমণীয় নীললোহিত রূপ তাহার বুকে বাজিল কিন্তু মনে ধরিল না। সে বাপের বাড়ী যাইতে চাহিলে রাজা বাধা দিল না। তাহাতে সুদর্শনার মনে খটকা লাগিল। রাজার দাসী সুরঙ্গমা রানীর সঙ্গ ছাড়িল না, সঙ্গে গেল। বাপের বাড়ী আসিয়া সুদর্শনার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইল। পিতা কান্যকুব্জরাজ মেয়ের ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না। তিনি কন্যাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। মন্ত্রী প্রতিবাদ করায় বলিলেন, "যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তবে পিতা নামের যোগ্য নই।" ওদিকে রাজারা সুদর্শনাকে পাইবার লোভে কান্যকুব্জে সমবেত। প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে স্বয়ংবরসভাগামী কাঞ্চীরাজের ছত্রধর সুবর্ণকে সুরঙ্গমা দেখাইয়া দিলে সুদর্শনার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল, "ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না! সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধতে মিলে আর একটা কি দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়।" স্বয়ংবরসভায় ডাক পড়িলে সুদর্শনা ধিক্কারে দেহপাত করিতে প্রস্তুত হইল। মনে মনে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি বুক চিরে সেটা কি তোমাকে জানিয়ে যেতে পারব না?"

স্বয়ংবরসভা জমিবার আগেই রাজার সেনাপতি ঠাকুরদাদা আসিয়া রাজাদের রণক্ষেত্রে ডাক দিল। সুদর্শনা অভিমান আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছে যুদ্ধশেষে বিজয়ী স্বামীর প্রতীক্ষায়। এমন সময় ঠাকুরদা আসিয়া খবর দিল রাজা চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়া অভিমানে সুদর্শনা সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না। কিন্তু থাকিতেও পারিল না। রাজার অভিসারে তাহাকে পথে বাহির হইতেই হইল। রাত্রিশেষে সূর্য উঠিলে দেখা গেল সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা রাজধানীতে

পৌছিয়াছে। তাহার পর মিলন হইল সেই অন্ধকার কক্ষে। রানীর দৃষ্টি এখন খুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং অন্ধকার কক্ষের আর প্রয়োজন নাই। রাজা তাহাকে বাহিরে আহ্বান করিয়া আনিল,—"এস, আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়!" এই হইল নাটকের কাহিনী।

নাটকের মধ্যে রাজা কোথাও দেখা দেন নাই। তিনি সৃষ্টির নিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতীক। প্রজারা তাঁহাকে চেনে না কিন্তু তাঁহার সত্য প্রশাসনের স্বাধীনতায় সংরক্ত। বিদেশীরা আসিয়া রাজাকে দেখিতে না পাইয়া প্রশ্ন করিলে সাধারণ প্রজা বিব্রত বোধ করে। তাহাদের বুঝাইয়া ঠাকুরদাদা বলে

> আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেইত সমস্ত রাজাটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বলে ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা ক'রে দিয়েছে।

প্রতিপক্ষ রাজারাও তাঁহাকে চেনে না, কিন্তু তাঁহার শক্তিকে চেনে। প্রতিপক্ষদের কাছে রাজা যেন বেদের পর্জন্যের মতো, "ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্"। পরাভূত হইয়া কাঞ্চীরাজ রাজার পরিচয় পাইয়াছে, তারপর দেখা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।

> যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মত এসে একমুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ঘরে দেখাই নেই।

সুরঙ্গমা রাজাকে চেনে—হাট হইতে কিনিয়া আনা দাসী যেমন পরে অনুরাগিণী উপাসক হইয়া প্রভুকে ভক্তি করে, দাস্যরসিক ভক্ত যেমন ভগবান্‌কে দেখে তেমনি। দুর্বৃত্ত বাপের অবহেলায় সুরঙ্গমা পাপের পথে নামিয়াছিল। রাজা বাপকে নির্বাসন দেন ও সুরঙ্গমাকে অন্তঃপুরে আটক করেন।

> আমি কেবল খাঁচায় পোরা বুনো জন্তুর মত কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।
>
> কী জানি কখন কি হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মত বেঁচে গেলুম।

"সুরঙ্গমা" নাম রবীন্দ্রনাথের তৈরি। নামটির মধ্যে "সুরঙ্গ" ও "গমা" দুইটি শব্দেরই ব্যঞ্জনা আছে। সে রাজার ও সুদর্শনার অন্ধকার-কক্ষের পথ-প্রদর্শিকা। সুদর্শনা তাহাকে বলিয়াছিল

> তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতই কথা, অর্থই বোঝা যায় না।

সুদর্শনার কাছে রাজা পরমপ্রেষ্ঠ। কিন্তু সুদর্শনা তাঁহাকে অন্ধকারের অন্তরালে

পাইয়াই খুশি নয়, সে চায় প্রিয়কে বাহিরে ইন্দ্রিয়গোচরে পাইতে। সে যেন সেই ভক্তসাধিকা যে অন্তরের ধ্যানে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া শান্ত হইতে পারিতেছে না, বাহিরে তাঁহাকে সাকার মূর্তিতে পাইতে চায়। "কিন্তু যা সকলের চেয়ে বড় পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়"। ঈশ্বরের আনন্দ জগৎব্রহ্মাণ্ডে খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া আছে। কোন এক বা একাধিক খণ্ডকে লইতে গেলে সমগ্রকে হারাইতে হয়। তাই যতক্ষণ সুদর্শনার প্রেম পাকা না হইতেছে, ভালোবাসা ভালোলাগা-মন্দলাগার উর্ধ্বে না উঠিতেছে, ততদিন তাহার কঠিন পরীক্ষা, অহংকারবিধ্বংসের সাধনা, চলিয়াছে। শেষ দৃশ্যে সুদর্শনাকে রাজার কাছে যাইতে দেখিয়া ঠাকুরদাদা বলিয়াছিল

> এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্চ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা উত্তর দিয়াছিল

> না, না, না! সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নীচে।

এক হিসাবে রাজা-সুদর্শনার বিরহমিলনের ব্যাপারকে বৈষ্ণব-ভাবনায় কৃষ্ণ-রাধার অভিসারের প্রতিরূপক বলিতে পারি। এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সৃষ্টিসংহারের রূপকরূপেও অন্যত্র কবিতায়-গানে ব্যবহার করিয়াছেন।

অসীমের সঙ্গে মিলনের বাসনা সসীমের ধর্ম—বৈষ্ণব কবিতাত্ত্বিকের কথায় "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম"। এই মিলনাভিসার একতরফা নয়। অসীমও তাঁহার আনন্দঘন রূপ সসীমের মিলনপ্রয়াসী। স্রষ্টার আনন্দ সৃষ্টির মধ্যে রূপ লইয়াছে। এই রূপে স্রষ্টাও মুগ্ধ।

> সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?
> রাজা। পাই বৈকি।
> সুদর্শনা। কেমন ক'রে দেখতে পাও? আচ্ছা, কি দেখ?
> রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে। তা'র মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

"আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি কি সেখানে শুধু তুমি!"[২]—রাজার এই কথায় বৈষ্ণব কবি-দার্শনিকের প্রতিধ্বনি শুনি

> দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী,
> আস্বাদিতে লোভ হয়

অসীমের প্রকাশ রূপে এবং অরূপে। সৎ-চিদ্‌-আনন্দসাগরের উপরে খেলিতেছে রূপের ঢেউ, আর ভিতরে লুকাইয়া আছে সুগভীর অরূপের ধ্যানমৌন অন্ধকার। রসের সাধনা শুধু রূপের নয়, অরূপেরও। অরূপের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই তবে রূপসাগরে ডুব দিবার অধিকার হয়। সুদর্শনা অসীমের সাধক, অরূপের ধ্যান এড়াইয়া রূপের মধ্যেই রসোপলব্ধি চায়।—"এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখী মাটিপাথর সব দেখচি সেইখানেই তোমাকে দেখব।"

অরূপ যিনি, "লোকে যাকে বলে সুন্দর তিনি তা নন।" তিনি শান্ত ও রুদ্র দুইই। তাঁহাকে শুধু সুন্দর রূপেই দেখার মধ্যে বিপদ আছে।

> আমরা অনেক জিনিষকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডীর মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত সৌখিন রকম ক'রে দেখতে চাই, তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি, সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।[১]

সুদর্শনা এই ভুলই করিয়াছিল। অবশেষে দুঃখের আঘাতে অহংকারের পরাজয় ও অভিমানের ক্ষয় হইলে পর সে রাজার স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিল।

> যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখ্‌লে এমন ভয়ংকর, তারই অখণ্ড সত্যরূপ কি পরম শান্তিময় সুন্দর![১]

সুরঙ্গমা সুদর্শনার গুরু নয়,—উত্তরসাধিকা, কল্যাণমিত্র। এ-পথে গুরু নাই।

> তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে ব'লে দেবে না—আর ব'লে দিলেই বা বিশ্বাস কি।

নাট্যকাহিনীতে ঠাকুরদাদা রাজার প্রতিনিধি। তিনি যেন রাজারই ছদ্মবেশ, হাসিখুশির ঢেউ তুলিয়া প্রজাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান। ঠাকুরদাদা কাহারও প্রণাম গ্রহণ করেন না। তাঁহার সঙ্গে সকলের "হাসির সম্বন্ধ"। দরকার হইলে সেনাপতিও সাজেন। ঠাকুরদাদা ছাড়া কেহই রাজাকে চেনে না। শুধু ঠাকুরদাদাই জানেন, "আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।"[২]

ঠাকুরদাদা রাজাকে ছাড়িয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারেন না। সুদর্শনা যখন জেদ করিয়া বলিয়াছিল

> এই জানালার কাছে আমি চুপ করে প'ড়ে থাকব—এক পা নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

---

১ 'সুন্দর' ভারতী আষাঢ় ১৩১৮ পৃ ২৬৯। ২ তান্ত্রিক মহাযানের 'মণি-পদ্ম'।

তখন ঠাকুরদাদা উত্তর দিয়াছিলেন

দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ ক'রে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না পাই একবার খুঁজতে বেরব।

রাজায় বাইশটি গান আছে, তাহার মধ্যে পাঁচটি প্রথম দৃশ্যে, চারটি করিয়া তৃতীয় ও পঞ্চম দৃশ্যে, তিনটি দ্বিতীয় দৃশ্যে, দুইটি অষ্টম দৃশ্যে, একটি করিয়া চতুর্থ, চতুর্দশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ দৃশ্যে।

রাজা ১৩১৭ সালের কার্তিক মাসে শিলাইদহে লেখা। কয়েক মাস পরে (চৈত্র, বৈশাখ) শান্তিনিকেতনে বইটি অভিনীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন॥[১]

৯

ঘটা দুই একের মতো অভিনয়ের উপযোগী করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'কে নবরূপ দিলেন 'অরূপরতন' নামে (১৯১৯)। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় নাট্যকাহিনীর মর্মটুকু বলিয়া দিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন

এই নাট্যরূপটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

অরূপরতনে দুইটি দৃশ্য। প্রথম—প্রাসাদকুঞ্জ বাতায়ন ও প্রাসাদকুঞ্জ দ্বার, দ্বিতীয়—কান্তিকনগরের পথ। সুদর্শনার পিতার রাজধানীর নাম কান্যকুব্জের বদলে কান্তিকনগর হইয়াছে। কাঞ্চীরাজ হইয়াছে বিক্রমবাহু, অন্য রাজাদের (কলিঙ্গ, কোশল, পঞ্চাল, বিদর্ভ, বিরাট) স্থানে পাই দুইটিমাত্র নাম—বিজয়বর্মা ও বসুসেন। 'রাজা'য় রাজাকে রঙ্গমঞ্চে দেখা না গেলেও রাজার ভূমিকা অপ্রধান নয়। অরূপরতনে রাজার ভূমিকা একেবারে বাদ গিয়াছে। বর্জিত অপর ভূমিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও তাঁহার মন্ত্রী।

অরূপরতনে উনচল্লিশটি গান আছে। তাহার মধ্যে সাতটি রাজায় আছে।

অরূপরতন নামের প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির এই গানটি স্মরণীয়

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ-রতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

১ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২৩৭, ২৩৯

১০

রাজার মতো 'অচলায়তন'ও (১৯১১)[১] শিলাইদহে লেখা। দুইটি রচনার ব্যবধানকাল সাত আট মাসের বেশি নয়।

অচলায়তনে কাহিনী ও রূপক অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাসে কোন ঘটনার ও ব্যক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ কোন পুরাণকাহিনী অথবা প্রাচীন-আধুনিক কোন গল্প অবলম্বনে নাটককাহিনী পরিকল্পিত নয়। তবুও অচলায়তনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাসের যে কোন বিশেষজ্ঞের রচনার তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়।—একথা বলিলে ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু অসত্যভাষণ হইবে না। অব্যবহিত পরবর্তী কালের রচনা—'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'[২] প্রবন্ধটি অচলায়তনের পূর্বাংশ অথবা উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণীয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীন স্রোতোধারা পরবর্তী কালে—তুর্কী আক্রমণের পূর্ব হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত—যেভাবে নিরুদ্ধবেগ পল্বলে পরিণত হইয়াছে তাহারই ইঙ্গিত অচলায়তনে।

> সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে—তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—একথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।[৩]

শুধু ভারতবর্ষের বেলায় কেন, একথা সব দেশের পক্ষেই সত্য।

সাধনার নামে বাহিরকে অস্বীকার করিয়া নিজেকে কল্পিত বাধা নিষেধের বেড়িতে বাঁধিয়া আত্মাকে পীড়িত করিলে পরিণামে সর্বগ্রাসী জড়ত্ব আসিবেই, এবং উপেক্ষিত বাহিরকে চিরকাল ঠেকানো যাইবে না। ভারতীয় ধর্মসাধনার ভালো এবং মন্দ দুই পরিণতিই রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন। ভালোর মধ্যেও দুর্বলতার পদক্ষেপ অচলায়তনের উদারতম চরিত্র আচার্যের মধ্যে লক্ষ্য করি। মন্দের মধ্যে ভালোর নির্দেশ রহিয়াছে কঠিনতম চরিত্র মহাপঞ্চকের মধ্যে।

---

১ রচনাসমাপ্তি ১৫ আষাঢ় ১৩১৮। প্রকাশ প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৮।

২ ওভার্টুন হলে চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে পঠিত এবং ১৩১৯ সালের বৈশাখ-সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত।

৩ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ।

"তট তট তোটয়" ইত্যাদির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কোন ধর্মকে তাচ্ছিল্য করেন নাই। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধনমালা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনরীতি একদা এমন সব মন্ত্রে আকীর্ণ ছিল। একজটা, মহামায়ূরী[১], পর্ণশবরী, মহামারীচী[২] ইত্যাদি দেবতা বৌদ্ধ-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ।

কোন্ সে অতীতে আর্যগুরু স্থবিরপত্তনে অধ্যাত্মসাধনার ও জ্ঞানচর্চার মহাবিহার (আয়তন) স্থাপন করিয়া অদীনপুণ্যকে তাহার ভার দিয়াছিলেন। ভিতরের আবহাওয়া যাহাতে বাহিরের অশুচি ও অজ্ঞান বহিয়া না আনিতে পারে সেজন্য দৃঢ় ও উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা আয়তন চারিদিকে সুরক্ষিত ছিল। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত না হওয়ায় আয়তনের শিক্ষক-ছাত্রেরা ("স্থবিরক") ক্রমশ সহজ জীবনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং হৃদয়হীন অভ্যাসের ও অর্থহীন মন্ত্রসাধনার জালজঞ্জাল জমাইয়া অবরুদ্ধ অচলায়তনে বন্দী হইয়া রহিল। নিরর্থ অভ্যাসের জড়তা ক্রমশ জ্ঞানী বৃদ্ধ আচার্যকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু শিশু-শাসনের ও ভয়ের এই পরিবেশ একজন ছাত্রকে গ্রাস করিতে পারে নাই। সে পঞ্চক। তন্ত্রমন্ত্রের ও শাস্ত্র-শাসনের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া, সুযোগ পাইলে, পঞ্চক অচলায়তনের বাহিরে গিয়া অস্পৃশ্য অন্ত্যজ দর্ভক-শোণপাংশুদের সঙ্গে মিশিত। সেইখানেই সে শোণপাংশুদের গুরু দাদাঠাকুরের সঙ্গ পায়। তাহার পর যখন অচলায়তনের মূঢ়তায় পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে তখন একদিন খবর আসিল অচলায়তনে গুরু আসিতেছেন। গুরু আসিলেন—যোদ্ধা দাদাঠাকুর সাজিয়া শোণপাংশুদের লইয়া অচলায়তনের প্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়া। আচার্য গুরুকে চিনিলেন। তাহার পর মহাপঞ্চককে আচার্য নিযুক্ত করিয়া গুরু পঞ্চকের উপর ভার দিলেন শোণপাংশু-দর্ভকদের সহযোগে আয়তন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে। আচার্যকে ছুটি দিয়া গুরু নিজের সঙ্গে লইয়া গেলেন।

অচলায়তনের ভূমিকার নামগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং কয়েকটি রূপকারূঢ়।[৩] অচলায়তনের পাথরের বুকে ভাই পঞ্চক যেন অশ্বত্থের চারা আর দাদা মহাপঞ্চক যেন সজীব জীবনের বিরুদ্ধে মহাকুঠার। পঞ্চেন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া জীবনকে সবদিক দিয়া অনুভব করিতে পঞ্চক উৎসুক। মহাপঞ্চক

---

[১] রবীন্দ্রনাথ "মহামযূরী" লিখিয়াছেন। [২] ঐ "মহামরীচি"।

[৩] শ্রীমতী সুনন্দা সেন 'রবীন্দ্ররচনায় রূপক' ('যাত্রী' রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৬৮ পৃ ৮২-৮৬) দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়নিরোধকারী মহাযোগী। জড়ত্বপ্রাপ্ত অচলায়তনের স্থবিরকদের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক স্থাবর। কিন্তু তাহারও অনন্যসাধারণ মূল্য আছে। "মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল" সঙ্গে লইয়া গুরু নিজের প্রতিষ্ঠিত আয়তনে ঢুকিতে না পাইয়া প্রাচীরদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেই গুরুকে মানিয়া লইল। শুধু মহাপঞ্চক তাঁহাকে স্বীকার করিল না। সে শোণপাংশুদের বলিল

> পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ ক'রে বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

একজন শোণপাংশু বলিল

> এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ফলা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক উত্তর দিল

> কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

শোণপাংশু দাদাঠাকুরকে বলিল

> ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর বলিলেন

> ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু বলিল

> ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর বলিলেন

> শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

নূতন শিক্ষায়তনের ভার দাদাঠাকুর মহাপঞ্চকের হাতে দিলেন। কর্মচঞ্চল অবিনীত শোণপাংশুদের স্থিরবুদ্ধি করিতে মহাপঞ্চকের মতো আচার্যেরই আবশ্যক। মহাপঞ্চকের চরিত্রের মহত্ত্ব যে কোথায় তাহা পঞ্চককে দাদাঠাকুর বলিয়াছিলেন।

> এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করেছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায়নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা লোভভয় জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

শোণপাংশু ও দর্ভক নাম দুইটিও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং রূপকস্পৃষ্ট। "শোণপাংশু" আক্ষরিক অর্থে—যাহারা গায়ে লাল মাটি মাখে। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল হইতে জানা যায় যে একদা ডোম চোয়াড় প্রভৃতি জাতির যোদ্ধারা যুদ্ধে নামিবার আগে গায়ে রাঙা ধুলা ("বীরমাটি") মাখিত। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সে কথা ভাবিয়া লিখেন নাই। অথচ দুর্দান্ত বুনোদের "শোণপাংশু" নাম অত্যন্ত সার্থক হইয়াছে। শোণপাংশুদের অচলায়তন আক্রমণের মধ্যে আমাদের দেশে ইউরোপীয় শক্তির প্রথম সংঘর্ষের ব্যঞ্জনা আছে। সেই দিক দিয়াও শোণপাংশু (=লালমুখ, গোরা) নাম সার্থক। শোণপাংশুদের মহাপঞ্চকের শিক্ষাবিধানের আওতায় আনার মধ্যে অভারতীয়দের ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার সঙ্গে পরিচিত করিবার গূঢ় ইঙ্গিত হয়ত আছে।[১]

"দর্ভক" কথাটির অর্থ করা যাইতে পারে—যাহারা দর্ভ (কুশ) সংগ্রহ করে (ব্রাহ্মণদের জন্য) অথবা তৃণ বিশেষ দিয়া ব্যবহার্য দ্রব্য ("কট"—মাদুর) প্রস্তুত করে। অর্থাৎ যাহারা অন্ত্যজ হইলেও সভ্যমানুষের সহযোগী ও আজ্ঞাবহ। দর্ভকেরা তাই অচলায়তনের প্রতিবেশী। ভারতবর্ষে অনুচ্চ জাতিদের প্রতিনিধি দর্ভক। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত, অধঃপতিত জনপিণ্ডেরও বটে।

অচলায়তনে তিন জাতের ভূমিকা আছে। স্থবিরক (অর্থাৎ উচ্চবর্ণ), দর্ভক (অর্থাৎ শূদ্রবর্ণ) এবং শোণপাংশু (অর্থাৎ ম্লেচ্ছ)। যিনি সর্বব্যাপী মানবাত্মা (—পরমাত্মা বলিব না, তাহা হইলে ভূমিকাটির সাহিত্যরস ক্ষুণ্ণ হইবে—) তিনি তিন জাতেরই নেতা। তবে প্রত্যেক দলের কাছে তাঁহার স্বরূপ বিভিন্ন রূপে প্রকটিত। শাস্ত্রশাসিত, বুদ্ধিমার্গী স্থবিরকদের কাছে তিনি গুরু—অধ্যাত্ম-মার্গনিয়ন্তা। দর্ভকেরা শাস্ত্র-আচারের ধার ধারে না, তাহারা হৃদয়মার্গী। তাহাদের সাধনা ভালোবাসার, সেবার। তাই মানবাত্মা তাহাদের কাছে গোঁসাই। শোণপাংশুদের অধ্যাত্মচেতনা হৃদয়বৃত্তিরও নীচের স্তরে চাপা। তাই তাহাদের সাধনা চঞ্চলতার, নাচগানের। সুতরাং মানবাত্মা তাহাদের মনের মানুষ এবং নিজের লোক, তিনি তাহাদের দাদাঠাকুর।

> যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

অদীনপুণ্য নামটির মধ্যে অচলায়তনের আচার্যের স্বরূপ ধরা আছে। গুরু

---

১ শোণপাংশুদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সমীকরণ কাল্পনিক নয়। যেমন উপাধ্যায়ের উক্তি, "তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রু সৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো।"

তাঁহাকে আচার্যের বেদিতে বসাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও গুরুর প্রতিষ্ঠিত সচল জীবনের শিক্ষাসাধনার আয়তন অচলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মূঢ়তার পাপ জড়ো হইয়া স্থবিরকদের স্থাবর করিয়া ফেলিয়াছে। আচার্যও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মূঢ়তার অপরাধ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। যতক্ষণ ক্ষমতা ছিল ততক্ষণ তিনি সুভদ্রকে ধর্মক্রিয়ার নামে যে যন্ত্রণা বিভীষিকা তাহা হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। তবে তাঁহাকেও দুর্বলতা আক্রমণ করিতেছিল। সে দুর্বলতা তাঁহার পুণ্য অখণ্ডিত ("অদীন") রাখিবার ভ্রান্ত প্রয়াসে। শোণপাংশুদের সেনাপতি হইয়া গুরু অচলায়তনের প্রাচীরদ্বার ভূমিসাৎ করিয়া দর্ভকপাড়ায় গিয়া নির্বাসিত আচার্যকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন

> আচার্য, তুমি এ কী করেছ?...
> যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ!—
> যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে ব'সে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য স্বীকার করিলেন

> পথ হারিয়েছিলুম, তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না।

গুরুকে চিনিতেন স্থবিরকদের মধ্যে চারজন—আচার্য অদীনপুণ্য, উপাচার্য সুতসোম, শঙ্খবাদক আর মালী। চারজনকেই গুরু নিজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতসোম—আক্ষরিক অর্থে সোমসবনকারী—নামটির মধ্যে সৌম্যতার ও প্রশান্তির ধ্বনি আছে। "যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ" আর "পূজার ফুল যে যোগায়"—এই দুইজন ব্রাহ্মণ নয়, শাস্ত্রজ্ঞ নয়। কিন্তু তাহারাই অচলায়তনে সজীব জীবনের সূত্রবাহী। তাহাদের দৃষ্টিতে সত্য অনবরুদ্ধ। তাহারা গুরুকে চিনে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার মধ্যে অচলায়তন সর্বাপেক্ষা সুসংহত, সর্বাপেক্ষা সুমিত এবং সর্বাধিক শিল্পোজ্জ্বল॥

১১

'গুরু' (১৯১৮) অচলায়তনের লঘু সংস্করণ। ভূমিকারূপে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি "গুরু" নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

অচলায়তনে অঙ্ক বা দৃশ্য-বিভাগ ছয়, গুরুতে চার। অচলায়তনে গান

আছে চব্বিশটি। গুরুতে গান আছে সাতটি, তাহার মধ্যে একটি নূতন ("ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়")। এই গানেই গুরুর পরিসমাপ্তি।

গুরুতে "শোণপাংশু" হইয়াছে "যূনক"। যুবণ্ শব্দের সঙ্গে ব্যুৎপত্তির ও অর্থের যোগ আছে, যুনানী শব্দের সঙ্গে ধ্বনিযোগও কল্পনা করিতে পারি॥

১২

'ডাকঘর' (১৯১২) অচলায়তনের ছয়-সাত মাসের মধ্যে লেখা। রচনাস্থান শান্তিনিকেতন। গীতাঞ্জলির শেষ গান লেখা হয় ৩০ শ্রাবণ ১৩১৭, গীতিমাল্যের প্রথম গান ১৫ চৈত্র ১৩১৮।[১] গীতিকাব্য-পালার এই ফাঁকের মধ্যে রাজা, অচলায়তন ও ডাকঘর এই তিনখানি ভাবনাট্য রচিত।

নাট্যরচনা হিসাবে ডাকঘর উপাখ্যানীয়, নাটকীয় নয়। কবির কথায়, "এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।"

ডাকঘর রচনা করিবার ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের মনে এক অহেতুক চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। "যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।" "সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকে ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে"।[২] দোতলার গৃহকোণাবদ্ধ শিশু রবীন্দ্রনাথ গবাক্ষপথে বহিঃপ্রকৃতির রূপরস পান করিয়া কল্পনাকে নিরুদ্দেশে ছাড়িয়া দিতেন। এখন যেন তাহারি পটভূমিকায় প্রৌঢ় কবি তাঁহার অধ্যাত্মরসকল্পনা অধিক্ষেপ করিয়া অমলের ভূমিকা সৃষ্টি করিলেন। মুমূর্ষু মধ্যম কন্যার ক্ষীণ ছায়াও বোধ করি স্থানে স্থানে পড়িয়াছে।

ফাল্গুনীর সূচনায় কবিশেখরের উক্তিতে ডাকঘরের ভাববীজ পাই।

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

ডাক-হরকরার কড়ানাড়া মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে অকস্মাতের আশা, অপ্রত্যাশিতের আনন্দ। চিঠির মধ্যে আছে না জানি কাহার নিমন্ত্রণ, কাহার

১ গীতিমাল্যের প্রথম তিনটি কবিতা বাদ দিলে প্রথম কবিতার রচনাকাল ১৪ আশ্বিন ১৩১৫ কিংবা ১৩১৭। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা লেখা হইয়াছিল ১৩১৬ সালে। এগুলি গীতাঞ্জলির সমসাময়িক।

২ শ্রীযুত শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ২২৫ দ্রষ্টব্য।

আগমনী!—ইহাই তো অন্তরের চকিত আনন্দ-উপলব্ধির উপযুক্ত রূপক। ডাকঘর-রচনার অল্পকাল পরে লেখা গীতিমাল্যের একটি কবিতায় এই আইডিয়া স্পষ্ট হইয়াছে।

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
সারাটা দিন দিনের কাজে
হয়নি কিছু দেখাশোনা,
কেবল মাথার বোঝা ব'হে
হাটের মাঝে আনাগোনা।
এখন আমায় কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি,
সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে
ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।[১]

সুদূরের পিয়াসী এই অমল শিশুচিত্তটিকে গৃহসংসার খাঁচায় ধরিয়া রাখিতে চায়। অবুঝ ভীরু প্রেমও—সুধা—অজানিতে তাহাদের সহায়তা করিতেছে। অমল অপেক্ষা করিয়া আছে রাজার চিঠির জন্য। বিচ্ছেদ মাত্রেরই বেদনা আছে, সে বেদনা লুপ্ত হয় তখনি যখন আনন্দের নিমন্ত্রণ আসে। সেই আনন্দটুকু বন্ধনচ্ছেদ সহজ করিয়া দেয়। তাই রাজার চিঠি যখন আসিয়া পড়িল তখন অমল অজানার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর দুয়ারটুকু পার হইতে সংশয়মাত্র করিল না।

ডাকঘরে রূপক আছে কিন্তু তাহা কোথাও সরল আখ্যায়িকাকে ছাপাইয়া উঠে নাই। ক্ষুদ্রস্নেহ মাধব দত্ত, সংসারবিমূঢ় পঞ্চানন মোড়ল, এমন কি জীবন্মুক্ত ঠাকুরদা—সবাই যেন চেনাশোনা মানুষের মতো।

দৃশ্যবিভাগ আছে, তবে কোন গান নাই। গানে রস পাইবার মতো বয়স অমলের হয় নাই॥

১৩

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ যে দুই তিনটি নাটক লিখিলেন, 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশি', তাহাতে দৃশ্যবিভাগ নাই। যাত্রার আসরের মতো রঙ্গমঞ্চে পাত্র-পাত্রীর আসা-যাওয়া। তবে একটি পশ্চাৎপট বা পৃষ্ঠভূমিকা দৃশ্য আছে।

[১] রচনা ১৫ চৈত্র ১৩১৮।

মুক্তধারায় এই একটিমাত্র দৃশ্যপট।

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরব-মন্দির চূড়ায় ত্রিশূল। পথের পাশে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির।

ব্যষ্টির পর সমষ্টি, একের সমস্যার পর বহুর সমস্যা,—এই ক্রম রবীন্দ্রনাথের রচনাপর্যায়ে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। ডাকঘরের পর 'মুক্তধারা'য় (১৯২২)[১] সেই ক্রম চোখে পড়ে। ডাকঘরে ব্যক্তির নিজস্ব অধ্যাত্ম-এষণা, মুক্তধারায় বহুর কল্যাণবিজড়িত সমস্যা। যখন মুক্তধারা লেখা হয় তখন আমাদের দেশে বড় বড় কারখানা কম ছিল এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। মহাত্মা গান্ধী তখন নন্-কোঅপারেশন শুরু করিয়াছেন, কিন্তু সে আন্দোলন যন্ত্রের বিরুদ্ধে, চরকার সমর্থনে। তাহার পর দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে। চরকা ঠাকুরঘরে সিকায় উঠিয়াছে। (এখন অন্তর্হিত।) দিকে দিকে যন্ত্রশীর্ষ সমুন্নতবাহু। নদনদীর স্রোত যন্ত্রাবরুদ্ধ। এবং ফল এখনও প্রত্যাশাবদ্ধ। মুক্তধারার বাণী এখন অরণ্যে রোদনের মতো শুনাইলেও ভবিষ্যতে ফলিবে কিনা বলা যায় না। যাই হোক নাটকটির তাৎপর্য আমাদের দেশের জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু আমাদের নয় ইউরোপ-এসিয়া-আমেরিকায় ভবিষ্য মানুষের মরণবাঁচনের সমস্যার শুভ সমাধানের সংকেত এই ভাবনাট্যটিতে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৈজ্ঞানিক মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধিকে চণ্ড করিয়া নামাইয়াছে। সেই সঙ্গে সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বণিক্‌বৃত্তি মিলিয়া পৃথিবীর বক্ষে যে পীড়নযন্ত্র চালাইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণপ্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হইবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হইয়া যন্ত্র মানুষের দাস হইবে।—ইহাই মুক্তধারার মর্মকথা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে কোন কোন প্রতীচ্য দেশে ক্ষুদ্র জাতীয়তাদম্ভ মানুষের সর্বজনিক শুভবুদ্ধিকে চাপা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশ সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। মুক্তধারায় এই অচিরাগামী অকল্যাণের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল।[২] আগেই বলিয়াছি, মুক্তধারা যখন লেখা হয় তখন আমাদের দেশে

[১] রচনাসমাপ্তি শান্তিনিকেতনে (পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮)।

[২] গুরু, ছেলেরা ও রণজিতের সংলাপ দ্রষ্টব্য। 'জাতীয়তা'র বিষ এমনি করিয়াই শিশুকাল হইতে মনকে জীর্ণ করিতে থাকে।

অসহযোগিতার আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের নেতা গান্ধীজী তখন অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে ঈশ্বরের অবতার প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে মহৎ পুরুষদের এই এক মস্ত বিড়ম্বনা। এই ভয় করিয়াই, "ওরা যে তোমাকেই দেবতা ব'লে জেনেছে"—রণজিতের এই কথার উত্তরে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দিয়া রবীন্দ্রনাথ বলাইয়াছেন, "তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছল না। ভিতর থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাহির থেকে আমি তাঁকে রেখেচি ঠেকিয়ে।" রণজিৎ যখন বলিল, "তবে আর দেরি কেন? সর না!"—ধনঞ্জয় উত্তর করিল, "আমি স'রে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়্বে ওদের মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সর্‌তে পারি নে।"

প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে মুক্তধারার কিছু সংযোগ আছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা ও তাহার সংলাপের অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হইতে নেওয়া। মুক্তধারায় গান আছে পনেরটি। তাহার মধ্যে ছয়টি, অল্পস্বল্প পরিবর্তন সহ, প্রায়শ্চিত্ত হইতে নেওয়া। মুক্তধারার কাহিনীর গড়নেও প্রায়শ্চিত্তের আদল আছে। অভিজিৎ উদয়াদিত্যের অনুরূপ, আর রণজিৎ ও বিশ্বজিৎ যথাক্রমে প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের রূপান্তর। বিভা-সুরমার স্থান গ্রহণ করিয়াছে সঞ্জয়। উদয়াদিত্যের মতো অভিজিৎ নির্বিরোধী ভালোমানুষ মাত্র নয়, আত্মসর্বস্বও নয়, এবং চরিত্রটিতে মানবিকতার কিছু অভাব আছে। আসলে অভিজিৎ কবিরই কোমল-কঠোর স্বরূপটিকে প্রকাশ করিয়াছে। রাজকুমার সঞ্জয় যুবরাজ অভিজিৎকে তাহার কঠিন সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েচে তুমি চলেচ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেচে রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোন ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যই কঠিনের সাধনা।

উদয়াদিত্য রাজশাসনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। অভিজিৎ দাঁড়াইয়াছে মানুষের শুভবুদ্ধিহীন যান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এ পীড়ন নির্ব্যক্তিক, সুতরাং অত্যন্ত ভয়াবহ॥

১৪

'রক্তকরবী' (১৯২৪)[১] রবীন্দ্রনাথের কঠিনতম ভাবনাট্য। রূপক ও গল্প কাহিনীতে অবিচ্ছেদ্যভাবে জমাট বাঁধিয়াছে। কেন্দ্রীয় ভূমিকা নন্দিনীর সাজ রক্তকরবী ফুলে, এবং এই ফুল দিয়া অথবা না দিয়া তাহার প্রেম ও প্রীতির গতি সূচিত। তাই নাটকটির 'রক্তকরবী' নাম অতিশয় সঙ্গত। হয়ত রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনায় কিছু ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ইরাবতী বসন্তের প্রথম-অবতারসূচক কুরবকগুচ্ছ পাঠাইয়া অগ্নিমিত্রকে দোলাঘরে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। "কুরবক" করবী নয়, তবে ধ্বনিসাম্যে "করবীর" মনে পড়ায়। একটি গানেও রক্তকরবীর উল্লেখ লক্ষণীয়।

অলকে তার একটি গুছি
করবী ফুল রক্তরুচি[২]

দৃশ্যপট একটিমাত্র।

> এই নাট্য ব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

রূপক বাদ দিয়া শুধু কাহিনীকে ধরিতে গেলে এইরকম নির্যাস পাওয়া যায়।

একদা কৃষিসমৃদ্ধ রাজ্য এখন খনিজসমৃদ্ধির জন্য পাগল। প্রজাদের শ্রমিক বানাইয়া রাজা তাহাদের মানবত্বের ও জীবনের বিনিময়ে সোনার তাল জমাইতেছেন এবং নিজের শক্তি ও আয়ু বাড়াইয়া চলিয়াছেন। তাই তিনি বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে জড়ের উপর তাঁহার শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি আকর্ষণও বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে বাহিরের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ একরকম লুপ্ত। প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকিলেও রাজার শাসনে কঠিন ভূমিগর্ভে খনক শ্রমিকদের খাটাইবার জন্য নানাশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত আছে। তাহারা ধন-লোভে অন্ধ হইয়া কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ করিয়া যাইতেছে। এমন সময় একদিন একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আসিল। মেয়েটি নন্দিনী, ছেলেটি রঞ্জন।[৩] পরস্পর ভালোবাসে। দুজনেই সরল, নিঃশঙ্ক, জীবনরসচঞ্চল। মেয়েটি

[১] প্রকাশ প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩১, পুস্তকাকারে ১৯২৬। ১৩৩০ সালে গ্রীষ্মকালে শিলঙে রচিত। প্রথমে নাম দেওয়া হইয়াছিল 'যক্ষপুরী', পরে 'নন্দিনী', অবশেষে 'রক্তকরবী'।

[২] প্রথম ছত্র "নিদ্রাহারা রাতের এ গান" (গীতবিতান পৃ ২৭৫)।

[৩] নাম দুইটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। যাহাতে আনন্দ আধৃত সে মেয়ে 'নন্দিনী', যাহাতে আনন্দ উদ্দীপিত হয় সে পুরুষ 'রঞ্জন'। সব পুরুষই যেন অল্পবিস্তর রঞ্জনের অংশ।

শ্রমিকদের মনে চাঞ্চল্য জাগাইল। একজনের সঙ্গে তাহার আগে কিছু পরিচয় ছিল। সে বিশু। বিশু ভালো গান গায়। তাহার গান নন্দিনীকে যেন ভালোবাসার উপরে অতিরিক্ত কিছুর উদ্দেশ দেয়। কিশোরও নন্দিনীকে ভালোবাসিয়াছে। সর্দারের শাস্তি উপেক্ষা করিয়াও সে খুঁজিয়া পাতিয়া করবী ফুল আনিয়া নন্দিনীকে দেয়। রাজা নন্দিনীকে দেখিয়াছে এবং নন্দিনীও তাহার কঠিন হৃদয়ে ঘা মারিয়াছে। এদিকে কুলিসর্দারেরা কিছুতেই রঞ্জনকে বশে আনিয়া পশুর মতো খাটাইতে পারিতেছে না। প্রধান সর্দার বুঝিয়াছে যে নন্দিনী-রঞ্জনের মিলন ঘটলে কারখানার শ্রমিকপল্লীতে জীবন জাগিয়া উঠিবে, তখন যক্ষপুরীর কারা-কর্মশালা অচল হইতে বিলম্ব হইবে না। চক্রান্ত করিয়া সে রঞ্জনকে রাজার কাছে পাঠাইল। বৈজ্ঞানিকেরা যেমন ল্যাবোরেটরিতে প্রাণী লইয়া নানারকম প্রক্রিয়া করে রাজাও জীবনরহস্য জানিবার জন্য জীবন্ত প্রাণী ও মানুষ লইয়া প্রক্রিয়া চালাইত। রঞ্জনের জীবনহর্ষ রাজা সহ্য করিতে পারিল না। রঞ্জন যে নন্দিনীর প্রিয় তাহা রাজা জানিত না, জানিলে হয়ত তাহাকে হত্যা করিত না। কিন্তু রঞ্জন নিজের পরিচয় দেয় নাই। রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার আত্মবন্ধন দশা ঘুচিয়া গেল। (এখানে মনে রাখিতে হইবে যে রঞ্জনের পার্ট নাটকে সম্পূর্ণ উহ্য। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাহার বিরোধ ও সে বিরোধের পরিণতি কল্পনার ব্যাপার।) নন্দিনী রঞ্জনের উদ্দেশে কিশোরের হাতে করবী-গুচ্ছ পাঠাইয়াছিল। মৃত রঞ্জনের হাত হইতে সে তাহা তুলিয়া লইল। ইতি-মধ্যে বিশু ও নন্দিনীর অনুরাগী ফাগুলালকে নেতা করিয়া শ্রমিকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা কারাগার ভাঙ্গিয়া সর্দারের কোপ হইতে বিশুকে উদ্ধার করিল। বিশু আসিয়া দেখিল যে রাজার সঙ্গে নন্দিনী চলিয়া গিয়াছে। একটু দূরে গিয়া দেখা গেল নন্দিনীর প্রকোষ্ঠচ্যুত রক্তকরবী-কঙ্কণ পড়িয়া আছে। বিশু তাহা তুলিয়া লইল। এইখানে নাটক শেষ।

রক্তকরবীর ভূমিকাগুলিকে প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করিলে নাটকটির একটি নিটোল রূপক নিষ্কর্ষ পাওয়া যায়। সে নিষ্কর্ষ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ,—"এই নাটকটি সত্যমূলক।" সে সত্য মানব-ইতিহাসের মেরু-দণ্ডের মজ্জাগত মর্মসত্য।

সৃষ্টির প্রথম ক্রমে জড় হইতে জীবের উদ্ভব কতকটা প্রকৃতির আনুকূল্যে এবং কতকটা দৈবসংঘটনায় সংসাধিত হইয়াছিল।—এইরূপ অনুমান বৈজ্ঞানিকেরা করেন। তাহার পর হইতে জীবের ক্রমবিবর্তন প্রধানত প্রকৃতির আনুকূল্যেই

ঘটিয়া আসিয়াছিল। সে আনুকূল্যের সঙ্গে অবশ্যই ক্রমস্ফুটমান জীববৃত্তির সহযোগিতা ছিল। অবশেষে যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটিল তখন হইতে প্রকৃতির সঙ্গে জীববৃত্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আরম্ভ। প্রকৃতির প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টার ফলেই মানুষের হৃদয়বৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোৎকর্ষ। এ চেষ্টার শেষ নাই, বিশেষ করিয়া বুদ্ধির অনুশীলনে। আধুনিক কালে সভ্যমানুষের বুদ্ধি-চর্চা তাহাকে প্রকৃতির নিগূঢ় শক্তির অধিকারী করিতেছে। এই শক্তিমদমত্ততায় ও সেই সূত্রে আগত লুব্ধতার ফলে তাহার হৃদয়বৃত্তি সংকীর্ণতর হইয়া পড়িতেছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে জীবনধারায় মানুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। নিখিল-জীবনপ্রবাহবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিজীবন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইলে হৃদয়ের শুষ্কতা ও শূন্যতাই বাড়িয়া যায়, আনন্দের সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হয়। মৃত্যু জীবন হইতে নবজীবনে উত্তীর্ণ হইবার তোরণদ্বার। নিখিল-জীবধাত্রী প্রকৃতি মৃত্যুর মধ্য দিয়াই ব্যষ্টিজীবনকে "স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি"। মৃত্যুকে ভয় করিয়া এড়াইবার প্রযত্ন আত্মহত্যার সমান। জীবনের আনন্দ সহজ ও সরল। তাহাকে মুষ্টিতে আঁকড়াইতে গেলে বাতাসের মতো উবিয়া যায়, জলের মতো গলিয়া যায়। কিন্তু বাতাসে আঁচল উড়ানোর মতো, স্রোতে গা ভাসানোর মতো সে আনন্দ অনায়াসে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। জীবনের আনন্দ জীবনের বেদনারই উল্টা পিঠ। দুঃখবেদনা না পাইলে, অনেক কিছু ত্যাগ না করিলে, সহজ আনন্দের স্বরূপজ্ঞান ও মূল্যবোধ হয় না। দুঃখবেদনার তারে-তারেই চপল আনন্দের সেই স্থির ঝঙ্কার বাজে—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"। —এই তত্ত্বকথা যাহা রবীন্দ্রকাব্যের অন্তরবাণী তাহা রক্তকরবীর রূপকেও প্রমূর্ত।

রূপকের মধ্যে যে সত্য থাকে সে সাধারণ সত্য, সব দেশের এবং সব কালের সত্য। মানুষের মনের গতির ইতিহাস যদি কোথাও স্থায়িভাবে ধরা পড়িয়া থাকে তো সে মুখ্যত সাহিত্যে এবং গৌণত চিত্র ও তক্ষণ শিল্পে। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরবাণীরূপে যে সত্য আমাদের কাছে প্রকাশমান সে সত্য আমাদের সাহিত্যে উপনিষদের কাল হইতে বারে বারে উচ্চারিত হইয়া আসিয়াছে। যে সত্য বাল্মীকির সমকালীন পাঠক-শ্রোতার উপযোগী রূপকে রামায়ণে অভিব্যক্ত, সেই সত্যই এখনকার দিনের পাঠকদর্শকের উপযোগী রূপকে রক্তকরবীতে প্রকটিত।[১] গীতায় বলা হইয়াছে যে কাম হইতে শুরু করিয়া রিপুপ্রাবল্যের

১ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ('রক্তকরবী' প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩২) পঠনীয়।

পর্যায়ক্রমে অবশেষে বুদ্ধিনাশ ঘটে এবং "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। এখানে আমরা বুদ্ধিনাশ বলিতে শুভবুদ্ধিনাশ বুঝিব। তাহার অর্থ দুর্বুদ্ধির প্রকোপ, যাহা রাবণের হইয়াছিল। আধুনিক কালের ভাবনায় সেকালের দুর্বুদ্ধির গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। এখন বিজ্ঞানবুদ্ধির অনুগামী যে নূতনতর দুর্বুদ্ধি দেখা দিতেছে তাহা শক্তিলোভের দ্বারা প্রণোদিত এবং নির্ব্যক্তিক, অতএব সৃষ্টির পক্ষে মহাভয়ঙ্কর। (রবীন্দ্রনাথ যখন রক্তকরবী রচনা করেন তখন আণবিক বোমার কথা কেহ চিন্তাও করেন নাই। হিরোসিমা ও নাগাসাকির কথা স্মরণ করিলে রবীন্দ্রনাথের বাণীর অমোঘতা উপলব্ধ হইবে।)

আধুনিক কালের "সভ্য" দেশে ধনমত্ত ও শক্তিলুব্ধ ব্যক্তিমানুষ পরিচালিত জনপিণ্ড যে জীবনের ক্ষেত্রে ইতস্তত তাড়িত হইতেছে তাহাতে প্রাণের ও প্রকৃতির সহজ দান ও সরল সৌন্দর্য উপেক্ষিত এবং রসবোধ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহারই প্রতিবাদে রক্তকরবীতে ধনের উপরে ধান্যের, শক্তির উপরে প্রেমের, এবং মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়গান ধ্বনিত। লোভের ভূমিগর্ভে সুড়ঙ্গ না কাটিয়া জ্ঞান ও শক্তি যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মোহমুক্ত ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে মিলিত হয় তবেই কল্যাণে সার্থকতা।—ইহাই রক্তকরবীর বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা রক্তকরবীর মর্মকথা।

> যক্ষপুরের পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস ক'রে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।
>
> এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল। প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।[১]

'রাজা' নাটকের রাজার মতো 'রক্তকরবী' নাটকের রাজাও নেপথ্যচারী। তাঁহার কথা শোনা যায়, কিন্তু আছেন যেন নেপথ্যেরও বাহিরে। নাটকের শেষ-ভাগে তাঁহার মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে, মৃতদেহের আভাস আছে—ধূলায় পড়া রক্ত-করবীর গুচ্ছে। রাজা ও রঞ্জন যেন একই ব্যক্তিত্ব দ্বিধাভিন্ন। যেমন চাঁদের উজ্জ্বল

---

[১] 'যাত্রী', পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪)।

মুখ ও অন্ধকার পিঠ। উপমাটি বেশি টানিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না। কেননা যে রাজা নাটকে বাক্‌কর্মের দ্বারা প্রকট সে ব্যক্তি প্রৌঢ় কিন্তু সুন্দর নয় এবং রঞ্জন যে নাটকে কায়বাক্যে অনুপস্থিত সে যৌবনচঞ্চল ও সুন্দর। শক্তিসঞ্চয়ের ও মৃত্যুবঞ্চনার সাধনায় নিবিষ্ট হইয়া রাজা যৌবন ও জীবনসৌন্দর্য হারাইয়াছে। তাহার সেই হারানো অংশটুকুই যেন পৃথক সত্তা ধরিয়াছে রঞ্জনে। এখানে নাম দুইটির ব্যুৎপত্তি লক্ষ্যে রাখিতে হইবে। "রাজা" ও "রঞ্জন" দুই শব্দই রন্‌জ ধাতু হইতে উৎপন্ন।[১] রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার ব্যক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তাহার সাধনা-কারাগার তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাই সে নন্দিনীর সঙ্গে মিলিতে পারিল।

রাজা ও রঞ্জনের প্রতিযোগ রবীন্দ্রনাথ নানাদিক দিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন।

রাজা জ্ঞানের পথে শক্তির সাধক। সে শক্তির লোভে আপন-রচা কারাগারে বদ্ধ। দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির সাধনায় সে সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বিসর্জন দিয়াছে। সে মৃত্যুভীত। ঘুমের নিশ্চেষ্টতা তাহার কাছে মৃত্যুরই মতো। তাই তাহার "ঘুমোতে ভয় করে"। সেই কারণেই হৃদয়দৌর্বল্য সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয় না।

> গান শুনতে ও ভয় পায়।
> ওর বুকের মাঝে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।

রাজা যেন তপস্বী রুদ্র। জাল-জটিল আবরণে তাহার রূপ দেখা যায় না, তাহার "ছায়া পড়ে—সে ভয়ঙ্কর"।

রঞ্জন যেন নটরাজ শিবসুন্দর। প্রাণের হিল্লোল তাহার যৌবনের উদ্দামতায় প্রকাশমান। তাহার লোভ নাই কিছুতে, তাই কোন বাঁধনই তাহাকে আঁটিতে পারে না। তাহার জাদুতে সব বন্ধনই শিথিল হইয়া আসে। রঞ্জন

> যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।
> ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে চেহারা বদল করে
> আশ্চর্য ওর ক্ষমতা।
> কখন্‌ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেল্‌কি জানে।

নন্দিনী "প্রাণভরা খুশি" বা হর্ষ, প্রাণের সহজ ভালোবাসা, জীবনের সরল সৌন্দর্য, সৃষ্টির শেষ অর্থ—আনন্দ। যাহার চিত্তে সজীবতা নিঃশেষিত নয় সে

---

[১] কালিদাস বলিয়াছেন, "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ।" রক্তকরবীর রাজা প্রকৃতিপীড়ক। রঞ্জন যেন তাঁহার খাঁচাছাড়া প্রাণপাখী।

তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। কিন্তু তাহাকে পাইতে গেলে দুঃখবেদনার, মৃত্যুর মধ্য দিয়া আসিতে হয়।

রঞ্জন রক্তকরবী ভালোবাসে বলিয়াই ও ফুল নন্দিনীর প্রসাধন[১] নয়, দুঃখ-বেদনার রঙে রাঙা বলিয়াই সে ফুল তাহার প্রসাদ। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া কিশোর নন্দিনীকে ফুল আনিয়া দিয়াছে। নন্দিনী সে গাছের সন্ধান জানিতে চাহিলে কিশোর বলিল

> ওই গাছটি থাক্, আমার একটি মাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল যোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী উত্তর করিল

> কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর বলিল

> সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী বলিল

> কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে।

কিশোর বলিল

> কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনীর আকর্ষণ বিভিন্ন প্রকার সাড়া জাগাইয়াছে। কিশোর চায় আত্মদান করিতে, বিশু চায় গান শুনাইতে, রাজা খুশি হয়—কিন্তু কিসে তা নিজের কাছে স্পষ্ট নয়[২], অধ্যাপক চায় নন্দিনীকে তত্ত্বকথা শোনাইতে।[৩]

"প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে" হারজিতের খেলায় রঞ্জন নন্দিনীকে জিতিয়া লইয়াছিল। তারপর যক্ষপুরীর চক্রান্তে তাহাদের দুইজনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। নন্দিনী মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত। কিন্তু রঞ্জনের দেখা নাই। রাজাকে দেখিয়া নন্দিনী আশ্চর্য মানিয়াছে, রাজার শক্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

---

[১] "একজন মানুষ রক্তকরবী ভালবাসে, আমি তাকে মনে ক'রে এই ফুলে আমার কানের দুল করেছি।" "রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে, রক্তকরবী। জানিনে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা—সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।"

[২] "তোমার ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে আগুন ক'রে পরতে পারিনে কেন।" "তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।"

[৩] "তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।"

নেপথ্যে। …আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী?

নন্দিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই ত বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রকাণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের অপেক্ষায় মেঘের মতো—দেখে আমার মন নাচে

রঞ্জনকে দেখিয়াও নন্দিনীর মন নাচে। রাজাকে সে উত্তর দেয়

সে নাচের তাল আলাদা তুমি বুঝবে না।

রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার দেহছাড়া আত্মা যেন ফিরিয়া আসিল। তাহার কর্মশালা ও কারাগার ধ্বসিয়া পড়িল। ধ্বজদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাজা নন্দিনীকে দীপশিখা করিয়া প্রলয়নাচনের পথে আগাইয়া গেল।

নন্দিনীকে লইয়া হারজিতের খেলায় বিশুও ছিল। রঞ্জন নন্দিনীকে জিতিয়া লইলে তাহার জীবনরস শুকাইয়া যায়। সে অসহায় হইয়া পড়ে। যাহাকে সে বিবাহ করিয়াছিল তাহার প্ররোচনায় সে যক্ষপুরীতে ভালো চাকরি—চরগিরি—পাইয়াছিল। কিন্তু সে কাজ করা তাহার চলিল না। তাহার পদাবনতি ঘটিলে তাহার স্ত্রীও তাহাকে পরিত্যাগ করিল। পাগলা বলিয়া তাহাকে কেহ অনুকম্পা কেহ বা অবজ্ঞা করিতে লাগিল। যক্ষপুরীতে নন্দিনীর দেখা পাইয়া বিশুর গানের নিরুদ্ধ কণ্ঠ খুলিয়া গেল। নন্দিনীর ডাক শুনিলে বিশু যে উৎসাহিত হইয়া উঠে, তাহা যক্ষপুরীর অধিবাসীদের অজ্ঞাত রহে নাই। ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা বিশুকে একদিন স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

চন্দ্রা। …কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বল দেখি বেহাই।

বিশু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেহাই, অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

ফাগুলাল। বিশুদাদা, পষ্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু। বলছি শোন, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

রক্তকরবীতে গুরু ঠাকুরদাদা বা বাউল গোছের কোন ভূমিকা নাই। কাছাকাছি যে ভূমিকাটি আছে তা বিশুর। রঞ্জন ও রাজা নন্দিনীর ভালোবাসা পাইয়াছে কিন্তু তাহাকে পায় নাই অর্থাৎ আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে কিন্তু

আনন্দের অধিকারী হয় নাই। বিশু দুঃখবেদনার মধ্য দিয়া আনন্দসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রাজা যেমন রঞ্জনের বিশু তেমনি নন্দিনীর অপরাধ।

নন্দিনী। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু। যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি।...এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন ক'রে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম, আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী। পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর সব বোজা।

বিশু। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাইনি।

মহাপ্রস্থানের পথে পা দিয়া নন্দিনী বিশুকে স্মরণ করিয়া রক্তকরবীর কঙ্কণ পথের ধুলায় ফেলিয়া দিয়া গেলে বিশু তাহা কুড়াইয়া লইয়া বলিয়াছিল

তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল—তার শেষ দান।

রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, ভয়ঙ্কর—কিন্তু নীচ নয়। ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, নীচ এবং সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বহীন হইতেছে সর্দার। আসলে সর্দারই রাজার প্রতিপক্ষ। রঞ্জনকে আনিয়া দিবে এই ভাবিয়া খুশি হইয়া নন্দিনী সর্দারকে কুন্দফুলের মালা দিয়াছিল। সর্দার বলিয়াছিল

আজই তাকে দেখতে পাবে।

মনে মনে সে রাজাকে বঞ্চনা করিয়া, রঞ্জনের বিনাশ স্থির করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তাহার কথা মিথ্যা হইল না, সেই দিনই নন্দিনী রঞ্জনকে দেখিল—মৃতদেহে। কিশোরের মৃত্যুর জন্য সর্দার কতটা দায়ী তাহা বোঝা যায় না। তবে বিশুকে জব্দ করিবার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। রাজাও শেষে স্বীকার করিয়াছিল

ঠকিয়েচে আমাকে। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

যন্ত্র এমনি করিয়াই যন্ত্রীকে জব্দ করে।

অপ্রধান ভূমিকাগুলিও বেশ স্পষ্ট। দুই একটি ভূমিকায়—যেমন গোঁসাইজীর—ব্যঙ্গের ঝাঁজ আছে। কিন্তু অধ্যাপকের ভূমিকায় তাহা নাই।

অচলায়তনের সঙ্গে রক্তকরবীর কিছু মিল লক্ষিত হয়। অচলায়তনের গুরু-শিষ্যেরা না বুঝিয়া আচার-অনুষ্ঠানের ঘানি ঘুরাইয়াছে, আর যক্ষপুরীর সর্দার-মজুরেরা ভয়ের কারায় লোভের নেশায় খাটিয়া মরিতেছে। লোভের প্রয়োজনের অন্ত নাই, তাই তাহাদের খাটুনিরও শেষ নাই।

রক্তকরবীর রঞ্জনের সঙ্গে ফাল্গুনীর চন্দ্রহাসের সামান্য একটু মিল আছে। রঞ্জন আগাগোড়া নাট্যের নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছে, এবং ফাল্গুনীর রঙ্গমঞ্চ চন্দ্রহাস অনেকখানি অধিকার করিয়া আছে। তবে চন্দ্রহাস যদি গুহাভ্যন্তর হইতে না ফিরিত তাহা হইলে রঞ্জন তাহার সগোত্র হইত। রঞ্জন রঙ্গভূমির বাহিরে থাকিলেও "রঞ্জন" আইডিয়াটি নাট্যসূত্র পরিচালিত করিয়াছে। এই আইডিয়ারও সিম্বল রক্তকরবী ॥[১]

১৫

মুক্তধারা ও রক্তকরবীর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ একটি নিতান্ত ছোট নাটকের মতো—"নাট্যদৃশ্য"—লিখিয়াছিলেন, নাম 'রথযাত্রা'।[২] রক্তকরবী রচনার বেশ কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ নাট্যদৃশ্যটি পরিবর্ধিত ও পুনর্লিখিত করিয়া এবং 'রথের রশি' নাম দিয়া আর একটি অতিক্ষুদ্র দ্বিসংলাপ (duologue) রচনা যোগ করিয়া 'কালের যাত্রা' নামে প্রকাশ করেন (১৯৩২)।[৩]

কাহিনী যৎসামান্য। মহাকালের মন্দিরে সকলে সমবেত হইয়াছে রথ-যাত্রার দিনে। বছরের সব শুভকাজের আরম্ভ সেইদিনে, রথযাত্রার পর। কিন্তু রথ অচল। পুরুতের মন্ত্রপাঠ, পাণ্ডার পূজাকর্ম,—কিছুতেই রথ নড়ে না। দেবতা রথে অধিষ্ঠিত, পাণ্ডা-পুরুষ ভক্তিমান্, তবুও রথ চলে না। সুতরাং নিশ্চয়ই দড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অপ্রসন্ন হইয়াছেন,—এই ভাবিয়া মেয়েরা দড়ি-নারায়ণের কাছে মানত করিয়া ঘি গঙ্গাজল ঢালিয়া পূজা চড়াইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই রথ চলে না। শূদ্রপাড়া হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল রথ

[১] "রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে, রক্তকরবী।" অধ্যাপকও নন্দিনীকে দুই একবার রক্তকরবী বলিয়াছে।

[২] ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ ২১৬-২২৫) প্রকাশিত। গোড়াতেই কবির এই মন্তব্য ছিল, "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশির কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে জাগিয়াছিল।"

[৩] "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে কবির সস্নেহ উপহার। ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯।"

টানিতে, কিন্তু তাহারা সংস্কারবহির্ভূত, অস্পৃশ্য। রথ দূরের কথা দড়িও তাহাদের ছুঁইতে দেওয়া চলে না। "কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র, চলে কেবল স্বর্ণচক্র।" তাই রাজা শেঠজিকে ডাক দিলেন। সমবেত বণিক্‌শক্তিও অপারক হইল। সুবুদ্ধি মন্ত্রী অগত্যা শূদ্রপাড়ার দলপতিকে আহ্বান করিলেন।[১]

সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই।
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন ক'রে যাও তোমরা।
তারপরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

পাণ্ডা-পুরোহিত-নাগরিক সকলে আতঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। কিন্তু ইতিমধ্যেই রথ চলিতে শুরু করিয়াছে। সৈনিকেরা পুরোহিতের আদেশ চাহিল।

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

পুরোহিত রথ চলা বন্ধ করিতে উৎসাহিত হইল না, ভবিষ্যতের ভরসায় রহিল। বলিল

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো, রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।

গড়গড় করিয়া রথ চলিল, তবে বাঁধা রাস্তা ধরিয়া নয়।

বাপ রে কী তেজ
মানছে না আমাদের বাবাদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপরে চ'ড়ে বসেছে যম।

কবি আসিয়া উপস্থিত হইলে এই অঘটনের ব্যাখ্যা শোনা গেল। ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় সৈনিক। এ কী উলটো-পালটা ব্যাপার, কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না,—
মানে বুঝলে কিছু?

[১] পুরীর জগন্নাথদেবের পূজার ইতিহাস এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবি। ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু।
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে-বাঁধন বাঁধে তাকে ওরা মানেনি।

পুরোহিত সন্দেহ প্রকাশ করিল।

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

(ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর ইতিহাসের যে অধ্যায় প্রথম্ মহাযুদ্ধের পর হইতে শুরু রথের-রশিতে তাহারই প্রশস্তি। কিন্তু পুরোহিতের প্রশ্নের উত্তরে কবি যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে এই ইতিহাসের পরিণতির ইঙ্গিত আছে। সে ইঙ্গিত যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী তাহা এখন বোঝা যাইতেছে।)

কবি। পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই সুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন ওরাই হবে বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

অনামা নারী-ভূমিকাগুলি এবং সন্ন্যাসী-চরিত্র রথযাত্রায় নাই, রথের-রশিতে সংযোজিত। খাতাঞ্চির ক্ষণিক ভূমিকা রথযাত্রায় আছে, রথের-রশিতে নাই। দুইটি রচনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রচনারীতিতে। রথযাত্রা শাদাসিধা গদ্যে লেখা, রথের-রশি গদ্যছন্দে। তুলনা করিয়া কিছু উদাহরণ দিতেছি। উপরে উদ্ধৃত পুরোহিত-কবি সংলাপ রথযাত্রায় এইভাবে আছে।

পুরোহিত। আর তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান্ যে দড়ির নিয়ম সাম্‌লে চল্‌তে পারবে?

কবি। হয়ত পার্‌বে না। একদিন ভাব্‌বে ওরাই রথের কর্তা, তখনি মর্‌বার সময় আস্‌বে। দেখোনা, কালই বলতে সুরু করবে, আমাদেরি কল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েচেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হবে উঠ্‌বেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

গোড়ার দিক থেকে উদাহরণ দিই। সৈনিক-ধনিক সংলাপ। রথযাত্রায়

২ সৈনিক। আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো চোখের উপর লাফ দিয়ে দিয়ে পড়্‌ছে।

১ সৈনিক। এখনি দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।

৩ ধনিক। তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা তুমি এখনো খবর পাওনি?

১ সৈনিক। চুপ্ বেয়াদব।

২ ধনিক। আমরা চুপ্ করব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?

১ সৈনিক। তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতঘ্নী যখন বজ্রপাত ক'রে ওঠে—

২ ধনিক। তোমাদের শতঘ্নী বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে ঘোষণা করবার জন্যে আছে।

রথের-রশিতে

দ্বিতীয় সৈনিক। আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম সৈনিক। সত্যি নাকি। এখনি দেখিয়ে দিতে পারি,
তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক। তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে?

প্রথম সৈনিক। চুপ দুর্বিনীত।

দ্বিতীয় ধনিক। চুপ করব আমরা বটে।
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক করে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক। মনে ভাবছ, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক। ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম ঘোষণা করতে হয়
এক হাট থেকে আরেক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

'রথযাত্রা'-'রথের-রশি' রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুরাপুরি পোলিটিকাল নাট্য-রচনা। বোধ করি আকার খর্ব বলিয়াই রচনাটি নজরে পড়ে না॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নাট্য ঃ শেষপালা

(১৯২৪-১৯৩৯)

১

শিশিরকুমার ভাছুড়ী অভিনয়ে ও রঙ্গসজ্জায় কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে অভিনবত্ব আনিয়া দিলেন সেই সূত্রে শিক্ষিত দর্শকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটক নূতন করিয়া প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইল। রবীন্দ্রনাথও তাহা মানিয়া লইলেন এবং কয়েকটি পুরানো নাট্যরচনা নব কলেবরে প্রকাশ করিলেন। যেমন 'চিরকুমার সভা' (১৯২৫), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮) এবং 'তপতী' (১৯২৯)। প্রথম দুইটি বইয়ের আলোচনা আগে করিয়াছি।

কুমারসেন-ইলার কাহিনীটুকু বাদ দিয়া রাজা-ও-রাণীকেই ঢালিয়া সাজিয়া হইল 'তপতী' (ভাদ্র ১৩৩৬)।[১] পুরাপুরি গদ্যে লেখা। কতকগুলি গান আছে। তাহাতে বর্জিত পদ্যাংশের কিছু ক্ষতিপূরণ হইয়াছে, ট্রাজেডির ভারও কিছু লঘু হইয়াছে।

তপতী রাজা-ও-রাণীর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ নয়, নূতন নাটক।[২] সুমিত্রা রাজা-ও-রাণীতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা, কিন্তু কতকটা পটান্তরিত। তপতীতে সুমিত্রাই নায়ক এবং নাটকীয় ঘটনার পরিচালক। তপতীতে বিক্রম-চরিত্র আরও পরিস্ফুট, তবে একটু মিতবাক্ হইলে নাটকীয়তা বাড়িত বলিয়া মনে হয়। রাণীর গৃহত্যাগের উদ্দেশ্য তপতীতে যেরূপ দেখানো হইয়াছে তাহাতে "হিউম্যান ইন্টারেস্ট" কিছু যেন কমিয়াছে। শঙ্কর প্রভৃতি কয়েকটি ভূমিকার আবশ্যকতা কমিয়া গিয়াছে। কুমারসেন-ইলার বদলে দেখা দিয়াছে নরেশ-বিপাশা। এই দুই ভূমিকা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের[৩] মোতির মা ও নবীনের কথা স্মরণ করায়। কুমারসেন-সুমিত্রার সৌভ্রাত্র্য রাজা-ও-রাণীর নাট্য-পরিণতির একটা বড় কারণ। তপতীতে এদিকে ঝোঁক নাই॥

---

১ তপতী দিন দশেকের মধ্যে লেখা হইয়াছিল। 'পথে ও পথের প্রান্তে' পৃ ৯৪ দ্রষ্টব্য। প্রথমে নাম দেওয়া হইয়াছিল 'সুমিত্রা'।

২ তপতীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩ তপতীর ঠিক আগেই লেখা।

২

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন লক্ষ্যে রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ দুইটি গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করিলেন। এই ধরনের প্রথম নাটক, 'শোধবোধ' (১৯২৫)[১] 'কর্মফল' গল্প (১৩১০) অবলম্বনে লেখা। 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫)[২] 'শেষের রাত্রি' (আশ্বিন ১৩২১) অবলম্বনে। অনেক কাল পরে লেখা হইল 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (আষাঢ় ১২৯৯) অবলম্বনে, এবং 'মুক্তির উপায়' (১৯৩৫)[৩] ঐ নামের গল্প লইয়া।

'গৃহপ্রবেশ'এর কাহিনী সামান্যই। ঘটনা-সংঘাত বলিতে বিশেষ কিছু নাই। নাটকীয়তা মনোগত এবং তীব্র। গল্পে ডাক্তার-ভূমিকার আভাসমাত্র আছে, নাটকে ইহা পরিস্ফুট হইয়া মাসীর সমস্যাকে জটিল করিয়াছে। অমূল্য-চরিত্র নাট্যকাহিনীতে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। হিমির ভূমিকা বিশেষ করিয়া গান-গুলির জন্য। গল্পে মণি অনেকটা নেপথ্যচারিণী, নাটকে ততটা নয়। গল্পে প্রধান পাত্র যতীন, নাটকে মাসীই প্রধান ভূমিকা॥

৩

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ কবিতা অবলম্বনে নাট্যরচনায় হাত দিলেন। এসব রচনার প্রয়োগে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচের মূল্যও স্বীকৃত হইল।

প্রথম রচনা 'নটীর পূজা' (১৯২৬) বহুকাল আগে লেখা 'পূজারিণী'[৪] কবিতা অবলম্বনে লেখা, চার অঙ্কে। অঙ্কবিভাগ থাকিলেও দৃশ্যপরিবর্তন একবারমাত্র, শেষ অঙ্কে। নাট্যকাহিনীর ভূমিকা এই

> অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে লোভ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নগরী হইতে দূরে বাস করিতেছেন।
>
> একদা রাজোদ্যানে ভগবান্ বুদ্ধ অশোক-তরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইখানে বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার চৈত্য স্থাপন করিয়া রাজকন্যাদিগকে বেদীমূলে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অর্ঘ্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।
>
> রাজমহিষী লোকেশ্বরী তাঁহার স্বামীর রাজ্যত্যাগ ও তাঁহার পুত্র চিত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধ-অনুশাসিত ধর্মের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন।[৫]

---

[১] প্রকাশ 'বার্ষিক বসুমতী' (১৩৩২)। মূল গল্পটিও সংলাপময় এবং নাট্যের ভঙ্গিতে লেখা।

[২] প্রকাশ প্রবাসী (আশ্বিন ১৩৩২)।

[৩] মূল গল্পের প্রকাশ সাধনায় (চৈত্র ১২৯৮), নাট্য-রূপ 'অলকা'য় (আশ্বিন ১৩৪২)।

[৪] 'কথা'য় সংকলিত।

[৫] কলিকাতায় অভিনয় উপলক্ষ্যে (১৪ মাঘ ১৩৩৩) প্রকাশিত 'নটীর পূজা' পুস্তিকা হইতে।

প্রথম অঙ্কের দৃশ্য মগধরাজপ্রাসাদে কুঞ্জবন (রাজোদ্যান)। ভিক্ষুণী উৎপল-পর্ণার মুখে মহারাজ বিম্বিসার মহিষী লোকেশ্বরীকে জানাইলেন যে ভগবান্ বুদ্ধের জন্মোৎসবের দিন সমাগত, তিনি রাজোদ্যানে অশোকবেদীমূলে পূজা দিতে আসিবেন। লোকেশ্বরী খুশি হইলেন না। তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজবাড়ির নটী শ্রীমতী প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের স্তব করিল। নবাগত গ্রাম্যবালিকা মালতী রাজোদ্যানে বেদীর পরিচারিকারূপে কাজ করিতে ইচ্ছা জানাইল। তাহাকে লইয়া রাজকন্যাগণের কৌতুক উচ্ছলিত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্য রাজোদ্যান। লোকেশ্বরী দ্বিধাচিত্ত। বাসবী পূজার জোগাড় করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিলে তিনি ভৎর্সনা করিলেন। এদিকে অজাতশত্রুর আদেশে বৌদ্ধনিপীড়নের কোলাহল শুনিয়া তিনি চিত্তে বেদনা বোধ করিতেছেন। অশোকবেদীমূলে পূজার পরিবর্তে নটীর যোগ্য নৃত্য শ্রীমতী দেখাইবে,—রত্নাবলীর এই প্রস্তাবে লোকেশ্বরী সম্মতি দিলেন না। মহারানী চলিয়া গেলে শ্রীমতী ও রাজপুর-মহিলারা আসিয়া বেদীমূলে পূজা দিয়া গান ধরিল

> বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে,
> ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।…

অন্তঃপুররক্ষিণীরা আসিয়া বাধা দিল। তখন জানা গেল যে রাজা অজাতশত্রু আদেশ দিয়াছেন যে অশোকবেদীমূলে যে-কেহ পূজা-মন্ত্রপাঠ করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আজ একজন আসিয়া খবর দিল, উৎপলপর্ণাকে হত্যা করা হইয়াছে। রত্নাবলী আসিয়া শ্রীমতীকে জানাইল, রাজার আদেশ হইয়াছে তাহাকে বেদীমূলে নাচ দেখাইতে হইবে।

তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যও রাজোদ্যান।

> একদা যাহার সহিত মালতীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল সেই সন্ন্যাসী পরিব্রাজিকা উৎপলপর্ণার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চলিয়াছেন এই দৃশ্য দূর হইতে দেখিয়া বিপদের মুখে তাঁহার সঙ্গ লইবার জন্য শ্রীমতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মালতীর প্রস্থান।
>
> রত্নাবলী মল্লিকার ও পরে বাসবীর প্রবেশ। মহারাজা বিম্বিসার পূজা লইয়া রাজপুরীতে আসিবার কালে পথে নিহত হইয়াছেন এই জনশ্রুতির আলোচনা। ধীরে ধীরে গান গাহিতে গাহিতে শ্রীমতীর প্রবেশ।

চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্য অশোকতল।

রত্নাবলী, রাজকিঙ্করীগণ, একদল রক্ষিণী। নটীর নৃত্যের দ্বারা কলুষিত পূজার শাপভয়ভীত কিঙ্করীদের চঞ্চলতা প্রকাশ। লোকেশ্বরীর প্রবেশ। বুদ্ধধর্ম-বিদ্রোহ-সূচক রাজাদেশ

পালনের পাপ হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করিবার জন্য শ্রীমতীকে মহিষীর উপদেশ। তাহাতে শ্রীমতীর অনম্মতি। গান ও প্রণতির ভঙ্গিতে শ্রীমতীর নৃত্য

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥...

পূজার ভঙ্গীতে নৃত্যের অপরাধে নটীকে হত্যা করিবার জন্য রক্ষিণীদের প্রতি রত্নাবলীর আদেশ। কেবলমাত্র স্তবমন্ত্র পাঠের বিরুদ্ধে রাজার আদেশ আছে স্তবের ভঙ্গীতে নাই রক্ষিণীরা এই কথা বলাতে শ্রীমতীর স্তবমন্ত্র উচ্চারণ। তাহার প্রাণদণ্ড।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নটীর-পূজার অভিনয় অত্যন্ত জমিয়াছিল। গানের সুরে চড়িয়া কথার পালে ভর করিয়া ভাব যে কত ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে এ সত্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে আগেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সেই সঙ্গে নাচের ভঙ্গী ও তাল যোগ দিলে ঊর্ধ্বগতির বেগ যে আরও কতটা বাড়িয়া যায় তাহা এখন দেখা ও বোঝা গেল।

অভিনয়ের বেলা নাটকের আকার কিছু কমানো এবং মোট সংখ্যায় প্রায় ঠিক থাকিলেও গান বদল হইয়াছিল।[১]

অভিনীত সংস্করণে একটু ছোট সূচনা আছে। যে সূত্রে শ্রীমতী বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু উপালির আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল তাহার কথা॥

৪

'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) একটি বৌদ্ধ অবদানের[২] ভূমিকা অবলম্বনে লেখা।[৩] ছোট রচনা। দুইটি দৃশ্য। গান আছে বারোটি। ভাববস্তু এই

---

[১] নটীর-পূজা নাটকে গানের সংখ্যা আট, অভিনীত রূপে নয়। তিনটি গান দুইয়েতেই আছে, "বাঁধন ছেঁড়া সাধন হবে." "হে মহাজীবন" এবং "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো।"

[২] "অবদান" মানে অমলকীর্তি সুমহৎ কীর্তি।

[৩] দিব্যাবদানের অন্তর্গত শার্দুলকর্ণাবদান। কাহিনী রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'দি সাংস্ক্রিট্ বুড্ডিষ্ট লিটারেচর অব্ নেপাল' (পৃ ২২৩-২২৭) গ্রন্থে পাইয়াছিলেন।

বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ শ্রাবস্তীনগরে কোন ভক্ত গৃহস্থের বাড়িতে আহার করিয়া বিহারে প্রত্যাবর্তনের পথে মধ্যাহ্নরৌদ্রে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া এক চণ্ডালকন্যাকে কূপ হইতে জল তুলিতে দেখিয়া তাহার কাছে জল চান। মেয়েটির নাম প্রকৃতি। সে নিজে নীচজাতি বলিয়া তাঁহাকে জল দিতে চাহে নাই। আনন্দ যখন বলিলেন মানুষে মানুষে জাতিভেদ নাই, তখন সে দিল। আনন্দের এইটুকু সংস্পর্শে আসিয়াই প্রকৃতি মুগ্ধ হইল। ভাবগতিক দেখিয়া তাহার মা শঙ্কিত হইল এবং অবশেষে আনন্দকে কন্যার সহিত মিলাইবার জন্য তান্ত্রিক অভিচার শুরু করিল। অভিচারের মন্ত্রে দুষ্ট শক্তি সব এক জোট হইয়া আনন্দের দেহকে প্রকৃতিদের গৃহে টানিয়া আনিতে লাগিল। মায়ামুকুরে সে দৃশ্য দেখিয়া মেয়েটি সহ্য করিতে পারিল না। সে বুঝিল যে আসিতেছে, তাহার কাছে যে পানীয় প্রার্থনা করিয়াছিল সে ব্যক্তি এ নয়। সে মাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

> ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলি নে কেন! কী দেখলেম। ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো!

আনন্দ পৌঁছিবার আগেই প্রকৃতি অভিচারতন্ত্রের উপকরণ সব লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিল। আনন্দ প্রবেশ করিলে তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রকৃতি কাতরকণ্ঠে ক্ষমা চাহিল।

> প্রভু তুমি এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এত দুঃখই পেলে—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর ক'রে দাও।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ কাহিনীকে ছাঁটাই করিয়াছেন। মূল কাহিনীতে পাই যে প্রকৃতির মায়ের অভিচারমন্ত্রের বশীভূত হইয়া আনন্দ প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইতে তাহাদের ঘরে আসিয়াছিলেন। প্রকৃতি যখন বাসরশয্যা রচনা করিতেছিল তখন আনন্দের মন্ত্রঘোর কাটিয়া যায় এবং তিনি মনে মনে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। স্মৃত হইবামাত্র বুদ্ধ যথোপযুক্ত মন্ত্র পড়িয়া প্রকৃতির মায়ের বশীকরণ মন্ত্র কাটাইয়া দেন। অপাপবিদ্ধ আনন্দ বিহারে ফিরিয়া আসে। প্রকৃতি তবুও আশা ছাড়ে নাই। সকালে উঠিয়া সে উত্তম বেশভূষা করিয়া আনন্দের পিণ্ডপাতচারিকা-পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকে। আনন্দ আসিলে সেও তাঁহার পিছু পিছু চলে। আনন্দ উপেক্ষা করিলেও এমন অসদৃশ ব্যাপার অপরের লক্ষ্য এড়ায় নাই। শহরে ও বিহারে কানাঘুঁষা চলিতে থাকিল। শেষে বুদ্ধও শুনিলেন। তিনি প্রকৃতিকে আনাইয়া বলিলেন, তুমি যদি আনন্দকে বিবাহ করিতে চাও তো বাপমায়ের মত

লইয়া এস। বুদ্ধ বোধ করি ভাবিয়াছিলেন যে বাপ-মা নেড়া ভিক্ষুর সঙ্গে বিবাহে মত দিবে না। কিন্তু মত সহজেই মিলিল। তখন বুদ্ধ প্রকৃতিকে বলিলেন, এখন তুমি আনন্দের মতো সাজ কর। প্রকৃতি তখনি রাজি হইল। তাহার মাথা মুড়ানো হইল, সে কাষায় গ্রহণ করিল। ভিক্ষুণী হইয়া সর্বদুর্গতিশোধন ধারিণী-মন্ত্র জপ করিবামাত্র তাহার চিত্তের মলিনতা ঘুচিয়া গেল। মূল কাহিনী এইখানেই শেষ। তবে চণ্ডালকন্যাকে ভিক্ষুণীসংঘে গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধের কোন কোন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভক্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেজন্য বুদ্ধকে একটি অতীত জাতককাহিনী বলিয়া সে অসন্তোষ ঘুচাইতে হইয়াছিল। সেই কাহিনীই শার্দূলকর্ণাবদান।

চণ্ডালিকার প্রথম অংশের, অর্থাৎ আনন্দের পানীয় গ্রহণ ও প্রকৃতির প্রেমে-পড়ার, ভাব লইয়া বৎসরকাল আগে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, 'জলপাত্র'[১]। এখানে কুয়ায় জল তোলা নয়, ঘড়ায় জল আনা।

ভাবের দিক দিয়া চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে চণ্ডালিকার মিল আছে। চিত্রাঙ্গদার রূপ ছিল না, কিন্তু অনুকূল পরিবেশ ছিল এবং তাহাই পুষ্পধনুর বাণাঘাতের কাজ করিয়াছিল। তা ছাড়া চিত্রাঙ্গদার গুণ ছিল এবং সেই গুণেই সে অর্জুনকে বাঁধিতে পারিয়াছিল। প্রকৃতির রূপ ছিল, গুণও ছিল—সে তৃষ্ণার্তকে জলদান করিয়াছিল। কিন্তু পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল। সুতরাং অভিচারতন্ত্রমন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ভালোবাসার ব্যর্থতা নাই। আনন্দ-প্রকৃতির মিলন যে ভূমিতে হইল সে ভূমি নিখিল জীবপ্রকৃতির মিলনভূমি।

আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুপ্রধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাহাকে রক্তমাংসের প্রাণী করিয়াছেন। প্রকৃতির ভালোবাসার টান মানুষ-আনন্দকে টানিয়াছিল। আনন্দের মনের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ অভিচারক্রিয়ার উপলক্ষে স্পষ্টভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

চণ্ডালিকা কাহিনীর প্রতি ইউরোপের একজন বড় কবি-গুণীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় পাঁচ বছর আগে। রিচার্ড হ্বাগ্‌নের (Richard Wagner) ১৮৫৬ সালে প্রকৃতির কাহিনী লইয়া একটি সঙ্গীত-নাটকের খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। রচনাটির নাম বাঙ্গালা করিলে হয়

[১] পরিশেষে সংকলিত। রচনা ৮ শ্রাবণ ১৩৩৯।

'বিজয়ীসজ্ঘ'। হ্বাগনেরের ইচ্ছা ছিল অপেরাটিতে দেখাইতে যে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরেও প্রকৃতির হৃদয় শান্ত হয় নাই ॥[১]

৫

'তাসের দেশ' (১৯৩৯) রূপকগর্ভ ব্যঙ্গবিজড়িত সরস উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ নাট্যরচনা। প্রয়োগে অভিনয়ের তুলনায় গানের ও নাচের গুরুত্ব কম নয়। কাহিনী বহুকাল আগে লেখা 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (১৮৯২) থেকে নেওয়া। চারিটি দৃশ্য, গান অনেক ॥

৬

'বাঁশরী' (১৯৩৩)[২] রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটক। এই ঘটনাবর্জিত নাট্যরচনায় নর-নারীর হৃদয়দ্বন্দ্বের শ্রেয়:সিদ্ধি উদ্দিষ্ট। গঠনরীতি নাট্যগল্পের মতো। এটিকে স্বচ্ছন্দে গল্প-উপন্যাসে রূপ দেওয়া যাইত। ঘটনার ঘনঘটা ব্যতিরেকেও যে নাট্যরস জমিতে পারে তাহার ভালো উদাহরণ বাঁশরী।

বাঁশরীর ভূমিকা নাটককাহিনীর সর্বস্ব। "তার প্রকৃতিটা ছিল বৈদ্যুত শক্তিতে সমুজ্জ্বল।" ভালোবাসার পাত্রকে আপনার আয়ত্তে না রাখিলে তাহার স্বস্তি নাই। ক্ষিতীশ ঠিকই ধরিয়াছিল

> আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ ক'রে শুধু চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

এই কারণেই সন্ন্যাসী পুরন্দর বুঝিয়াছিল যে সোমশঙ্করের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বাঁশরী-সোমশঙ্করের মিলন বাঞ্ছনীয় নয়।

> সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না।

শেষে ত্যাগের মধ্য দিয়াই বাঁশরীর ভালোবাসা উন্নীত হইল প্রেমে।

সুষমা ভিন্নপ্রকৃতির নারী। সে ছিল চকোরীর জাত। তাই পুরন্দরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া সে স্বচ্ছন্দে সোমশঙ্করকে বরণ করিল।

সন্ন্যাসী পুরন্দর নিরাসক্ত আইডিয়ালিস্ট। সে বাঁশরীর পুরুষ প্রতিরূপ। বাঁশরী প্রকৃতি, পুরন্দর পুরুষ।

> বাঁশরী। মোহ চাই, চাই সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের।...

---

১ অধ্যাপক ঈ. হ্বাল্ড্ শ্মিট্, 'The influence of German Philosophy and Poetry' (University of Ceylon Review Vol XXI, No. 1) পৃষ্ঠা ২৮-২৯ দ্রষ্টব্য।

২ রচনাসমাপ্তি ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৯

পুরন্দর। মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয় একথা মানতে রাজি আছি।... আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ নেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

ক্ষিতীশ উপস্থিতকালের সাহিত্যবিলাসী। তাহার অক্ষমতা বাঁশরীর মনে অনুকম্পা জাগায়। যে-জ্বালা বাঁশরী অন্তরে অনুভব করে সে জ্বালা সে ক্ষিতীশের কলমের মুখে প্রকাশিত দেখিতে চায়। কিন্তু ক্ষিতীশের সে বোধ কই সে দৃষ্টি কই। বিদেশী মালের সস্তা নকল লইয়া তাহার কারবার।

ক্ষিতীশবাবু ন্যাচরাল্ হিস্ট্রি লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রং লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানী সমুদ্রের ওপার থেকে।

৭

নটীর-পূজায় নৃত্যের অল্পস্বল্প প্রয়োগ করিয়া যে ফল পাওয়া গেল তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বাঁশরীর পরে রবীন্দ্রনাথ তিনখানি গীতনৃত্যনাট্য লিখিলেন, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' (১৯৩৮) এবং 'শ্যামা (নৃত্যনাট্য)' (১৯৩৯)। এ রচনাগুলির মধ্যে অভিনব হইতেছে "গদ্য গান", অর্থাৎ গানে মুক্তবন্ধ গ্রহণ ও ছন্দে মিল পরিত্যাগ। এ এক্সপেরিমেণ্ট বিস্ময়াবহ।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আরম্ভ গীতিনাট্যে, অবসান নৃত্যনাট্যে। শেষ কালে তিনি গদ্যেও গানের সুরের সাজ চড়াইয়াছেন। গানে যেমন কাব্যরসের ফল পরিণতি, নাট্যে তেমনি রূপরসের। নাট্যরচনার বিবিধ কর্ম লইয়া রবীন্দ্রনাথ আজীবন অনুশীলন করিয়া সার্থকতালাভ করিয়াছিলেন। নৃত্যনাট্যে সে সার্থকতা তুলনাবিরহিত॥

৮

'শ্যামা'র কাহিনী মহাবস্তু হইতে নেওয়া। এই বিষয় লইয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখিয়াছিলেন (২৩ আশ্বিন ১৩০৬) একটি কবিতা—'পরিশোধ' (প্রথমে 'কাহিনী'তে সঙ্কলিত ছিল)। তাহার পর এই কবিতাটিকেই সংক্ষেপ করিয়া নাট্যোচিত গানে রূপ দিলেন এই নামেই (আশ্বিন ১৩৪৩)।[১] শেষে "নেপথ্যে"

---

[১] প্রকাশ প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৩। পরে এই নাট্যগীতিটি বাড়ানো হইয়াছিল নাট্যোচিত নির্দেশ সহ।

গানটি ভরতবাক্যের মতো। (এমন রবীন্দ্রনাথের আর কোন গম্ভীর নাট্য-রচনায় দেখি নাই।)

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।...

চার দৃশ্যে গঠিত নৃত্যনাটিকা 'শ্যামা' (১৯৩৯) 'পরিশোধ' কবিতা ও গান হইতে অনেকটা যেন স্বতন্ত্র। কবিতায় ও গানে প্রেমের তৃতীয় বিন্দু উত্তীয় উল্লিখিত মাত্র, তাহার কোন ভূমিকাই নাই।

বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরী অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।[১]

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর
মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ
নিজ করে লয়ে স'পেছে আপন প্রাণ।[২]

নৃত্যনাট্যে উত্তীয় রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্য আগাগোড়া সেই অধিকার করিয়া আছে॥

১ কাহিনী পৃ ৩৯-৪০

২ প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৩ পৃ ৭

বিংশ পরিচ্ছেদ

গল্প

১

বস্তুশিল্প নিয়মমাফিক গড়িতে হয়। কেননা সে বহুলোকের প্রয়োজনে একই রকম ব্যবহারের জন্য তৈয়ারি। ভাবশিল্প, যা দিনগত প্রয়োজনের নয়, তা স্রষ্টার অন্তরের প্রেরণায় উদ্‌গত হয়। ভাবশিল্পের বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচকেরা নিয়ম বাহির করিতে চেষ্টা করেন, এবং সে নিয়ম অনুসারে ভালো রচনাও তৈয়ারি হয়। কিন্তু সে তৈয়ারি রচনার জ্যোতি বেশিদিন টিকে না। শ্রেষ্ঠ লেখকের সৃষ্টি নিয়ম-বাঁধন না মানিয়াই দেখা দেয়। এই কথা স্মরণে রাখিয়া গল্পের অর্থাৎ ছোটগল্পের লক্ষণ বিচার করিতেছি।

ছোটগল্পের কাহিনী ঘিরিয়া একটি অখণ্ড ইমোশন বা ভাবরস জমাট বাঁধিয়া উঠে, অর্থাৎ একটি অখণ্ড ভাবরস পাঠকের চিত্ত অভিষিক্ত করিয়া তোলে, এবং স্বল্পতম আয়োজনে ভাবরসের একটি ঘনীভূত একাগ্রতায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহাই ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ। গীতিকবিতার সঙ্গেও ছোটগল্পের মিল এইখানে। ভাবৈকঘনরসতায় পর্যবসিত হয় বলিয়া ছোটগল্পের কাহিনী শেষ হইয়া গেলেও পাঠকের চিত্তে তাহার রেশ লাগিয়া থাকে এবং তাহাতেই যেন গল্পের যথার্থ বিরাম গুঞ্জরিত হয়। অর্থাৎ, "অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে না হইল শেষ।" লেখক থামিয়া গেলেন কিন্তু পাঠকের কৌতূহল যেন তার-পর তার-পর করিতে থাকে। কাহিনী শেষ হইয়া গেলেও ভাবরসের পরিপাক নিঃশেষে চুকিয়া যায় না।

একান্তভাবে রসৈকাশ্রিত বলিয়া ছোটগল্পে রসান্তরের সংযোগ লঘুস্পর্শ হওয়া আবশ্যক। সহযোগী রসের মধ্যে কৌতুকই ছোটগল্পের বিশেষ উপযোগী। স্মিতালোকের বিকীর্ণ রশ্মিতে ছোটগল্পের রেখাচিত্র উদ্ভাসিত হয়। স্মিত ও করুণ এই দুই রসের পাশাপাশি প্রবহমাণ স্রোতের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যেই হিউমার জমিয়া উঠে। ছোটগল্পে এই দুই রসের অবতারণা তাই সহজ ও স্বাভাবিক।

গীতিকাব্যের মতো ছোটগল্পের রসেরও পাক লেখক-পাঠকের সমরসানুভূতির উষ্ণতায়। তাই গীতিকবিতার মতো ছোটগল্পেরও রূপ বিচিত্র। প্রণয়, কৌতুক, অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি করিয়া ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ অজস্র, অতএব

নিরর্থ। মানবজীবনের জটিলতা অনন্ত, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যও অপরিমেয়। মানুষের মনের বহুবিচিত্র টানাপোড়েনে যে বাণী শিল্প সৃষ্টি হয়, তাহাতে কোন-রকম মার্কা মারা চলে না। রঙের যেমন রসেরও তেমনি অসংখ্য শেড্। সুতরাং রস বিচার করিলে ছোটগল্পের শ্রেণীর অন্ত নাই॥

২

একদা বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি সমালোচক রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে এই অভিযোগ তুলিয়াছিলেন যে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন"। ইহার অর্থ, রবীন্দ্রনাথের রচনা—কবিতা ও গল্প—একান্তভাবে কল্পনার সৃষ্টি সুতরাং বাঙ্গালী নরনারীর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার দুঃখসুখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনার সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত। (এই অভিযোগ এখন খুব মুখরিত নয় তবে আভাসে-ইঙ্গিতে পরিস্ফুট।) রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এই বিচারমূঢ় মন্তব্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং তাঁহার ছোটগল্পের সম্বন্ধে এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের রঙীন ফানুস নয়। প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং গভীর অনুভূতির সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্য-সৃষ্টির আয়োজন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারি অভিনব প্রকাশ তাঁহার ছোটগল্প-গুলিতে। সমসাময়িক একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

> আমি সমস্ত জিনিষের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখ্তে পাই, অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই।[১]

সাধারণ পাঠকের পক্ষে গোল বাধিয়াছে এইখানেই।

নিরবচ্ছিন্ন অবকাশপূর্ণ প্রকৃতির স্নিগ্ধশ্যাম ক্রোড়ে কুটীরনীড়ে হোক অথবা জনাবিল নগরকারার ইটকাঠের বায়ুরুদ্ধ কোটরে হোক, যে অনাদি চিরপ্রবাহিত জীবনস্রোত ক্ষুদ্র তুচ্ছ দুঃখসুখের ক্ষণিক বুদ্বুদ-ভঙ্গে অনুচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালায় নিরলসগতিতে প্রবহমাণ, যেখানে চমকপ্রদ বৈচিত্র্যও নাই এবং মহত্ত্বের উত্তুঙ্গতা অথবা নীচতার অতলতাও নাই, বাঙ্গালী-মানুষের সেই সনাতন জীবনলীলা রবীন্দ্রনাথের অনুভব-উদ্ভাসিত গল্পে প্রতিবিম্বিত। সাহিত্যশিল্পের সর্বজনীন আদর্শের মাপে এই প্রতিবিম্বন যথাযথ, কিন্তু সব সময়ে হয়ত এখনকার দিনের বিশেষ অর্থে "বাস্তব" নয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানুষের বাহ্য অথবা আন্তর-

[১] বিশ্বভারতী পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা পৃ ২৯৪।

জীবনের ছাঁকা হীন ঘৃণ্য জুগুপ্সিত খণ্ডরূপ সাধারণত প্রতিফলিত হয় নাই, দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয় বিজড়িত এবং দুঃখে-সুখে আশায়-নৈরাশ্যে বিচিত্রিত নিখিল-জীবনসংহিতার কিছু ক্রমপাঠই তাহাতে উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যথার্থভাবে বাস্তব, কেননা তাহাতে মানুষের কোন টাইপ আঁকা হয় নাই, কেবল ব্যক্তি-মানুষের নিজত্ব প্রকাশিত। তথাচ রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পে এই বাস্তবতাই শেষ কথা নয়। গল্পের গল্পত্ব ছাড়াইয়াও এমন একটা ধ্বনিরেশ থাকে যাহা মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে থাকে। চোখে-দেখা মানুষের সুখদুঃখময় যে জীবনখণ্ড আবহমান প্রাণপ্রবাহের ভঙ্গ-তরঙ্গমাত্র, রবীন্দ্রনাথের গল্পে জীবনের ক্ষণলব্ধ ভালোবাসা-ভালোলাগা ও তুচ্ছতা-ব্যর্থতা-অচরিতার্থতা সবই একটি যেন অতিলৌকিক সার্থকতায় পৌছিয়াছে, জীবনের অসার্থকতার ব্যথা বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনার মীড় হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, প্রেমের দুঃখদহন বিশ্ব-চৈতন্যের শান্তিজলে নির্বাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্পে বিনা আয়োজনে দ্যাবাপৃথিবী সম্মিলিত, স্বর্গের অচঞ্চল নক্ষত্রালোক মাটির প্রদীপের ক্ষীণ চঞ্চল শিখায় দীপ্যমান।

অতএব রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছোটগল্পের কাহিনীতে ব্যর্থতার যে করুণ সুর গুঞ্জরিত অথবা ব্যথিত বেদনার যে ছায়া পতিত তাহা সাধারণ অর্থে নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ নয়। তাহাতে সাধারণ মানুষের দুদিনের কাঁদাহাসা ও আধখানি ভালোবাসা "সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া" এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে বিরাম লাভ করিয়াছে। হিউম্যানিটির অর্থাৎ বিশ্বমানবতার গভীর সহঅনুভব-জাত অনির্বচনীয় বোধেই সেই সুমহৎ চরিতার্থতা। তাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এমন একটি অনুপম রস আছে যাহাতে সহৃদয় পাঠকের মনে অতৃপ্তি-বেদনার উপচয়ে একটা বৃহত্তর সান্ত্বনা আনিয়া দেয়, পাঠক যেন মানসগঙ্গা-স্নানের শুচিতা পায়। এইখানেই গল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের অতিশায়িত্ব। তাঁহার ছোটগল্পে—সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিয়াছে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয়, সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে, পৃথিবীতে যাহারা একান্ত অনাবশ্যক বোধ হয়, সেখানে দেখি তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সেই নবদ্বৈপায়ন, যিনি আমাদের চারপাশে বিকীর্ণ কুরুক্ষেত্রখণ্ডের মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুনের যে অখ্যাত অজ্ঞাত আত্মীয় আছেন—সেই আত্মীয়তা

আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্যের প্রয়োজনীয়তা দূর করিয়াছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নগর ও নগরবাসী এবং জনপদ ও জনপদবাসী তুল্য স্থান ও মর্যাদা পাইয়াছে। মানুষ অবশ্য সর্বত্রই এক, কি নগর কি জনপদ, এবং রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক ও জটিল মনোবস্তু লইয়া কারবার করিয়াছেন তাহাতেও নাগরিক-জনপদিক বিভাগ চলে না। তবে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে পল্লীজীবনের অবকাশে মানুষের ভাবপরিমণ্ডল সরল ও সুস্থ থাকিবার বেশি সুযোগ পায়, এবং ইহাও ঠিক যে পল্লীর প্রতিবেশ এবং পল্লীর জীবন রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি শহরবাসের প্রতিক্রিয়াজনিত নয়, ইহার জড় অনেক নীচে। বৃহৎ অট্টালিকায় এক কোণে বন্দী শিশুচিত্ত জানালার ফাঁক দিয়া বহিঃপ্রকৃতির যে সংকীর্ণ রূপটুকু দেখিয়া নিজের কল্পনাকে দিগ্‌বিদিকে উধাও করিয়া দিত তাহারি মধ্যে কুটীরমণ্ডিত তরুশ্যাম পল্লীজীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূল খুঁজিতে হইবে। বহুকাল পরে[২] রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় জনসভার অভিনন্দনের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই ইতিহাসটুকুর আভাস আছে।

> আমার মরাইয়ে আজ যা কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে।...বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না।...বহির্জগতের এই স্বল্প-পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেগ সৃষ্টি করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাইনি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব—আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলা-দেশকে দেখেছেন; আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনার প্রথম এবং প্রধানতম আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার একটি অত্যন্ত শাদাসিধা বাস্তব ছবি তিনি বিসর্জনের উপসর্গ কবিতায় দিয়াছেন।

---

১ দ্রষ্টব্য 'ডায়ারী,' সাধনা ১৩৩০ বৈশাখ ('পঞ্চভূত')।

২ ১৮ ফাল্গুন ১৩৪৩।

বাঙ্গালাদেশের নিভৃত অন্তরটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের তুলনা হয় ভগীরথের গঙ্গাবতারণের সঙ্গে। দাদাদের সঙ্গে বোটে ও স্টীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যবর্তী ভাগীরথীতীরে যে পল্লীদৃশ্য দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে গল্পরচনার প্রথম প্রেরণা দেয় এবং তাহাতে তাঁহার প্রথম গল্প দুইটি—'রাজপথের কথা' এবং 'ঘাটের কথা'—লেখা হয়। 'সরোজিনী-প্রয়াণ' প্রবন্ধে গল্প দুইটির বাস্তব ভূমিকা রহিয়াছে। তাহার প্রায় ছয়-সাত বৎসর পরে উত্তরমধ্যবঙ্গের নদীতীরে বাস করিয়া গল্পরচনার তীব্রতর প্রেরণা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্প অকষ্টকল্পিত। ছোটগল্পের পক্ষে একথা বোধ করি বেশি সত্য। কবিতা ও উপন্যাস লিখিয়া প্রকাশের পরেও রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় কিছু না কিছু পরিবর্তন পরিবর্জন বা পরিবর্ধন করিয়াছেন, কিন্তু কোন ছোটগল্প লিখিয়া আর তিনি তাহাতে কলম ছোঁয়ান নাই। মনের মধ্যে যে-আনন্দ লইয়া তিনি হিতবাদীর ও সাধনার জন্য এক একটি করিয়া গল্প লিখিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি তাঁহার মনে বহুকাল জাগরূক ছিল।

নদীতীরের অদূরে কুঠিবাড়ীর গবাক্ষপথে অথবা নদীবক্ষে বজরার ছাদ বা জানালা হইতে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের যে গভীর অথচ অনুত্তরঙ্গ প্রবাহ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেও সত্যতর। এই অনুভবের উজ্জ্বল ও অনেকগুলির অখণ্ড পরিচয় তাঁহার ছোটগল্পে আছে। কয়েকটির কাহিনীতে বাস্তব-ঘটনার প্রতিবিম্বন আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। চোখে-দেখা মানুষ ও মনে-লাগা ঘটনা রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার রচিত গল্পে সে মানুষের চেহারা ও সে ঘটনার ছবি হয়ত মিলিবে না।[১] যেমন 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। তখন রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে কুঠিবাড়ীতে থাকেন। কুঠিবাড়ীর একতলাতে ছিল পোস্ট আফিস। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় পোস্টমাস্টারবাবু তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতেন ও সম্ভব-অসম্ভব নানারকম গল্প বলিয়া যাইতেন। ইহাকে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' লিখিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু গল্পের পোস্টমাস্টারবাবু আসল ব্যক্তির সজাতি হইলেও সগোত্র ছিলেন না। গল্পের পোস্টমাস্টার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং আসল পোস্টমাস্টারের তুলনায় ঢের বেশি সত্য।

১ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না ম'রে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আরেকটা মিলে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব না পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।" (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৯ পৃ ৪৫১)।

'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী-চরিত্রের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন একদা সাজাদপুরের নদীঘাটে শ্বশুরালয়গামিনী এক বালিকাকে দেখিয়া।[১] কিন্তু সে আভাস মাত্র। মৃন্ময়ীর পিছনের বাস্তব মূর্তি রবীন্দ্রনাথের চিত্তে গল্পের সুইচ টিপিয়া দিয়াই অন্তর্হিত।

শুধুই করুণকোমল ছবি নয়, অনেক নিষ্ঠুরকঠোর দৃশ্যও তাঁহার গোচরে আসিয়াছিল। সে নীচতা-নিষ্ঠুরতার মধ্যে ঘোর বাস্তবতা পাইলেও মানুষের সত্য পরিচয়ের কোন রেশ তাহাতে পান নাই বলিয়া এ কাহিনী তাঁহার গল্পে ঠাঁই পায় নাই। (রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অনেকদূর যাইত, তাহা মানুষের বহিরঙ্গ হীনতাকদর্যতায় প্রাচীরে অবরুদ্ধ হইত না। তাই তাঁহার কাছে মানুষের সত্য মনোবিজ্ঞানীর অবধারিত সত্য নয়।) যেখানে অসুন্দরতা সত্ত্বেও মানবাত্মার মহনীয়তা আভাসিত সেখানে রবীন্দ্রনাথের গল্পে তাহার প্রতিফলন। যেমন 'শাস্তি'তে। কিন্তু নীচতা ও নিষ্ঠুরতা যেখানে শুধুই অসুন্দর পশুবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখনী কুণ্ঠিত ও বিমুখ। একটি চিঠিতে এমনি একটি গল্পে-উপেক্ষিত দৃশ্যের বর্ণনা আছে।[২]

> আমার এই খোলা জানালার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখ্‌তে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে—কিন্তু এক একটা দেখে ভারি মন বিগ্‌ড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে অসাধ্য রাস্তায় যখন গরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোট উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে—আজ ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণস্বরে কাঁদচে আর কাঁপচে, ভয়ানক কাশীতে তার গলা খন্‌-খন্‌ করচে—মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম। ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল—কাশীতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তারপর ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল। ছেলেটা নিতান্ত ছোট—আমার খোকার বয়সী। এরকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যে একটা ideal-এর উপর আঘাত লাগে—বিশ্বস্তচিত্তে চল্‌তে চল্‌তে খুব একটা হুচট্‌ লাগার মত। ছোট ছেলেরা কি ভয়ানক অসহায়—তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিদারুণ কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরো বিরক্ত করে তোলে; ভাল করে আপনার নালিস জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই—তার উপরে কাশী—তার উপরে এই ডাকিনীর হাতে মার।

১ ছিন্নপত্র (সাজাদপুর ৪ জুলাই ১৮৯১)।

২ ছিন্নপত্র (সাজাদপুর ফেব্রুয়ারী ১৮৯১)।

তবে যেখানে সবল মনুষ্যত্বের সঙ্গে সংঘর্ষ আছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ নীচতা ও নিষ্ঠুরতাকে বাস্তব করিয়াই আঁকিয়াছেন। এ যেন মিথ্যাকে অসুন্দরকে নীরবে প্রত্যাখ্যান।

পঞ্চভূতের-ডায়ারির একস্থানে[১] তাঁহার যে অখ্যাত ঠিকা মুহুরী ছেলেটির কথা আছে, সেটিও একটি ছোটগল্পের মতো করুণমধুর। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের উৎসের সন্ধান দেয় বলিয়া মূল্যবান্ এই কাহিনীটুকু এখানে উদ্ধৃত করি।

> একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহুদূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্য লোক ছিল। একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে 'পিসিমা', 'পিসিমা' করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল। সেই যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগবগ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? একদিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গলবার্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল? এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণ কাতরতা উদ্বেগজড়িত হইয়া ছিল? সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপামান হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মুহুরীর মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না…একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোষাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মত দীপ্তিহীন ছোট ছোট লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়;—পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান্ হইয়া উঠি।

---

[১] সাধনা ১৩০০ বৈশাখ।

রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে নিতান্ত নগণ্য মানুষও দীপ্তিমান্ হইয়া শিল্পের অমরাবতীতে রাজসিংহাসন লাভ করে। তাহার মূক ব্যথা-বেদনা বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া জীবলোকের অব্যক্ত বৃহৎ বেদনা রূপে স্পন্দিত হইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ও ছোটগল্প অনেকটা সমধর্মী। তবে পার্থক্যও আছে। কবিতায় কবিসত্ত্বের অন্তরপ্রকাশই মুখ্য, ছোটগল্পে মানসপ্রবেশ। কবিতায় কবির নিজের কথা হইয়াছে বিশ্বসংসারের বাণী, ছোটগল্পে বিশ্বসংসারের কথা হইয়াছে নিজের বাণী ॥

৩

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনার সূত্রপাত ১২৯১ সালে। দুইটিমাত্র গল্প লিখিয়া তিনি প্রায় সাত বৎসর ক্ষান্ত থাকেন। ১২৯৮ সালে প্রথমে 'হিতবাদী' পরে 'সাধনা' বাহির হইলে রবীন্দ্রনাথ রীতিমত ছোটগল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সালের গোড়া হইতে মাস দেড়েক হিতবাদীতে তাহার পর চারি বৎসর ধরিয়া সাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছোটগল্পের পদ্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছিল। সাধনা উঠিয়া গেলে ভারতী-প্রদীপ-বঙ্গদর্শন-প্রবাসী-সবুজপত্রে ছোটগল্পের জের চলিয়াছিল, কখনো ছিন্ন কখনো অবিচ্ছিন্ন ধারায়। তাঁহার গল্পলেখার প্রেরণা শেষ অবধি (১৩৪৫-১৩৪৭) সক্রিয় ছিল।[১]

১২৯১ সালে ভারতীতে ও নবজীবনে প্রকাশিত গল্প দুইটি, হিতবাদীতে প্রকাশিত গল্প সাতটি এবং চারি বছরে সাধনায় প্রকাশিত গল্পমালা দেড় বছরের মধ্যে পাঁচখানি বইএ সংকলিত হইয়াছিল। প্রথমে বাহির হয় 'ছোটগল্প' (ফাল্গুন ১৩০০)। অগ্রহায়ণ ১৩০০ পর্যন্ত প্রকাশিত গল্পের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ষোলটি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।[২] ১৩০০ সালের মাঘ হইতে ১৩০১ সালের আশ্বিন পর্যন্ত সাধনায় প্রকাশিত গল্পগুলি ১৩০১ সালে পূজার পূর্বে 'বিচিত্র গল্প' (দুই ভাগ) ও 'কথাচতুষ্টয়' নামে একসঙ্গে বাহির হইয়াছিল। (আকারে সবচেয়ে বড় চারিটি গল্প কথাচতুষ্টয়ে স্থান পাইল।) বিচিত্রগল্প প্রথম ভাগে যে সাতটি গল্প গাঁথা হইল[৩] সেগুলির মধ্যে একটু ক্ষীণ ভাবৈকতা

১ রাজপথের কথা, দেনা-পাওনা, পোষ্টমাষ্টার, রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, ব্যবধান, খাতা, সম্পাদক, একরাত্রি, ছুটি, দানপ্রতিদান, কাবুলিওয়ালা, সমস্যাপূরণ, গিন্নি, ঘাটের কথা, রীতিমত নভেল।

২ মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র।

৩ অসম্ভব কথা, কঙ্কাল, স্বর্ণমৃগ, ত্যাগ, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, জয় পরাজয়, সম্পত্তি সমর্পণ।

পরিলক্ষিত হয়। অদৃষ্টের চক্রান্তে স্নেহপ্রেমের ব্যবহারে ভুলবোঝা মানুষের জীবনকে যে কতদূর বিভ্রান্ত করিতে পারে তাহারই গভীর পরিচয় এই গল্পগুলিতে পাই। বাকি আটটি[১] গল্প লইয়া বিচিত্র-গল্প দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্তিক হইতে ১৩০২ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত সাধনায় যে দশটি গল্প বাহির হইয়াছিল তাহা লইয়া 'গল্প দশক' ১৩০২ সালে পূজার পূর্বে প্রকাশিত হইল।

অতঃপর ভারতীতে (১৩০৫,১৩০৭)[২], প্রদীপে (১৩০৭)[৩] এবং অন্যত্র[৪] প্রকাশিত গল্পগুলি লইয়া রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গল্পসংগ্রহ (১৩০৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত) 'গল্প' (গল্পগুচ্ছ') নামে বাহির হইল (১৩০৭),—দুইখণ্ডে তবে পত্রসংখ্যা ধারাবাহিক। মিনার্ভা থিয়েটারে শিক্ষিত দর্শকদের টানিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারী-অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বিবিধ গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া শুরু করিয়াছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের 'গল্প'এর অনেক কপি কিনিয়া নেন এবং ইহার সুবিধার জন্য প্রকাশক (মজুমদার এজেন্‌সি বা মজুমদার লাইব্রেরী[৫]) প্রায় সাড়ে নয় শ পৃষ্ঠার বইটি চারটি খণ্ডে স্বতন্ত্র মলাট দিয়া বাঁধাইয়া দেন। এই খণ্ডীকৃত বইটির নাম দেওয়া হয় 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'। প্রত্যেক খণ্ডে খণ্ডসংখ্যা ও সূচী না দিয়া মলাটে সেই সেই খণ্ডের গল্পগুলির নাম দেওয়া ছিল। এই হইল "গল্পগুচ্ছ" নামের ইতিহাস। এই গল্পগুচ্ছে আগেকার বইগুলির গল্পক্রম রক্ষিত হয় নাই। ১৩১৫ সালে 'গল্পগুচ্ছ' নামে গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঁচ খণ্ডে বাহির হয়। প্রকাশক এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস। প্রথম চারি-খণ্ডে পূর্বসংকলিত গল্পগুলি সংকলিত, তবে আগেকার ক্রমবর্জিত। পঞ্চম খণ্ডে ১৩০৮ সাল হইতে ১৩১৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস[৬] ও তিনটি একটু বড় আকারের গল্প[৭] স্থান পাইল। ১৩০৯ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এবং

---

[১] দালিয়া, জীবিত ও মৃত, মুক্তির উপায়, সুভা, অনধিকার প্রবেশ, মহামায়া, একটা আষাঢ়ে গল্প, একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প।

[২] দুরাশা, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল্।

[৩] সদর ও অন্দর, শুভদৃষ্টি।

[৪] যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী। গল্প তিনটি কোথায় প্রথম বাহির হইয়াছিল অথবা কোথাও বাহির হইয়াছিল কিনা জানা নাই।

[৫] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

[৬] নষ্টনীড় (ভারতী ১৩০৮)।

[৭] কর্মফল (কুন্তলীন পুরস্কার ১৩১০), গুপ্তধন, মাষ্টারমশায় (প্রবাসী কার্তিক ১৩১৪)।

গল্পগুচ্ছে অসংকলিত দুইটি গল্প[১] এবং ভারতীতে সদ্য-প্রকাশিত দুইটি গল্প[২] লইয়া গল্পগুচ্ছের সংযোজন রূপে 'গল্প চারিটি' প্রকাশিত হইল (১৩১৮)। সবুজপত্রে প্রকাশিত সাতটি গল্প লইয়া ১৩২৩ সালে পূজার পূর্বে বাহির হইল 'গল্প সপ্তক'। তাহার পর 'পয়লা নম্বর' (বৈশাখ ১৩২৭) শিশির পাবলিশিং হাউসের "পপুলার সিরিজ" এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা রূপে। ইহাতে দুইটি সোজাসুজি গল্প[৩] ও দুইটি রূপক-কাহিনী[৪] আছে। রূপক-কাহিনী দুইটি পরে 'লিপিকা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া সে দুইটি বাদ দিয়া এবং গ্রন্থাকারে অসংকলিত কয়েকটি গল্প লইয়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থবদ্ধ গল্প তিনখণ্ডে তৃতীয় (বা বিশ্বভারতী) সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছ' রূপে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হইল। ১৩৪২ সালের বৈশাখে মুদ্রিত নব সংস্করণে আরও চারটি গল্প যুক্ত হইয়াছে। ১৩৪৭ সালে পৌষ মাসে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্পের বই 'তিন সঙ্গী'র গল্প তিনটি এখনও গল্প-গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের আকার সুনির্দিষ্ট নয়। নষ্টনীড় বাদ দিলে বড় গল্প হইতেছে, হ্রস্বতাক্রমে—কর্মফল (২৯ পৃষ্ঠা)[৫], রাসমণির ছেলে (২৮ ৩/৮), মাষ্টার-মশায় (২৩ ১/৪), মেঘ ও রৌদ্র (২১ ৩/৪), বোষ্টমী (২১ ১/৪), সমাপ্তি (১৬ ১/২), মণিহারা (১৬ ১/৪), দৃষ্টিদান (১৬ ১/৪)। ছোট গল্প হইতেছে, দীর্ঘতাক্রমে—উলুখড়ের বিপদ (১ ২/৩), একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প (২ ১/৮), সদর ও অন্দর (২ ১/৩), উদ্ধার (২ ১/২), ফেল (২ ৭/৮), দুর্বুদ্ধি (৩ ২/৩), খাতা (৪ ১/২) ইত্যাদি॥

৪

রবীন্দ্রনাথের প্রথমপ্রকাশিত গল্প 'ভিখারিণী'[৬] বাল্যরচনা, চার পরিচ্ছেদে ভাগ করা বড় গল্প। (পরবর্তী কালের ছোট গল্পও রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়াছেন।) গল্পটির ভাব ও বিষয় সমসাময়িক কাব্যরচনার (বনফুলের ও কবিকাহিনীর) মতো। কাহিনী যতটা কাঁচা ভাষা ততটা নয়। (প্রথম হইতেই পদ্যের তুলনায় গদ্যে রবীন্দ্রনাথ বেশি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।) ভিখারিণীর রচনার একটু উদাহরণ দিই।

---

১ দর্পহরণ, মাল্যদান। ২ রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা। ৩ পয়লা নম্বর, তপস্বিনী।

৪ তোতা-কাহিনী, কর্তার ভূত। চারটি গল্পই সবুজ-পত্রে (১৩২৪) প্রথম প্রকাশিত।

৫ গল্পগুচ্ছের আধুনিকতম সংস্করণের (১৯৫৮) পৃষ্ঠামানে এই সংখ্যা ধরা হইয়াছে। এই হিসাবে নষ্টনীড় সাড়ে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা।

৬ ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র, ১২৮৯।

ঘন-বৃক্ষ বেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে; গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ-কবি বউ-কথা-কও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন কবির স্বপ্ন।

৫

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প দুইটি, 'ঘাটের কথা'[১] ও 'রাজপথের কথা'[২] কলিকাতার উজানে ও ভাটিতে গঙ্গাবক্ষে স্টীমারে ভ্রমণের ফল।[৩] গল্পবস্তু বিশেষ পুষ্ট না হইলেও রচনাতে ছোটগল্পের প্রায় সকল লক্ষণ পরিস্ফুট। দুইটি গল্পই জনসমাগমস্থানরূপ অচেতন মূক সাক্ষীর স্বগতোক্তিরূপে উপস্থাপিত এবং দুই-টিতেই বিরহিণী নারীর মৌন অন্তর্বেদনা মুখরিত। সদ্যঃপ্রিয়জনবিরহী কবি এই দুই কাহিনীর মধ্যে নিজেরই অন্তর্গূঢ় বেদনার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। গল্প দুইটি রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার দুই প্রধান সিম্বল বহন করিতেছে। ঘাট অচল, পথ সচল—কিন্তু দুইই বহমান জনজীবনস্রোতের সাক্ষী।

ভাবাবেগের দিক দিয়া গল্প দুইটি সন্ধ্যাসঙ্গীত-প্রভাতসঙ্গীতের সহযোগী॥

৬

ঘাটের-কথা ও রাজপথের-কথা লিখিয়াই রবীন্দ্রনাথ গল্পের প্রথম পালা সাঙ্গ করিয়া দিলেন।[৪] দ্বিতীয় এবং প্রধান পালা শুরু হইল সাত বৎসর পরে (১২৯৮)। হিতবাদীতে প্রথম ছয় সপ্তাহে সাতটি গল্প বাহির হইল,—'দেনাপাওনা', পোষ্ট-মাষ্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' এবং 'খাতা'।[৫]

বিবাহের পণ লইয়া বরপক্ষের, বিশেষ করিয়া বরের মায়ের নিষ্ঠুরতার কাহিনী 'দেনাপাওনা'। আধুনিক কালে ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের এই নির্মম হৃদয়-হীনতার পরিচয় সাহিত্যে এই প্রথম। ইহার পূর্বে বৌঠাকুরাণীর-হাটে কিছু আভাস আছে। তবে সে কাহিনী অতীত দিনের। প্রায় বাইশ বছর পরে

---

১ ভারতী কার্তিক ১২৯১। ২ নবজীবন অগ্রহায়ণ ১২৯১।

৩ 'সরোজিনী প্রয়াণ' (ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১২৯১) দ্রষ্টব্য।

৪ ইতিমধ্যে ছেলেদের জন্য একটি গল্প লেখা হইয়াছিল, 'মুকুট' (বালক বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)। এটি গল্পগুচ্ছে সংকলিত হয় নাই।

৫ হিতবাদীর কোন এক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুইটি গল্প বাহির হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ১৭ (পাদটীকা) দ্রষ্টব্য।

লেখা 'হৈমন্তী' গল্পে ইহারি আর এক পিঠের ছবি। দেনাপাওনায় যেমন হৈমন্তীতেও তেমনি পিতা সরলহৃদয় ও কন্যাবৎসল আর কন্যা নির্বাক স্নেহশীল ও দৃঢ়চিত্ত। দেনাপাওনার বাচনরীতিতে বিশেষত্ব আছে। বর্ণনা দ্রুতগতি, ব্যঙ্গ-মিশ্র এবং কাহিনীসর্বস্ব।

কাহিনীহীন বস্তু লইয়াও যে পরিপূর্ণ ছোটগল্প লেখা যায় তাহার নিদর্শন 'পোষ্টমাষ্টার'। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া গল্পটিকে ঘিরিয়া একটি উদাসবিধুর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। ধারামুখর বর্ষাদিন শ্যামবনানী-বেষ্টিত নদীমেখলিত ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে নূতন স্থাপিত পোষ্ট আপিস, "অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল,"—ইহার মধ্যে কলিকাতাবাসী গৃহনীড়চ্যুত নবাগত ভদ্রসন্তানের মনোভাব সহজেই কল্পনা করিয়া লইতে পারি। রতনের সঙ্গে পোষ্টমাষ্টারের আর্থিক সামাজিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য অপার হইলেও অবস্থাগতিকে দুইজনের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য সমভূমিতে মিলিত হইয়াছিল। বর্ষাপ্রকৃতিপীড়িত, স্বজনহীন নির্বাসনে স্নেহকাতর যুবকের সান্ত্বনার বস্তু ছিল অনাথ বালিকা রতনের আত্মীয়াধিক পরিচর্যা ও স্নেহবুভুক্ষা। অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে "দাদাবাবু" কিশোরী রতনের নারীহৃদয় স্পর্শ করিল। এদিকে দাদাবাবুর মন পড়িয়া আছে সুদূর কলিকাতার এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহে। রতন সেই গৃহেরই স্থলাভিষিক্ত। যতদিন ঘরে ফিরিবার সম্ভাবনা হয় নাই ততদিনই রতন ভাড়াটের মতো তাহার হৃদয়ের খানিকটা অংশ অধিকার করিয়া ছিল। কিন্তু রোগশয্যা হইতে উঠিয়া পোষ্টমাষ্টার যখন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিবার সংকল্প করিল তখন রতনকে সঙ্গে লইবার কথা একটিবারও মনে হয় নাই। নৌকায় উঠিয়া গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার মুহূর্তে রতনের জন্য সে মনে ব্যথা অনুভব করিল, এখনও মনে করিল ফিরিয়া যাই, কিন্তু সে দ্বিধা মুহূর্তের জন্য। বয়সের ধর্মে এবং শিক্ষার গুণে মনে সান্ত্বনা আনিতে বিলম্ব হইল না। "কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি! পৃথিবীতে কে কাহার!"

গল্প এইখানেই শেষ হইয়া গেল কিন্তু অবুঝ বালিকার অশ্রুসজল আর্তি যে অশ্রুত ব্যাকুল ক্রন্দনধ্বনি তুলিয়াছে তাহা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিশ্ববেদনার

সহিত মিলিত হইয়া গিয়া পাঠকহৃদয়ে একতারার মতো ঝংকৃত হইতে থাকে।

'গিন্নি' গল্পে হৃদয়হীন ইস্কুল পণ্ডিতের কাছে একটি গৃহপালিত ভীরু লাজুক বালকের রূঢ় লাঞ্ছনার বর্ণনা। কথাবস্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির আধারে প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এই বস্তুই স্বর্ণকুমারী দেবী একটি গল্পে রূপ দিয়াছিলেন।[১]

স্বার্থচিন্তায় অনুদাসীন অতিসাধারণ লোকের আচরণেও অনপেক্ষিত দৃঢ়-চিত্ততার এবং মহত্ত্বের স্ফুরণ হইতে পারে। এমনি এক নগণ্য ব্যক্তির কাহিনী 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'। পুত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে আদালতে সত্য সাক্ষ্য দিয়া আসিয়া রামকানাই ঘরে যে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল তাহার বর্ণনায় গল্পটির বজ্রকঠিন অবসান।

> গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন জ্বরবিকার উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ,—সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসারিত হইয়া গেল—আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, 'আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত'—কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

পোষ্টমাষ্টারের মতো 'ব্যবধান' গল্পেরও কথাবস্তু যৎসামান্যই। বহুকাল পরে লেখা 'হালদার-গোষ্ঠী' গল্পের সঙ্গে এই গল্পটির ভাবের কিছু মিল দেখা যায়।

সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত নির্বোধ অকর্মা অধ্যয়নপরায়ণ পণ্ডিত স্বামীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধালু মুগ্ধ নারীর প্রেমবাৎসল্য 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পটিতে অভিনব স্নিগ্ধ কারুণ্যের মেদুরতা দিয়াছে॥

৭

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা' বাহির হইল। ইহাতে সাধারণত প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্প থাকিত। প্রথম গল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'এর[২] মূল পাত্র রাইচরণের মনোবৃত্তি স্বাভাবিক কিন্তু সরল নয়। মনিবের প্রতি মমতা ও সেই সঙ্গে কর্তব্যবোধ, নিজের ছেলের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ কিন্তু মনিবের পুত্রহানির জন্য দায়ী ভাবিয়া তাহার অযৌক্তিক বিদ্বেষ—এই বিপরীতমুখী ভাবের টানাপোড়েনে পড়িয়া সে পুত্রকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শোনা যায় একদা আমাদের দেশে দৈবাৎ কোন কৃপণ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বংশীয়ের নিশ্চিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সম্পত্তি "যখ" দিয়া রাখিত। এই পৈশাচিক নিষ্ঠুর

[১] 'নবকাহিনী' দ্রষ্টব্য। [২] সাধনায় নাম 'খোঁকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন'।

ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া 'সম্পত্তি-সমর্পণ' কল্পিত। অদৃষ্টের নিষ্করুণ পরিহাস কাহিনীর পরিসমাপ্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর করিয়াছে।

সাধনায় প্রকাশিত এই প্রথম দুইটি গল্পে পুত্রবৎসল পিতার স্নেহের ভাগ্যহত পরিণাম প্রকটিত।

এক তরুণীর চিত্তে প্রেমের জাগরণ, প্রণয়ী কর্তৃক সেই প্রেমের অমর্যাদা এবং তাহার নিদারুণ প্রতিফলের কাহিনী 'কঙ্কাল' গল্পে উপস্থাপিত। গল্পটি যে কালে লেখা হইয়াছিল তখন বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের মুখে নিজের প্রণয়কাহিনী ব্যক্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইত। তাই গল্পটির বাস্তব ভূমিকায় একটু অতিপ্রাকৃত উপক্রমণিকা যোগ করিতে হইয়াছে। উপক্রমণিকাটুকুতে রবীন্দ্রনাথ বাল্যস্মৃতি হইতে উপাদান লইয়াছেন। গল্পের মধ্যে ব্যঙ্গের ঝাঁজ উপভোগ্য। কঙ্কালের নায়িকার ভাবনার সঙ্গে পরবর্তী কালে লেখা 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরি-বালার আত্মরতির কিছু মিল আছে।

'মুক্তির উপায়' ব্যঙ্গাত্মক কৌতুককাহিনী। ফকিরচাঁদের মনোভাব ও আচরণ আমাদের দেশে একেবারেই বিরল নয়। এই গল্পটি শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথ ছোট নাটকে রূপ দিয়াছিলেন।

অকৃতার্থ প্রেমের শান্ত সান্ত্বনাময় কাহিনীহীন গল্প 'একরাত্রি' একটি গীতিকবিতার মতো নিটোল ও ভাবঘন। প্রথমযৌবনের নবোৎসাহে ও উল্লাস-গরিমায় তরুণ হৃদয় ভবিষ্যতের কত না কল্পনা করে। সংসারে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেসব প্রায় বুদ্‌বুদের মতো একেএকে মিলাইয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, যখন আর কোন উপায় থাকে না তখনি সে উপলব্ধি করে তাহার হাতের কাছে যে শান্তিসুখের প্রদীপটি ছিল তাহা সে কল্পনার ফানুসের দুরাশায় কোন্‌কালে না জানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে সারাজীবন তাহারি জন্য সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিবে।

'জীবিত ও মৃত' গল্পের বিষয় একটু অসাধারণ। মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিলে কাহাকেও জীবিত বলিয়া গ্রহণ করা যে সাধারণ কুসংস্কারের পক্ষে কত কঠিন, এমন কি তাহার নিজের বোধের কাছেও কত শক্ত, তাহা এই গল্পটির করুণকঠোর কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। ভাসুরের শিশুপুত্রের প্রতি সন্তানহারা বিধবা কাদম্বিনীর স্নেহ মাতৃবাৎসল্যের চেয়েও বেশি—"পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো বেশি হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না।" কাহিনীর মধ্যে ভীতিরসের আমেজ

বালিকাই। কৈশোরসুলভ কৌতুকপ্রিয়তা, উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রাচুর্য, স্বামীর প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা—সবশুদ্ধ মিলিয়া চন্দরাকে চিরকালের কিশোরী করিয়াছে। অদৃষ্টের পাকে সে যে-অবস্থায় পড়িল তাহাতে স্বামীর ও সংসারের উপর তাহার অরুচি জন্মিল। তাহার মায়ের কথা কেবল মনে পড়িতে লাগিল। উপসংহার চমৎকার।

> জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর?"
>
> চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"
>
> ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?"
>
> চন্দরা কহিল, "মরণ!—"

'শাস্তি'—নারীচরিত্রের মৌলিক একগুঁয়েমির ও দুর্জ্জেয়তার অপূর্ব চিত্র।

মাতৃহীন বালিকা পাড়াগাঁয়ে বালকের সঙ্গে ফিরিয়া দুষ্ট ছেলের মতো চপলতা ও দৌরাত্ম্য করিয়া স্বজন-প্রতিবেশী এমন কি অভ্যাগতকেও তিক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তবুও তাহার শিশুমনে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে মুগ্ধ স্বামীর স্নেহদৃষ্টির ও সহৃদয়তার উত্তাপে তারুণ্যশ্রী ও প্রেম সঞ্চারিত হইয়া রাতারাতি তাহার হৃদয় নারীত্বে ও পত্নীত্বে জাগ্রত হইয়া উঠিল তাহাই 'সমাপ্তি'[১] গল্পের বিষয়। মৃন্ময়ীর মন যখন কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে না তখন অপূর্বর সহানুভূতি তাহার অন্তরের এমন একটি তারে ঘা দিল যাহা মৃন্ময়ীর মনে অপূর্বর প্রতি কৃতজ্ঞতার সঞ্চার করিল। তাহাতে প্রেমের পথ খুলিয়া গেল। আমেরিকান লেখক ব্রেট্ হার্টের ম্লিস্ গল্পের নাম-ভূমিকার সঙ্গে এই গল্পের মৃন্ময়ীর মিল আছে। মৃন্ময়ীর পিতা ঈশানের চকিত চিত্রে কন্যাবাৎসল্য যেন মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে।

আধুনিক কালের "শিক্ষিত" পুত্রের দৃষ্টিতে সেকালের "অশিক্ষিত" পিতার নৈতিক চরিত্র অবজ্ঞেয় হইতে পারে, কিন্তু দৃঢ়চিত্ততায় হৃদয়বত্তায় এবং সত্য-সন্ধতায় সেকেলে পিতা একেলে নীতিবাগীশ পুত্রের অনেক উপরে।—ইহাই 'সমস্যাপূর্ণ'[২] গল্পের মর্ম। বৃদ্ধ কৃষ্ণগোপাল স্নিগ্ধশান্ত সংমূর্তি,—"খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।" অছিমদ্দিনের চরিত্র খুব স্বাভাবিক। মর্জাবিবির ক্ষণিক দর্শনটুকু কাহিনীর মধ্যে একটু বিশেষ মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিপিনবিহারীর চরিত্রে ব্যঙ্গের রেশ

[১] আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০। [২] অগ্রহায়ণ ১৩০০।

নিরতিশয় উপভোগ্য। সমস্যাপূরণের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ যেন মাইকেলের প্রহসন দুইটি মিলাইয়া লইয়া নিজের মতো করিয়া গড়িয়াছেন।

কর্তব্যসম্পাদনে কঠোরহৃদয় নিঃসন্তান নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণবিধবাও যে নিতান্ত হেয় ও অস্পৃশ্য জীবের প্রতি দয়া করিয়া দেবায়তনের শুচিতা এবং পল্লীসমাজের জনমত উপেক্ষা করিবার মতো তেজস্বিতা দেখাইতে পারে, তাহাই 'অনধিকার প্রবেশ"[১] গল্পের বস্তু। সাত মাস বিশ্রামের পরে সাধনায় এই গল্পটি বাহির হইয়াছিল।

'মেঘ ও রৌদ্র'[২] বড় গল্প। কিন্তু গল্পটিতে ছোটগল্পের ভাবঘন অখণ্ডতা আছে। গিরিবালার ভূমিকা বাস্তব ও মধুর, "গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে" পাঠকের সামনে প্রথম দেখা দিয়াই একেবারে অন্তর অধিকার করিয়া বসে। বাঙ্গালা সাহিত্যে "স্বদেশী" বা "জাতীয়" আন্দোলনের সুব্যক্ত প্রতিবিম্বন এই গল্পেই প্রথম পাইলাম। পরবর্তী কালে 'গোরা" উপন্যাসের নামভূমিকায় শশিভূষণ ভূমিকার ঈষৎ ছায়া পড়িয়াছে।

মুগ্ধ স্বামিসর্বস্ব অসুন্দরী পত্নীর এবং সেই পত্নীর ধনী পিতা ও পরিজনের প্রতি লঘুচিত্ত অকর্মণ্য বৃথাগর্বিত আত্মসর্বস্ব এক যুবকের হৃদয়হীন ব্যবহার 'প্রায়শ্চিত্ত'[৩] গল্পের বিষয়। শেষের ক্লাইমাক্স্ অত্যন্ত অতর্কিত।

'বিচারক'[৪] পতিতা রমণীর বাস্তব করুণ কাহিনী। নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া যাহারা সমাজে পতিতা হইয়াছে তাহারা সব সময়ে দোষের ভাগী নয়, কিন্তু যাহারা জানিয়া শুনিয়া অপরিণতবুদ্ধি অসহায় তরুণীকে দুদিনের খেলার সামগ্রী করিয়া চিরদিনের জন্য ধূলায় লুটাইয়া দেয় এবং পরে বিচারক হইয়া সেই নিরপরাধ অবলার দণ্ডবিধান করে তাহারা কী? অদৃষ্টের এ পরিহাস নিষ্ঠুরতম।

আত্মাপরাধবোধের সঙ্গে তীব্র মানসিক আঘাতের যোগে উৎপন্ন স্নায়বিক বিকার লইয়া অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত গোছের পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে 'নিশীথে'[৫] গল্পে। এই মানসিক বিকারজাত পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে বাস্তব ও অত্যন্ত স্পষ্ট।

যাত্রার দলের, অকালপক্ব অথচ বয়সের অনুপাতে বিষয়বুদ্ধিহীন এক কিশোর নারীহৃদয়ের সস্নেহ পরিচর্যায় কেমন করিয়া স্বাভাবিক ভগিনীপ্রীতির ও মাতৃ-

---

[১] শ্রাবণ ১৩০১। [২] আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১।
[৩] অগ্রহায়ণ ১৩০১। [৪] পৌষ ১৩০১। [৫] মাঘ ১৩০১।

স্নেহের আস্বাদ লাভ করিয়া সত্যকার জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার পর স্বাভাবিক ঈর্ষা-অভিমানের ও ভ্রান্তির বশে স্নেহনীড়চ্যুত হইয়া সংসারারণ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল,—ইহাই 'আপদ'[১] গল্পের কাহিনী। নিরুদ্ধ-যৌবনোন্মেষের মনোবৃত্তি গল্পটিতে বিশেষ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। নীলকান্তর ভূমিকায় লেখকের নিজেরই ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরে লেখা 'অতিথি' গল্পের তারাপদর সঙ্গে নীলকান্তর চরিত্রের সাদৃশ্য ও বিরোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সাংসারিক স্বার্থান্ধ কুটিল নিষ্ঠুর স্বামীর ক্রূর চক্রান্ত হইতে পুত্রস্নেহভাগী শিশু ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ষীয়সী ভগিনী কর্তব্যজ্ঞানে স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া নিঃশব্দে কঠিন নির্যাতন ভোগ করিয়া অবশেষে মৃত্যুবরণ করিল।—ইহাই 'দিদি[২] গল্পের কঠিন কাহিনী। নীলমণি শশীর ভাই হইলেও তাহার প্রতি যে স্নেহ তাহা একরকম পুত্রবাৎসল্যই। এই স্নেহের জোরে গৃহস্থবধূ শশী প্রবল স্বামীর সমস্ত নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া তাহার নিষ্ঠুর গ্রাস হইতে স্নেহের ধন নীলমণিকে তাহারি কল্যাণের জন্য নিজের বক্ষ হইতে ছিনিয়া লইয়া বিদেশী রাজকর্মচারীর হস্তে অনায়াসে তুলিয়া দিয়াছিল। গল্পটির ইঙ্গিতময় উপসংহারে মূক ও উপায়হীন নারীহৃদয়ের সুগভীর ব্যথা অশ্রুহীন মর্মবেদনায় উদ্বেলিত। 'দিদি' রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নিষ্ঠুর বাস্তব গল্প। শশীর স্বামী জয়গোপালের সঙ্গে পরবর্তী কালে লেখা 'সৎপাত্র' গল্পের সাধুচরণের তুলনা চলে।

থিয়েটারের অভিনেত্রীদের মোহপাশবদ্ধ মূর্খ ধনী স্বামীর অনাদরের ফলে আত্মরত সুন্দরী তরুণী, রঙ্গমঞ্চের দীপ্তির ও অভিনেত্রীদের প্রতি বর্ষিত আদর ও করতালিধ্বনির মোহে পড়িয়া, গৃহত্যাগ করিল এবং রঙ্গমঞ্চের রানী হইয়া দর্শকের হৃদয় লুট করিয়া লইল, কেবল তাহার স্বামী সেই উৎসব হইতে বঞ্চিত রহিল।—এই কাহিনী 'মানভঞ্জন'[৩] গল্পের বিষয়। গিরিবালা ও তাহার স্বামী গোপীনাথ উভয়েরই মনোবৃত্তি বেশ স্বাভাবিক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান যাহাকে আত্মরতি-মনোবৃত্তি (Narcissus complex) বলে গিরিবালার মনে সেই ভাবই।

ব্যঙ্গ-উপহাসের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ একটি অলক্ষ্য বেদনাস্রোত 'ঠাকুর্দা'[৪] গল্পটিকে স্নিগ্ধকরুণ আভা দিয়াছে। অতীত গৌরব লইয়া প্রমত্ত, দারিদ্র্য-

---

[১] ফাল্গুন ১৩০১। [২] চৈত্র ১৩০১।
[৩] বৈশাখ ১৩০২। [৪] জ্যৈষ্ঠ ১৩০২।

দশাগ্রস্ত, প্রতিবেশীদের প্রকাশ্য সহানুভূতির ও জনান্তিক উপহাসের পাত্র, এক নাতিনী-সম্বল বৃদ্ধের সজ্ঞান আত্মপ্রবঞ্চনার সলজ্জ করুণ এবং মহৎ কাহিনী ইহার বিষয়। গল্পটির গঠননৈপুণ্য এমন অসাধারণ যে নয়নজোড়ের চৌধুরী বংশের একমাত্র বংশধর, সকলের "ঠাকুর্দা", বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র যে শঠ নয়, তাহার অতীত-গৌরবের প্রত্যক্ষবৎ আলোচনা ও তদনুযায়ী ব্যবহার যে ভণ্ডামি অথবা পাগলামি নয়, তাহা যে পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের অতিরিক্ত স্পর্শকাতর মনের আত্মসম্মান রক্ষার কবচমাত্র তাহা গল্পের উপসংহারের পূর্ব অবধি বোঝা যায় না। যাহা প্রার্থনার অতিরিক্ত এমন সৌভাগ্য লাভ করিবামাত্র ঠাকুর্দা ভড়ঙের ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া নিজের দৈন্য অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করিতে একটুও বিলম্ব করে নাই। নাতিনী কুসুম তাহার ঠাকুরদাদার ঠিক বিপরীত। গল্পে সে ঠাকুর্দার অতিরঞ্জনের ভারসাম্য করিয়াছে। বংশমহিমার সাড়ম্বর বর্ণনায় তাহার কোনই আস্থা ছিল না, তবুও মা যেমন ছেলের সকল কথায় সায় দিয়া তাহাকে ভুলায় কুসুমও তেমনি বৃদ্ধের সকল কথায় পোষকতা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিত। "বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকা"ই বৃদ্ধের সর্বস্ব। তাহারি সৎপাত্রের কামনায় ঠাকুর্দা অতীতের জীর্ণ গৌরব গায়ে জড়াইয়া চারিদিকের স্মিতমুখ বর্তমানকে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিত।[১]

'ঠাকুর্দা'র প্রায় সহযোগী গল্প (—এখানে ঠাকুর্দা অকর্মণ্য নড়ে-ভোলা নয়—) 'প্রতিহিংসা'র[২] নায়িকা ইন্দ্রাণী রূপসী, সন্তানহীনা। তাহার পিতামহের স্মৃতি, তাহার স্বামী, এবং তাহার পিতামহপ্রদত্ত ও স্বামী-উপহৃত গহনাগুলি তাহার ভালোবাসার আলম্বন। উচ্চতর প্রতিহিংসার বশে সে নিজ প্রাণপ্রিয় অলঙ্কারগুলির বদলে জমিদারের মূল্যবান্ সম্পত্তি—যাহা তাহারি পিতামহ কিনিয়া দিয়াছিলেন —তাহা উদ্ধার করিয়া প্রভুবংশকে দান করিল। সন্তানহীনা রমণীর কাছে তাহার অলঙ্কার সন্তানতুল্য, এমন কি তাহার অপেক্ষাও প্রিয়তর। এত বড় মহৎ ত্যাগ করিতে পারে মানুষ তখনি যখন সে কোন বৃহত্তর ভালোবাসার আশ্বাস ও নির্ভয়ের পরিচয় পায়। স্বামীর মহত্ত্ব এবং পিতামহের স্নেহের স্মৃতি ইন্দ্রাণীকে এই মহৎত্যাগে প্রেরণা দিয়াছিল। "বিরল শুভ্রকেশধারী, শান্ত-স্নেহহাস্যময়, ধীপ্রদীপ্ত, উজ্জ্বলগৌরকান্তি" বৃদ্ধ দেওয়ানের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় জীবন্ত করিয়া পাঠকের চোখের সামনে ধরিয়াছেন। 'মণিহারা' গল্পের মণিমালিকা

---

১ ও-হেন্‌রির Duplicity of Hargreaves গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দা'র তুলনা চলে।

২ আষাঢ় ১৩০২।

ইন্দ্রাণীর বিপরীত চরিত্র। মণিমালার স্নেহ কাহাকেও আশ্রয় করিয়া বাড়িতে পারে নাই, তাই সে মৃত্যুবরণ করিল তবু গহনার মায়া ছাড়িতে পারিল না।

'ক্ষুধিত পাষাণ'এর[১] অতিপ্রাকৃত পরিবেশ একান্তভাবে চিত্তবিকারজনিত নয়। অতীতে মোগল-রাজত্বে ভোগবিলাসপূর্ণ এক প্রাসাদের রুদ্ধদ্বারগবাক্ষ অন্তঃপুরের কক্ষে কক্ষে একদা অতৃপ্তির যে দাহ, তীব্র ভোগবিলাসের যে আকাঙ্ক্ষা, পৈশাচিক যে প্রতিহিংসা দিনের পর দিন সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই যেন জীবসত্তা লাভ করিয়া অতিলৌকিক অথচ অনুভবগ্রাহ্য প্রাণস্পন্দনময় বাতাবরণের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হইয়া উঠিত। এই পুরাতন প্রাসাদের অন্তঃপুরে বাসনাজালে আবদ্ধ দেহহীন লালসাময় রূপসীদের অদৃশ্য অবোধ প্রভাবের বশে যে সেখানে একাধিক রাত্রিযাপন করিয়াছে তাহারই শরীর-মন অল্পে অল্পে সেই প্রাসাদের মোহগ্রাসে জীর্ণ হইতে হইতে অবশেষে জীবন অথবা বুদ্ধি বিরহিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। গল্পের পাত্র —যিনি গল্পটি বলিতেছেন—তাঁহার মন তো পূর্ব হইতেই প্রাসাদে সেকালের রূপ-ঐশ্বর্যের আড়ম্বর কল্পনা করিয়া পুলকিত হইয়াছিল, এখন ভয়ে ভয়ে দুই-চার রাত্রি কাটাইবার পরই তিনি অতিপ্রাকৃতের জালে ধীরে ধীরে জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা "নব আরব্য উপন্যাস" গোছের রচনা বলিতে পারি।

সাধনায় (ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক যুক্ত সংখ্যা ১৩০১) প্রকাশিত শেষ গল্প 'অতিথি' এক জন্মপথিক উদাসী কিশোরচিত্তের সর্ববিধ স্নেহবন্ধনের প্রতি উদাসীনতার বিপুল কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের ঘরছাড়া নিরুদ্দেশ স্নেহ-বন্ধনবিমুখ কবিসত্তা তারাপদর মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে॥[২]

৮

চতুর্থ বর্ষ সমাপন করিয়া 'সাধনা' উঠিয়া গেল (অগ্রহায়ণ ১৩০২ হইতে)। গল্প-রচনায়ও কিছুদিনের জন্য ছেদ পড়িল। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ এক বছরের

[১] শ্রাবণ ১৩০২।

[২] ও-হেন্‌রির Whistling Dick's Christmas Stocking গল্পের সঙ্গে অতিথির আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য আছে। ডিক্‌ও তারাপদর মতো প্রকৃতির সন্তান, তবে তারাপদর মতো যে আজন্ম স্নেহসৌভাগ্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় নাই, সে ভবঘুরে (tramp), ভিক্ষাজীবীর মতো। তারাপদর ভয় ভালোবাসার ঘেরের, ডিকের আতঙ্ক কাজের, রুটিনের।

জন্য (১৩০৫) 'ভারতী'র সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। সেই সঙ্গে ভারতীও সাধনার আকৃতি পাইল। (এই আকার ১৩১৫ পর্যন্ত চলিয়াছিল।) সেই বছর ভারতীতে সাত মাসে সাতটি গল্প বাহির হইল। সাধনার শেষ বছরে গল্পের আয়তন সাধারণত বাড়িয়াছে, এবং কাহিনী যেন প্রোফাইল হইতে পোর্ট্রেটের দিকে ফিরিয়াছে। ভারতীর গল্পগুলিও সেই ধরনের। রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের একটি ধারা এই ভাবে উপন্যাসের দিকে আগাইয়া গিয়াছে।

ভারতীতে প্রকাশিত গল্পগুলির আরো বিশেষত্ব আছে,—রচনাভঙ্গীর অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য এবং ধ্বনিপ্রবাহের অসামান্য মাধুর্য আর ক্লাইমাক্সে প্রায়ই অদৃষ্টের পরিহাস।

ভারতীর প্রথম গল্প 'দুরাশা'।[১] প্রেমের একনিষ্ঠ অনুসরণে অদৃষ্টের বঞ্চনা গল্পটির বিষয়।[২] প্রেমের অবাঞ্ছিত পরিণতিতে আঘাত লাগে নারীহৃদয়ে বেশি পুরুষহৃদয়ে কম। নারীর প্রেমসাধনায় যে নিষ্ঠা তা পুরুষের প্রেমসাধনায় নাই। যৌবনে তেজস্বী পুরুষের পক্ষে নিষ্ঠা অবিচলিত রাখা সহজ, কিন্তু বয়োধর্মে যখন শরীর অপটু হইতে থাকে এবং মনের দৃঢ়তা কমিয়া যায়, তখন নিষ্ঠায় শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী। তেজস্বিনী নারীর নিষ্ঠা একান্তভাবে আদর্শপরায়ণ। পুরুষের নিষ্ঠার মতো দেহবলাশ্রিত নহে বলিয়া তাহা শেষ অবধি অবিচলিত থাকে। গল্পটির মধ্যে নিপুণ হিউমারের পরিচয় আছে। মোগল-সাম্রাজ্যের অস্তোন্মুখ মহিমার বর্ণচ্ছটাভাস এই গল্পটিতে স্বল্পরেখায় অথচ অতুলনীয়ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষুধিত-পাষাণেও এই ধরনের চিত্র পাই, কিন্তু সে চিত্রের পরিবেশ স্বতন্ত্র। দুরাশার ছবি আমাদের মনে স্বর্ণাভ গোধূলির করুণ মায়া বিস্তার করিয়া দেয়।

> নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈল-নগরী দার্জিলিঙের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল-সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেত-প্রস্তর-রচিত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর-রচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ,—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

---

১ বৈশাখ ১৩০৫।

২ যে প্রসঙ্গে গল্পটির কাহিনী কবির মনে প্রথম আসে তাহা বিপিনবিহারী গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩২২ পৃ ১৬)।

'পুত্রযজ্ঞ'[১] গল্পে অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা ব্যঙ্গবিজড়িত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটির অনাড়ম্বর এবং দ্রুত বর্ণনারীতির মধ্য দিয়া ব্যঙ্গ বড় তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। যৌন প্রেমের ইঙ্গিতও ইহার অসাধারণত্ব। 'নষ্টনীড়' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের কিছু সাদৃশ্য আছে। সম্পত্তি-সমর্পণের পরিণতির সঙ্গে এই গল্পের পরিণতি তুলনীয়।

'ডিটেক্‌টিভ'[২]এর সরসতা উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ভূতের গল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখেন নাই। এটি কতকটা ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্যারডির মতো।

রোমান্‌স ও হিউমারের অপূর্ব সংযোগ 'অধ্যাপক'[৩] গল্পটি সমুজ্জ্বল। গল্পটি যাহার আত্মকথা সেই কলেজে-পড়া ছেলের অপক্ক বুদ্ধির ও আত্মাভিমানসর্বস্ব মনোবৃত্তির প্রতিফলন নিখুঁত।

যে-শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোক একদা সরকারী খেতাবের মোহে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া সাহেব-সমাজকে সেলাম বাজাইয়া এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষ্যে গভর্নমেণ্ট-সংপৃক্ত ব্যাপারে মোটা টাকা চাঁদা দিয়া পরম গৌরব বোধ করিত সেই সমাজেরই একটি শিক্ষিত যুবকের সরল ও সরস কাহিনী 'রাজটীকা'।[৪] স্বদেশী-আন্দোলন লইয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গল্প। ইহাতে যেন মেঘ-ও-রৌদ্রের উল্‌টা পিঠ।

'মণিহারা'[৫] গল্পে একটি একনিষ্ঠ এবং কতকটা নিরুদ্ধ হৃদয়ের একতরফা প্রেমের কাহিনী অলক্ষ্যে অতি স্বাভাবিকভাবে অতিপ্রাকৃতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। গল্পটিতে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এত নিপুণ, এবং "ভৌতিক" রস এত জমাট যে সমস্ত কাহিনীটি প্রত্যক্ষের মতো জলন্ত। কাহিনীতে বাস্তবতার কিছু স্পর্শ আছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথ এককালে পাটের ব্যবসায়ে নামিয়াছিলেন এবং তাহাতে বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়াছিলেন।

মণিমালিকার মনোবৃত্তির সহিত প্রতিহিংসা গল্পের ইন্দ্রাণীর মনোভাবের কিছু মিল আছে। উভয়েই নিঃসন্তান, উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয়। কিন্তু ইন্দ্রাণীর মন মণিমালিকার মনের মতো স্নেহবৃত্তির অধৃষ্য নয়। তাহার পিতামহের স্নেহের

---

[১] জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। সূচীপত্রে লেখকের নাম ছিল সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২] আষাঢ় ১৩০৫। [৩] ভাদ্র ১৩০৬। [৪] আশ্বিন ১৩০৫।
[৫] অগ্রহায়ণ ১৩০৫। যে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই "ভূতের গল্প"টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা বিপিনবিহারী গুপ্তের রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে (মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৫ পৃ ১৬) দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি, তাহার স্বামীর সুগভীর ভালোবাসা তাহার চিত্তকে স্নিগ্ধসরস করিয়া রাখিয়াছিল। নায়ক ফণিভূষণের অন্তঃসলিল প্রেম কতকটা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের প্রেমের মতো।

এক বুদ্ধিমতী পতিব্রতা ভক্তিমতী সরলহৃদয় নারীর প্রেমের ও নম্রতার কাহিনী 'দৃষ্টিদান'।[১] রবীন্দ্রনাথের খুব কম গল্পেই এমন সর্বাংশে আনন্দময় পরিসমাপ্তি দেখা যায়। অনেক কাল পরে সবুজপত্রের কোন কোন গল্পে উপন্যাসে যেমন গভীর আত্মবিশ্লেষণ দেখা গিয়াছিল এই গল্পে তাহার পূর্বাভাস পড়িয়াছে। দৃষ্টিদানে রবীন্দ্রনাথ অন্ধের যে নিপুণ মনোবিকলন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত।

> এখন মনে হইতে লাগিল দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে।

১৩০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প বাহির হয় নাই। ১৩০৭ সালে পাঁচটি গল্প বাহির হইয়াছিল—দুইটি 'প্রদীপ' পত্রিকায় আর তিনটি ভারতীতে। আরও তিনটি গল্প এই সালে লেখা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি ॥[২]

৭

১৩০৭ সালে লেখা গল্পগুলিতে আবার যেন সাধনার প্রথম দিকের লঘুতা ও তীক্ষ্ণতা আরও লঘু আরও তীক্ষ্ণ হইয়া নূতনভাবে দেখা দিল।

কাহিনীবর্জিত ব্যঙ্গাত্মক ক্ষুদ্র 'সদর ও অন্দর'[৩] গল্পটিতে নারীমানসের দোলাচল-বৃত্তির গূঢ় রহস্য এবং পুরুষপ্রকৃতির বিপরীতপ্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। বিপিনকিশোরের ট্রাজেডি গভীর ও অবোধ। কর্তা ও গিন্নীর পর্যায়ক্রমে অনুরাগ ও বিরাগ বাড়াইয়া ধনিবংশের নিঃস্ব সন্তান এই নিতান্ত ভদ্র ও সরল চিত্ত গুণী ব্যক্তিটি কারণ না বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। অবশেষে যখন আশ্রয় ছাড়িতেই হইল তখনো সে অনেক ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারে নাই, কি অপরাধে সে রাজা-বন্ধুর সখ্য হারাইয়াছে। অগত্যা বিপিনকিশোর

> দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন এবং বৃহৎ

১ পৌষ ১৩০৫। ২ যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ ও প্রতিবেশিনী

৩ প্রদীপ আষাঢ় ১৩০৭।

সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন…যাইবার সময় রাজভৃত্য পুঁটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

সন্দিগ্ধচিত্ত স্বামীর হাতে পড়িয়া এক দৃঢ়চিত্ত আত্মসমাহিত স্বল্পভাষিণী সুন্দরী তরুণী অবস্থাগতিকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল—এই সাধারণ ঘটনা 'উদ্ধার'[১] গল্পে অল্প আয়োজনে জমিয়া উঠিয়াছে। গৌরীর চরিত্র মহামায়া গল্পের মহামায়ার সঙ্গে এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীর সঙ্গে তুলনীয়। পরেশের ভূমিকা পরবর্তী কালের সৎপাত্র গল্পের সাধুচরণের ভূমিকার মতো।

নিতান্ত সাংসারিক এবং বেপরোয়া ব্যক্তির হৃদয়ে সুগুপ্ত সন্তানবাৎসল্যের অকাল আবির্ভাব এবং সেইহেতু তাহার সাংসারিক ক্ষতির কাহিনী 'দুর্বুদ্ধি'[২]র বিষয়। মনের নীচতার এবং নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নবজাগ্রত স্নেহের স্নিগ্ধতার ও ধর্মজ্ঞানের সংঘর্ষের ছবি অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ে পুলিসের যে হৃদয়হীন অকথ্য অত্যাচার ও প্রতিশোধস্পৃহা অনির্বিচারে রাজত্ব করে তাহার মর্মান্তিক বাস্তবচিত্র এই গল্পে পাই। দুর্বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় নিষ্ঠুর বাস্তব গল্প।

'ফেল্'[৩] সরসমধুর মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী। জ্ঞাতি-ভাইয়ের উপর ঈর্ষালু যথেচ্ছাচারী অশিক্ষিত যুবকের অব্যবস্থিতচিত্ততার হাস্যকর পরিণাম এবং বড়োলোকের মোসাহেবের দুর্গতি এই ক্ষুদ্র গল্পটিতে অত্যন্ত নিরাভরণ ও সহজ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নলিনের পরাভিমতপ্রেক্ষী শিশুসুলভ দোলাচলচিত্তবৃত্তি বোধ করি কাহারো অপরিচিত নয়।

> সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কা ছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না, পাছে আরো ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর কাহারো ভাগ্যে জোটে।

অবিমৃষ্যকারিতার বিষম ফলভোগ হইতে ঘটনাচক্রে উদ্ধার পাইবার কাহিনী 'শুভদৃষ্টি'[৪]। বয়স যখন কাঁচা থাকে তখন অবাঞ্ছিত জোটনা হইতে বাঞ্ছিত ফলাহরণ অসম্ভব হয় না। যে সুন্দরী মেয়েটিকে বিবাহ করিতে গিয়া অন্য মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঘটিবার ফলে কান্তিচন্দ্রের দারুণ মনোবেদনা হইয়াছিল সে মেয়েটি হাবা কালা। —এই কথা শুনিয়াই কান্তিচন্দ্রের "দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিষগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।" তৎক্ষণাৎ বধূর প্রতি তাহার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল।

---

১ ভারতী শ্রাবণ ১৩০৭। ২ ভারতী ভাদ্র ১৩০৭। ৩ ভারতী আশ্বিন ১৩০৭।
৪ প্রদীপ আশ্বিন ১৩০৭।

এক প্রতিবেশিনী বিধবা বালিকার সহিত বেনামী প্রণয় করিয়া অদৃষ্টের পরিহাসে ঠকিবার সরস কাহিনী 'প্রতিবেশিনী'। বিচারক গল্পে বিধবা প্রতিবেশিনীর সহিত প্রণয়ের এবং তাহার পরিণামের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা এই চিত্রের বিপরীত।

আমাদের দেশে এক সময়ে বিবাহসভায় কন্যাপক্ষের উপর জুলুম করা বরপক্ষের যেন দস্তুর ছিল। এখনো কোনো কোনো অঞ্চলে অভদ্র জুলুমবাজি অপরিচিত নয়। এমনি অত্যাচারের একটি কাহিনী লইয়া 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' লেখা। ধনিবংশের নিঃস্ব সন্তান যজ্ঞেশ্বরের ও তাঁহার পিসিমার ভূমিকা চমৎকার। গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদের সহৃদয়তা গল্পের স্বাদ বাড়াইয়াছে।

জমিদার-নায়েবি শাসনের এক অত্যন্ত ক্রূর বাস্তব চিত্র আঁকা হইয়াছে 'উলুখড়ের বিপদ'এ। আকারে এটি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ছোট গল্প। সামনে পদানত ভৃত্য, পিছনে সাজ্যাতিক শত্রু—এইরূপ কুটিল চরিত্র হইতেছে বাবুদের নায়েব গিরিশচন্দ্র বসুর। একটি অল্পবয়সী দাসী গিরিশচন্দ্রের কবল হইতে পলাইয়া গ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ হরিহর ভট্টাচার্যের শরণ লয়। এই অপরাধে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র তো গেলই, উপরন্তু পৈতৃক ভিটাও ছাড়িতে হইল। উকিলের বিশ্বাসঘাতকতায় যেদিন জজকোর্টের আপিলে ব্রাহ্মণের হার হইল তাহার পরদিন নায়েব মহাশয়

> লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায় কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল—প্রভু, তোমারি ইচ্ছা।

উলুখড়ের-বিপদ রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ নিষ্ঠুর বাস্তব গল্প॥

৮

'নষ্টনীড়'[১] আকারে ছোট উপন্যাসের মতো হইলেও অর্থাৎ আকারে ছোট না হইলেও প্রকারে গল্পই, এবং সেই হেতু গল্পগুচ্ছের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই গল্পটিতে এবং সমকালীন 'চোখের বালি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে যে-সামাজিক সম্পর্ক লইয়া নরনারীর মধ্যে বিপদ ঘটিবার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকে তাহা অত্যন্ত সাবধানে এবং সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। দুই কাহিনীতেই দেবর-ভাজের সম্পর্ক। চোখের-বালিতে ভাজ বিধবা, নষ্টনীড়ে ভাজ সধবা কিন্তু

১ ভারতী বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ ১৩০৮। হিতবাদী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে (১৩১১) প্রথম সংকলিত।

স্বামীর প্রতি উদাসীন। কাহিনী দুইটির সূক্ষ্ম চিত্রণরেখা, মানসদ্বন্দ্বের বুনানি ও বচনরচনার কারুদক্ষতা তখনকার পাঠকসাধারণের বোধগ্রাহ্য ছিল না বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দুর্নীতিপ্রচারের অভিযোগ শুনিতে হইয়াছিল। যে-দেশের গীতি-কাব্যে[1] আবহমান কাল হইতে দেবর-ভাজের সম্পর্ক লইয়া গ্রাম্য রসিকতার ও অশোভন ইঙ্গিতের কখনো কমতি নাই সে-দেশে মানস-নীতিধর্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নির্দোষ কাহিনী দুইটির নিরর্থক অপবাদ দুর্বোধ্য বটে।

অমলের স্নেহ লইয়া চারু-মন্দার সংঘর্ষের পূর্বাভাস 'অতিথি'তে চারু-সোনামণির ভূমিকায় পাইয়াছি। 'আপদ'এ কিরণ-সতীশের মধ্যে যে সম্পর্ক নষ্টনীড়ে চারু-অমলের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক, তবে শেষের গল্পে দেবর স্বামীর সহোদর নয়। এবং স্বামীর হৃদয়ে স্থান না পাইয়া চারুর চিত্ত যে আপনার অজ্ঞাতসারে অমলের প্রতি ধাবিত হইতেছিল,—তাহাও শুদ্ধ দেবরপ্রীতি অথবা সৌভ্রাত্র্যসখ্য নয়। চোখের-বালিতে বিনোদিনী সংসারাভিজ্ঞ, কতকটা জ্ঞান-পাপিনী; মহেন্দ্র মেরুদণ্ডহীন, দুর্বলচিত্ত; বিহারী সংযত, দৃঢ়চিত্ত। আর নষ্টনীড়ে চারু সরলহৃদয়, অপাপবিদ্ধ; অমল কৌতুকপ্রবণ, সরলমন। বিহারীর অসাধারণ ধৈর্য ও সংযম এবং অমলের ভ্রাতৃভক্তি ও কর্তব্যাকর্তব্যবোধ শেষ পর্যন্ত বাঁচাইয়া দিয়াছে। ভূপতি-চারুর মধ্যে যে স্নেহ-ভক্তি তাহা সুকুমার ও মধুর। ভূপতির অসংসারিক উদার আত্মসমাহিত চরিত্রের ট্রাজেডিটুকু সূক্ষ্মকণ্টকের মতো বড়ো বেদনানায়ক। তাহার কাছে চারুর অকথ্য বিরহ-বেদনা যেন কিছু ভারহীন হইয়া গিয়াছে॥

৯

স্বসম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্পের মধ্যে প্রথম হইতেছে 'সৎপাত্র'[2]। এটি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম নিষ্ঠুর বাস্তব গল্প। চোখেরবালি সমাপ্ত হইবার পরে গল্পটি লেখা হইয়াছিল। সৎপাত্র গল্পগুচ্ছে সংগৃহীত হয় নাই।[3] বাড়ীর বাহিরে মৃদুবাক্ ভালোমানুষ, বাড়ীর ভিতরে

---

[1] গাথাসপ্তশতী ১-২৮; আর্যাসপ্তশতী ৩০২; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। [2] পৌষ ১৩০৯।

[3] গল্পটি ইতিপূর্বে কোন সমালোচকের চোখেও পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমার এই উক্তির প্রতিবাদে বলেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫ পৃ ৩০০) যে গল্পটির কাঠামো জ্যেষ্ঠা কন্যার রচনা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করিতে দেন নাই। কিন্তু রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাত যে চৌদ্দ আনার কম নয় তাহা বোঝা যায় মাধুরীলতা দেবীর পরবর্তী কালে প্রকাশিত গল্পগুলি হইতে, যদিচ সেখানেও রবীন্দ্রনাথের সংশোধন আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

নিষ্ঠুরভাষী অত্যাচারী সন্দিগ্ধচিত্ত পল্লীবাসী চাষী গৃহস্থ সাধুচরণের প্রথম দুই পত্নী সন্দেহজনকভাবে অকালে দেহত্যাগ করে। তৃতীয় পত্নী কিশোরী বিমলাও কি ভাবে সপত্নীদ্বয়কে অনুসরণ করিয়াছিল তাহাই এই মিতভাষিত গল্পের বিষয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন শোভনভাবে বর্ণিত ও সংযত অথচ ব্যঙ্গদীপ্ত নিষ্ঠুর বাস্তব কাহিনী আর নাই। স্বল্পরেখায় অঙ্কিত বলিয়া সৎপাত্রের নিষ্ঠুর বাস্তবতা 'উলুখড়ের বিপদ'এর তুলনায় আরও ঘনীভূত। বিমলার চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই গল্পটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোন গল্পে-উপন্যাসে এমন নির্জলা পাষণ্ড ভূমিকা পাই নাই। সাধুচরণ পাষণ্ড, তবে সে মানুষ এবং স্বভাব-সঙ্গত। বনমালীর ভূমিকাও স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

অল্পস্বল্প ইংরেজী শিখিয়া এবং জাতীয়তার ভাণ করিয়া যে-শ্রেণীর কূটবুদ্ধি ব্যক্তি মোকদ্দমার তদ্বির ও ঝগড়া-বিবাদে মাতব্বরি ফলাইয়া এবং সংবাদপত্রে কাজে-অকাজে পত্রাঘাত করিয়া ও সংবাদদাতা সাজিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে তাহারি নিখুঁত আলেখ্য এই গল্পটির অসাধারণ আকর্ষণ। সাধুচরণের "পাড়ায় ভোলানাথ বলিয়া একটি এফে-ফেল যুবক বেকার বসিয়া আছে, সেই ভদ্রলোক নানা কৌশলে এই ভদ্রলোকটিকে বিচারের বজ্রমুষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া পল্লীর সাধুবাদভাজন হইয়াছে।" বিমলার বেলাতেও ভোলানাথই সাধুচরণকে উদ্ধার করিল।

> ভোলানাথের কথা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা। পুলিশের ঘুষ এবং অন্যায় অত্যাচারের সম্বন্ধে তিনি অনেক লেখনী ক্ষয় করিয়াছেন।
>
> রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার দ্বারে ঘা পড়িল। সাধুচরণের চাদর হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার বাক্সর মধ্যে কিছু টাকা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।
>
> পরদিন রাষ্ট্র হইল, সাধুচরণের যুবতী স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। বিমলার পিতা অবিশ্বাস প্রকাশপূর্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া দোহাই দিয়া পড়িলেন। কিন্তু এবারেও এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রলোককে রক্ষা করিল। ভোলানাথ পরোপকারী। সে নিজের জন্যও উপায় করিতে জানে।
>
> অনতিবিলম্বে অনেকগুলি বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যাবৎসল পিতারা সৎকুলীনের মর্যাদা বোঝে।
>
> স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'।

সৎপাত্রের বাচনভঙ্গি দ্রুতগতি এবং কাটাছাঁটা। এবিষয়েও গল্পটির অসাধারণত্ব।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাহিত্যযশঃপ্রার্থিতা লইয়া প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ

সরস কাহিনী হইতেছে 'দর্পহরণ'[১]। পত্নীর নীরব ত্যাগস্বীকার পতিকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তি দেওয়ায় গল্পটির পরিণতি শোকাবহ হইতে পারে নাই।

'মাল্যদান'[২] একটি করুণ মৃদু প্রেমের কাহিনী। এক কিশোরী বালিকার অপরিণত মন যে কেমন করিয়া প্রেমের মৃদুস্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটায় বিকশিত হইয়াই চিরতিমিরে ডুবিয়া গেল তাহাই এই গল্পটিতে সহজভাবে বিবৃত হইয়াছে।

'কর্মফল'[৩]এর আকার বড় এবং নাটকের মতো কথোপকথনের দ্বারা বিধৃত, অনেকটা প্রজাপতির-নির্বন্ধের ধরনের। এটিকে নাট্য-গল্প বলিতে হয়। (পরে এটিকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দিয়াছিলেন।) বিদ্যাসাগরের[৪] ভুবনের মাসির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়িলে যেমন হইতে পারিত এই গল্পে যেন তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়॥

১০

কর্মফল বাহির হইবার পর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল রবীন্দ্রনাথের কোন গল্প বাহির হয় নাই। ১৩২১ সালের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চারিটি মাত্র গল্প বাহির হইয়াছিল,—'মাষ্টারমশায়', 'গুপ্তধন', 'রাসমণির ছেলে' এবং 'পণরক্ষা'।

এক ধনী স্বেচ্ছাচারী বালকের মায়ায় বদ্ধ হইয়া অদৃষ্টবঞ্চিত স্নেহশীল মাতৃপরায়ণ দরিদ্র ভদ্র যুবকের ব্যর্থজীবনের অত্যন্ত শোকাবহ এবং মহৎ কাহিনী 'মাষ্টারমশায়'[৫] গল্পে অভিব্যক্ত। হরলালের মতো ছেলে এদেশে এখনও দুর্লভ নয়। তাহাকে মফঃস্বলবাসী নিম্নমধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের ছেলের টাইপ বলিয়া নেওয়া যায়। দেশের দীন যুবত্বের প্রতীক বলিলেও চলে।

> বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফঃস্বলের এনট্রেন্স স্কুলে কোনো মতে এনট্রেন্স পাশ করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুখাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকারিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

---

[১] বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১৩০৯। [২] বঙ্গদর্শন চৈত্র ১৩০৯। [৩] কুন্তলীন পুরস্কার ১৩১০।
[৪] বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের শেষ পাঠ।
[৫] প্রবাসী আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩১৪। কাহিনীটি প্রথমে "ভূতের গল্প" বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল (মানসী ও মর্মবাণী ফাল্গুন ১৩২৪ পৃ ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য)।

মাষ্টারমশায় গল্পটিকে মাতৃপরায়ণী গীতা বলিতে পারি। যে-মায়ের স্নেহ ধ্রুবতারা হইয়া তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, যে-মায়ের বাৎসল্যে সে জীবনের চরম শ্রেয় উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিল, এখন শেষ মুহূর্তে অবাধ মুক্তির ক্ষণে সুবিপুল আনন্দে হরলালের মগ্ন চৈতন্যে যেন সেই-মাতৃমূর্তি বিশ্বরূপ ধরিল।

> হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের মাতৃস্নেহসৌভাগ্য তেমন হয় নাই, তাই তাঁহার কাব্যে মানবী মাতৃমূর্তি প্রকট নয়, তাঁহার মাতৃস্নেহকল্পনা একদা বসুন্ধরা-মূর্তিতে ভাবার্পিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, "মা যে কী জিনিষ জানলুম কই আর। তাই তো তিনি আমার সাহিত্যে স্থান পেলেন না।"[১] একথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তাহার প্রমাণ 'মাষ্টারমশায়' এবং 'রাসমণির ছেলে'। গল্প দুইটিতে বিশ্বমায়ের প্রতিমার প্রতিষ্ঠা।

গল্পের অতিপ্রাকৃত উপোদ্‌ঘাতটুকু চমৎকার। যে সুতীব্র হৃদয়বেদনা দুঃসহ অপমান অপরিসীম মাতৃবাৎসল্য অনুভব করিতে করিতে হরলালের আত্মা দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিল তাহাই যেন ঠিকাগাড়ীর সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে সদ্য-বিলাতফেরত বেণুগোপালের অবচেতন মনের কোণে সুপ্ত স্নেহের স্পর্শ পাইয়া মুহূর্তের জন্য সজীব সত্তা লাভ করিয়াছিল।

'গুপ্তধন'[২] গল্পটিতে বিশুদ্ধ ধনলিপ্সার পরিণাম যে কেমন ভয়াবহ হইতে পারে তাহাই দেখানো হইয়াছে। এটি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র মিস্ট্রি গল্প (—ডিটেকটিভ নয়—) বলা যায়।

'রাসমণির ছেলে'[৩] আকারে ক্ষুদ্র উপন্যাসের মতো। এত বড় মর্মান্তিক ট্রাজিক গল্প যে-কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। এক কর্মিষ্ঠ

---

[১] 'ঘরোয়া' পৃ ।/০ দ্রষ্টব্য।

[২] ভারতী চৈত্র ১৩১৫।

[৩] ভারতী আশ্বিন ১৩১৮।

সংসারাভিজ্ঞ বধূ একদা ধনী অধুনা নিঃস্বপ্রায় বিরাট সংসারের ও নিতান্ত অকর্মণ্য নিরীহ স্বামীর ভার লইয়া এবং পরিশেষে জীবনের একমাত্র ভরসা পুত্রের বিয়োগবেদনা বক্ষে চাপিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া গেল।—ইহাই গল্পটির কাহিনী।

প্রধান ভূমিকা তিনটির মনঃপর্যটনে ও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কালীপদর বালকসুলভ সাধারণ মনোবৃত্তি তাহার মায়ের প্রভাবে ও উপদেশে সর্ববিধ ত্যাগ অনায়াসে স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছিল। এইখানে মাষ্টারমশায়ের হরলালের সহিত তাহার পার্থক্য। হরলালের হৃদয়বৃত্তি আশৈশব নিপীড়িত, শুধু তাহার মায়ের নীরবস্নেহই তাহার মনের জোরের একটিমাত্র অনিরুদ্ধ উৎস ছিল। কালীপদ বাপের ও মায়ের ভালোবাসা তো পাইয়াই ছিল, অধিকন্তু তাহার পিতা নিজের জীবনের যে নৈরাশ্যকরুণ দিকটা সর্বদা গোপন করিয়া চলিতেন তাহাও তাহাকে সুগভীর বেদনা দিয়া অকালে অভিজ্ঞ ও মনে মনে সংসারভার-পীড়িত করিয়াছিল। স্বর্ণমৃগ গল্পে বৈদ্যনাথের বড় ছেলের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ছবিতে যেন কালীপদর পূর্বচ্ছায়া পড়িয়াছিল।

'পণরক্ষা'[১] মাষ্টারমশায় ও রাসমণির-ছেলের সমপর্যায়ের গল্প। মাষ্টার-মশায়ে মাতৃ-অনুরক্তি মাতৃশরণ্য ও ছাত্রবাৎসল্য, রাসমণির-ছেলেতে স্বামি-বাৎসল্য পুত্রবাৎসল্য ও মাতাপিতৃ অনুরক্তি, আর পণরক্ষায় অনুজবাৎসল্য ও অগ্রজ-অনুরক্তি। পণরক্ষায় রসিক বংশীর ছোট ভাই হইলেও তাহার প্রতি বংশীর স্নেহ মাতৃস্নেহেরই সমপর্যায়ের॥

১১

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের শেষের দিকে 'সবুজ পত্র' বাহির হয়। এই পত্রিকা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ গল্পলেখায় নূতন প্রেরণা পাইলেন। সবুজ পত্রের প্রথম বর্ষে সাত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সাতটি গল্প প্রকাশিত হইল।[২] এই গল্পগুলির রচনারীতি নূতনতর, বিষয়েও যথেষ্ট বৈচিত্র্য, এবং সবগুলির মধ্যদিয়া একটি ক্ষীণ সুর টানা বাজিয়া চলিয়াছে। সে হইল বুদ্ধির দোষে, ভালোবাসার ও স্বভাবের বশে অথবা ঘটনার গতিকে মনের অমিল কিংবা ভালোবাসার প্রত্যাখ্যান।

---

[১] ভারতী পৌষ ১৩১৮।

[২] 'গল্প-সপ্তক' নামে সংকলিত (১৯১৬), অধুনা গল্পগুচ্ছে সন্নিবিষ্ট।

'হালদার-গোষ্ঠী' গল্প মামুলি পারিবারিক অভ্যাসের এবং সাংসারিক জ্ঞানের সহিত ভাবুক, প্রবল স্নেহশীল উদার ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ ও পরাজয়ের কাহিনী। বাঙ্গালী সংসারের অন্তঃপুরের ব্যবহারের সহিত অপরিচিত, সরল, তেজস্বিনী, লেখাপড়া জানা তরুণী সংকীর্ণচিত্ত অনুদার শ্বশুরালয়ের নিঃস্নেহ আবেষ্টনে নির্বাক মনোভঙ্গে পীড়িত হইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িল।—ইহাই 'হৈমন্তী' গল্পের কাহিনী। দেনা-পাওনা গল্পের সঙ্গে এই গল্পটির কিছু মিল আছে। কাবুলিওয়ালার উপসংহার রূপেও নেওয়া যায়। বর্ণনার রীতি গল্পটিকে যেন বেদনাময় সজীব রূপ দান করিয়াছে।

> বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি.এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী?
>
> সে তো বটেই! দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালবাসি। তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

হৈমন্তীর প্রকৃতি তাহার শ্বশুরবাড়ীর লোকের কাছে অবোধ্য ছিল, তাই সরল সত্যসন্ধ বালিকার দোষ তাহারা পদে পদে দেখিতে পাইত। এই সর্বক্ষণ বিরুদ্ধতার বিষবাষ্পে হৈমন্তীর যেন শ্বাসরোধ হইতেছিল। হঠাৎ একদিন স্বামী অপূর্বর চোখে হৈমন্তীর মনের গভীর বেদনা ছবির মতো প্রত্যক্ষ হইল।

> আমার ঘরের সমুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে দেওয়া এক একটা জানালা। দেখি তাহারই জানালায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।
>
> কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেওয়ালের উপরে হেলানো খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

হৈমন্তীর পিতার ভূমিকা যেন 'চতুরঙ্গ'এর জ্যাঠামশাইয়ে অন্যরকম পরিণতি পাইয়াছে।

'বোষ্টমী' গল্পে প্রেমের এক অপূর্ব রূপ উদ্ভাসিত। প্রেম যখন একাগ্র হয় তখন কোন কিছু ত্যাগ করা কঠিন হয় না। এই অত্যন্ত বাস্তব গল্পটিতে নিরতিশয় সংযত ও সংক্ষিপ্ত রেখায়, বোষ্টমীর নিতান্ত অসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পটিতে বোষ্টমীকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও

সাধনার যে সুগভীর তাৎপর্য ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের নিজের অধ্যাত্মভাবনার মিল আছে। "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ,"—বৈষ্ণব-সাধনার এই মূলকথা। বোষ্টমীর এবং তাহার মতো সাধকদের সাধনাও সেইমতো। স্বামীর নীরব ভালোবাসা ও শিশুপুত্রের ব্যাকুল অনুরক্তি,—তাহার চিত্তে ফলকামনাহীন ভালোবাসার পথ দেখাইয়াছিল, তাই এই দুইজনের ভালোবাসাই তাহার গুরু। আর যাহা তাহাকে ঘর ছাড়াইয়া পথে বাহির করিয়াছিল, সে ভালোবাসা নয়—মোহ। এ মোহকাহিনী রবীন্দ্রনাথ উহ্য রাখিয়াছেন—কেননা সেহ বাহ্য। মোহ মিলাইয়া গেলে ছাড়িয়া-আসা দুইজনের সত্য ভালোবাসা তাহার অন্তরে আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

> পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর নয়।

বোষ্টমীর স্বামীর চিত্রটুকু বড় মধুর।

> আমার স্বামী বড় সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।...আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।...
>
> রাত্রে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গ হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সে আঁধারে এক একদিন তাঁহার মুখে একটা আধটা কথা হঠাৎ শুনিয়া বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

গুরুদেবের চরিত্র-চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত সংযম দেখাইয়াছেন। এই সঙ্গে উদ্ধার গল্পের গুরুর চরিত্র তুলনীয়। চতুরঙ্গে লীলানন্দ স্বামীর ভূমিকা কতকটা এইরকম, তবে বিস্তৃততর। কিন্তু এতটা পরিস্ফুট নয়।

অল্পস্বল্প বাস্তব চরিত্র অথবা ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের সূত্র যোগাইয়াছে, কিন্তু সে বাস্তব বস্তুর সঙ্গে কাহিনীর সম্পর্ক সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ নয়। দুই একটি যে ব্যতিক্রম আছে বোষ্টমী তাহার মধ্যে একটি।[১] বোষ্টমী মানুষটি

[১] রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়—সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।"

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাই দীর্ঘকালেও তিনি বোষ্টমীর কথা ভুলেন নাই।[১] গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা অনেকখানি বলিয়াছেন। এমন স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ জীবনস্মৃতি ছাড়া অন্যত্র পাই না।

বোষ্টমী লেখাপড়ার শিক্ষা পায় নাই, বেদবেদান্ত-উপনিষদ্ শুনে নাই, যোগাভ্যাস করে নাই। তাহার চিত্তে সত্যের যে আবির্ভাব, সে তো আপনিই ঘটিয়াছে। যিনি বর—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ", সে সুন্দর বরণীয়কে বোষ্টমীর ভালোবাসাই প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার যো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য্য প্রণালী।

সন্তানহীন, স্নেহশীল, বৃহৎপরিবারের এক বধূ মাতাপিতৃহীন অনাথ লাঞ্ছিত অসুন্দরী বালিকাকে স্নেহ করিয়া এবং তাহার ভক্তি ও প্রীতি পাইয়া ধন্য হইয়াছিল।—ইহাই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বস্তু। সংসারের নির্মম উদাসীনতার মধ্যে বিন্দুকে আশ্রয় দিয়া এবং ভালোবাসিয়া তবে সেই ভালোবাসার দীপ্তিতে মেজ-বৌ সংসারের ক্লিষ্ট ও ক্লিন্ন পরিধির বাহিরে নিজের স্বরূপ ও মহিমা উপলব্ধি করিল। নিজের লাঞ্ছিত জীবন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এবং তাহার ভালোবাসার একমাত্র পাত্র মেজ-বৌকে শাস্তি দিবার জন্য বিন্দু যেদিন আত্মঘাতিনী হইল[২] সেদিনে মেজ-বৌয়ের শিথিল গৃহবন্ধন আপনিই খসিয়া পড়িল।

> সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজ্‌ল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধ্‌ল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ জগতের মধ্যে যা-কিছু সবচেয়ে তুচ্ছ তাই সবচেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন?

বোষ্টমীর সঙ্গে এই গল্পের মর্মের মিল আছে। স্বার্থহীন ভালোবাসা বন্ধন সৃষ্টি করে না, সংসারের ও সমাজের মিথ্যা জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করায়। ইহাতে সংসার হইতে মানুষের সত্যকার মুক্তি।

---

১ 'বনবাণী' কাব্যের ভূমিকা এবং 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' (১১, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬) দ্রষ্টব্য।

২ সমসাময়িক একটি মর্মন্তুদ ঘটনা—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে রেহাই দিবার উদ্দেশ্যে কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া বালিকা স্নেহলতার পুড়িয়া মরা—দেশে প্রভূত আলোড়ন তুলিয়াছিল।

সবুজপত্রে স্ত্রীর-পত্র প্রকাশিত হইলে পর সাহিত্যিক ও পাঠকসমাজে কিছু গুঞ্জন উঠিয়াছিল। সহরবাসী বাঙ্গালী ভদ্রঘরের অন্তঃপুরের সংকীর্ণ ও নিরানন্দ পরিসরের ভাবছবি এই গল্পটিতে উপস্থাপিত এবং স্ত্রীলোকের স্বাধীন অধ্যাত্মসত্তার ও সাধনার দাবি স্বীকৃত। একথা গতানুগতিকদের অভিমতের বিরুদ্ধে। তাই ইহারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া নারীপ্রগতির উদ্দাম আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া আতঙ্ক বোধ করিলেন। কিন্তু ইহারা বুঝিলেন না যে সংসারে মেজ-বৌরা একেবারেই সুলভ নয়, এবং কোন দেশে কোনকালে কোন সমাজবন্ধন কোন সংসারশৃঙ্খল কখনো এই মেজ-বৌদের ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

গল্পের নায়ক নকল সাধুতার আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া পরে আত্মাভিমানের বশে ও অসাধু চাটুকারের প্ররোচনায় পরম স্নেহাস্পদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করিয়াছিল।—ইহাই 'ভাইফোঁটা' গল্পের বস্তু। অপরদিকে গল্পটি নীরব প্রেমের ও উপেক্ষিত অনাদৃত স্নেহের করুণ আলেখ্য।

পাঠ্যপুস্তকে মুখস্থ করা সাধুতার সাজ পরিয়া থাকা প্রাণবন্ত মানুষের পোষায় না। যে সাধুতার মূলে সত্য নাই, দায়ে পড়িলে সে সাধুতা টিকিতে পারে না, এবং তখন তাহার প্রতিক্রিয়াও সাংঘাতিক হয়।

> আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের দৃষ্টান্তস্থল।

চিরকাল এইরূপ দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকা বড়ই কঠিন সেইজন্য মনে দুর্বলতা আসিলে চাটুবাক্য শুনিয়া মন তাজা করিয়া লইতে হয়। পরপ্রশংসালুব্ধ আত্মম্ভরিতা ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতা গল্পটির নায়কের জীবনে ব্যর্থতার কারণ।

'শেষের রাত্রি' গল্পের বস্তু নিতান্ত ক্ষীণ,—এক মরণাপন্ন যুবক তরুণী পত্নীকে পূজা করে, কিন্তু লঘুচিত্ত তরুণীর মন রুগ্‌ণ স্বামীর উপর পড়িয়া নাই। এদিকে মুমূর্ষুকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য মাতৃকল্প মাসি মিথ্যাকথার মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন। শেষে যখন ফাঁকি ধরা পড়িল, তখন তরুণী অনুতপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইল। কিন্তু তখন আর সময় নাই।

গল্পটির রচনারীতির বৈশিষ্ট্য এই যে সবটাই সংলাপ। শেষের-রাত্রি বাহির হইবার পর হইতে কোন কোন নবীন লেখক মুমূর্ষু পাত্রপাত্রী লইয়া শোক-ছায়াচ্ছন্ন (morbid) রচনা করিতে লাগিলেন।

গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ পরে নাট্যরূপ দিয়াছেন 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫ ?) নামে।

'অপরিচিতা' রবীন্দ্রনাথের লেখা রোমান্টিক-প্রেমের গল্পের মধ্যে একটি। পরিশেষের 'বাঁশি' কবিতা এই গল্পটির সঙ্গে তুলনীয়। দুই চার পুরুষ ধরিয়া কলিকাতাবাসী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সম্যক্ প্রতিনিধি নায়কের মামা॥

১২

অপরিচিতার প্রায় তিন বৎসর পরে বাহির হইল 'তপস্বিনী'।[১] রচনারীতি সহজ সরল। বিবাহিত নারীর তপশ্চর্যা প্রসঙ্গে উদ্ধার গল্পের সঙ্গে এই গল্পের তুলনা করা যাইতে পারে।

'পয়লা নম্বর'[২] এক অধ্যয়নরত কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি এবং তাঁহার অনাদৃত তরুণী পত্নীর কাহিনী। পত্নীর অনাদর সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্তির দিক দিয়া। প্রতিবেশী এক ধনী গুণী যুবক তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহার অন্তর এই আকর্ষণের প্রতি বিমুখ না হইলেও অবিবেচক স্বামী আর গুণমুগ্ধ ভক্ত উভয়ের হাত হইতে তরুণী (পলাইয়া অথবা আত্মহত্যা করিয়া) আত্মরক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথের শেষকালের গল্পে-উপন্যাসে দম্পতীর প্রেম ও বিবাহবন্ধনের বাহিরের প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এবং বিরোধ উপস্থাপিত। প্রতিদিনের সংসারের কাজকর্মে দ্বন্দ্ব বাধে, সংঘর্ষ হয়, তখন প্রেমের সুরটি ঠিক বাজে না। দাম্পত্যমিলনে স্থূলতা থাক চাই না থাক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা হইবেই।—এই কথা, অর্থাৎ বৈষ্ণব রসতত্ত্বের স্বকীয়-পরকীয় প্রেমের নূতন ও আধুনিক ব্যাখ্যা, রবীন্দ্রনাথের শেষের গল্প-উপন্যাসগুলির অধিকাংশের মর্মকথা। চতুরঙ্গ উপন্যাসে এবং পয়লা-নম্বর গল্পে এই তত্ত্বের প্রথম আভাস, শেষের-কবিতায় প্রতিপাদন।

পিতার কর্তৃত্বে মাতৃকৃত বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল, পিতৃসমর্থিত সম্বন্ধ বেশি-দূর গড়াইল না, প্রৌঢ় বয়সে নিজকৃত সম্বন্ধও অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বিবাহ আসর অবধি পৌঁছিল না। আর শেষে পাত্রীকে তাহার প্রেমাস্পদের সহিত বিবাহ দিয়া ঘরে আনিয়া সংসার সাধ মিটাইতে হইল।—ইহাই 'পাত্র ও পাত্রী'[৩] গল্পের বস্তু।

নারী যতই শিক্ষিত হোক এবং উদারতার যতই ভাণ করুক স্বাভাবিক ঈর্ষা-পরায়ণতা ও ক্ষুদ্রচিত্ততা কাটাইয়া ওঠা তাহার পক্ষে সহজ নয়।—ইহাই 'নামঞ্জুর

[১] সবুজ-পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। [২] সবুজ-পত্র আষাঢ় ১৩২৪। [৩] সবুজ-পত্র পৌষ ১৩২৪।

গল্প''[1]এর মূলকথা। নন-কোঅপারেশনের সময়কার রাষ্ট্রনীতিক উত্তেজনার একটি তীক্ষ্ণ সমালোচনার চিত্র এই গল্পে পাওয়া যায়। রচনাভঙ্গিতে যেন সবুজ-পত্রের দীপ্তি পুনরাগত। অমিয়ার চরিত্রে নারীচিত্তের স্বাভাবিক দৌর্বল্যের পরিচয় জাজ্বল্যমান, তবুও হরিমতির যবনিকান্তরালবর্তী ভূমিকায় সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের ভীরু স্নেহশীলতার সকরুণ ছবি মনকে টানিতে থাকে ॥

১৩

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের শেষ উৎসার পাই 'তিন সঙ্গী'তে (পৌষ ১৩৪৭)।[2] এই বইয়ের গল্প তিনটিতে ছোটগল্পের রীতি বেশ একটু নূতনতর।

'রবিবার' শেষের-কবিতা স্মরণ করায়। রবিবারের অভীকের সঙ্গে শেষের-কবিতার অমিতর কিছু মিল আছে। অতি-আধুনিক মেয়েরা অমিতর মন অধিকার করিতে পারে নাই। তাহারা অভীকের মন অধিকার করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বাঁধিতে পারে নাই। বিভার প্রতি অভীকের ভালোবাসা লাবণ্যর প্রতি অমিতর ভালোবাসার মতো রঙীন মুহূর্তের আকস্মিক সংঘাতজাত নয়, তবে দুই-ই গভীরতায় অগাধ। মিলনের প্রতিবন্ধক ছিল বিভার পিতৃপরায়ণতা। পিতার ইচ্ছা ছিল না যে বিভা অভীককে বিবাহ করে, যেহেতু সে নাস্তিক। তাঁহার বাসনা ছিল কোন প্রতিভাবান্ যুবকের সঙ্গে, সম্ভবত অমরবাবুর সঙ্গে, বিভার বিবাহ হয়। বিভা অভীককে মন সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে তাহার পিতার ইচ্ছাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। কেননা

> সেই ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না।

চার-অধ্যায়ের এলার মতো বিভাও সম্পূর্ণভাবে তাহার "বাবারই মেয়ে"। মায়ের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল না, তিনি মেয়ের পিতৃবাৎসল্য-সৌভাগ্যে ঈর্ষা অনুভব করিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বিভা বাপের হাতে মানুষ হয়। এলার পিতার অত শীঘ্র মৃত্যু না হইলে তাহার পরিণতি বিভার মতোই হইতে পারিত। বিভার সঙ্গে গোরার সুচরিতার কিছু মিল দেখা যায়। অমরবাবুর সঙ্গে দুই-

---

[1] প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

[2] তিন-সঙ্গীর গল্প তিনটি ১৩৪৬-১৩৪৭ সালে রচিত ও সেই সময়ে সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত।

বোনের নীরদবাবুর বেশ সাদৃশ্য আছে। এই ধরনের বিপ্লবপন্থীর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের এই শেষ তিনটি গল্পের বিশেষত্ব।

'শেষ কথা' গল্পের নায়ক নবীনমাধবের সঙ্গে 'রবিবার' গল্পের অভীকের এবং 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসের অতীন্দ্রর কিছু মিল আছে। নবীনমাধব ও অভীক বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পী, অভীক ও অতীন্দ্র রূপশিল্পী ও কথাশিল্পী, অতীন্দ্র ও নবীনমাধব বিপ্লবী। নবীনমাধবের জীবনে নারীপ্রেমের স্পর্শ লাগে নাই। অভীকের মতো সেও জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জাহাজের খালাসী হইয়া আমেরিকায় পলাইয়াছিল।

> জামসেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে মা মা ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র ব'লেই মানব, দরিদ্রনারায়ণ বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না।

নবীনমাধব রুচিরাকে যখন প্রথম দেখে সেই দৃশ্য 'অধ্যাপক' গল্পটি মনে পড়াইয়া দেয়। শেষ-সপ্তকের 'ক্যামেলিয়া' কবিতার সঙ্গেও মিল আছে। রুচিরার "দাদু" অধ্যাপক সরকার চতুরঙ্গের 'জ্যাঠামশায়,' হৈমন্তীর বাবা ও গোরার পরেশবাবু—এই তিনজনেরই সগোত্র। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের চৌধুরী-মহাশয়ও এই দলের। নাতনী-ঠাকুরদার গভীর স্নেহসম্পর্কের অন্য রকমের চিত্র পাইয়াছি ঠাকুর্দা ও প্রতিহিংসা গল্প দুইটিতে।

'ল্যাবরেটরি' গল্পের মেরুদণ্ড সোহিনী-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সৃষ্টি। দেহসম্পর্কে সতীত্ববোধ শিক্ষা ও সংস্কার সাপেক্ষ। শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে যে দৈহিক শুদ্ধি রাখিতে পারে নাই সেও শুধু মনের জোরে ভালোবাসার পাত্রের উপর নিষ্ঠা রাখিয়া সতীত্বের অন্যতর উচ্চ আদর্শে অবিচল থাকিতে পারে। ইহাই সোহিনী-চরিত্রের মর্ম এবং ল্যাবরেটরি গল্পের মূলকথা। পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী নারীর বৈশিষ্ট্য সোহিনীর ও পিসিমার ব্যবহারের মধ্যে পরিস্ফুট। একজন মানুষের মানুষত্ব মানিয়া চলিয়া আনন্দ পায় আর একজন মানুষকে শিশু করিয়া রাখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ গল্প 'বদনাম' তিরোধানের তিন মাস আগে রচিত এবং প্রকাশিত॥[১]

---

১ প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮।

১৪

যে-সকল ছোটগল্পের আলোচনা করা গেল সেগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় আরও কতকগুলি রচনা আছে যাহাতে ছোটগল্পের লক্ষণ কমবেশি থাকিলেও সম্পূর্ণ নাই। কোন-কোনটিতে একটি বিশেষ ভাবরসের চিত্র প্রস্ফুটিত। কোন-কোনটিতে রূপকথার রীতি পরিলক্ষিত। কোন-কোনটিতে ব্যঙ্গের অথবা রূপকের সাহায্যে একটি বিশেষ তত্ত্ব বা ভাব প্রতিপাদিত। আবার কোন-কোনটিতে ছোটগল্পের আভাস মাত্র আছে। সবুজ-পত্রের পৃষ্ঠায় ছোটগল্প লেখার তৃতীয় যুগের অবসান হইয়া গেলে পর রবীন্দ্রনাথ এইধরনের গল্পের টুকরা বা "কথিকা" অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি 'লিপিকা'য় (১৯২২) সঙ্কলিত।

'গল্পস্বল্প'এ (১৯৪১) ষোলটি ছোট ছোট গল্প আছে, প্রত্যেক গল্পের শেষে কবিতায় পরিশিষ্টের মতো আছে। বিষয় প্রায় সবই বাল্যজীবন থেকে নেওয়া। অল্পবয়সীদের জন্য লেখা। রীতি সহজ ও সরল॥

১৫

ধর্মকর্মের বাহিরে সাহিত্যের প্রয়াস সব দেশে গল্পেই প্রথম দেখা দিয়াছিল। সে গল্পের কাজ ছিল শিশুর অথবা নিষ্কর্মা বয়স্কের মন-ভোলানো। শিশুর গল্প—রূপকথা—সবচেয়ে পুরানো গল্পঠাট হইলেও সাহিত্যে তাহার স্বীকৃতি বহু বিলম্বে ঘটিয়াছে। তবে আমাদের দেশে প্রায় গোড়া থেকেই বালকের অথবা অল্প-বুদ্ধি বয়স্কের শিক্ষা-সংবিধানে রূপকথাকে সাধারণ জীবনে প্রয়োজনীয় অথবা ধর্মজীবনে অনুকূল উপদেশের আধার করিয়া সাহিত্যের কাজে রীতিমত লাগানো হইয়াছিল। ছেলে-ভুলানো গল্পে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য লইয়া কোন চিন্তা নাই, পাত্রপাত্রীর যৌক্তিকতা লইয়াও মাথাব্যথা নাই। দেব দানব যক্ষ রক্ষ হইতে সিংহ ব্যাঘ্র হাতি শিয়াল সজারু ইঁদুর কাক পিঁপড়া পর্যন্ত সব কাল্পনিক ও বাস্তব জীব লইয়াই ছেলে-ভুলানো গল্পের কারবার। সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানে, বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক-কাহিনীতে এবং জৈন সাহিত্যে চরিত-কথায় তাহাই দেখি। এ ধরনের গল্পের একটা পরিণতি হইয়াছিল রূপক গল্পে, ইংরেজীতে যাহাকে প্যারব্‌ল বলে।

নিছক ছেলে-ভুলানো গল্পের প্রতি শিক্ষিত বয়স্ক লোকের দৃষ্টিপাত উনবিংশ শতাব্দে বিজ্ঞানবুদ্ধির জাগরণের ফল। আমাদের দেশে এ ব্যাপার বিদেশী

শিক্ষার প্রভাবেই শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষিত ও সাহিত্যিক ব্যক্তিদের মধ্যে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সর্বপ্রথম ছেলে-ভুলানো গল্পের সংকলন—ইংরেজীতে—প্রকাশ করেন। তাঁহার বই বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল, এদেশেও ইংরেজী ভাষার পাঠ্যপুস্তকরূপে বহুপ্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে কোন বাঙ্গালী (বা ভারতীয়) সাহিত্যিক ছেলে-ভুলানো গল্পের যে স্থায়ী মূল্য ও নিজস্ব মর্যাদা আছে সে-বিষয়ে নির্দেশ দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু ভালো সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেক কিছু ভালো—যা আমরা আগে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই—আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আছে ছেলে-ভুলানো ছড়া ও গল্প। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও কবিতায়, গল্পে ও প্রবন্ধে রূপকথার (এবং রূপকের) ছাঁচ ছাঁদ ও বস্তু ব্যবহার করিয়াছেন।

রূপক ও রূপকথা বিজড়িত প্রথম গদ্য রচনা 'একটা আষাঢ়ে গল্প' সাধনায় ১২৯৯ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। (ইহার অনেক আগে রীতিমতো ছোটগল্প লেখার অস্ফুট প্রয়াসের সময়ের রচনা দুইটিতে[১]—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'—রূপকের আভাস দেখা দিয়াছিল।) একটা-আষাঢ়ে-গল্পের আরম্ভ ও শেষ রূপকথার মতো, মাঝখানে রূপকের সঙ্গে রূপকথার জড়াজড়ি। রূপকথায় পাথর-হওয়া অথবা প্রাণছাড়া মানব-মানবী রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে সজীব হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাসের দেশের নরনারী পাষাণ নয় মৃতও নয়, তাহারা নিষ্প্রাণ—অর্থাৎ নির্মনস্ক, ইমোশন-বর্জিত, যেন যন্ত্রমানুষ। বিদেশাগত রাজপুত্রের হৃদয়ের আতপ্ত স্পর্শ পাইয়া একে একে তাহারা মোহ-আবরণ ত্যাগ করিয়া সুখদুঃখ-ভালোমন্দের জীবনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। রূপকথাটির তাৎপর্য গভীর ও মহৎ। (রচনাকালে হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে এ দেশের অবস্থার কথা জাগিয়াছিল। এখন পৃথিবীর মানুষকে রাষ্ট্র-ক্রীড়ায় ঘুটি রূপে জনপিণ্ডে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে সর্বত্র।)

ঠিক এক বছর পরে বাহির হইল 'অসম্ভব গল্প' (পরে 'অসম্ভব কথা')। রূপকথার ধাঁচে আগাগোড়া লেখা হইলেও এটি ঠিক গল্প নয়। সেইজন্য প্রথমে গল্পগুচ্ছে (১৯০০, ১৯০৮-৯) সংকলিত হয় নাই। তবে বিচিত্রপ্রবন্ধে

---

[১] রচনা দুইটি পর পর বাহির হইয়াছিল (ভারতী কার্তিক ১২৯১, নবজীবন অগ্রহায়ণ ১২৯১)। এ দুইটিতে গল্পসার নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মাঝে 'গল্পগুচ্ছ' (১৯১০) হইতে বাদ দিয়াছিলেন।

(১৯০৭) স্থান পাইয়াছিল।[১] অসম্ভব-কথায় আত্মকথা ও আত্মভাবনা রূপকথার ছাঁদে উপস্থাপিত। ইহার আগে একটি গল্পে ('গিন্নি') রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্য-জীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অসম্ভব-কথার গোড়ায় জীবনকথা প্রচ্ছন্ন নয়, তবে শেষভাগে তাহা রূপকথার ছায়াচ্ছন্ন। ব্যক্তিজীবনের অনুভাবকে প্রকাশ করিবার রমণীয় কৌশল এই গল্পে দেখা গেল। রচনাটি এই সময়ে লেখা ছেলে-ভুলানো (বা মেয়েলি) ছড়া প্রবন্ধের পরিপূরক।

অসম্ভব-কথার দুই মাস পরে 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' বাহির হইল। এটি পুরাপুরি রূপক-গল্পের (parable) আঁটসাঁট ছাঁদে লেখা। রচনাটির নেজামুড়া বাদ দিয়া গল্পটুকু উদ্ধৃত করিতেছি। এটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা আদর্শ ফেবল্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

> পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।
>
> ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।
>
> কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।
>
> তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"
>
> শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।"
>
> তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল। এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারম্বার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।
>
> বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্ত সমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

গল্পটির যে দুইপক্ষ "নীতিকথা" (moral) আছে তাহা চট করিয়া বুঝিয়া

---

[১] রাজপথের-কথাও বিচিত্রপ্রবন্ধে সংকলিত হইয়াছিল।

ফেলিবার নয়। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। গল্পটা পুরাতন বটে, সুখদুঃখের কাহিনীও বটে।

কৃষ্ণপক্ষের মরাল্

> বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্ ঠক্ শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ্ খচ্ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে—আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ রহিয়া গেল।

শুক্লপক্ষের মরাল্

> ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে, সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দুটি বিদ্বেষ-বিষজর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পারে না।

'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' লিখিবার পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পরে আবার রবীন্দ্রনাথ রূপক-রূপকথাময় গল্প অথবা গল্পাভাস লিখিবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। সে রচনাগুলি লিপিকায় সন্নিবিষ্ট আছে। তবে লিপিকার সব রচনাই ঠিক এই শ্রেণীতে পড়ে না। প্রথম অংশে যে চোদ্দটি "কথিকা" আছে তাহার মধ্য দুই তিনটিকে রূপক-রূপকথার শ্রেণীতে জোরজার করিয়া ফেলা যায়। প্রথম কথিকা 'পায়ে চলার পথ' ১২৯১ সালে লেখা রাজপথের-কথার যেন জের টানিয়াছে। 'পুরানো বাড়ি'র মতো ক্ষীণ কথাবস্তু অনেক কাল পরে গদ্যকবিতায় উপস্থাপিত হইয়াছে।

লিপিকার দ্বিতীয় অংশের সাতটি রচনার সবগুলিতেই অল্লাধিক পরিমাণে গল্পসার আছে। কোন-কোনটিতে রূপকের আলো বেশি, কোন-কোনটিতে রূপকথার ছায়া বেশি। 'বিদূষক' ছাড়া কোনটিই নেহাত ক্ষীণকায় নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি রচনা। হিতবাদীতে প্রকাশিত 'খাতা' গল্পের সহযোগী 'নামের খেলা' গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য। 'রাজপুত্তুর'এ বর্তমান কালের সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছেলেমেয়ের রোমান্স্ উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের চিরকালের জয়যাত্রা রূপকথার ভাষায় ভণিত। এটিকে ৬১০ শব্দের একটি মহাকাব্য বলিলে অন্যায় হয় না।

> পৃথিবীতে আর সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে; আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েচে। তুফান উঠল, নৌকা মিল্ল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

> এইটেই হচ্চে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা, আর সব দেশের। পৃথিবীতে যারা নতুনজন্মে আসে, দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোট মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করচে বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।…
>
> যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে ব'সে খবর পায়,—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তরের মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করচে।
>
> ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ,—সে রাজপুত্তুর।

রূপকথায় রূপকের আভরণ দিলে কেমন হয় তাহার উদাহরণ পাই 'সুয়োরানীর সাধ'এ।

লিপিকার তৃতীয় অংশে সতেরোটি রচনা। দুইএকটিতে গল্পসার কিছু নাই। কতকগুলি রচনাকে তত্ত্বগর্ভ গল্পিকা (অর্থাৎ parable) বলিতে পারি। যেমন 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত', 'তোতা-কাহিনী', 'সিঙ্গি', 'রথযাত্রা' ও 'সওগাত'। কর্তার-ভূত বাঙ্গালাদেশের মামুলি ভূতের গল্পের রীতি মাফিক ছাঁদা। রচনাটি গভীর মূলপ্রসারী সত্যগর্ভ এবং অত্যন্ত ঝাঁজালো। আরব্য-উপন্যাসের সিন্দবাদ একবার এক কাঁধেচাপা বৃদ্ধের পাল্লায় পড়িয়াছিল, আর আমরা দেশ-কে-দেশ বহু কর্তা-ভূতের দৌরাত্ম্যে নিষ্পিষ্ট। অথচ মরিয়া ভূত হইয়া থাকা কর্তাদের দোষ নয়, আমাদেরই মূঢ়তা।

> দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ—যারা দিনের বেলায় নায়েবের ভয়ে কথা কয় না—তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় ক'রে বলে, "কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি?"
>
> কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"
>
> তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।"
>
> কর্তা বলেন, "সেইখানেই ত ভূত।"

'তোতা-কাহিনী'তে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে সমালোচনা আছে তাহার উপযোগিতা উপস্থিত কালেও বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

বেশির ভাগই সোজাসুজি রূপকথার ছাঁদে লেখা। বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—'পট', 'নতুন পুতুল', 'উপসংহার', 'পুনরাবৃত্তি' ও 'পরীর পরিচয়'। পরীর-পরিচয় এবং শেষ রচনা 'স্বর্গ-মর্ত্য' আকারে সাধারণ ছোটগল্পের মতোই। পরীর-পরিচয়ে রূপকথার রস আধুনিক ছোটগল্পের আধারে উপচিত। সে রসে আছে মানুষের চিরকালের চাওয়া-পাওয়ায় মর্ম-কথা। যে কথা অন্যরসে পরশ-



'সে'র প্রচ্ছদপট

পাথর কবিতায় আছে। স্বর্গ-মর্ত্য নাট্যের ধরনে সংলাপে গাঁথা। গোড়ায় ও শেষে একটি করিয়া গান আছে। প্রথম গানে কথিকাটির রূপক উদ্‌ঘাটিত।

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মত,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মত দোলে।
সেই আলোটি নেবে জ্বলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল চাওয়ার ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌ল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হ'তে আশীষ আনি,
অমর শিখা আকুল হ'ল মর্ত্যশিখায় উঠ্‌তে জ্ব'লে।

১৬

অদ্ভুতরসের (fantasy) ভিয়ানে পাক করা ছেলে-ভুলানো গল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন গল্প ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম লিখিয়াছিলেন। ছোট ছেলেদের একটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথও একটি অদ্ভুতরসের গল্প লিখিয়াছিলেন, নাম 'ইচ্ছাপূরণ'।[১] গল্পটি সাদাসিধা, এবং সোজাসুজি ছেলেদের জন্য লেখা।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে ও পদ্যে অদ্ভুতরসের কাহিনী রচনায় বিচিত্র প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। পদ্য রচনাগুলির অধিকাংশেই কাহিনী যৎসামান্য। সেগুলি 'খাপছাড়া'য় (১৯৩৭) ও 'ছড়ায় ছবি'তে (১৯৩৭) সংকলিত আছে। গদ্য কাহিনীগুলি একসূত্রে গাঁথা হইয়া 'সে' (১৯৩৭) বইটিতে সংকলিত হইয়াছে।[২] উপক্রমণিকা বাদ দিলে 'সে' বইটিতে পনেরোটি গল্প ও গল্পকণা আছে। সেগুলির এই নাম দিতে পারা যায়,—হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস, শিবা-শোধন সমিতির রিপোর্ট, গেছোবাবা, সে-র কনেদেখা কাণ্ড, সে-র অসম্ভব গল্প, বাঘের কাণ্ড, সে-র দেহবদল প্রথম পর্ব, সে-র দেহবদল, মগজবদল, পুপে-সুকুমারের এড্‌ভেঞ্চার, পুপের ছেলেবেলার গল্প, সে-র সঙ্গীত-সাহিত্য সাধনা, মাষ্টারমশায়ের কথা, দাদামশায় ও সুকুমারের কথা। অধিকাংশ গল্পের মধ্য দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-কৌতুকের ধারা বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে রচনায় নূতন স্বাদ জাগিয়াছে। কিন্তু রচনাগুলির আসল প্রেরণা আসিয়াছিল খেয়াল-

১ প্রকাশ 'সখা ও সাথী' (আশ্বিন ১৩০২)।

২ বইটিতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা অনেকগুলি ছবি আছে। সেগুলি গল্পের রস বাড়াইয়াছে। কিছু কিছু কবিতাও আছে।

খুশি হইতে, যে খেয়ালখুশি তাঁহাকে ছবি আঁকিবারও প্রেরণা দিয়াছিল। বইটির উৎসর্গ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে···
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।

ব্যঙ্গ-কৌতুকের একটু উদাহরণ দিই। সে-র কাহিনীর সূত্রধার দাদামশায় লেখক নিজে। অনাথ-তারিণী সভার সভ্য ছেলেদের গানে বাজনায় চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া কাছে যা কিছু ছিল—এক টাকা ন আনা তিন পয়সা—সবই তিনি দিয়া দিলেন। তখনও মাস কাবার হইতে দুইদিন বাকি। কিন্তু ছেলেরা খুশি হইল না, তাঁহাকে লক্ষপতি কৃপণ বলিয়া গালি দিতে লাগিল।

এ কথাগুলো পুরোনা ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই হোলো সুরু। তারপরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারী সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সঙ্গীত সভা, কচুরিপানাধ্বংসন সভা, মৃত-সৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষু-ছিবড়ের পণ্য-পরিণতি সভা, খন্যানে খনার লুপ্ত ভিটা সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতি-সাধিনী সভা, ক্ষৌর-ব্যয়নিবারিণী দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা—ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টঙ্কারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিত পাঠের অভিমত দিতে, ভুবন-ডাঙ্গায় ভবভূতির জন্মস্থান নির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেষ্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

মাষ্টারমশায়ের কথা অনেকটা সোজাসুজি গল্প। শুধু মাষ্টারমশায় ভূমিকাটির জন্যই এটুকু গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার যোগ্য। নাতনীর কাছে দাদামশায় তাঁহার এক বন্ধু ইস্কুলের মাষ্টারমশায়ের কথা পাড়িলেন।

আজো তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে: ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়েছে আকাশ থেকে।

মাষ্টার ক্লাস পড়ায় কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকায় না। লোকে ভাবে ক্ষ্যাপা।

তারা বলে, তোমার পড়ানোও ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভুলে যাও।

মাষ্টার বলে

পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাষ্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইঢাই করে না।

তাহার পড়াইবার প্রণালী কেমন জিজ্ঞাসা করিলে মাষ্টার উত্তর দিয়াছিল

গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যে রকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও সহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হোত তাহোলে আজপর্য্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হতো না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মত শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা ক্ষেতে, ফসল ফলে ক্ষেত অনুসারে।

দাদামশায় (লেখক) পুপু ও সুকুমারের কথায় গল্পবস্তু আরো একটু পুষ্ট। এটিও গল্পগুচ্ছে স্থান পাইবার অধিকারী। পুপু আর সুকুমার এই দুই শিশু-সঙ্গীর মধ্যে সুকুমারের সঙ্গে দাদামশায়ের মনের মিল বেশি ছিল। একদিন ছেলেমেয়ে দুইটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাঁহার কি হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। দাদামশায় বলিলেন, আমি হইতে চাহিয়াছিলাম

একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকাল বেলাকার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরানো অশথ গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনীচু ডাঙায় ঝাপসা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ, সেই আকাশে একটা সুদূরতা,—মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ওপার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে—বেলা যায়—।

এ কল্পনা পুপুর কাছে অত্যন্ত উদ্ভট ঠেকিয়াছিল। সুকুমারের ভালো লাগিয়াছিল। সে বলিল

গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

দাদামশায় জবাব দিলেন

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে কবিতা আছে। আপনার কথা ভুলে গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার ঐ বড়ো রাস্তা

সে-র শেষ কথাটি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাস ঃ ভূমিকা

১

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ করিলে মোটামুটি তিনটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এখানে অসংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের চাপে ভাবমগ্ন কোমল চিত্তের দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ প্রকাশিত। হৃদয়সম্পর্ক প্রধানত সৌভ্রাত্র্যের ও বাৎসল্যের। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' এই স্তরের উপন্যাস। দ্বিতীয় স্তরে প্রেমসম্পর্কেরই প্রাধান্য, আর যা কিছু রস আনুষঙ্গিক বিশেষ অবস্থায় পতিত নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং সংসারে সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের জটিল প্রতিক্রিয়ার অনুসরণ মুখ্য উদ্দেশ্য। 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' এই স্তরের রচনা। তৃতীয় স্তরে ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তি ও মানসদ্বন্দ্ব জীবনের, ঘরসংসারের ও বাহিরের, বৃহত্তর ভূমিকায় উপস্থাপিত। এখানে উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সুস্পষ্ট ব্যক্তি হইয়াও যেন বিশেষ বিশেষ ভাবাদর্শের মূর্তিতে উপস্থাপিত। প্রেমসম্পর্কের প্রাধান্য থাকিলেও এখানে অন্য রসের যোগান আছে। কিন্তু সবার উপরে আছে সেই জিনিস যাহাকে বলিতে পারি বুদ্ধিরস। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' এবং পরবর্তী সব উপন্যাস ও বড়-গল্প এই স্তরের অন্তর্গত॥

২

বাহিরের ঘটনাসংঘাত অথবা ব্যক্তিচিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ নয়, পাত্রপাত্রীর হৃদয়াবেগ ও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিসংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাত্রপাত্রী বাহিরের সংঘটনার হাতের পুতুলের মতো, বহির্জগৎই যেন একসঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও সূত্রধার। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বহির্জগৎ সূত্রধার তো নয়ই, রঙ্গমঞ্চও নয়, রঙ্গমঞ্চের অন্তঃপটমাত্র। পাত্রপাত্রীর হৃদয়ই রঙ্গমঞ্চ, এবং রস জমিয়াছে সেই হৃদয়ের আলোড়নে ও সংঘাতে। রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্গালা উপন্যাসে পাত্রপাত্রী যেন নাচের পুতুল, তাহাদের বাহিরের চেহারা দর্শকের গোচরে কিন্তু মনের চেহারা বিন্দুমাত্রও গোচর নয়। যিনি পুতুল খেলাইতেছেন তাঁহার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুই পুতুলের নাচে প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে বাহিরের ঘটনার প্রাধান্য সেখানে এমন ভূমিকাই আবশ্যক, কিন্তু যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বই সর্বস্ব সেখানে অচল। এমন অবস্থায়

লেখক যদি ভূমিকার বৃহৎ অংশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পাত্রপাত্রীকে রঙ্গমঞ্চ হইতে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন তবেই রচনা সার্থক হয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর প্রণয় জমিতে নিশ্চয়ই সময় লাগিয়াছিল, এবং নগেন্দ্রর তরফে সূর্যমুখীর উপর তাঁহার প্রবল ভালোবাসার ও কর্তব্যবোধের সহিত মানসিক দ্বন্দ্বও কিছুকাল ধরিয়া অবশ্যই চলিয়াছিল, এবং ইহাই উপন্যাসটির গুরুতর ব্যাপার,—বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বৃহৎ ব্যাপার প্রথমে স্বগত রাখিয়া পরে অকস্মাৎ উপন্যস্ত করিয়াছেন। পাঠককে অন্ধকারে রাখিয়া হঠাৎ সূর্যমুখীর চিঠিতে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার স্বামী কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরক্ত, এবং কুন্দকে হীরার ঘরে কয়েক দিন আটক রাখিয়াই তাহাকে নগেন্দ্রর প্রণয়পিপাসু করিয়া ছাড়িলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মধ্যবর্তিনীতে অনুরূপ অবস্থায় নিবারণের মনঃক্রিয়ার অথবা চোখের-বালিতে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মনঃক্রিয়ার বিকাশ ও পরিণতি আদ্যন্ত পাঠকের চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন। নগেন্দ্রর অনুতাপের কারণও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। তাহার অনুরাগ যেমন আকস্মিক বিরাগও তেমনি আচম্বিত। কিন্তু নিবারণের ও মহেন্দ্রর অনুরাগে কেমন করিয়া ভাটার টান ধরিয়াছিল তাহা আমরা কাহিনীর সঙ্গে সহজে অনুসরণ করিতে পারি॥

৩

রবীন্দ্রনাথের আগে লেখা রোমান্টিক উপন্যাসের ঘটনাশৃঙ্খল আধুনিক অথবা অনাধুনিক কোন জীবনের পক্ষেই বাস্তব নয়, তা সে ঘটনা যতই কেন ঘরোয়া অথবা ব্যক্তিনিষ্ঠ হোক। পাঠকের ভালোলাগা, অর্থাৎ বিষাদময় পরিণতিতে পাঠকের মন ভারি না হওয়া, রোমান্টিক উপন্যাসের এক প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণে বাহ্যঘটনার উপর লেখককে অনেকটা নির্ভর করিতে হয়, এবং সংসারে সচরাচর ঘটনার যে-পরিণতি হয় না তাহাই দেখাইতে হয়। সূর্যমুখীর অবস্থায় কখনো বাঙ্গালীঘরের গৃহিণী অমনভাবে গৃহত্যাগ করিত না। হয় ঘরে থাকিয়া স্বামীর মন ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করিত, নয় স্বামীর সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া সংসারে অথবা ধর্মকর্মে মন দিত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী গল্পে হরসুন্দরীর আচরণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মিলন ঘটাইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীসূত্র গুটাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু কাহিনী চুকিয়াছিল কি। বিষবৃক্ষের ফলভোগ তো দুইজনেরই বাকি রহিয়া গেল। রোমান্সের অনুরাগবিরাগ শোধবোধ এককথায় শেষ করিয়া দেওয়া যায়,

কিন্তু সত্যকার জীবনে তাহার জের চলে বহুকাল ধরিয়া। মানুষের মন কাদার ঢেলা নয় যে ইচ্ছামতো ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আবার যে ঢেলা সেই ঢেলা করা যায়। মানুষের মন গড়িতে সময় নেয়, ভাঙ্গিতে সময় নেয়, এবং ভাঙ্গিয়া গড়িতে—যদি তা সম্ভব হয়—আরও সময় নেয়। পুরাতন শয়নকক্ষে নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর আবার মিলন হইয়াছিল, কিন্তু সে মিলনে পূর্বেকার পূর্ণতা ও রস নিশ্চয়ই রহে নাই। মধ্যবর্তিনীতে এইরূপ মিলনের স্বাভাবিক পরিণতিই রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মনোবৃত্তি অনুসারী বলিয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাহ্যঘটনার প্রাধান্য একেবারে নাই। যতটুকু আছে তা অনেক সময় যেন অন্তর্বিক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। কাজে কাজেই এই স্বগতদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কতকটা কাব্যগুণের[১] সঞ্চার করিয়াছে। তবে ইহার জন্য তাঁহার অনায়াসসুন্দর বাচনরীতিও কম দায়ী নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে-গল্পে চরিত্র-অঙ্কনে কোন অস্পষ্টতা দুর্বলতা অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা নজরে পড়ে না। তাঁহার কল্পনায় চরিত্রটি যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী এবং বিশ্লেষণী লেখনীমুখে তাহা সঙ্গে সঙ্গে বাণীমূর্তি পায়। পাত্রপাত্রীর মনের কথা পাঠককে অনুমান করিয়া লইতে হয় না, লেখক অথবা পাত্রপাত্রী নিজেরাই সেকথা বলিয়া দেয়। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গল্প একটু বেশি মুখর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু এই মুখরতাই তাঁহার বচনরচনার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার মধ্যে যে-পরিমাণে গভীর মনোবিশ্লেষণ ও তথ্যদৃষ্টি প্রকাশিত তাহার তুলনা নাই ॥

৪

রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসেই একটি করিয়া প্রশান্ত আত্মসমাহিত মধ্যস্থ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকায় যেন উপন্যাসের আন্তর ও বাহ্য ঘটনা-দোলার ভারসাম্য রাখিয়াছে। নাটকের আলোচনায় বৈরাগী বা গুরু ভূমিকায় ইহারি অনুরূপ দেখিয়াছি। বৌঠাকুরাণীর-হাটে বসন্ত রায়, রাজর্ষিতে বিল্বন, চোখের-বালিতে অন্নপূর্ণা, নৌকাডুবিতে নলিনাক্ষ, গোরায় পরেশবাবু, চতুরঙ্গে জগমোহন, ঘরে-বাইরেয় চন্দ্রনাথবাবু, যোগাযোগে বিপ্রদাস আর শেষের-কবিতায় যোগমায়া মধ্যস্থ ভূমিকা। দুই-বোন, মালঞ্চ এবং চার-অধ্যায় (—এগুলি ঠিক উপন্যাস নয়, বড়গল্প—) এগুলিতে এমন ভূমিকা নাই। গোরা অবধি এইরূপ মধ্যস্থ

---

[১] এখানে মনে রাখিতে হইবে যে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের সংজ্ঞায় কবিতা ও গল্প দুইই "কাব্য"। এখানে কাব্য কথাটি ইংরেজি poetryর সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।

চরিত্রগুলি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাহার পরে চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে এবং যোগাযোগ —এই তিনখানি উপন্যাসে এই ভূমিকাগুলি হয়ত শাস্ত্র মোতাবেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি নয়, কিন্তু তাঁহারা লোকহিতপরায়ণ এবং অধ্যাত্মবোধে আত্মসমাহিত। শেষের-কবিতার যোগমায়া মাঝামাঝি ভাবের, তিনি শান্তরসাশ্রিত অথচ ঠিক প্রচলিত আচারপরায়ণ নহেন। তবে সকলেই জীবনকে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

প্রথম চারটি উপন্যাসে এবং যোগাযোগ, শেষের-কবিতা, দুই-বোন এবং মালঞ্চ, এই চারটি উপন্যাস-গল্পে সমস্যা নিতান্তভাবে ব্যক্তিহৃদয়ের, শুধু নৌকা-ডুবিতে সমাজ-ব্যবহারের সমস্যা বিজড়িত আছে। গোরাই ব্যক্তিধর্ম, সমাজ-ব্যবহার ও দেশসমস্যা সব মিলিয়া জট পাকাইয়াছে। চতুরঙ্গে সংসারজীবনের সমস্যার সঙ্গে অধ্যাত্ম-এষণা এবং জীবনের সত্যদর্শন মিশিয়া গিয়াছে। ঘরে-বাইরেয় এবং চার-অধ্যায়ে দেশ-উদ্ধার প্রচেষ্টার পাকে জীবনসমস্যা জড়ানো।

এক হিসাবে ঘরে-বাইরে রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস, কেননা এই পর্যন্তই উপন্যাসে লেখকের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী উপন্যাসে ও বড়গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তেমন ধরা দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্গালা (তথা ভারতীয়) উপন্যাসে শুধু প্রেমকাহিনীর অথবা ঘরোয়া সুখদুঃখের কথারই স্থান ছিল। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের পরিসর অনেকদূর বাড়াইয়া দিলেন। বৌঠাকুরাণীর-হাট আর রাজর্ষি ছাড়া তাঁহার আর সব উপন্যাসের আখ্যানবস্তু প্রেমমূলক হইলেও সেগুলি রোমান্স নয়, সেগুলিতে প্রেমরস ছাড়া আরও অনেক রস সঞ্চারিত। বলাবাহুল্য ভারতীয় সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ এবং তথাকথিত বাস্তব-পদ্ধতির প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই করিয়াছেন॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাস ঃ ব্যক্তিসংঘর্ষ

১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' কখনো বই হইয়া বাহির হয় নাই। ইহা ভিখারিণী গল্পের পরেই লেখা ও ভারতীতে প্রকাশিত[১]। কাহিনী অসমাপ্ত বলিয়া মনে হয় যেন কিশোর লেখক কাহিনীকে পূর্ণ পরিণতির দিকে আগাইয়া লইবার ধৈর্য, অথবা বিলাতে যাইবার মুখে লিখিবার প্রেরণা, হারাইয়াছিলেন। সাতাশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত আছে। বিষয় কৈশোর কাব্যগুলিরই মতো—নিষ্ঠুরের হস্তে প্রণয়ভীরু কিশোরীর নিপীড়ন। করুণা অপরিণত রচনা হইলেও ঐতিহাসিক মূল্যবর্জিত নয়। মোহিনী-মহেন্দ্রর অপ্রধান কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণকান্তের-উইলের ছায়া এবং চোখের-বালির পূর্বাভাস আছে। করুণার মহেন্দ্র ও রজনী পরে চোখের-বালির মহেন্দ্র ও আশাতে পরিণত॥

২

করুণার কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস দুইটির[২] বিষয়পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে। মোগল-রাজত্বকালেও বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চল অল্পবিস্তর সাময়িক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিয়াছিল। এই স্বাধীন-বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষীণ কাহিনীসূত্র অবলম্বনে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' লেখা।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সবই বাঙ্গালী, জাতিতে না হইলেও সংস্কারে সমাজে ও শিক্ষায়। নিজের দেশের নরনারীর সুখদুঃখ আশা-আকাজ্ক্ষা লইয়াই তিনি কারবার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতে গিয়া তিনি পাঠান-মোগল-রাজপুতকে না লইয়া দেশেরই প্রান্তীয় দুই স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস হইতে কাহিনী গ্রহণ করিলেন। স্বার্থান্ধ এবং বিচারমূঢ় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সর্বজনীন প্রেমের—সৌহার্দ্য সৌভ্রাত্র্য বাৎসল্য জীবপ্রীতির—বিরোধ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস-গল্পের মর্মকথা।

---

[১] আশ্বিন ১২৮৪ হইতে ভাদ্র ১২৮৫।

[২] এই সঙ্গে 'মুকুট' গল্পও ধরা চলে (বালক ১২৯২)।

'বৌঠাকুরাণীর হাট'[১] যশোরের প্রতাপাদিত্যের সংসার লইয়া লেখা। তবে প্রধান ভূমিকাগুলির নাম এবং কোন কোন ঘটনার ছায়া ঐতিহাসিক হইলেও কাহিনীতে কল্পনাই বেশি।[২] উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ দেখানো হইয়াছে তাহা কোন ইতিহাসে নাই। বসন্তরায়-উদয়াদিত্য-বিভার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের বাল্যকথাই অধিক্ষিপ্ত। শৈশবে ভৃত্যলালিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ মাতৃ-বিয়োগের আগে ও পরে কিছু স্নেহলালন পাইয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ ভগিনী সৌদামিনী দেবীর কাছে। বৌঠাকুরাণীর-হাটের কাহিনীতে এমনি স্নিগ্ধ সৌভ্রাত্র্যেরই আভা। বৌঠাকুরাণীর-হাট সৌদামিনী দেবীকে উপহৃত হইয়াছিল,—ইহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আত্মসর্বস্ব প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুর মেজাজ জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যের প্রতি অসন্তোষসঞ্জাত বিদ্বেষের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদের মতো করিয়াছিল। উদয়াদিত্যের ও বসন্তরায়ের মৃদু স্নিগ্ধ স্বভাব প্রতাপাদিত্যের মনে দুইজনের প্রতিই বিরুদ্ধতা বাড়াইয়াছিল। শেষে একজন পলাইয়া এবং আর একজন আত্মোৎসর্গ করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

উদয়াদিত্যের স্বভাবে লেখকের নিজের ছায়া পড়িয়াছে। উদয়াদিত্য কোমলচিত্ত ও অপ্রতিবাদী। তাহার স্বভাবে পুরুষে-প্রত্যাশিত দৃঢ়তার ও মনস্বিতার কমতি নাই কিন্তু উদ্যমের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথেরও তাই ছিল। পিতৃবন্ধু সরলহৃদয় সঙ্গীতসিদ্ধ প্রীতিস্নিগ্ধ বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ সিংহের কথা মনে রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়কে আঁকিয়াছিলেন। উদয়াদিত্যের মা রানীর চরিত্রে বড়ঘরের গৃহিণীর গুণদোষ সমানভাবে প্রকটিত। বধূবিদ্বেষ বাঙ্গালী শাশুড়ীদের মধ্যে খুব সুলভ মনোভাব। রানীর বধূবিদ্বেষবহ্নি সুরমাকে দগ্ধ করিয়া তবে নির্বাপিত হইয়াছিল। (চোখের-বালিতে বধূবিদ্বেষের যে চিত্র পাই সে আরও এখনকার। তাই তাহাতে রঙ এতটা ঘোরালো নয় কিন্তু আরও জটিল।) সুরমার ও বিভার ভূমিকা বাঙ্গালী মেয়ের নম্রমধুর কোমলতায় উদ্ভাসিত। রামচন্দ্র রায়ের ভূমিকায় অশিক্ষিত মূর্খ চাটুকারসেবিত নাবালক জমিদারের চিত্র ব্যঙ্গের তুলিকায় অঙ্কিত। তবে বিদ্রূপের

---

১ প্রকাশ ভারতী ১২৮৮ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৯ আশ্বিন, পুস্তকাকারে পৌষ ১৮০৪ শক (১৮৮৩)।

২ প্রতাপচন্দ্র ঘোষের প্রথম খণ্ড 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯) রবীন্দ্রনাথকে বৌঠাকুরাণীর-হাটের বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই বইটি তাঁহার বৌঠাকুরাণীর (জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের পত্নীর) ভালো লাগিয়াছিল।

ঝাঁজ একটু বেশি আছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে পাষণ্ড চরিত্র পাই একটিমাত্র ; সে এই উপন্যাসের মঙ্গলা। এই ভূমিকায়, বিশেষ করিয়া সীতারামের সহিত তাহার সম্পর্কে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে করি।

বৌঠাকুরাণীর-হাটের কাহিনী অবলম্বনে অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে কথা আগে বলিয়াছি। নাটকে মূল আখ্যানের অনেক ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। যেমন বধূবিদ্বেষ-প্রণোদিত নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে রানীর নির্বুদ্ধিতাই সুরমার অপমৃত্যুর হেতু দেখানো হইয়াছে এবং উদয়াদিত্য-রুক্মিণী (মঙ্গলা) সীতারাম-কাহিনীটুকু বাদ গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে॥

৩

'মুকুট'[১] রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক কাহিনী—উপন্যাস নয়, বড় গল্প। ছেলেদের জন্য লেখা। রচনা লঘু, বর্ণনা দ্রুতগতি। বিষয় স্বাধীন-ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে নেওয়া, ভাব সৌভ্রাত্র্য এবং ভ্রাতৃবিদ্বেষ। বড় ভাইয়ের প্রতি ছোট-ভাইয়ের নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতা অব্যবহিত পরবর্তী রচনা রাজর্ষিতেও আছে, কিন্তু সেখানে ভ্রাতৃস্নেহের মধ্যে অনেকখানি বাৎসল্য লুক্কায়িত॥

৪

'রাজর্ষি'[২] উপন্যাসের মুখ্য রস বাৎসল্য, গৌণ রস সর্বজনীন প্রীতি। ইহারও আখ্যানবস্তুর মূলে স্বাধীন-ত্রিপুরার রাজকাহিনী। রাজর্ষিতে ঐতিহাসিক উপাদান বৌঠাকুরাণীর-হাটের চেয়ে বেশি ও স্পষ্ট। রাজর্ষি-কাহিনীর মূলসূত্র কিভাবে (ট্রেনে স্বপ্নে) লব্ধ হইয়াছিল সেকথা জীবনস্মৃতিতে[৩] আছে।

বৌঠাকুরাণীর-হাটে ও মুকুটে রবীন্দ্রনাথের আঁকা সৌভ্রাত্র্যস্নেহের ছবি পাইয়াছি। নূতনতর হৃদয়বৃত্তি শিশুস্নেহের পরিচয় পাওয়া গেল রাজর্ষিতে। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্কন্যারা তাঁহার প্রথম বয়সে হৃদয়ে কতটা স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও রচনার সহিত যাঁহাদের ভালো পরিচয় আছে তাঁহাদের অগোচর নয়।

---

[১] প্রকাশ বালক ১২৯২ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, হরিশচন্দ্র হালদারের লিথোচিত্র সংবলিত। পরে 'ছুটির পড়ার'-য় সংকলিত (১৩১৬)।

[২] প্রকাশ (ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ মাত্র) বালক ১২৯২ আষাঢ় হইতে মাঘ, হরিশচন্দ্র হালদারের লিথোচিত্র সংবলিত। পুস্তকাকারে প্রকাশ ১২৯৩ (১৮৮৭)।

[৩] 'রচনাবলী' সংস্করণের ভূমিকায়ও রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছেন।

স্বপ্নলব্ধ অংশটুকু রাজর্ষির মূল কাহিনী ধরিলে গল্পটি শেষ হওয়া উচিত ছিল পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে,[১] কেননা সেইখানেই গল্পের আসর হইতে জয়সিংহের নিষ্ক্রমণ। এইটুকু লইয়াই পরে বিসর্জন নাটক (১২৯৭) রচিত হয়। ছেলেদের জন্য লেখা বলিয়া রাজর্ষিতে কোন নারী-ভূমিকা নাই। নাটকে দুইটি বড় নারী-ভূমিকার এবং আরো কয়েকটি নূতন ভূমিকার অবতারণা হইয়াছে।

কর্তব্যবোধের সহিত হৃদয়বৃত্তির ও সাধারণ বোধের দ্বন্দ্ব, এবং ক্ষমার ও প্রেমের আবির্ভাবে দ্বন্দ্বের মীমাংসা,—রাজর্ষির মূল কথা। গোবিন্দমাণিক্য যেন উদয়াদিত্যেরই পরিণামরমণীয় মূর্তিভেদ। গোবিন্দমাণিক্যের স্নেহকোমল হৃদয়ের ট্রাজেডি কাহিনীকে আগাগোড়া ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য কর্তব্যবোধে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়কে যে দণ্ড দিলেন তাহাতে প্রকারান্তরে নিজেকেই শাস্তি দেওয়া হইল। রাজা নিঃসন্তান, এবং উপন্যাসে তাঁহার পারিবারিক জীবনের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় সংসারে তাঁহার সান্ত্বনার ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ ছিল। সেইজন্য হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ পড়িয়াছিল ছোট-ভাই নক্ষত্ররায়ের উপর। রাজধর্মের অনুরোধে যখন তিনি ভাইকে নির্বাসনের আদেশ দিলেন তখন ঠাকুরঘরের রুদ্ধদ্বারের আশ্রয় ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না।

> নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে-সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এককেটা দিন এককেটা রাত্রি, তাহার সূর্যালোকের মধ্যে, তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ভাইয়ের উপর গোবিন্দমাণিক্যের ভালোবাসা শুদ্ধ বাৎসল্য নয়, তাহার মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহ যথেষ্ট ছিল। ভ্রাতৃস্নেহের পথেই রাজার চিত্তের দৌর্বল্য। বালিকা হাসির ও শিশু তাতার প্রতি তাঁহার ভালবাসা বিশুদ্ধ বাৎসল্য। এই ভালোবাসা তাঁহার চিত্তের মুক্তি ও প্রসন্নতা আনিয়া দিয়াছিল।

রাজার তুলনায় রঘুপতির ভূমিকা স্পষ্টতর। রঘুপতির ঋজু নির্লিপ্ত ও অক্ষোভ্য ব্যক্তিত্ব সকলকেই আকৃষ্ট করিত।

> রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপ্তশিখার মত আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

রঘুপতি যে রক্তমাংসের মানুষ সে-পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জয়সিংহের

[১] 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সংস্পর্শে। চাণক্যের মতো কূটবুদ্ধি রঘুপতি রাজার নির্বাসন ঘটাইয়া যখন বহুকাল পরে আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিল তখন জয়সিংহের স্মৃতি যেন তাঁহাকে চারিদিক হইতে আঁকড়াইয়া ধরিল। উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন রঘুপতি জয়সিংহের স্মৃতির মধ্যে যেন নবজীবনের আশ্বাস পাইল।

> সোপানের বাম পার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় তেজস্বী এবং হরিণশিশুর মত সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল—তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। ইতিপূর্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড় জ্ঞান করিতেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল।

ইহাই রঘুপতির নবজীবনের প্রত্যূষ। এইটুকু ধরিতে না পারিলে রঘুপতি-চরিত্রের পরিণতি বোঝা যাইবে না।

বৌঠাকুরাণীর-হাটের রামচন্দ্র রায়ের মতো মেরুদণ্ডহীন ও দুর্বলচিত্ত হইলেও নক্ষত্ররায়কে মানুষ বলিয়া চেনা যায়। চরিত্রদৌর্বল্য ও ছেলেমানুষি সত্ত্বেও সে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে।

জয়সিংহ-ভূমিকা মহনীয়। কর্তব্যবোধের সঙ্গে রাজভক্তির ও হৃদয়বৃত্তির বিরোধ তাহার তরুণ অপাপবিদ্ধ হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। তাহার সমস্যার কাছে রাজার সমস্যা ছোট। এই ভূমিকায় লেখকের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে। জয়সিংহের জীবনপ্রীতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের কথাই বলিয়াছেন

> আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

পীতাম্বরের মতো নিতান্ত সাধারণ ভূমিকাও নক্ষত্ররায়ের প্রতি স্নেহশীলতার প্রকাশে উজ্জ্বল হইয়াছে।

হাস্যরসের তলে তলে কারুণ্যের স্রোত খুড়া-সাহেবের চরিত্রকে কমনীয় করিয়াছে। নির্বোধ গতানুগতিক জনগণের যে অব্যবস্থিত ও অযৌক্তিক মনোবৃত্তির ব্যঙ্গচিত্র রাজর্ষিতে পাই তাহা কঠোর হইলেও অবাস্তব নয়। গোবিন্দমাণিক্য যখন স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ভাইকে দিয়া চলিয়া যাইতেছেন তখন "কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না"।

রাজর্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া গিয়াছে॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাস ঃ ব্যক্তি ও সংসার সংঘর্ষ

১

রাজর্ষি রচনার পনেরো-যোল বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন আবার উপন্যাসরচনায় হাত দিলেন তাহার অনেক আগেই তিনি ছোটগল্পে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। সেই সিদ্ধি এখন 'চোখের বালি'[১] উপন্যাসেও দেখা গেল। সমাজের ও যুগযুগান্তরাগত সংস্কারের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিরোধ চোখের-বালির (ও পরবর্তী উপন্যাসের) বিষয়।

চোখের-বালির কেন্দ্রীয় ভূমিকা বিনোদিনীর। এই চরিত্রের উজ্জ্বলতায় সমগ্র উপন্যাসখানি উদ্ভাসিত। চোখের-বালি রচনার কিছুকাল আগে হইতেই রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী-চরিত্রের পরিকল্পনা করিতেছিলেন, এবং কাহিনীটিও মোটামুটি তাঁহার মনে একটি সমগ্র রূপ লইয়াছিল। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা দুইটি চিঠিতে বিনোদিনীর অলিখিত কাহিনীর উল্লেখ আছে।

> লেখা সম্বন্ধে নদীর উপমা খাটে না—যদি খাট্‌ত তা হলে আমার সেই বিনোদিনীর সুদীর্ঘ কাহিনীটি এতদিনে খাতার মধ্যে শেষ হয়ে থাকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে না লিখলে লেখা অগ্রসর হয় না—জগতের এমনি কঠোর নিয়ম।[২]
>
> বিনোদিনী লিখতে আরম্ভ করেছি—কিন্তু তার উপরে ভারতী এবং বঙ্গদর্শন উভয়েই দৃষ্টি দিয়েছেন।[৩]

কাহিনীটি বাস্তব হোক বা না হোক, লেখকের কল্পনায় তাহা অখণ্ডভাবে বিন্যস্ত হইবার পরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া চোখের-বালি বাঙ্গালা উপন্যাসের শিল্প-উৎকর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়াছে।

ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের অপেক্ষা মনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার আবর্ত ও তাহার পরিণতির গুরুত্ব আধুনিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চোখের-বালিতে পাত্র-পাত্রীর দ্বন্দ্ব অবলম্বনে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ স্বাভাবিক ও সুনিপুণ ভাবে

---

[১] প্রকাশ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ১৩০৮-০৯ (পুস্তকাকারে ১৩০৯ সালে)। রবীন্দ্রনাথ তখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক।

[২] শিলাইদহ ২৬ শ্রাবণ, বৎসরের উল্লেখ নাই (প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি পৃ ২৮৩ দ্রষ্টব্য)।

[৩] শিলাইদহ অথবা সাজাদপুর হইতে লেখা, তারিখের উল্লেখ নাই, তবে ঐ বৎসরেই পূজার ছুটির কিছুকাল আগে (ঐ পৃ ২৮০ দ্রষ্টব্য)।

চিত্রিত। তাই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। চোখের-বালির প্লট-বয়নের সূক্ষ্ম চাতুর্য আর কোন বাঙ্গালা উপন্যাসে অতিক্রান্ত নয়।

চোখের-বালির প্রধান ভূমিকা বিনোদিনীর। বিনোদিনী সুন্দরী শিক্ষিত শিল্পনিপুণ সেবাদক্ষ। এই মেয়ে ভাবী স্বামীর ও শ্বশুরালয়ের যে কল্পনাচিত্র মনে মনে আঁকিয়া রাখিয়াছিল তাহা ভাগ্যের বঞ্চনায়—মহেন্দ্রর মূঢ়তায়—বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। তাহার বিবাহ হইল পাড়াগাঁয়ে, এবং নূতন অবস্থায় নিজেকে সামলাইয়া লইবার সুযোগ পাইবার আগেই সে বিধবা হইয়াছিল। ফলে তাহার মানসপটে কুমারীজীবনের কল্পনাচিত্র লুপ্ত না হইয়া তাহার বুভুক্ষু হৃদয়ের উত্তেজনার বস্তু হইয়া রহিল। যে-মনোভাবের প্রেরণায় বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মীর সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল তাহা সাদাসিধা সহজবোধ্য ঈর্ষাই শুধু নয়, তাহার মূলে অন্য মনোভাবও ছিল। প্রথমত আশার মুখে তাহাদের প্রণয়লীলা শুনিবার নারীসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহল এবং তাহাতে তাহার অচরিতার্থ প্রেমতৃষা কথঞ্চিৎ মিটাইবার প্রয়াস। প্রেমবুভুক্ষা বিনোদিনীর অবচেতনায় যে বিশেষভাবে সজাগ ছিল তাহার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে দিয়াছেন।

> নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে মা যখন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য কলেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্রকণ্ঠ অতি ক্ষীণস্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তখন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানায় বালিশের উপর আশা তাহার খোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুন্-গুন্-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত,—তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

দ্বিতীয়ত তাহার নিজের যোগ্যতার ও দক্ষতার বোধ তাহাকে এই পীড়া দিত যে তাহার ন্যায্য সিংহাসন আজ আশার মতো অকর্মণ্য অবোধ বালিকার দখলে। বিনোদিনীর সম্বন্ধে বিহারী প্রথম হইতেই ঠিক ধারণা করিয়াছিল। বিহারীর

> মন বুঝিয়াছিল, এ-নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

মহেন্দ্রর প্রধান দুর্বলতা এই যে তাহার মন যথেষ্ট সবল ছিল না। তাই তাহার মানসিক সত্তা অপরের আশ্রয় না পাইলে দাঁড়াইতে পারিত না। বিবাহের পর মায়ের কর্তৃত্ব সে কাটাইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর অভিমান এবং মহেন্দ্রর প্রেমোন্মত্ততা মাতাপুত্রের স্নেহবন্ধন খানিকটা শিথিল করিয়া আনিয়াছিল। অথচ আশার এমন সাংসারিক জ্ঞান অথবা সহজ বোধ ছিল না যাহাতে তাহার উপর মহেন্দ্রর দুর্বল মন নির্ভর করিতে পারে। সুতরাং বিনোদিনীর কর্মনিপুণ

ও সবল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া মহেন্দ্রর নিরাশ্রয় মন যেন কূল পাইয়াছিল।

মহেন্দ্রর প্রতি বিনোদিনীর আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য বিহারীর অগোচর থাকে নাই। বিনোদিনীও বুঝিয়াছিল, "এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে—কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।" সে ইহাও বুঝিল, "বিহারীর সম্মুখে সশস্ত্র থাকিতে হইবে।" বিহারীকে আঘাত করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া আশাকে উপলক্ষ্য করিয়া সে বক্রোক্তি হানিতে থাকে। ইহাতে একদিকে যেমন বিহারী ব্যথা পাইতে লাগিল অপরদিকে তেমনি আশার মন বিহারীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রর মূঢ়তাও বিহারীকে দূরে ঠেলিতে লাগিল।

দমদমের বাগানে চড়িভাতি বিনোদিনীর জীবনে একটা বৃহৎ ঘটনা। রন্ধনের কাজে সহযোগিতা করিয়া বিহারী বিনোদিনীর মনে প্রসন্নতা জাগাইল। আহারান্তে মহেন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলে এবং আশা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলে বটগাছের তলায় বসিয়া বিহারী কথা প্রসঙ্গে বিনোদিনীকে তাহার দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বিনোদিনী যেন তাহার হারানো বাল্যজীবনের সরল সুন্দর দিনগুলি ফিরিয়া পাইল, তাহার নিজের—দেহের নয়, ব্যক্তিত্বের—উপর তাহার প্রথম আস্থা জাগিল এবং সেইজন্য নিজের প্রতি এবং সেই সঙ্গে বিহারীর প্রতি কিছু শ্রদ্ধাও অনুভব করিল। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব-উন্মেষের, দেহশয্যা হইতে তাহার মনের জাগিয়া ওঠার, এই ইঙ্গিতটুকু চমৎকার-ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বিনোদিনীর দৃঢ়তার অন্তরালে যে কোমল হৃদয়টুকু চাপা পড়িয়াছিল তাহাও এই কয় ছত্রে বিদ্যুৎবিচ্ছুরিত।

> ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দীঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথীর কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটা দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল।[১]

---

[১] তুলনীয়, "বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল,—তাহার অশ্রুহীন চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরে বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।" ('পুত্রযজ্ঞ', ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ পৃ ১০০)।

পুত্রযজ্ঞের বিনোদা-চরিত্রে চোখের-বালির বিনোদিনীর ক্ষীণচ্ছায় পূর্বাভাস লক্ষণীয়। নামের সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য।

নিরলস কর্মপরায়ণতা বিনোদিনীর স্বভাব। "কোনো কাজ যখন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে তখন সে আর কিছুই মনে রাখে না।" তাই সহজেই বিরোধ ভুলিয়া গিয়া বিনোদিনী কর্মপটু বিহারীর প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করিল এবং তাহার সুপ্ত নারীপ্রকৃতির কোমলতা বিহারীর কাছে মুহূর্তের জন্য উন্মুক্ত হইল। এইখানেই বিনোদিনীর নবজাগরণ শুরু।

আশা বিনোদিনীর প্রতিরূপ। বিনোদিনী খরযৌবন রূপসী, শিক্ষিত কর্মদক্ষ মনস্বিনী। আশা অনতিরূঢ়যৌবন শ্রীমতী, অপটু ভীরু সলজ্জ। বিবাহের আগে বিনোদিনী পিতামাতার স্নেহলালনসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। আশা দরিদ্রকন্যা, মাতাপিতৃহীন হইয়া ধনী জ্যেষ্ঠতাতের গৃহে অনুগ্রহলালিত, তাই সে সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। বিনোদিনীকে দেখিলে মোহ হইত, আশাকে দেখিলে মায়া হইত। বিনোদিনী তাহার যোগ্যতার গুণে রাজলক্ষ্মীর সংসারে স্থান করিয়া লইয়াছিল, অনুকম্পার উদ্রেক করিয়াই আশা মহেন্দ্রর বধূরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব হইতে বিনোদিনীর দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত, বিবাহের পর হইতে আশার ভাগ্যোদয়। তাহার দুর্ভাগ্যই যে আশার সৌভাগ্য এই কথা বিনোদিনী কখনো ভুলিতে পারে নাই, এবং ইহাই তাহার মনকে বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আশার ব্যক্তিত্ব নিরুদ্ধপ্রকাশ। তাই সে রাজলক্ষ্মীর সংসারে নিজের যথার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া লইতে এবং বিনোদিনীর সম্মুখে নিজের স্নিগ্ধ মহিমা বিস্তার করিতে পারে নাই।

> আত্মীয় গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোক-সাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুণ্ঠিতভাব ছিল। ভয় হইত পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে।

বিনোদিনীর সম্মুখে আশা নিজেকে সর্বদা খাটো করিয়া না রাখিলে রাজলক্ষ্মীর সংসারে বিনোদিনীর প্রতিষ্ঠা অতটা সহজে হইত না। আশা নিজেই বিনোদিনীর গুণমুগ্ধ ক্রীড়নক হইয়া বিজয়িনীর জয়যাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়াছিল।

অবুঝ পুত্রপরায়ণতা রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের দুর্বলতা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। আশার প্রতি তাঁহার বিরূপতার কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথমত পুত্র তাঁহার জা অন্নপূর্ণার বোনঝি আশাকে বিবাহ করিয়াছে। শুধু তাঁহার মতো অবহেলিত হইয়াছে বলিয়া নয়, আশা অন্নপূর্ণার সম্পর্কিত বলিয়াই রাজলক্ষ্মীর অসন্তোষ। দ্বিতীয়ত পুত্রবৎসল মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক ঈর্ষা। এতদিন মহেন্দ্র তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া ছিল, এখন সে পত্নীর অনুগত হইবে,—শুধু রাজলক্ষ্মীর নয় বাঙ্গালী বধূর

শাশুড়ীদেরই এই সাধারণ মনোভাব। তৃতীয়ত গৃহকর্মে আশার অপটুতা। বারাসতে গিয়া রাজলক্ষ্মী যখন বিনোদিনীর সেবানৈপুণ্যের পরিচয় পাইলেন তখন বিনোদিনীর শ্রেষ্ঠতা তাঁহার বধূবিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইল। বিনোদিনীকে বিবাহ না করিয়া মহেন্দ্র ঠকিয়াছে, ইহা জানাইবার জন্যই যেন রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর উপর সংসারের কর্তৃত্ব এবং আশার অনুপস্থিতিতে মহেন্দ্রর পরিচর্যার ভার দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে যে কথা উঠিতে পারে তাহা রাজলক্ষ্মী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই।

> স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না!
> মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিন্দার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন।

রাজলক্ষ্মী নিজের মন জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনের কথা বিনোদিনীর সজাগ অনুভবের অগোচর ছিল না। রাজলক্ষ্মী যখন মহেন্দ্রকে ভুলাইবার অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল

> আমার ছেলের দোষগুণ আমি জানি—কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী তাহা জানিতাম না,

তখন উত্তরে বিনোদিনী বলিয়াছিল

> সে কথা ঠিক পিসিমা,—কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই। একবার ঠাওর করিয়া দেখ দেখি।

রাজলক্ষ্মী পুত্রের অপরাধ না দেখিয়া বিনোদিনীর ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইলেন। বিনোদিনীর উপর তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গেলে পর তবেই তিনি আশার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। পুত্রকে গৃহবাসী করিতে না পারায় আশার উপর তাঁহার বিরক্তি জন্মিতেছিল, কিন্তু তাঁহার পীড়ায় আশার উদ্বেগ ও ব্যাকুল পরিচর্যা দেখিয়া রাজলক্ষ্মী অবশেষে পুত্রবধূর যথার্থ মূল্য বুঝিলেন। মহেন্দ্রর বিরহ শ্বশ্রূবধূর হৃদয় নিকটতর করিল। রাজলক্ষ্মীর ব্যথাতুর মন অন্নপূর্ণাকে কাছে পাইয়া সান্ত্বনা বোধ করিল। বিহারীর প্রচেষ্টায় অনুতপ্ত পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া রাজলক্ষ্মী নিশ্চিন্তমনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মূল-কাহিনীর সঙ্গে অন্নপূর্ণা-ভূমিকার যোগ খুব প্রত্যক্ষ না হইলেও অপ্রয়োজনীয় নয়। নিতান্ত অল্প আয়োজনে অন্নপূর্ণার চরিত্র স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসে একটি নির্লিপ্ত আত্মসমাহিত সদানন্দ ধৈর্যশীল শান্তরসাস্পদ চরিত্র থাকে যাহা কোন কোন প্রধান ভূমিকার ভক্তির আলম্বন হইয়া তাহার জীবনের ভারকেন্দ্র নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। চোখের-বালিতে অন্নপূর্ণা এমন ভূমিকা। অন্নপূর্ণা সংসারে যতই দুঃখ পাইয়াছেন

ততই ভগবানের কৃপা অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। কাশীবাস তাঁহার আবশ্যক ছিল না। তিনি কাশী গিয়াছিলেন শুধু রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষা হইতে সংসারের শান্তি রক্ষা করিতে। বিহারীর শিক্ষা অন্নপূর্ণার কাছে। আশাও কাশীতে গিয়া তাঁহার কাছে থাকিয়া সংসারের সেবাধর্মের মর্ম বুঝিয়াছিল।

চোখের-বালির নায়ক বলিতে যদি কোন ভূমিকা থাকে তো সে বিহারীর। উপন্যাসের প্রথমদিকে বিহারীর প্রকাশ ঘটিয়াছে মহেন্দ্রর ছায়ামণ্ডলের পিছনে। বিহারীর স্বভাব মহেন্দ্রর মতো আত্মপ্রকাশশীল নয়। তাই রাজলক্ষ্মীর মতো সকলেই তাহাকে

> ষ্টীম্‌বোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আস্‌বাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।

মহেন্দ্রর উপর বিহারীর প্রীতি স্নেহবিজড়িত, তবুও মহেন্দ্রর খামখেয়ালির ঝোঁক সহিয়া সহিয়া তাহার মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হইত না এমন কথা বলা চলে না। এই কারণেই সে মহেন্দ্রর প্রত্যাখ্যানের পর বিনোদিনীকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। আশাকে বিবাহ করিতে বিহারী নিজেই ইচ্ছুক ছিল। মহেন্দ্র ঝোঁক করিয়া তাহাকে বিবাহ করায় বিহারী ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। নবপ্রেমের উচ্ছ্বাসমত্ত মহেন্দ্র-আশার প্রতি মৃদু তিরস্কারের ঝাঁজেই শুধু এই ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং এইজন্যই আশাকে লইয়া বিনোদিনী ঠাট্টা করিলে অথবা মহেন্দ্র কটাক্ষ করিলে তাহা বিহারীর মনে লাগিত। মহেন্দ্রর আওতার বাহিরে বিহারীর যে একটা স্বতন্ত্র ও মূল্যবান্ সত্তা আছে তাহা ধরা পড়িল যখন সে মহেন্দ্রর সঙ্গচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীকে লইয়া বারাসতে গিয়া উঠিল।

> বৃদ্ধদের তাস-পাশার বৈঠক হইতে বাগ্‌দীদের তাড়িপান-সভা পর্যন্ত সে তাহার সকৌতুক কৌতূহল এবং স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত—কেহ তাহাকে দূর মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত।

মহেন্দ্রর পরিবেশমুক্ত বিহারীকে পূর্ণভাবে বিকশিত দেখিয়া বিনোদিনী প্রথম হইতে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং বিহারীরও অন্তরালবর্তিনী বিনোদিনীর প্রথম পরিচর্যা লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। বিহারী বিনোদিনীকে বারাসতে দেখে নাই, দেখিলে হয়ত তখন হইতেই আকৃষ্ট হইত। বিনোদিনীকে সে প্রথম দেখিল রাজলক্ষ্মীর সংসারে, কিন্তু তাহার দ্বারা আশা-মহেন্দ্রর অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া বিহারী তাহাকে ভালো মনে লইতে পারে নাই। তবুও

বিনোদিনীর স্বভাব সম্বন্ধে বিহারী গোড়া হইতে মোটামুটি সত্য ধারণাই পোষণ করিয়াছিল। বিহারী বুঝিয়াছিল

> এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়—সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

বিনোদিনীও বুঝিয়াছিল

> এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে—কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

দমদমের বাগানে দুপুরবেলায় বিনোদিনীর ছেলেবেলাকার গল্প শুনিয়া অজানিতে বিনোদিনীর প্রতি বিহারীর সজ্ঞান শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল।

বিহারী যতই বিচক্ষণ হোক না কেন বিনোদিনীর মতো নারীর ছলনা সবটুকু ধরিয়া ফেলা তাহার সাধ্য ছিল না। যখন বিনোদিনীর চলিয়া যাওয়ার কথা হইতেছে তখন সে আশার প্রতি কৃত্রিম স্নেহ জানাইয়া বিহারীর সম্মুখে যে অভিনয়টা করিয়াছিল তাহাতে বিহারী অবিচলিত থাকিতে পারে নাই। সমস্ত সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার মন বিনোদিনীর উপর প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল। ছলনালব্ধ হইলেও বিহারীর এই শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য বিনোদিনী পুলকিতচিত্তে গ্রহণ করিল। এই হইতে বিনোদিনীর উপরে বিহারীর মন ফেরা শুরু।

তাহার প্রতি মনে মনে কি-যে ভাব পোষণ করিয়া বিনোদিনী অধীর হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিহারীর নিকট প্রকাশ পাইল বিনোদিনীর মুখ হইতেই। মহেন্দ্রর নেশার পাশ হইতে মুক্তির আশা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া যেদিন বিনোদিনীর মন উচ্ছ্বসিত হইয়া নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করিল সেদিন বিহারী এই ভাগ্যবঞ্চিত নারীচিত্তের দুর্বিষহ বেদনা বুঝিতে পারিল। বিনোদিনীকে বারাসতে রাখিয়া আসিবার পর তবে বিহারী আত্মজিজ্ঞাসার অবসর পাইয়াছিল। যে-বিহারী কোনকালেই "নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই," সে "আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে কোনমতেই ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না", "একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল"। বিহারীর উদাসীনতা ও বিরাগ যেন বিনোদিনীকে বেশি করিয়া তাহার দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্রর বিপরীত আচরণ—প্রেমভিক্ষার কাতরতা—মহেন্দ্রর প্রতি বিনোদিনীর বিরাগ এবং বিহারীর প্রতি অনুরাগ বাড়াইয়া দিতে লাগিল। "বিহারী যে মানুষ, তাই সে পোষ মানিতে পারে না",—ইহাই বিনোদিনীর কাছে বিহারীর তীব্রতম আকর্ষণ। অবশেষে এলাহাবাদে আত্মগ্লানিকাতর বিনোদিনীর মন বিহারীর সম্মুখে স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠিলে

পর ভালোবাসিয়া শ্রদ্ধা করিয়া বিহারী অশ্রুবিধৌতকল্মষ বিনোদিনীর প্রেম স্বীকার করিয়াছিল।

বিনোদিনীর রুদ্ধ প্রেমতৃষার, অনুপলব্ধ আত্মরতির বলি হইল মহেন্দ্র। মহেন্দ্রর বয়স হইয়াছে, তবুও তাহার মন সম্পূর্ণভাবে ছেলেমানুষি ছাড়াইয়া উঠে নাই।

> কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

> বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল।

পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। বিহারীর নীরব সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের কাছে মহেন্দ্র মনে মনে মাথা নত করিল, "বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে"। সেইজন্য বিনোদিনীর পা টানাটানি করিবার সময় বিহারীর কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া মহেন্দ্র যেন একটা মুক্তির আনন্দ পাইয়াছিল।

> বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের ছিপিআঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

"হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রর উচিত-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া।" তাই আকর্ষণের তীব্রতা এবং প্রলোভনের দুর্নিবারতা সত্ত্বেও মহেন্দ্র শেষ অবধি ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। অবশ্য বিনোদিনীর বিরাগও এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। বিনোদিনী ঠিকই বুঝিয়াছিল, তাহার প্রতি মহেন্দ্রর যে ভালোবাসা তাহা আত্মপ্রীতিরই রূপান্তর। তাহাতে ক্ষমা নাই, ধৈর্য নাই, বেদনাসহিষ্ণুতা নাই। বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে, বিশেষ করিয়া বিহারীর হাতে তাহাকে তুলিয়া দিতে মহেন্দ্রর অহঙ্কারে বাধে, তাই সে সকল লাঞ্ছনা সহিয়াও বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু অপরের প্রতি অসীম প্রেম পোষণ করিয়া যে নারী নির্বাক ধৈর্য ও দুঃসহ দুঃখের ভারে ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহার প্রত্যাশায় কতদিন থাকা যায়। অপ্রাপ্যকে সাধনা দ্বারা লাভ করিবার মতো প্রেমের টান মহেন্দ্র কখনো জানে নাই। তাই মাতা ও পত্নী পরিত্যাগের অনুতাপগ্লানিতে এবং মনোভঙ্গক্লান্তিতে একদা অকস্মাৎ মহেন্দ্রর চিত্ত হইতে বিনোদিনীর মোহনির্মোক খসিয়া গেল। তখন আর চিরপরিচিত পুরাতন সংসারে ফিরিয়া আসিতে তাহার বাধিল না। তাহার আহত আত্মাভিমান সহজেই তাহাকে মাতৃবাৎসল্যের ও পত্নীপ্রেমের দিকে ধাবিত করিয়াছিল।

চোখের-বালির সূক্ষ্ম কৌশল ও জটিল কারুকর্ম নিখুঁত বলা চলে। নির্জ্ঞান ও সজ্ঞান মনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া লূতাতন্তুর মতো সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্বকে যে বিচিত্র রূপ দেয় তাহার এমন শিল্পচতুর সহৃদয় বিশ্লেষণ বিদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেও সহজলভ্য নয়।[১]

'নষ্টনীড়'[২] চোখের-বালির সমসাময়িক এবং সমপর্যায়ের কঠিন রচনা॥

২

'নৌকাডুবি'[৩] চোখের-বালির ঠিক পরে লেখা। রবীন্দ্রনাথের আর কোন দুইটি বড় উপন্যাস এত অল্পকাল ব্যবধানে রচিত হয় নাই। তবুও নৌকাডুবিতে চোখের-বালির প্রভাব ও অনুবৃত্তি নাই। বরং দুই তিন বৎসর পরে লেখা 'গোরা'র সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়। নৌকাডুবির কাহিনীর আসর চোখের-বালির অপেক্ষা অনেক বড়ো, পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও বেশি। প্রধানত এইজন্য নৌকাডুবির কাহিনী চোখের-বালির মতো অতটা সংহত ও সুডোল নয়। তার আরও একটি কারণ আছে। চোখের-বালির কাহিনী যেমন উপন্যাসরচনার আগেই লেখকের মনে সমগ্রতা পাইয়াছিল, নৌকাডুবির কাহিনী তেমন প্রথম হইতে একেবারে পরিপূর্ণ ভাবে পরিকল্পিত হয় নাই, লিখিতে লিখিতে কাহিনীটি পরিণামের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। এই কারণেই প্রধান ভূমিকা দুইটি—রমেশ ও হেমনলিনী—কিয়ৎপরিমাণে অসমাপ্ত ও উপেক্ষিত বলিয়া মনে হয়।

চোখের-বালিতে ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার সহিত সংসার-জীবনের সমস্যা ঘনীভূত, নৌকাডুবিতে ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার সহিত সমাজ-জীবনের সমস্যা

---

[১] অধুনা কথা উঠিয়াছে, চোখের-বালির সমাপ্তিতে যে বিনোদিনী-বিহারীর বিবাহ ঘটানো—যেমন অনেককাল পরে চতুরঙ্গে হইয়াছে—হয় নাই তাহার কারণ পিতা দেবেন্দ্রনাথ বিধবা-বিবাহ পছন্দ করিতেন না! চোখের-বালি বাহির হইবার সময় মহর্ষি জীবিত ছিলেন সে কথা সত্য। দেবেন্দ্রনাথ কোনও বিধবা-বিবাহ দেন নাই সে কথাও ঠিক, এবং বিধবা-বিবাহ তাঁহার কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না তাহা সত্য হইতেও পারে। কিন্তু পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন এই ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ চোখের-বালির গল্পের "স্বাভাবিক" পরিণতি ঘটিতে দেন নাই—এমন কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ-ব্যক্তিটিকে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহার শিল্প অনুধাবনেও তাঁহাদের মনোযোগ নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতাকে যতটা বুঝিতেন এমন আর কেহই নয়। আধুনিক সমালোচক তো নয়ই। বিনোদিনী ও দামিনী'র মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে—ভাবের, সংস্থানের ও কালের। সেই পার্থক্যই তাহাদের জীবনের পরিণতি ভিন্নরূপ করিয়াছে।

[২] ছোটগল্পের প্রসঙ্গে আলোচিত।

[৩] প্রকাশ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩১০-১২); গ্রন্থাকারে ১৩১৩।

বিজড়িত। চোখের-বালির কাহিনী-আবর্তে মানুষের মন যতটা দায়ী সাংসারিক অবস্থা ও দৈব-ব্যবস্থা ততটা নয়। নৌকাডুবিতে দৈব-ব্যবস্থা এবং সামাজিক-সংস্কার যতটা দায়ী মানুষের মন ততটা নয়। সামাজিক-সংস্কায় মানুষ দৈবগতিকে কত অসহায় হইতে পারে নৌকাডুবিতে তাহার একটি আলেখ্য পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুই উপন্যাসে, বৌঠাকুরাণীর-হাটে ও রাজর্ষিতে ব্যক্তিসত্তার দুর্বলতা (suseptibility) ও অনুভবশীলতার (sensibility) সংঘর্ষের পরিণতি দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় উপন্যাস চোখের-বালিতে গার্হস্থ্য-পরিবেশে ব্যক্তিবিশেষের ব্যাহত আত্মপ্রকাশের বিরোধ ফুটিয়াছে। চতুর্থ উপন্যাস নৌকাডুবিতে গার্হস্থ্য-পরিবেশে ও সামাজিক-পরিমণ্ডলে দৈবহত ব্যক্তির আত্ম-প্রকাশের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পঞ্চম উপন্যাস গোরায় সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমস্যার পশ্চাদ্‌ভূমিকায় ব্যক্তিগত সমস্যা খর্ব হইয়া গিয়াছে। এইরূপে দেখিতেছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্তির প্রকাশ সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান প্রসারণের দিকে অগ্রসর। এই পরিণতি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও লক্ষ্য করি। বাল্যে তিনি ছিলেন গৃহকোণে নিলীন। কৈশোরে ভ্রাতৃসন্তানদের লইয়া সখ্যবাৎসল্যমিশ্রিত প্রীতি তাঁহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। যৌবনে তাঁহার মন যেন বিহারীরই মতো আত্মগত কুণ্ঠিত সুদূর ও প্রসন্ন ছিল। প্রৌঢ় বয়সে বৃহত্তর জীবনের দেশের ও বিশ্বের সমস্যা তাঁহার মন অধিকার করিয়াছিল।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্রসমস্যার আলোচনা যা অব্যবহিত পরে 'গোরা'য় প্রধানভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার একটু আভাস নৌকাডুবিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষও নৌকাডুবিতেই প্রথম প্রকটিত।[১] গোরার কয়েকটি ভূমিকায় নৌকা-ডুবির কয়েকটি চরিত্রের ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখি। নৌকাডুবির অন্নদাবাবু এবং নলিনাক্ষ মিলিয়া গোরায় পরেশবাবুতে পরিণত। হেমনলিনী সুচরিতায়, অক্ষয় পানুবাবুতে এবং ক্ষেমঙ্করী হরিভাবিনীতে রূপান্তরিত।

নৌকাডুবির নায়ক আসলে রমেশ। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেলা রমেশের জীবনের ট্রাজেডিকে নিষ্করুণ করিয়াছে। হেমনলিনীর হৃদয়ের তবু একটা অবলম্বন ছিল —তাহার পিতৃবাৎসল্য। রমেশের কিছুই ছিল না। তাই ভাগ্যহত রমেশের বেদনা এত পীড়াদায়ক।

[১] 'সমস্যাপূরণ'এর মতো গল্পেও কিঞ্চিৎ আভাস আছে।

কমলার জীবন হইতে রমেশ অন্তরিত হইলে পর কাহিনীর রঙ্গমঞ্চে নলিনাক্ষ ডাক্তারের আবির্ভাব। এই আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য পাঠকের মন বেশ প্রস্তুত ছিল না। তবুও কাহিনীর পরিণতির পক্ষে তা অসঙ্গত নয়। নলিনাক্ষর মাতৃসেবার মধ্যে পিতৃপরায়ণ হেমনলিনী কিছু অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়াছিল। ইহার উপর তাহার আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ততা হেমনলিনীর মনে নলিনাক্ষর প্রতি ভক্তির সঞ্চার করাইয়াছিল। কিন্তু এই ভক্তি তাহার চিত্তে স্থিরতা আনিয়া দিতে পারে নাই, তাই নলিনাক্ষর অনুপস্থিতিতে হেমনলিনীর চিত্ত আবার অশান্ত হইয়া উঠিত। নলিনাক্ষও ভিতরে ভিতরে হেমনলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। এ ব্যাপার শুধু তাহার মা ক্ষেমঙ্করীই বুঝিয়াছিলেন।

তুমি ভাবিলে, আমার নলিন সন্ন্যাসীমানুষ, দিনরাত্রি কি-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন? হোক্ আমার ছেলে, তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়।

নলিনাক্ষর কর্তব্যবোধ সদাজাগ্রত। তাহার মনে তখনো সংশয় ছিল তাহার পরিণীতা বধূ হয়তো বাঁচিয়া আছে। সেইজন্য হেমনলিনীর সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলেও তাহার মন সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নাই। সুন্দরী কমলার গোপন পূজা যে তাহাকে টানে নাই এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। তবে তাহার কর্তব্যবোধই অত সহজে কমলাকে হৃদয়ে এবং সংসারে অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে তাহাকে প্রেরণা দিয়াছিল।

নৌকাডুবির অন্য পুরুষ-ভূমিকাগুলি নিজ নিজ বিশেষত্ব লইয়া বিকশিত হইয়াছে। অন্নদাবাবুর শরীর ও মন দুইই দুর্বল, অথচ কন্যাস্নেহে আঘাত লাগিলে এই নরম মানুষটি কত অনায়াসে কঠিন হইয়াছেন। যোগেন্দ্রর প্রকৃতি অধীর, মন সাদাসিধা, ব্যবহার রাফসাফ, কথাবার্তা চোখাচোখা। সে মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে পারে না, যাহা বলিবার তাহা মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া চুকাইয়া দেয়। অক্ষয়-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে কাজের লোক। স্বত হোক, পরত হোক "অক্ষয় যে ভার গ্রহণ করে তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না।" অক্ষয় মনে মনে হেমনলিনীকে পূজা করিত, এবং তাহার এই ভালোবাসা একেবারে স্বার্থপর ছিল না। রমেশের প্রতি তাহার ঈর্ষা খানিকটা বিদ্বেষের ভাব লইয়াছিল। তাহার ক্ষীণ আশা ছিল, রমেশকে তাড়াইতে পারিলে বুঝি বা হেমনলিনীকে পাওয়া সহজ হইবে। এ বিষয়ে যোগেন্দ্রর সাহায্যেও যখন কিছু করিতে পারা গেল না তখন হেমনলিনীর মুখ চাহিয়াই অক্ষয় আপনার স্বার্থ বলি দিয়া নলিনাক্ষকে আনিয়া দিল। স্টীমারের ক্ষুদ্র পরিসরে রমেশ ও

কমলা বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের, বিশেষ করিয়া কমলার দিক দিয়া এই ব্যবধান বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই উমেশের অবতারণা। শুধু তাই নয়। উমেশকে পাইয়াই কমলার নারীহৃদয়ের স্নেহবৃত্তির উন্মেষ আরম্ভ। উমেশ না থাকিলে আমরা স্নেহসরস পতিপূজারিণী কমলাকে পাইতাম না, সে রমেশের চিঠি পড়িয়া নিশ্চয়ই গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিত। উমেশের ভূমিকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চক্রবর্তী খুড়া ও তাঁহার স্ত্রী "সেজ বৌ"এর চরিত্রও তাই।

নৌকাডুবির নায়িকা কমলা কি হেমনলিনী সে-কথা বলা সহজ নয়। এক হিসাবে কমলা নায়িকা, যেহেতু তাহার চরিত্রেরই সম্পূর্ণ বিকাশ দেখানো হইয়াছে এবং তাহারি মিলনে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। অন্য হিসাবে হেমনলিনীকেই নায়িকা বলিতে হয়, যেহেতু তাহার চিত্তের দ্বন্দ্ব কঠিনতর এবং তাহার আঘাত দুঃসহ। কমলার মিলনে বই শেষ হইয়া গেলেও হেমনলিনীর বেদনা পাঠকচিত্তে বাজিতে থাকে, এবং কাহিনীর আদি হইতে শেষ পর্যন্ত হেমনলিনী পাঠকের মনে বিরাজ করিতে থাকে। নৌকাডুবির আসল দুর্ভাগিনী হেমনলিনী।

মানুষের প্রবৃত্তি সংস্কারের উপর কতখানি নির্ভর করে তা কমলার ভূমিকায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। যতক্ষণ কমলা জানিত যে রমেশ তাহার স্বামী ততক্ষণ তাহার উপর স্বাভাবিক প্রীতির অভাব হয় নাই। অবশ্য রমেশের আচরণে প্রীতি প্রেমে পরিণত হইবার সুযোগ পায় নাই, অধিকন্তু আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া সংকুচিত হইয়াছিল। তবুও তাহার নবজাগ্রত যৌবনের সমস্ত ব্যাকুলতা রমেশের তরফে এতটুকু আগ্রহের প্রত্যাশায় ছিল। ফুল ফুটিবার জন্য যেমন আলোকের প্রত্যাশা, তরুণীহৃদয় উন্মীলিত হইবার জন্য প্রীতি-প্রেমের উপর নির্ভরশীল। অবস্থা অনুকূল অথবা স্বাভাবিক হইলে রমেশের প্রেমই কমলার প্রেম জাগাইয়া দিত। তাহা না হওয়ায় উমেশের অনুরুক্তি, চক্রবর্তীর স্নেহ, এবং সর্বোপরি চক্রবর্তীর কন্যা শৈলজার সখ্য কমলার চিত্তকে পোষণ করিয়াছিল। চিঠি পড়িয়া কমলা যখন জানিতে পারিল যে রমেশ তাহার স্বামী নয় তখনি তাহার মন রমেশের প্রতি বিমুখ হইয়া গেল, এবং নিজের আচরণের লজ্জা তাহাকে যেন ধূলায় লুটাইল। যেখানে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয় নাই সেখানে সংস্কারের বিরুদ্ধতা সম্পর্ককে যে নিঃশেষে চুকাইয়া দিবে তা নিতান্ত স্বাভাবিক। এদিকে কমলার নারীহৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার হৃদয়নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে।

সুতরাং নদীস্রোত যেমন একদিকে বাধা পাইলে অপরদিকে দ্বিগুণ ঠেলা দেয় তেমনি কমলার মন তাহার অজ্ঞাত স্বামীর জ্ঞাত নামটুকু প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিল। ভাগ্যের প্রসন্নতায় সে অচিরকালে স্বামীর সান্নিধ্য পাইল। সৌম্যদর্শন শান্তস্বভাব প্রসন্নমুখ নলিনাক্ষ সহজে কমলার হৃদয়সিংহাসনে আরোহণ করিল।

হেমনলিনী কতকটা কমলার প্রতিরূপ চরিত্র। দেহসৌন্দর্যই কমলার প্রধান আকর্ষণ। নবযৌবনের দীপ্ত লাবণ্য লইয়া সে রমেশকে এবং নলিনাক্ষকে টানিয়াছিল। কিন্তু তাহার মন তখনো কাঁচা। সুন্দরী বলিতে যা বোঝায় সে-হিসাবে হেমনলিনী সুন্দরী ছিল কিনা সন্দেহ। তাহার আকর্ষণ চরিত্রের সৌকুমার্যে, তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখের শান্তরশ্মিতে।

> হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরণের সেই শাড়ীপরা, তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত-ভঙ্গী, তাহার হাতে…প্লেন-বালা এবং তার-কাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি…রমেশের বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্যন্ত……ঠেলিয়া উঠিল।

হেমনলিনী ছেলেবেলায় মা হারাইয়াছে, বোনও ছিল না। তাই তাহার মন হইয়াছিল অন্তর্মুখ। সে কমলাকে বলিয়াছিল

> ছেলেবেলা হইতে সব কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন খুলিয়া কথা বলিতে পারি না। লোকে মনে করে আমার বড় দেমাক।

হেমনলিনী-রমেশের প্রেম পরস্পরের উপর পরমবিশ্বস্ত। কমলাকে লইয়া রমেশের পলায়ন তাহার অপরাধের লক্ষণ বলিয়া সকলে গ্রহণ করিল। হেমনলিনীর বিশ্বাস টলিল না ঠিকই, তবে মনে সন্দেহ উঁকি দিতে লাগিল। তাহার সরল হৃদয় "রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে—সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে জোর করিয়া—আঁকড়িয়া রহিল।" রমেশ কিন্তু দূরেই রহিয়া গেল। পিতার সেবায় হেমনলিনী অন্তরের বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধ অন্নদাবাবুর কাছে মাতৃহীনা কন্যার বিধুর হৃদয়ের কথা অজ্ঞাত থাকে নাই। মায়ের কথা তুলিয়া কন্যা পিতাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত।

> চারিদিকে কলিকাতার কর্ম ও কোলাহল তাহারি মাঝখানে একটি গলির ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা, দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণ-চ্ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

হেমনলিনীর ক্ষুব্ধ ক্লান্ত মন নলিনাক্ষর বক্তৃতায় নিজের প্রতিধ্বনি পাইয়া তাহার উপর শ্রদ্ধাশীল হইল। তাহার পর মাতৃ-অনুরক্তির পরিচয় পাইয়া এই শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইয়াছিল।

মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরসভক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল।

নলিনাক্ষর আধ্যাত্মিকতার ও মাতৃভক্তিতে পিতৃনিষ্ঠ হেমনলিনীর বিরহিহৃদয় যেন একটা আশ্রয় পাইয়া বাঁচিল। নলিনাক্ষর সাধনপ্রণালী ও শুচি আচার এবং নিরামিষ-আহার অবলম্বন করিয়া হেমনলিনীর মন তৃপ্ত হইল। যেটুকু জোর মনে আসিল সেটুকু নলিনাক্ষর প্রত্যক্ষ প্রভাবে। "নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আহ্নিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত।"

নলিনাক্ষর উপর হেমনলিনীর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে কখনো প্রেমের রঙ ধরে নাই। পিতার মুখ চাহিয়া এবং নলিনাক্ষর শান্তহৃদয়ের সান্ত্বনায় ভরসা লইয়া হেমনলিনী বিবাহের প্রস্তাবে মত দিয়াছিল। নলিনাক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া এবং তাহার মায়ের সেবায় সহায়তা করিবার অধিকার পাইবে বলিয়া হেমনলিনী আত্মবিসর্জনে রাজি হইয়াছিল।

নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপর ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নাই—তা না-ই থাকিল! ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে-কোনো স্ত্রীলোকের ভালবাসার অপেক্ষা রাখে তাহা ত মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন ত সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন—নলিনাক্ষকে কে দেখিবে! এ-সংসারে নলিনাক্ষের জীবন ত অনাদরের সামগ্রী নহে—এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।

প্রেমাস্পদ এবং ভক্তিভাজন এই দুই লইয়া হেমনলিনীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহা রূপান্তরিতভাবে অনেককাল পরে 'শেষের কবিতা'য় দেখা গিয়াছে। পুরাতন বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে মনে করিয়া হেমনলিনী যে "একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আনন্দ অনুভব করিল", সে যে "নিজের জীবনের একাংশের নিঃশেষ-অবসানজনিত শান্তি লাভ করিল" তাহা সবটা সত্য নয়, অনেকটাই তাহার মনগড়া। তাই রমেশকে দেখিবামাত্র তাহার হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হওয়ায় দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া বাঁচিল। কিন্তু নিজের উপর তাহার বিশ্বাস আর রহিল না। উৎসাহ করিয়া সে ক্ষেমঙ্করীর আশীর্বাদী মকরমুখো মোটা সোনার বালা জোড়া পরিয়া আসিল, কিন্তু "সমস্ত শিষ্টালাপের মধ্যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস হেমনলিনীর মনকে আজ ভিতরে ভিতরে ব্যথিত করিতে লাগিল।"

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিতে রাখিতে হেমনলিনীর মন বোবা হইয়া গিয়াছিল। কমলার সঙ্গ পাইয়া তাহা যেন খুলিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া

রমেশের চিঠি পাইয়া তাহার চিত্ত আবার টলোমলো হইল। এই অসহায় নারীর নিদারুণ দুঃখ কল্পনা করিয়া নলিনাক্ষ ব্যথা বোধ করিল।

> ঐ যে নারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার স্থিরশান্ত মূর্তিটি উহার অন্তঃকরণকে কেমন করিয়া বহন করিতেছে?···ইহাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যায় কি না? কিন্তু মানুষে মানুষে কি দুর্ভেদ্য ব্যবধান! মন জিনিসটা কি ভয়ঙ্কর একাকী।

এই বৈরাগ্যবিধুর মূর্তি লইয়াই হেমনলিনী পাঠকের মনশ্চক্ষে শেষবারের মতো চিরকালের জন্য দাঁড়াইয়াছে।

নৌকাডুবির গৌণ নারী-ভূমিকার মধ্যে প্রধান ক্ষেমঙ্করী। সংসারে নানা আঘাত পাইয়া ক্ষেমঙ্করীর মন পুত্রপরায়ণ ও স্পর্শকাতর হইয়াছিল। তিনি আচারে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি যে ছুঁই-ছুঁই করিতেন তা "মনের ঘৃণা নয়—ও কেবল একটা অভ্যাস।" "সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড় ভালবাসিতেন", এবং "ছোটখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিস দেখিলেই তিনি না কিনিয়া থাকিতে পারিতেন না।" এই সৌন্দর্যপ্রিয়তার জন্যই কমলা অত সহজে তাঁহার সংসারে স্থানলাভ করিয়াছিল। ছেলের বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁহার ছেলের সহিত বিবাহে কোন মেয়ের অমত থাকিতে পারে—ইহা তাঁহার কল্পনায় আসে নাই। এইজন্যই অনেকটা অজ্ঞাতসারেই তিনি হেমনলিনীর প্রতি বিমুখ ও কমলার উপর প্রসন্ন এবং সকল দিকেই "হেমনলিনীর গর্ব খাটো করিতে উদ্যত" ছিলেন।

স্বার্থপর সাধারণ মেয়ের প্রতিভূ নবীনকালী। কমলাকে আশ্রয় দিয়া যে নবীনকালী নিজেই বর্তাইয়া গিয়াছিল তাহা কমলাকে সে কিছুতে বুঝিতে দেয় নাই, উপরন্তু সর্বদা কৃতজ্ঞতার দাবি তুলিয়া খাটাইয়া খাটাইয়া তাহার অবসর ভরাইয়া রাখিত।

> নবীনকালী যে কমলাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে রস ছিল না।

শৈলজার ভূমিকায়, বিশেষ করিয়া শৈলজা-কমলার সখিত্বে, বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার কথা মনে পড়ে।

> শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটখাটো—মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত—মুখ দেখিলেই স্থিরবুদ্ধি এবং শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।

আড়াল হইতে কমলার পতিপূজাও যেন পাচিকাবেশিনী ইন্দিরাকে স্মরণ করায়। আকৃতিতে এই বৈপরীত্যের জন্যই দুই সখীর অন্তরঙ্গতা অত শীঘ্র ও অনায়াসে জমিয়াছিল॥

৩

বঙ্গদর্শনে ও প্রথম সংস্করণে চোখের-বালির উপসংহার দীর্ঘ ছিল—রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরেও জের টানা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে তাহা ছোট করিয়া মাতাপুত্রের মিলনে শেষ করা হয়। (রচনাবলী-সংস্করণ হইতে, ১৩৪০, আবার পরিত্যক্ত অংশ গৃহীত হইয়াছে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপার জানিতেন না।)

নৌকাডুবি দীর্ঘকাল ধরিয়া লেখা এবং একটানা নয়। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিছু কিছু সংস্কার করিতে হইয়াছে॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাস : ব্যক্তি প্রতিযোগে আদর্শ

১

'গোরা'[১] বিরাট ও অভিনব সৃষ্টি। এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্য দিয়া সংসারের অথবা ঘটনার পাকে নরনারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। গোরায় উপন্যাসের আসর আরও বিস্তীর্ণ। আধুনিক ভারতবর্ষের কঠিনতম সমস্যা, হিন্দুসমাজের এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতার মরণ-বাঁচনের সমস্যা, এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত বিজড়িত। অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপন্যাস নৌকাডুবিতে সামাজিক-সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষের একটা পরিণাম প্রদর্শিত। গোরায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের, এবং ধর্মের সঙ্গে মানব সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের নির্দেশ উদ্ঘাটিত। ভারতীয় সংস্কৃতির উদার নিরপেক্ষতা, নিঃসঙ্গ ব্রাহ্মণ্যমহিমা, সার্বভৌম কারুণ্য, সর্বোপরি শান্ত সত্যনিষ্ঠা—এসকল সত্ত্বেও সমাজ-ব্যবহারে বৈষম্য, আচার-বিচারের নিগড়, জাতিভেদের জঞ্জাল এবং জনসাধারণের নিঃসহায় দারিদ্র্য ও অপরিসীম মূঢ়তা যে দেশকে তিলে তিলে মহতী বিনষ্টির পথে লইয়া যাইতেছে—তাহা উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তাহার সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তা সত্যসত্যই ভবিষ্যার্থকথা। হিন্দুসমাজের অনুদারতা, এবং আচারকে ধর্মের স্থানে প্রতিষ্ঠা করার মূঢ়তা যে অহরহ সমাজবেষ্টনীকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করিয়া জনজীবনকে নিষ্পীড়িত করিতেছে তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেহ এমনভাবে উপলব্ধি করেন নাই।

> হিন্দু-সমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই, খিড়কীর দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়—দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মায় এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজ সমষ্টিগত। যে সমাজ বাঁচিয়া আছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাকে প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখিতেই হয়। প্রত্যেক দেশের আকাশ জল বাতাস আলো গাছপালা জীবজন্তু নরনারী ইত্যাদির রূপে রঙে রসে স্বভাবে আচরণে কিছু না কিছু ভিন্নতা আছে। ভারতবর্ষের মানুষের

---

[১] প্রকাশ প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৪ হইতে ফাল্গুন ১৩১৬। গ্রন্থাকারে ১৯০৯।

দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব—আত্মদমন, ত্যাগ, অহিংসা ও মরণের পরপারেও জীবনকে দেখা। হিন্দুসমাজের বেড়া ঘুচাইয়া বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে যথাসম্ভব আপোস না করিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের এই সনাতন ভাবে যে অনুভাবিত সেই তো যথার্থ ভারতবাসী এবং যে-ই ভারতবর্ষে বাস করিবে সে-ই বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে পড়িবে। যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ না করিয়াও যে-কেহ ইংলণ্ডে বাস করিয়া সেখানকার আদর্শ অনুযায়ী চলিলে ইংরেজ-সমাজভুক্ত হইবার অধিকার হইতে সর্বথা বঞ্চিত হয় না তেমনি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সনাতন আদর্শের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং সেকালের সরল অনাড়ম্বর ত্যাগপরায়ণ আত্মসমাহিত আনন্দঘন ব্রাহ্মণ্যজীবনের প্রতি সুগভীর অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের রচনায়—কবিতায় এবং প্রবন্ধে—অজস্র-ভাবে ব্যক্ত হইলেও গোরায় যেমন তীক্ষ্ণ স্পষ্ট ও সাধারণবোধ্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে এমন আর কোথাও নয়। সমসাময়িক 'তপোবন' প্রবন্ধ[১] এই হিসাবে গোরার আংশিক ভাষ্য। তপোবন ও গোরা—এই দুইটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রচনার মর্মকথা একই।

> ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘট্‌বে ততদিন নানাদিক্ থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে।

গোরার ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধীর আগমনীর আভাস আছে। দুঃস্থ-দরিদ্র-নিপীড়িতের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের দুঃখনির্যাতন স্বীকার করিয়া লইয়া গোরা তাহার প্রতিরোধে শুধু আত্মিক বল লইয়া একাকী দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেইজন্য আদালতে সে স্বেচ্ছায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই। সে বলিয়াছিল, "এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারো সেই গতি।" ভারতবর্ষে নন্-কোঅপারেশন আন্দোলন শুরু হইবার প্রায় বারো বৎসর আগে গোরা লেখা হইয়াছিল। এ কথা মনে রাখিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় নেতাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজে যে পরিবর্তন আসিতেছিল তাহার অনুদারতায় ও স্বজাত্যবিমুখতায় রবীন্দ্রনাথ খুশি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি অপৌত্তলিক ধর্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং পৌত্তলিক হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার অন্তরের অনুরাগ

---

[১] প্রকাশ প্রবাসী পৌষ ১৩১৬।

থাকার কথা নয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথ পূর্বতন অনেক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই, রবীন্দ্রনাথ তাহাও করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের যে কোন ব্যক্তির তুলনায়ও অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল ছিলেন। কিন্তু যা সত্য তা তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন নাই। তাই তিনি গোরায় ঝানু ব্রাহ্ম পানুবাবুর মতো রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতাকে হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। মূর্তিপূজার মধ্যে ভক্তির প্রকাশ থাকিলে তাহাও তাঁহার কাছে অশ্রদ্ধেয় হয় না। তাই গোরাকে দিয়া বলাইয়াছেন

> আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কি না ঠিক বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি।...তুমি যখন তোমার মাসীর ঘরে ঠাকুরকে দেখ তুমি কেবল পাথরকেই দেখ, আমি তোমার মাসীর ভক্তিপূর্ণ করুণ হৃদয়কেই দেখি।

তপোবন প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথাই আর একভাবে বলিয়াছেন। যে কোন একটি বিশেষ

> নদীর জলে স্নান করিলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতির সম্ভাবনা আছে এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড় জিনিস বলে শ্রদ্ধা করিনে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি।

এক হিসাবে 'গোরা' নব্য ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা। ব্রাহ্মধর্মের গুণ এবং দোষ দুইই ইহাতে আশ্চর্য উদারতা ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিশ্লেষিত। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, অন্তত তখন পর্যন্ত ছিলেন। এইজন্য 'গোরা' পড়িয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভ হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় নাই।[১] রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যে অযথার্থ নয় তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। ব্রাহ্মরা বৃহৎ হিন্দুসমাজের বাহিরে নহেন,—তাঁহাদের মধ্যে এই মনোভাব প্রকট হইতে লাগিল। এবং বিনয়-ললিতার মতো হিন্দু-ব্রাহ্ম বিবাহও পরে অপ্রত্যাশিত ঘটনা হয় নাই।

বৃহৎ সামাজিক-সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান গোরার সব কথা নয়, এবং গোরা আধুনিক ভারতের মহাভারতমাত্রও নয়। সাধারণ অর্থে উপন্যাস বলিতে যাহা বোঝায় সে-হিসাবেও গোরা উত্তুঙ্গ রচনা। এতদিন পর্যন্ত বাঙ্গালা উপন্যাসে একমাত্র রস ছিল মধুর অর্থাৎ প্রেম। বাৎসল্যের মতো রসের ছোঁয়া উপন্যাসে সাধারণত করুণরসের উপকরণ হিসাবেই চলে। চোখের-বালিতে

[১] অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যতালিকা হইতে নাম তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বাৎসল্যরস নাই বলিলেই হয়, এবং নৌকাডুবিতে কিছু থাকিলেও তা গৌণ। গোরায় প্রেমরসের সঙ্গে সখ্য-বাৎসল্য-শান্তরসের সমান যোগান। বর্ষীয়ানের সখ্য-রস ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম দেখিলাম।

চোখের-বালিতে ঘটনাস্রোত ঢেউ তুলিয়াছে অতৃপ্ত হৃদয়ে সুপ্ত বাসনার জাগরণে আর অবচেতন মনে ঈর্ষাবৃত্তির দংশনে। নৌকাডুবিতে অদৃষ্টের পাকচক্রের সঙ্গে সচেতন মনের স্বার্থকাজ্ক্ষা যোগ দেওয়ায় কাহিনী জটিল হইতে জটিলতর হইয়াছে। গোরায় অদৃষ্টের চক্রান্ত নেপথ্যেই চুকিয়া গিয়াছে এবং তাহারি ফল এবং মহৎ হৃদয়ের অন্তরালে থাকিয়া সংস্কারের ও সমাজের ছোট বড় সহস্র বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে কাহিনীকে প্রশান্ত পরিণতিতে পৌছাইয়া দিয়াছে।[১]

গোরা এক আইরিশ সৈনিকের ছেলে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এক সৈনিক-পত্নী কৃষ্ণদয়ালের গৃহে আশ্রয় লয় এবং সেইখানে পুত্রপ্রসব করিয়াই মারা যায়। গোরাকে পাইয়া স্তনন্ধয়প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া নিঃসন্তান আনন্দময়ীর মাতৃহৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই পত্নীর মুখ চাহিয়া কৃষ্ণদয়াল গোরার জন্মকথা তখন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। গোরা বড় হইলেও পারিলেন না—দুই কারণে, প্রথমত আনন্দময়ী বেদনা পাইবেন, দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় শিশুকে লুকাইয়া রাখার জন্য গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে শাস্তি দিবে। গোরার জন্মরহস্য রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর মধ্যে সুকৌশলে ঢাকিয়া রাখিয়া একেবারে গল্পের শেষে আসিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তবে মধ্যে মধ্যে অনেকবার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে গোরা আনন্দময়ীর গর্ভজাত নয়, এবং তাহাকে লইয়াই আনন্দময়ীকে সমাজপ্রচলিত আচার-বিচারের খুঁটিনাটি ছাড়িতে হইয়াছে। গোঁড়া বামুন-পণ্ডিতের পৌত্রী আনন্দময়ী আচারবিচার মানেন না কেন, এই অনুযোগ করিলে আনন্দময়ী গোরাকে বলিয়াছিলেন

> তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েচি তা জানিস্? ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেচি সেদিন থেকে ও কথা নিশ্চয় জেনেচি যে আমি যদি খৃষ্টান ব'লে ছোট জাত ব'লে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বরও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন।

---

[১] গোরার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজের ছায়া পড়িয়াছে। শুধু আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতেও গোরা রবীন্দ্রনাথের ছায়াবহ। কোন কোন ঘটনাও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষীকৃত। চরঘোষপুরের ব্যাপার এইরূপ একটি বাস্তব ঘটনা। পাবনা প্রাদেশিক-সম্মিলনী অভিভাষণে (১৩১৪) এই ঘটনার উল্লেখ আছে ('সমূহ' পৃ ১০২-১০৩)।

আনন্দময়ীর কথায় বিনয়ের মনেও খটকা লাগিয়াছিল। গোরা ইউরোপীয়-সন্তান, খ্রীস্টান, সুতরাং হিন্দুসমাজের আচার-বিচারে এবং হিন্দুধর্মের পূজা-অনুষ্ঠানে তাহার অধিকার নাই,—এই ধারণা যদি কৃষ্ণদয়ালকে কুণ্ঠিত না করিত এবং আনন্দময়ীকে মাঝে মাঝে পীড়া না দিত তাহা হইলে কাহিনীর উৎপত্তিই হইত না। দৃঢ়মূল সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ গোরা-কাহিনীর এক বীজ।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে গোরার আইরিশ-সন্তান হওয়া কাহিনীর পক্ষে একান্তই আবশ্যক ছিল কি না। গোরাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গড়িয়াছেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার যে মনোভাব এবং ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার সেবার যে প্রয়োজন—তাহাতে গোরাকে এমন পদস্থান লইতে হইয়াছে যেখানে সে ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়াও বিবিক্ত রহিতে পারে। ভারতবর্ষের উপর গোরার সাজাত্যের স্বতঃসিদ্ধ দাবি নাই, তাহার দাবি অনুরাগের, ভক্তির, সত্য-উপলব্ধির। এইজন্য গোরাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতার, সমস্ত ক্ষুদ্রতার, সমস্ত ভেদাভেদের, সমস্ত সংস্কারের বহির্ভূমিতে। দেহমনের তেজ প্রখর না হইলে এমন কঠিন সাধনায় অগ্রগমন হয় না, তাই গোরাকে বিদ্যুদ্‌গর্ভস্তনিতবচন দেব বজ্রপাণির মত করিয়াই গড়িতে হইয়াছে। তাহা না হইলে বহু শতাব্দের আবর্জনাকে ভস্মসাৎ করিবে কে। এই তেজস্বিতার জন্য এবং মুক্তিচিত্ততার জন্য গোরাকে আইরিশ দম্পতীর সন্তানরূপে আনন্দময়ীর ক্রোড়ে জন্ম লইতে হইয়াছে।

গোরা-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য অসামান্য প্রবলতা—কায়ে বাক্যে এবং মনে। বপুষ্মান্ সে, কাহারও চোখ এড়াইয়া যাইবার যো নাই। দেহের অসামান্যতায় চরিত্রের দৃঢ়তায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিশ্বাসের কঠোরতায় ইচ্ছার প্রচণ্ডতায় মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের মর্মভেদী প্রবলতায় গোরার ব্যক্তিত্বের দুর্দম প্রকাশ।

> তুমি মনে কর যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই দিয়েছেন, আর আমরা সবাই দুর্বল প্রাণী।

বিনয় ঠিকই বলিয়াছিল, এবং সেকথা গোরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

> সব বিষয়েই যতটা দরকার আমি তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি, সেটা যে অন্যের পক্ষে কতটা অসহ্য তা আমার ঠিক মনে থাকে না।

পূজা-অনুষ্ঠান ও ঠাকুর-ঘর হইতে গোরাকে তফাৎ রাখিতে গিয়া কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী গোরার নির্জ্ঞান মনে বিরুদ্ধতা জাগাইয়া হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের

প্রতি তাহার আগ্রহ অস্বাভাবিকভাবে বাড়াইয়া দিয়াছিল। গোরার প্রবল বিশ্বাস এবং প্রচণ্ড ইচ্ছার মধ্যে জবরদস্তির ভাব ছিল, তাই বুদ্ধির দ্বারা তলাইয়া না দেখিয়া আচার-অনুষ্ঠানের কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়াই গোরার দেশপ্রীতি সাময়িক তৃপ্তি পাইয়াছিল। আনন্দময়ীর স্নেহ গোরার হৃদয়ে পরিপক্ক হইয়া পরে উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। অবিনাশের উৎসাহের স্রোত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গোরা যখন ছটফট করিতেছিল তখন "বেহারা আসিয়া খবর দিল, মা গোরাকে ডাকিতেছেন।" মা ডাকিতেছেন,—এই আহ্বানে যেন তাহার মোহ দূর হইয়া দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। ভারতবর্ষের জ্যোতির্ময় সৌম্য রূপটি সে প্রত্যক্ষ করিল।

এই মধ্যাহ্নসূর্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

গোরার হিন্দুয়ানির মধ্যে উগ্র বিদ্রোহের ভাব ছিল। ইহার কারণ দুইটি। এক—দেশের দুর্গতির প্রতি শিক্ষিতলোকের নিশ্চিন্ত উদাসীনতা, দুই—উপর-পড়া হইয়া মিশনারি-মনোভাবজনিত সংস্কারপ্রচেষ্টা। গোরা জানিত দেশের দুর্গতি মোচন করিতে হইলে, সমাজের গলদ দূর করিতে হইলে, ভিতর হইতে সহজ ভাবে এবং শ্রদ্ধার সহিত কাজ করিতে হইবে। যাহার ভালোবাসা নাই তাহার তিরস্কার অথবা সংশোধন করিবার অধিকারও নাই। তখন ব্রাহ্মসমাজ ছিল শিক্ষিত ও সংস্কারক দলের নিলয়। সেইজন্য পরেশবাবুদের বাড়ী যাইবার সময় "শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই-পড়া ও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা এক জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতা" পরিয়া "যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মত আসিয়া উপস্থিত হইল।"

গোরার প্রকৃতির মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতার ভাব ছিল যাহাতে খুব অল্প লোকেই তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে উৎসাহিত হইত।[১] হয়ত এই কারণেই যৌবনের স্বাভাবিক প্রেরণা সত্ত্বেও সে এতদিন নারীপ্রেমের আকর্ষণ

[১] এখানে গোরার সঙ্গে গোরার স্রষ্টার স্বভাবগত সুগভীর মিল আছে। পশ্চিমযাত্রীর-ডায়ারীর একস্থানে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হ'য়েচে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নাম্‌তে হচ্চে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে ব'সতে পারিনি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম, শত্রুরা ভাবে অহঙ্কারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলো পাল গোটাতে সময় দিলে না, রসি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেচি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েচে, সে কোনো কৈফিয়ৎ দিলে না।"

অনুভব করে নাই। আনন্দময়ীর বাৎসল্য আর বিনয়ের সৌহৃদ্য ইহাই গোরার হৃদয়বৃত্তির একমাত্র অবলম্বন ছিল। গোরার বিবিক্ততায় সময়ে সময়ে বিনয়ও দূরে পড়িয়া যাইত, এবং আনন্দময়ীও তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিতেন। পরেশবাবুর বাড়ীতে সুচরিতাকে দেখিয়া, তাহার সহিত তর্ক করিয়া, এবং তাহার কিছু শ্রদ্ধালাভ করিয়াও গোরা সুচরিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। কারণ বিনয়কে ভাঙ্গাইয়া লইতেছে মনে করিয়া তাহাদের প্রতি গোরার যেন বিরাগ ছিল। কেবল পরেশবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাই তাহাকে কিছু নরম রাখিয়াছিল। নারীর কল্যাণহস্ত পুরুষের জীবনকে কী অপূর্ব সম্পদে ভরিয়া তুলিতে পারে সে কথা যখন বিনয় নিশীথ রাত্রিতে ছাদে বসিয়া বলিতেছিল তখনি গোরার মনে একটা অজানিত ক্ষুধার চমক জাগিল। মানবহৃদয়ের এই প্রেম-উদ্দীপনা যে একটা সত্য পদার্থ তাহা গোরার কাছে এমনভাবে কখনো প্রকাশিত হয় নাই।

> এই সমস্ত ব্যাপারকে সে এতদিন কবিত্বের আবর্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে—আজ সে ইহাকে এত কাছে দেখিল যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না।···তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এতদিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎনিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।

কিন্তু এ মায়া কদিন থাকে। দেশের মহামায়া তাহাকে মহাশক্তির টানে দিবা-রাত্রি টানিতেছে। তাই বিনয়ের প্রত্যক্ষ নারীপ্রেম গোরাকে অপ্রত্যক্ষ স্বদেশ-প্রেমকেই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উত্তেজনা দিল। গোরা বলিল

> তুমি এতদিন বই-পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি—প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হ'ল তখনি বুঝতে পেরেছ বইয়ের জিনিসের চেয়ে এ কত সত্য। স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও রক্ষা নাই···তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে—তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনোদিন বুঝতে পারব কি না জানি না—কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করচি।

বলিতে বলিতে গোরার ভাবঘনচিত্তে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে যেন ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিল।

> ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটি জ্যোতির্ময় শতদলে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল—তাহার সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

গোরার মতে, দিন আর রাত্রি—কালের এই দুই ভাগের মতো, সমাজেরও দুই ভাগ, পুরুষ আর নারী।

> সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই ব'লে তার যে গভীর ধর্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না। সে গোপনবিশ্রামের অন্তরালে আমাদের ক্ষতি পূরণ করে আমাদের সহায়তা করে।

এই একদেশদর্শিতা গোরার আদর্শের একটা ত্রুটির মতো ছিল। সুচরিতাকে ভালোবাসিয়া এবং তাহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পাইয়া সে ত্রুটির সংশোধন হইয়াছিল।

গোরার স্বদেশপ্রেম একসঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত ও আনন্দঘন। তবে বুদ্ধির অংশই বেশি। তাই তাহার আদর্শের খুঁতগুলি সে মানিতই না, সর্বদা সেগুলির অনুকূলে চোখাচোখা যুক্তি খাড়া করিয়া মনকে শক্ত করিয়া রাখিত। প্রচণ্ড সহানুভূতি এবং ন্যায়বোধ গোরার স্বদেশপ্রেমের আনন্দময়তার উৎস। এইজন্য গোরার ইমোশনে ঘরে-বাইরের সন্দীপের লোভার্দ্র ভাবালুতার লেশমাত্র ছিল না। সত্যকে, আদর্শকে গোরা বুদ্ধির সাহায্যেই খুঁজিত। কিন্তু বুদ্ধির নাগালের তো সীমা আছে। সত্য অনুভবের বস্তু, বিশ্লেষণের নয়। গোরার মধ্যেও অনুভব ছিল, এবং সে অনুভবের মূলে ছিল ঐক্য-উপলব্ধির আনন্দ।

> ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে, এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও মহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই আমি আমার এই ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ দেব ব'লে ঠিক করেছি।

কিন্তু আত্মোপলব্ধির দ্বারা এই আনন্দ-অনুভবকে স্থায়ী করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরেশবাবুও গোরার মতো নিরাসক্ত, তবে তাঁহার নিরাসক্তির সঙ্গে প্রবলতা অথবা উদাসীনতা ছিল না, তিনি ছিলেন উপলব্ধিজাত ভক্তিতে ও শান্তিতে ভরপূর। মতে না মিলিলে গোরা বন্ধুকে হয় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিত নয় একেবারে ত্যাগ করিত, কিন্তু পরেশবাবু সকলকেই ছাড়িয়া দিতেন নিজের নিজত্বে বিকশিত হইয়া উঠিতে। পরেশবাবুর সম্পর্কে আসিয়া গোরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার আদর্শে, তাহার সত্যে ধর্মের স্থান নাই বলিয়া তাহা সে সর্বান্তঃকরণে অবিরোধে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরেশবাবুর আত্মসমাহিত প্রশান্তি গোরাকে দেখাইয়া দিল যে ধর্মের অতিভূমিতে উঠিলে সর্ব বন্ধ দূর হইয়া যায় এবং ভারতবর্ষের চিরকালের আকাঙ্ক্ষিত তিতিক্ষা-ধৈর্য-সেবার সিদ্ধি লাভ হয়। গোরার জন্মরহস্য ভেদ হইলে পরে তবে সে জানিতে

পারিয়াছিল যে সে এমন এক স্থান পাইয়াছে যেখানে সমস্ত ভেদাভেদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া তাহার পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। তখনি গোরার কাছে মাতৃস্নেহ এবং দেশপ্রেম এক হইয়া গেল। ইহার সহিত সুচরিতার ভালোবাসা ও পরেশবাবুর প্রশান্তি তাহার চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া সেবা-ভক্তির পথ দেখাইয়া দিল। গোরার জীবন-সাধনা পরিপূর্ণতার পথে দাঁড়াইল।

বিনয় দেহে-মনে গোরার প্রতিরূপ, ছায়া নয়। বাঙ্গালী ভদ্রঘরের কলেজে-পড়া বুদ্ধিমান্ ভালো ছেলে যেমন হইতে পারে বিনয় তেমনিই।

> বিনয় সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত নয়, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনোমতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারে না।

গোরার মতো বিনয়ের চিত্তে জবরদস্তি ছিল না, বাঙ্গালী সে, হৃদয়বৃত্তি তাহার প্রবল। গোরার প্রচারিত অধিকাংশ মত বিনয় বন্ধুর ভালোবাসার খাতিরেই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছিল।

> তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তার চেয়ে বেশী না মানিয়া থাকিতে পারে না।

বিনয়ের মন বড় কোমল, যাহাকে সে ভালোবাসে বা শ্রদ্ধা করে তাহাকে সে সহসা ত্যাগ করিতে পারে না। তাহার বুদ্ধি পরিষ্কার, জেদের বশে সে একদিক দেখিয়া অপর দিকে পিঠ ফিরাইয়া রহিত না। গোরার মতে

> বিনয়ের দোষ এই সে একটা জিনিষের দুই দিক না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না।

সেইজন্য তর্ক উঠিলে বিনয়ের বুদ্ধি শাণিত শস্ত্রের মতো ঝলক দিত। গোরার একগুঁয়েমির কাছে হার মানিয়াই সে বন্ধুত্ব অটুট রাখিয়াছিল।

> গোরা নিজের সমস্ত মত, উৎসাহ, সঙ্কল্প লইয়া বিনয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বিনয় সেইজন্য কেবল মত প্রকাশ এবং তাহা লইয়া তর্ক করিতে পটু ছিল। প্রবন্ধ লেখা, সভাস্থলে বক্তৃতা করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু লোকজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে আলাপ করা কিংবা একটা সাদা চিঠি লেখা তাহার দ্বারা সহজে হইতে পারিত না।

পরেশবাবুর সংসারে অনাত্মীয় নারীর নিঃসঙ্কোচ সংস্পর্শে আসিয়া বিনয়ের আত্মা যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল। তখন সে গোরার বিরুদ্ধতার সম্মুখেও নিজের

মত ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। গোরার প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে নিপীড়িত বিনয়ের সৌহার্দ্য এখন যেন খোলা হাওয়ায় বিস্তারিত হইল।

> এতদিন পরে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে লোককে খুসি করিতে পারে এমন কি শিক্ষা দিতেও পারে।

পরেশবাবুর বাড়ীর আতিথ্য স্বীকার বিনয় অনুচিত বলিয়া মনে করে নাই। বরং তাহার হৃদয়মনের এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহার পুরাতন আকর্ষণগুলিকে মধুরতর করিয়াছিল। কিন্তু গোরার চিত্ত স্বার্থপর—কেননা তখনও তাহার মন নারীসঙ্গমাধুর্যের স্বাদ পায় নাই। তাই পরেশবাবুর বাড়ীতে বিনয়ের যাওয়া-আসা গোরাকে এই বেদনা দিতে লাগিল যে

> বিনয়ের চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে, যে পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোন সম্পর্ক নাই।

বিনয়ের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য গোরার জীবনের একটা বড় অবলম্বন ছিল, সেকথা গোরা বরাবরই জানিত। তাই বিনয়ের নিন্দা করাতে সে বিরক্ত হইয়া অবিনাশকে বলিয়াছিল

> তুমি কি মনে কর বুদ্ধিতে ক্ষমতাতে বিনয় আমার চেয়ে কোন অংশে ছোট! তুমি জান তার সাহায্য না পেলে আমার নিজের মত ও বিশ্বাস আমার নিজের কাছে আজ এত স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠত না।

অনাত্মীয় তরুণীর সঙ্গে বিশ্রব্ধ পরিচয়ের কুণ্ঠা বিনয়ের ভূমিকাকে কাহিনীর উপক্রমেই সজীব ও স্বাদু করিয়াছে। সুচরিতার প্রতি তাহার অনুরাগ স্বাভাবিক ভালোলাগার বেশি কিছু ছিল না, এবং সে ভালোবাসা বিনয়ের মনে রঙ ধরাইবার আগেই গোরার প্রতি সুচরিতার অনুরাগ তাহার কাছে ব্যক্ত হইয়া গিয়াছিল। ললিতা-বিনয়ের অনুরাগ একটা যেন বিরুদ্ধতাকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অসামান্য মেয়েটির মনস্বিতায় বিনয় প্রথম হইতেই একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর তাহার সুস্পষ্ট সতেজ ইংরেজী উচ্চারণ ও আবৃত্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সর্বোপরি গোরার অপমানে বিনয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়ানোয় এবং তাহার সঙ্গে স্টীমারে চলিয়া আসায় বিনয়ের চিত্তে নির্ভর প্রেমের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

> ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল।

এই প্রেমের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড বাধা দাঁড়াইল ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণতা এবং

বিনয়-ললিতার আত্মসম্মান। পানুবাবু ব্রাহ্মসমাজের নামে বারবার পরেশবাবুকে আঘাত দিতে লাগিল বলিয়া ললিতার মনে বিরোধ জাগাইয়া তাহাদের বিবাহসম্ভাবনা সম্ভব করিল এবং অচিরে বিবাহ ঘটাইয়া দিল। আনন্দময়ীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া এবং পরেশবাবুর উদারদৃষ্টির আশীর্বাদ দম্পতীকে সাংসারিক সামাজিক এবং পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া নির্বিঘ্নে পার করাইয়া দিল।

পরেশবাবুর ভূমিকা গোরা উপন্যাসের কেন্দ্রস্থানীয়। ইহারই চরিত্রপ্রভাব প্রধান পাত্রপাত্রীগুলিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। প্রাচীনকালের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহপতির আদর্শ আধুনিককালের ভাবের ভিয়ানে পরিপক্ব হইলে যেমন হয় পরেশবাবু তেমনিই। পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাকিয়াও অন্য সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। তিনি সত্যের উপাসক। ঈশ্বরের কাছে তাঁহার এই প্রার্থনা ছিল

> ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্বত্রই নতশিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করিতে পারি—বাইরের কোনো বাধা আমাকে যেন আটক ক'রে না রাখতে পারে।

যৌবনে ধর্মমতের স্বাধীনতার জন্য হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, তাই স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা অন্তরে তিনি সর্বদাই পোষণ করিতেন। সকলকেই, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকেও, তিনি "তার জায়গাটুকু" ছাড়িয়া দিতেন। গোরার সঙ্গে তাঁহার এই এক বৈপরীত্য। পরেশবাবু নিজের বুদ্ধির উপরেই আস্থা রাখিতেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে তিনি বেশি নির্ভর করিতেন। তাই তাঁহার নিজের ইচ্ছার ও মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ হইলে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করিয়া দুঃখ পাইতেন না। পরেশবাবুর মনের জোর বুদ্ধিনির্ভর নয়, তাহা সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আস্থার জোর। এইজন্য তাঁহার জোরের কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

> নিজের জোর তিনি কোথাও কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই কিন্তু তাঁহার মধ্যে কত বড় একটা জোর অনায়াসেই আত্মগোপন করিয়া আছে।

গোরার ব্যাপার কিন্তু ঠিক তার উল্টা।

> গোরার কাছে তাহার নিজের ইচ্ছা কি প্রচণ্ড! এবং সেই ইচ্ছাকে সবেগে প্রয়োগ করিয়া সে অন্যকে কেমন করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে!

মানুষের মহত্ত্বের একটা দিক যেমন পরেশবাবুতে প্রকাশিত আর একটা দিক তেমনি আনন্দময়ীতে। আনন্দময়ী যেন কৃষ্ণলীলার যশোদা। যাহাকে

আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার মতো কোন দাবি দাওয়া নাই এমন পরের ছেলের উপর স্নেহ আত্মজ-প্রীতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। চিত্তের প্রশান্তিতে ও উপলব্ধিতে পরেশবাবু যেখানে পৌঁছিয়াছেন, শুধু মাতৃহৃদয়ের সকরুণ বাৎসল্য লইয়া আনন্দময়ীও সেই অতিভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আনন্দময়ীর বাৎসল্যের সাধনা, এবং তাহাতেই তাঁহার অধ্যাত্মসিদ্ধি। গোরা আর বিনয় এই দুই ক্রোড়দেবতাকে তিনি

> তাঁহার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সংসারে ইহাদের চেয়ে বড় তাঁহার আর কেহ ছিল না।

যে-গোরাকে কোলে পাইয়া তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পৌত্রী হইয়াও আচার-বিচারে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সেই-গোরাই আবার অতিমাত্রায় আচারবিচারপরায়ণ হইয়া তাঁহার হাতের রান্না খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু কোনরকম দুঃখকষ্ট তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

> সমস্ত উদ্বেগ নিস্তব্ধভাবে পরিপাক করাই তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি শান্তভাবেই গ্রহণ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের আক্ষেপ কেবল অন্তর্যামীরই গোচর ছিল।

তাই গোরা হাজতে গিয়াছে শুনিয়াও তিনি অযথা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নাই।

> তিনি চোখের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ বেদনার ছায়া লইয়া ঠোট চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

আনন্দময়ীর চারিদিকে একটি সকরুণ শান্তির হাওয়া বহিত, এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে অন্তরের অশান্তি-বিদ্রোহের তাপ যেন জুড়াইয়া আসিত, "চারিদিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিত।" তাই বিনয় বলিয়াছিল

> মা, ইচ্ছা করে আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ঐ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করি। কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই না থাকে।[১]

গোরার দেশপ্রেমের মূলে আনন্দময়ী। তাঁহারি স্নেহঘন মাতৃমূর্তির ছায়া সমগ্র দেশকে ব্যাপিয়া যেন গোরার হৃদয়কে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল। গোরার পরম উপলব্ধির শেষেও আনন্দময়ী। তাঁহারি মধ্যে দেশমাতৃকার কল্যাণময়ী প্রতিমা দেখিয়া তাহার চরিতার্থতা।

> গোরা কহিল মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ!

---

[১] গোরার ঠিক আগে লেখা 'মাষ্টারমশায়' গল্প এই মাতৃবাৎসল্যপ্রসঙ্গে তুলনীয়।

পরেশবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা সুচরিতার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। পরেশবাবু-সুচরিতার সম্বন্ধ সুগভীর স্নেহমধুর। ঘরের ও বাহিরের মূঢ় অবিচার ও হৃদয়হীনতা হইতে পরেশবাবুর একটিমাত্র আশ্রয়ভূমি ছিল। সে সুচরিতার সঙ্গ। তাঁহার কাছে আসিলে সুচরিতারও চিত্তের বেদনাভার লঘু হইত। বয়স তাহার বেশি নয়, কিন্তু সংসারের আঘাতে আর পরেশবাবুর শিক্ষায় সুচরিতার মনের বাড় বয়সের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল। তাহার মুখে বড় বড় তর্ক তাই অশোভন হয় নাই। গোরার উগ্র বেশ, উদ্ধত তর্ক এবং প্রবল কণ্ঠস্বর সুচরিতার মনে প্রথমেই বিরোধ জাগাইয়া আকৃষ্ট করিয়াছিল, কেননা প্রবলের প্রতি আকর্ষণ নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। গোরার প্রতি হারাণের অশিষ্ট আচরণ এবং মূঢ় তর্ক সুচরিতার মনকে হারাণবাবুর প্রতি অপ্রসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহারি প্রতিক্রিয়ায় গোরার প্রতি সে নিজের অজ্ঞাতসারে অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল। হারাণের ক্ষুদ্রতা সুচরিতাকে গোরার পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য করিল। এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার অবচেতন মানসে গোরার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ শিকড় ছড়াইল, এবং একটি প্রচণ্ড সমস্যা হইয়া গোরা তাহার মনে বসিয়া রহিল। তর্কের মাঝে সুচরিতা একবার উত্তেজিত হইয়া পড়ায় গোরা তাহার দিকে চাহিয়াছিল। "সে চাহনিতে সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না," তবুও এই দৃষ্টি সুচরিতাকে লজ্জা দিতে লাগিল। তাহার নারীচিত্ত এই মনে করিয়া কুণ্ঠিত হইল,—গৌরমোহনবাবু কি মনে করিলেন! এই লজ্জায় শিক্ষিত ব্রাহ্ম-তরুণীর মহিমা নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে করিতে লাগিল। এই হীনতাবোধ তাহার মনের অনুরাগের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। যাইবার সময় গোরা তাহাকে কোন সম্ভাষণ করে নাই,—এই উপেক্ষা সুচরিতার মনকে পীড়া দিয়া তাহাকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়া দিল যে গোরার উপেক্ষা ও উদাসীনতা আজ সে আর তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। বিনয়ের মুখে গোরার কথা, গোরার মত, সুচরিতা এখন আগ্রহের সহিত শুনিতে চায়। গোরার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে সুচরিতার অনুরাগ আরও স্পষ্ট হইল। প্রথম পরিচয়ে আর বিনয়ের কথায় গোরার মনের ও স্বভাবের কিছু স্বাদ সে পাইয়াছিল। এবার গোরার রূপ তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া তাহাকে বিস্ময়হত করিল এবং তাহার মনে অনুরাগের বান ডাকাইল। গোরাও যেন সুচরিতাকে এই প্রথম দেখিল, আর দেখিয়া যেন একটা অপূর্ব অনুভূতির নিবিড়তা তাহার চিত্তকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

> গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে।

পানুবাবুর সঙ্গে সুচরিতার হৃদয়ের পরিচয় নাই। তবে বিবাহের সম্ভাবনা উভয়পক্ষ মৌনভাবে মানিয়া লইয়াছিল। পানুবাবু সেই ভাবিয়া সুচরিতার শিক্ষা ও সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন, এবং সুচরিতাও বাধ্য ছাত্রীর মতো নিজেকে তাঁহার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার গুরু পরেশবাবুর উদার সত্যনিষ্ঠার পরিচয় সে পাইয়াছে। তাই "হারাণবাবুর সাম্প্রদায়িক উৎসাহের অত্যাচারে এবং সংকীর্ণ নীরসতায়" সুচরিতা ভিতরে ভিতরে বিমুখ হইতেছিল। পানুবাবুর সহিত সুচরিতার মনের মিল হইয়াছে কিনা এবিষয়ে পরেশবাবু নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। এইজন্যই তাহাদের বিবাহ অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ছিল। সুচরিতার কর্তব্যবোধ তাহার হৃদয়-বৃত্তির অপেক্ষা প্রবলতর ছিল, তাই মনের বিমুখতা সত্ত্বেও সে কেবল কর্তব্যের খাতিরে পানুবাবুকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু গোরার প্রতি পানুবাবুর রূঢ়তা ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি নীচ কপটতা সুচরিতাকে দূরে ঠেলিয়া দিল।

বরদাসুন্দরীর সংসারের তথা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনী হইতে বাহিরে আসিয়া সুচরিতার মন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরেশবাবুর শিক্ষা তাহার ধ্রুবতারা। চিত্তের বেদনায়, সংসারের সঙ্কটে সে পরেশবাবুর কাছেই ছুটিয়া যাইত এবং তাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে প্রগাঢ় শান্তি তাহাকে নীরবে অভিষিক্ত করিয়া দিত।

> এই তাহার সঙ্কটের সময় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল পরেশবাবু। তাঁহার কাছে সে পরামর্শ চাহে নাই, উপদেশ চাহে নাই, অনেক কথা ছিল যাহা পরেশবাবুর সম্মুখে সে উপস্থিত করিতে পারিত না এবং অনেক কথা ছিল যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য। কেবল পরেশবাবুর জীবন, পরেশবাবুর সঙ্গমাত্র তাহাকে যেন নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে, কোন মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।

পিতা-কন্যার নিবিড় স্নেহসম্পর্ক এবং আত্মিক সহানুভূতির পরিপূর্ণ চিত্র উপন্যাসটির পরিমণ্ডল জুড়িয়া আছে।

অনুরাগের সঙ্গে কারুণ্যের যোগ না ঘটিলে প্রেমরসের গাঢ়তা হয় না। সুচরিতার মনে গোরার উপর করুণার সঞ্চার হইল তাহার জেল-ফেরত চেহারা দেখিয়া।

গোরার দেহের এই শীর্ণতাই সুচরিতার মনে বিশেষ করিয়া একটি বেদনাপূর্ণ সম্ভ্রম জাগাইয়া দিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল প্রণাম করিয়া গোরার পায়ের ধূলা গ্রহণ করে। যে উদ্দীপ্ত আগুনের ধোঁয়া এবং কাঠ আর দেখা যায় না গোরা সে বিশুদ্ধ অগ্নিশিখাটির মত তাহার কাছে প্রকাশ পাইল; একটি করুণামিশ্রিত ভক্তির আবেগে সুচরিতার বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল।

জেলের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় গোরার মনও সুচরিতার ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়াছিল।

এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষে যে স্ত্রীলোক আছে সে কথা গোরার মনে উদয়ই হয় নাই।

আজ নবজাগ্রত প্রেমের আলোকে তাহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল।

জেলের মধ্যে বাহিরের সূর্যালোক এবং মুক্ত বাতাসের জগৎ যখন তাহার মনের মধ্যে বেদনা সঞ্চার করিত তখন সেই জগৎটিকে কেবল যে নিজের কর্মক্ষেত্র এবং কেবল সেটাকে পুরুষসমাজ বলিয়া দেখিত না,—যেমন করিয়াই সে ধ্যান করিত বাহিরের এই সুন্দর জগৎ-সংসারে সে কেবল দুইটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখ দেখিতে পাইত, সূর্য চন্দ্র তারার আলোক বিশেষ করিয়া তাহাদেরই মুখকে বেষ্টন করিয়া থাকিত—একটি মুখ তাহার আজন্ম পরিচিত মাতার, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত আর একটি নম্র সুন্দর মুখের সঙ্গে তাহার নূতন পরিচয়।

গোরা-সুচরিতা পরস্পরের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাই তাহাদের প্রেমের সম্মুখে কোন বাধাই টিকিতে পারে নাই—হরিমোহিনীর স্বার্থপরতা নয়, গোরার অভিমানহত আত্মসম্মানবোধও নয়। জন্মরহস্য-উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে গোরার মনের কল্পিত সংস্কারের সকল শৃঙ্খল কাটিয়া গেলে সে একদিকে আনন্দময়ী অপরদিকে সুচরিতা এই দুই নারীর স্নেহে ও প্রেমে নূতন জীবন লাভ করিল। সুচরিতাও একদিকে পরেশবাবু অপরদিকে গোরা এই দুই পুরুষের প্রশান্তিতে ও তেজস্বিতায়, ভক্তিতে এবং সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

ললিতার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে বোধ করি সর্বাধিক সতেজ ও দীপ্ত। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ললিতাকে সুন্দরী বলা চলে না, তবুও পরেশবাবুর কন্যাদের মধ্যে সে-ই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। ললিতার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তেজস্বিতা। অপরের অন্যায় বা জুলুম সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না, জবরদস্তি দেখিলে বা অনুমান করিলেই তাহার অন্তর বিমুখ হইয়া উঠে।

আমার স্বভাবই ঐ—যদি আমি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করচে সে আমি একেবারেই সইতে পারিনে।

ললিতার মনে যে স্বাতন্ত্র্যের তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা ছিল তাহাই তাহার

মুখশ্রীতে একটি বিশেষ সৌন্দর্যের আভা বিকীর্ণ করিত, কিন্তু এই লাবণ্য সকলের চোখে পড়িবার নয়। প্রথমে পরেশবাবু ও সুচরিতা এবং পরে বিনয় ললিতার বলিষ্ঠ অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিল। মা বরদাসুন্দরী তাহাকে একেবারেই বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু তাহার সত্যপরতাকে ও তাহার তেজস্বিতাকে ভয় করিয়া চলিতেন।

> পরেশবাবু এই খামখেয়ালি দুর্জয় মেয়েটিকে তাঁহার অন্যান্য সকল সন্তানের চেয়ে একটু বিশেষ স্নেহই করিতেন। ইহার ব্যবহার অন্যের কাছে নিন্দনীয় ছিল বলিয়াই ললিতার আচরণের মধ্যে যে একটি সত্যপরতা আছে সেইটিকে তিনি বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। সংসারে ললিতা প্রিয় হইবে না ইহাই জানিয়া পরেশবাবু কেমন একটু বেদনার সহিত তাহাকে কাছে টানিয়া লইতেন—তাহাকে আর কেহ ক্ষমা করিতেছে না জানিয়াই তাহাকে করুণার সহিত বিচার করিতেন।

ললিতার মনের তলে তলে একটা বিপরীত ধারা বহিত। যখনি তাহার জেদে পড়িয়া কেহ অনুকূল মত দিত অমনি তাহার অথবা নিজের উপর তাহার অপ্রসন্নতা জাগিত। কেহ-যে তাহার জেদের জোর মানিয়া লইবে এটুকুও তাহার স্বাধীনচিত্ত অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিতে চাহিত না। জেদ ও অভিমান তাহার জটিল চরিত্রের প্রধান প্রকাশভঙ্গি ছিল।

> ভুলিয়া গেছি বলিলে ললিতার কাছে অপরাধ ক্ষালন হয় না—কারণ ভুলিতে পারাটাই সকলের চেয়ে গুরুতর অপরাধ।

বিনয়ের উপর ললিতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহার অন্যের জুলুম সহ্য না করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া। একই দিনে বিনয় ও গোরার সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয়। গোরার উগ্র বেশ, উগ্র ভাব ও উগ্র তর্কনিষ্ঠা ললিতার ভালো লাগে নাই, এবং বিনয়ের মতো লোক যে গোরার মন্ত্রে বশীভূত হইয়া তাহারি কথা আবৃত্তি করিতে থাকিবে ইহাও সে পছন্দ করে নাই। শিক্ষিত তরুণীর সঙ্গে প্রথম আলাপ বলিয়া সুচরিতার প্রতি বিনয়ের মন প্রথমে কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ললিতার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল বুঝি বা সুচরিতা বিনয়কে ভালোবাসিয়াছে। সেই সন্দেহের জন্যই ললিতার মন প্রথমে বিনয়ের বিরুদ্ধে "যেন অস্ত্রধারণ করিয়া উঠিয়াছিল", কেননা বাড়ীর লোকের মধ্যে তাহার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিল সুচরিতা। পিতৃস্নেহসৌভাগ্য এই দুই মেয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিল এবং সেই কারণে পরস্পরের মন অতি কাছাকাছি আসিয়াছিল। যখনি সে জানিল যে সুচরিতা বিনয়ের প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাতের ভাব

পোষণ করে না তখনি তাহার মন বিনয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিল। তাহার পর ললিতার মন চাহিল বিনয়কে গোরার প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে।

> আমার ইচ্ছা করে ওঁর বন্ধুর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে।

এই অস্পষ্ট অধিকারবোধ হইতে অনুরাগের প্রথম সূচনা বোঝা যাইতেছে। ললিতার খোঁচায় উত্তেজিত হইয়া বিনয় তর্ক করিতে লাগিল, ললিতার তাহা ভালোই লাগিল। কিন্তু বিনয় তর্ক ছাড়িয়া দিয়া ললিতার ইচ্ছার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেই তাহার মন আবার বিরূপ হইয়া গেল। ললিতার সজ্ঞান মন চাহিতেছে বিনয় তাহাকে স্বীকার করুক, কিন্তু, তাহার নির্জ্ঞান মন যেন লজ্জা পাইয়া বিনয়ের প্রতি তাহার অনুরাগকে এবং বিনয়ের নতিস্বীকারকে তিরস্কার করিতে থাকে। ললিতার মন বলিতে লাগিল

> কেবল আমার অনুরোধ রাখিবার জন্য বিনয়বাবুর এমন করিয়া রাজি হওয়া উচিত হয় নাই। অনুরোধ! কেন অনুরোধ রাখিবেন। তিনি মনে করেন, অনুরোধ রাখিয়া তিনি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করিতেছেন। তাঁহার এই ভদ্রতাটুকু পাইবার জন্য আমার যেন অত্যন্ত মাথাব্যথা।

তাহার ব্যবহারে বিনয় ব্যথা বোধ করিতেছে জানিয়া ললিতার মনে কষ্ট হইল।

> ললিতা সহজে কাঁদিতে জানে না কিন্তু আজ তাহার চোখ দিয়া জল যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। কি হইয়াছে কেন সে বিনয়বাবুকে বারবার খোঁচা দিতেছে এবং নিজে ব্যথা পাইতেছে।

আবৃত্তি-অভিনয়ের মহড়া উপলক্ষ্যে বিনয়-ললিতার মন ঘনিষ্ঠ হইল। পরেশবাবুর কথায় ললিতা যেদিন রিহার্সালে যোগ দিল সেদিন তাহার নারীকণ্ঠের সুস্পষ্ট সতেজ ইংরেজী-উচ্চারণ তাহার মুখশ্রীর তাহার স্বভাবের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া বিনয়ের চোখে এক অপূর্ব সৌকুমার্যের ছবি তুলিয়া ধরিয়াছিল। নিজের কৃতিত্ব এবং বিনয়ের শ্রদ্ধা ললিতার মনেও রঙ ধরাইল। সুচরিতার নির্লিপ্ততায় বিনয় ও ললিতা দুইজনেই—অবশ্য বিভিন্ন কারণে—বেদনাবোধ করিল, এবং উভয়ের মধ্যে সাধারণ এই বেদনাবোধ উভয়কে আরো কাছাকাছি আনিয়া দিল। গোরার পরিবেশের বাহিরে এবং ললিতার সান্নিধ্যে আসিয়া বিনয় নিজের একটু বিশেষ মহিমা অনুভব করিয়া নূতন উৎসাহস্ফূর্তি বোধ করিল। গোরার প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা দুইজনের মধ্যে একটি গ্রন্থির মতো হইল, এবং গোরার অপমান দুইজনকেই আঘাত করিয়া দুইজনের ভাগ্য এক শিকলে বাঁধিয়া দিল। কাহাকেও না বলিয়া ললিতা স্টীমারে বিনয়ের সঙ্গে পিতার কাছে ফিরিয়া গেল। ললিতা যে সকলকে ছাড়িয়া আজ তাহাকেই সহায় করিয়াছে এই ভাবিয়া বিনয়ের চিত্ত

ভরিয়া উঠিল। তাহার সম্ভ্রমপূর্ণ ও আন্তরিক ভদ্র ব্যবহারে ললিতা স্বস্তিবোধ করিল এবং সামাজিকতার দিক হইতে সে-যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে এই সঙ্কোচ এবং বিনয়ের আশ্রয়ে আসিয়াছে এই আরাম তাহার মনে নবানুরাগের হর্ষ জাগাইল।

স্টীমার হইতে নামিয়াই ললিতার মন আবার বাঁকিতে শুরু করিয়াছে। আসল কথা, উত্তেজনার মুখে চলিয়া আসিয়া সে যে ভালো করে নাই, নিজের উপর এই ক্ষোভই তাহার অভিমানী চিত্তকে বিনয়ের বিরুদ্ধে ঠেলিতে লাগিল।

> আজ সকাল হইতেই ললিতা বিনয়ের উপর রাগ করিয়া আছে। রাগটা যে অসঙ্গত তাহা সে সম্পূর্ণ জানে···কিন্তু অসঙ্গত বলিয়াই রাগটা কমে না বরং বাড়ে। ঘটনাবশতঃ বিনয় যে তাহার উপরে একটা কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে ইহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল।

আবার পূর্বেকার মতো বিনয়ের প্রতি বিরোধের ভাব জাগিল, কিন্তু এ বিরোধ বিরাগের নয়, অনুরাগের। বিনয়কে ব্যথা দিয়া সেও ব্যথা পায়, তবুও আগেকার সেই মিলনের সুরটি মনে ফিরাইয়া আনিতে পারে না। যখনি জানিল যে তাহার সহিত বিবাহ সম্ভব নয় বলিয়া বিনয় তাহাদের বাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছে তখনি ললিতার বিরহী হৃদয়ে প্রেমের সুর আর চাপা রহিল না। অশান্ত হৃদয় লইয়া সে আনন্দময়ীর কাছে গেল, এবং তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় তাহার মান-অভিমান দূর হইল। কিন্তু এখন সে করিবে কি। তাহার দিন কাটিবে কি করিয়া।

> ললিতার জীবন যে ললিতার পক্ষে অত্যন্ত সত্য পদার্থ, সে ত আধাআধি কিছুই জানে না; সুখ দুঃখ তাহার পক্ষে কিছু সত্য-কিছু-ফাঁকি নহে। কিন্তু শেষ পর্যান্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল।

বিনয়ের সহিত বিবাহ ললিতার কাম্য, কিন্তু সেজন্য বিনয় যে নিজেকে খাটো করিবে এ চিন্তা তাহার অসহ্য। তাই সে বিনয়কে ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইতে বাধা দিল। তাহার আত্মসম্মানবোধ, তাহার সুবৃহৎ প্রেম, পরেশবাবুর উদার দৃষ্টি এবং আনন্দময়ীর সুনিবিড় স্নেহ সব মিলিয়া ললিতাকে অসাধারণ মনস্বিতায় উদ্দীপ্ত করিল। অবশেষে সামাজিক প্রভেদকে স্বীকার করিয়াও বিনয়-ললিতার প্রেম জয়যুক্ত হইল।

> তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম একথা তাহারা ভুলিল; তাহারা যে দুই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মধ্যে নিষ্কম্প দীপশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

পানুবাবু বরদাসুন্দরী হরিমোহিনী কৃষ্ণদয়াল মহিম অবিনাশ কৈলাস ও সতীশ প্রভৃতি ভূমিকা স্বভাবসঙ্গত। প্রথম দুই চরিত্রে ব্রাহ্মসমাজের এবং

পরের দুই চরিত্রে হিন্দুসমাজের বিশেষ বিশেষ মনোভাব মূর্তি ধরিয়াছে। পানুবাবুর চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে পরিমাণে বক্রোক্তিপরায়ণ হইয়াছেন তাহা বোধ করি তাঁহার অপর কোন উপন্যাসে দেখা যায় নাই। (ছোটগল্পে অবশ্য ছোটখাটো কোন কোন ভূমিকায় এমন দেখা যায়।) পানুবাবুর চরিত্রের ক্ষুদ্রতার প্রকাশ মনের সঙ্কীর্ণতায় এবং মূঢ় আত্মম্ভরিতায়। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে এবং তাঁহার সমাজের লোকে সেই বিদ্যাবুদ্ধির উপর অনেক বেশি মূল্য ধার্য করিয়াছিলেন। দূরে হইতে ব্রাহ্মসমাজের সকলেই তাঁহাকে "ইংরেজী বিদ্যার ভাণ্ডার, তত্ত্বজ্ঞানের আধার ও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের অবতাররূপে" দেখিত। তবে পরেশবাবুর বাড়ীতে তাঁহার সে পরিমাণ খাতির ছিল না, কেননা সুচরিতা তাঁহাকে বুদ্ধিবিদ্যায় পরেশবাবুর তুলনায় নিতান্ত খর্ব বলিয়া বুঝিয়াছিল। ললিতা পানুবাবুকে বরদাস্ত করিতে পারিত না, এবং বরদাসুন্দরীও তাঁহাকে মনে মনে অবজ্ঞা করিতেন—যেহেতু তিনি সামান্য ইস্কুলমাস্টার মাত্র। গোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পানুবাবু, তর্কে এবং প্রভাবে, সুচরিতার মন ও পরেশবাবুর সংসার হইতে নিজেকে স্বাধিকারচ্যুত মনে করিয়া আরও খেলো হইয়া গেলেন। অবশ্য শেষ অবধি তাঁহার এই ধারণা অটুট রহিয়া গিয়াছিল যে তিনিই ব্রাহ্মসমাজের রক্ষাকর্তা, তাঁহার

> ন্যায়াগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে ভীরুতা কম্পিত হয়, কপটতা ভস্মীভূত হইয়া যায়—তাঁহার এই তেজোময় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের মূল্যবান্ সম্পত্তি।

বরদাসুন্দরী-ভূমিকা অতি অল্পকথায় পরিষ্কারভাবে আঁকা। শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিধির বাহিরে বড় হইয়া পরে শিক্ষিত এবং উন্নত সমাজের সঙ্গে তাল রাখিতে গেলে চিত্তের যে প্রশস্ততা ও প্রসন্নতা থাকা প্রয়োজন বরদাসুন্দরীর তাহার একান্ত অভাব ছিল।

> বড় বয়স পর্যন্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত কাটাইয়া হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার সিল্কের সাড়ি বেশী খস্‌খস্ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশী খট্‌খট্ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেইজন্যই রাধারাণীর নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি সুচরিতা রাখিয়াছেন।...মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমনভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের একটা অঙ্গ।

পরেশবাবুর উদার জীবনের শিক্ষা বরদাসুন্দরীকে ছুঁইতে পারে নাই। পাড়াগেঁয়ে মেয়ের অনুদারতা তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। যতদিন সুচরিতা

কৃপাপাত্রী ছিল ততদিন তাহার উপর বরদাসুন্দরীর প্রসন্নতাও ছিল, কিন্তু যখন হইতে সে বিদ্যাবুদ্ধিচরিত্রে সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে লাগিল তখন হইতে বরদাসুন্দরীর মনে তাহার সম্বন্ধে অপ্রসন্নতা জাগিল। শেষে সুচরিতা যখন নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল তখনও স্বস্তিবোধ না হইয়া তাঁহার অহংকারে যেন ঘা লাগিল।

> সুচরিতা যে তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে এ যেন তাহার একটা অপরাধ।

পানুবাবু ও বরদাসুন্দরী যেমন ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতার প্রতিনিধি, কৃষ্ণদয়াল ও হরিমোহিনী তেমনি হিন্দুধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের এবং হিন্দুঘরের সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত। মানুষ হিসাবে হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর তুলনায় একটু উঁচু, কেননা তাঁহার স্বার্থপরতা বরদাসুন্দরীর স্বার্থপরতার মতো অতটা আঁট ও হৃদয়হীন নয়। তাহা ছাড়া সংসারে ঘা খাইয়া খাইয়া হরিমোহিনীর অন্তরে একটা বৈরাগ্যের এবং বাহ্য ভক্তির আস্তরণ পড়িতেছিল।

> তিনি অন্তরে যে অসহ্য দুঃখ পাইয়াছেন বাহিরেও যেন তাহার সহিত ছন্দরক্ষা করিবার জন্য কঠোর আচারের দ্বারা অহরহঃ কষ্ট সৃজন করিয়া চলিতেছিলেন। এইরূপে দুঃখকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা বরণ করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাকে বশ করিবার এই সাধনা।

হরিমোহিনীর স্নেহাতুর চিত্ত অবলম্বন হারাইয়া বৈরাগ্যপরায়ণতা এবং ভগবদ্‌ভক্তির প্রশান্তি কিছু লাভ করিয়াছিল। সুচরিতা ও সতীশের কাছে আসায় তাঁহার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় কতকটা তৃপ্তি পাইল। যতক্ষণ সুচরিতা তাঁহার প্রভাবের বাহিরে ছিল ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে স্বার্থপরতা জাগে নাই। কিন্তু সুচরিতার গৃহে আসিয়া তাহাকে আয়ত্তে পাইয়া ও সাংসারিক নিশ্চিন্ততা লাভ করিয়া হরিমোহিনীর সুপ্ত স্বার্থপরতা প্রকট হইতে লাগিল।

> হরিমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।

পানুবাবুর সহিত তর্ক ও ঝগড়া করিয়া সুচরিতা যেদিন বলিল যে সে হিন্দু, আর সে তাঁহার সম্মুখে বাহির হইবে না, তখন হরিমোহিনী লুকাইয়া লুকাইয়া শুনিয়া আশাতীত আনন্দ পাইয়াছিলেন। সুচরিতা যে এত শীঘ্র সাবেকি-আচারবিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। এখন এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্বার্থপরচিত্ত লোভাতুর হইল।

> হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূজাগৃহে গিয়া মেঝের উপরে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া তাঁহার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং আজ হইতে ভোগ আরও বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত

হইলেন। এতদিন তাঁহার পূজা শোকের সান্ত্বনারূপে শান্তভাবে ছিল, আজ তাহা স্বার্থের সাধন রূপ ধরিতেই উগ্র, উত্তপ্ত, ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিল।

গোরা অথবা আর কাহারো সহিত বিবাহ হইলে সুচরিতা তাঁহার একেবারে হাতছাড়া হইয়া যাইবে এই ভয়ে তিনি পূর্বেকার সকল অপমান অত্যাচার ভুলিয়া গিয়া তাঁহার বয়স্ক দেবরের সঙ্গে বিবাহ ঘটাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

পরেশবাবুর বাড়ীতে সর্বদাই অপরাধভীরুর মত যে হরিমোহিনী ছিলেন, যিনি কোন মানুষকে ঈষৎমাত্র অনুকূল বোধ করিলেই একান্ত আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিয়া ধরিতেন সে হরিমোহিনী কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে হিন্দুসমাজের প্রতি যে একটু বিশেষ টান ছিল তাহা বোঝা যায় কৃষ্ণদয়ালের ও মহিমের ভূমিকা হইতে। (অথবা পাছে হিন্দু-সমাজের প্রতি অযথা কঠোরতা প্রকাশ পায় তাহা এড়াইবার জন্য?) এই দুইটি নিতান্ত সাধারণ মানুষ শুধু সহৃদয়তার স্পর্শেই পাঠকের অন্তরঙ্গ হইয়াছে। প্রথম জীবনে পশ্চিমে থাকিতে কৃষ্ণদয়াল

পল্টনের গোরাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ-মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পূজারি পুরোহিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এখন না মানেন এমন জিনিষ নাই। নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পন্থা শিখিতে বসিয়া যান। মুক্তির নিগূঢ় পথ এবং যোগের নিগূঢ় প্রণালীর জন্য ইঁহার লুব্ধতার অবধি নাই।

স্ত্রীর অঞ্চলছায়াশ্রয়ী দশটা-পাঁচটা-আপিস-পরায়ণ কলিকাতা-নিবাসী বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের টাইপ মহিম। বাহিরে আপিসের আর ঘরে স্ত্রীর তাড়া খাইতে খাইতে তাহার দিনগুলি তাঁতের মাকুর মতো জীবনের সূত্র বয়ন করিয়া চলে। মহিমের স্বভাব কোমল। আনন্দময়ীর প্রতি মহিমের মনোভাব যেমনই হোক "গোরার প্রতি তাহার একপ্রকার স্নেহ ছিল।" গোরা হাজতে গেলে মহিম তাহাকে খালাস করিবার জন্য উকীলখরচা দিয়া লোক পাঠাইয়া "আপিসে গিয়া সাহেবের কাছে ছুটি যদি পান এবং বৌ যদি সম্মতি দেন তবে নিজেও সেখানে যাইবেন" স্থির করিয়াছিল। মহিমের বড় দুঃখ যে তাহার পিতা সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকিলেও টাকার বেলা খুব সজাগ। সাধুসন্ন্যাসীর জন্য তাঁহার খরচে আটকায় না, কিন্তু ছেলের প্রতি কৃপণতা।

যারা গৃহস্থ, যাদের টাকার দরকার সবচেয়ে বেশী, বাবার টাকা তাদের ভোগে আসবে না এটা তুমি নিশ্চয়ই জেনো! আমার মুস্কিল হয়েছে এই যে, অন্যের বাবা কষে টাকা তলব করে, আর নিজের বাবা টাকা দেবার কথা শুনলেই প্রাণায়াম করতে বসে যায়!

তবুও সন্ন্যাসীদের প্রসন্নতা লাভ করিলে যদি পিতার তহবিলের গ্রন্থি কথঞ্চিৎ শিথিল হয় এই আশায় তত্ত্বালোচনায় যোগ দিতে সে সাধ্যমতো চেষ্টা করিত ॥

২

রবীন্দ্রনাথের বড়গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে পর পর দুইটি রচনায় একটু বিশেষ মিল দেখা যায়। যেমন বৌঠাকুরাণীর-হাট ও রাজর্ষি, নষ্টনীড় ও চোখের-বালি, নৌকাডুবি ও গোরা। 'চতুরঙ্গ'ও (১৯১৬)[১] তেমনি অব্যবহিত পরবর্তী উপন্যাস ঘরে-বাইরের সঙ্গে জোড়া। সবুজপত্রে প্রকাশিত অব্যবহিত পূর্ববর্তী গল্পগুলির সঙ্গেও চতুরঙ্গের যোগ আছে। চতুরঙ্গের গঠনরীতি সাধারণ উপন্যাসের মতো নয়। বইটির চারটি "অঙ্গ" বা ভাগ—'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'—যেন চারটি গল্প। (এগুলি স্বতন্ত্র গল্পরূপে স্বতন্ত্র নামে সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।) এই চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়া একটি কাহিনীই চলিয়াছে।

চতুরঙ্গ আকারে বড় নয়। ঘটনার ঘনঘটা অথবা ভূমিকার ভিড় নাই।

আগেই বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুগম নয়, কেননা যে-পরিমাণ রসবোধ ও সংবেদনা থাকিলে রবীন্দ্রনাথের রচনার রস পুরাপুরি পাওয়া যাইতে পারে তা তখন সুলভ ছিল না (এবং এখনও নয়)। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে চতুরঙ্গের রচনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও শিল্পনিপুণ। ইহাতে অধ্যাত্মসাধনার গভীর কথা যেমন সহজভাবে ও অনায়াসে বলা হইয়াছে তেমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমাদের দেশে যে "সহজ" (বা "রস-") সাধনার দ্বারা বাউল-দরবেশ-বৈষ্ণব-বৈরাগীরা অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন সে সাধনার মধ্যে একটা বড় সংকট ছিল যা "উত্তর" (অর্থাৎ উচ্চতর) সাধকের পথ আটকাইত না কিন্তু "প্রবর্ত" (অর্থাৎ নিম্নতর) সাধকেরা তাহাতে বিপন্ন হইত। রসসাধনার সেই রসাল দিকটার বিপদ যে কত সাজ্ঘাতিক তাহা রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে খোলাখুলি দেখাইয়াছেন। সমসাময়িক গল্প বোষ্টমীতে রসসাধনার উচ্চতর—স্বাত্মানন্দ—দিকের চিত্র উপস্থাপিত। চতুরঙ্গে—আনুষঙ্গিকভাবে—আমাদের দেশের লোক-দেখানো স্বার্থপর হৃদয়হীন জনসেবার হীনতাও চিত্রারোপিত হইয়াছে।

[১] প্রকাশ সবুজপত্র (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩২১)।

"সব প্রেম প্রেম নয়," অর্থাৎ সব প্রেম জীবনে চরিতার্থতা (—যে চরিতার্থতা সুখভোগে অথবা স্বস্তিতে নয়—) আনিয়া দিতে পারে না। এক প্রেম হইতেছে ধ্যানের ধন, অন্তরের গুরু—"গুরু যে তার মনের ব্যথা ঝরায় দুনয়ন"। আর এক প্রেম হইতেছে সাধনার দেবতা, দেহের প্রাণ। এই দুই ধারার প্রেমের দোটানায় পড়িয়া নারীহৃদয়ের বেদনাময় দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল পরবর্তী উপন্যাস-গল্পেরই মুখ্য অথবা গৌণ সমস্যা। এই সমস্যা সর্বপ্রথম চতুরঙ্গে দেখা দিয়াছে। চতুরঙ্গে সমস্যাটি যতটা সূক্ষ্ম এবং গভীর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে ততটা নয়, যেহেতু সেখানে ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। বোধ করি এই কারণে চতুরঙ্গের শিল্পসৌন্দর্য রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচকদের অনেকেরই নজর এড়াইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে যেন বাসরঘরের চৌকাঠ অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া পাঠকের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন, অর্থাৎ পূর্বরাগেই যেন প্রেমের সমাপ্তি। শুধু চতুরঙ্গেই বিবাহের পরবর্তী দাম্পত্যপ্রেমের আভাস-চিত্র পাই। কিন্তু শ্রীবিলাস-দামিনীর সংসার দুই বৎসরও টিকে নাই, পূর্বরাগ-অনুরাগের রঙ মিলাইয়া যাইবার আগেই ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

চতুরঙ্গের প্রথম অঙ্গ 'জ্যাঠামশায়' সব চেয়ে স্বসম্পূর্ণ। শচীশের জ্যাঠামশায় জগমোহনের ভূমিকা এইখানেই সমাপ্ত। কেবল শচীশের অন্তরে তাঁহার শিক্ষা এবং প্রভাব শেষ অবধি কাজ করিয়া গিয়াছে। জগমোহন রবীন্দ্রনাথের এক মহৎ সৃষ্টি। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কোন কোন গল্পে এই ধরনের মানুষ দেখা গেলেও কোনটিই এমন সুস্পষ্ট নয়।

> জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।
>
> কারো কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাত জোড় করিতে নারাজ।
>
> জগমোহনের নাস্তিক ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা,

তাহার মধ্যে নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই লাভ দেখা যাইত না। জগমোহন শচীশকে বলিতেন

> দেখ্‌ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

> পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের রাগ ছিল ; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন।

ছোট ভাই হরিমোহন আদালতে বড় ভাইকে বিধর্মী ও আচারভ্রষ্ট প্রমাণ করিয়া পৈতৃক দেবত্র-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলে পর আইনজ্ঞদের ভরসা সত্ত্বেও জগমোহন হাইকোর্টে আপিল করিতে রাজি হইলেন না। বলিলেন

> যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মত বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মত ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

জগমোহনের অসাধারণ মনের জোর ছিল। বাড়ী ভাগ হইবার পর শচীশ স্বভাবতই তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল, কিন্তু যখন তাঁহার কানে গেল যে হরিমোহন বলিয়া বেড়াইতেছে যে শচীশকে হাতে রাখিয়া প্রকারান্তরে জগমোহন হরিমোহনের কাছে আর্থিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় আছেন, তখন তিনি চমকাইয়া উঠিলেন।

> শচীশকে বলিলেন, গুড্‌বাই শচীশ! শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে আর কথা চলিবে না।

ঠাকুরদেবতায় ও ধ্যানধারণায় জগমোহনের যতই নাস্তিক্যবুদ্ধি থাক জীবন্ত নরদেবতায় ও তাহার সেবায় পরিপূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধিতেই তাঁহার সিদ্ধি। শচীশের স্নেহ তাঁহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইয়াছিল। মানবদেবতার সেবা যে তিনি শুধু কর্তব্যবুদ্ধিতে করিতেন তাহা নয়, তাঁহার হৃদয়রস এই সেবার মধ্য দিয়াই উৎসারিত হইত। জগমোহনের শুষ্ক পাণ্ডিত্য এবং দুর্ধর্ষ একগুঁয়েমির অন্তরালে যে মানুষটি বাস করিত তাহার করুণকোমল হৃদয় সমবেদনার সুধাধারায় টলটল করিত এবং মানুষের লাঞ্ছনা বেদনা দেখিলেই তাহা উথলিয়া উঠিত।

> জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না—তাঁর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে, সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এত বড় লজ্জা কে চাপাইল?

জগমোহন আজ ননীবালাকে যতখানি স্নেহমর্যাদা দিলেন ততখানি সে আর কাহারো কাছে পায় নাই, এমন কি তাহার মায়ের কাছেও নয়।

> কেননা মা ত তা'কে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত—সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোট ছোট কাঁটায় ভরা ছিল।

হরিমোহন জগমোহনের উল্টা পিঠ। হালদার-গোষ্ঠী[১] গল্পের নীলমণির সঙ্গে হরিমোহনের মিল আছে। জগমোহন-হরিমোহনের বৈপরীত্যের পূর্বাভাস

[১] সবুজপত্র বৈশাখ ১৩২১।

যেন বনোয়ারি-নীলমণির সম্পর্কের মধ্যে অনুভূত হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদাসের প্রতি বনোয়ারির স্নেহই যেন শচীশের প্রতি জগমোহনের স্নেহে পরিণতি পাইয়াছে।

জগমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র-শিষ্য শচীশ চতুরঙ্গের কেন্দ্রীয় ভূমিকা। দেহে মনে আচরণে সে অসাধারণ মানুষ। শচীশের অসাধারণত্ব গোরাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

> শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার সরু সরু লম্বা আঙ্গুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অম্‌নি তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম।

শচীশের হৃদয় গভীর, আচরণ উচ্ছ্বাসবিহীন, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী,—"তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কি।" সংসারে নিন্দা গ্লানি কলুষ তাহার শিশুসরল চিত্তকে অমলিন রাখিয়াছিল। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তায় কেহ তাহাকে হটাইতে পারিত না।

> জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে তাঁকে সকল মুস্কিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে।

জগমোহনের মৃত্যুতে শচীশের কাছে জগৎ নিরর্থ হইয়া গেল। নিজের লেখাপড়া, মানবের সেবা, কোন কাজেই তাহার মন বসিল না।

> এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তা'র আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতে পারিলাম না।

জগমোহনের কাছে শচীশের যে দীক্ষা হইয়াছিল তা নাস্তিকতার নেতি-মন্ত্র নয়। তা স্নেহপ্রীতির সুদৃঢ় আস্তিক্যের উপর স্থিতপ্রতিষ্ঠিত। তাই জগমোহনের মৃত্যুতে সেই বুদ্ধের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িলে তাহার অন্তরে যে নিঃসীম গহ্বর হাহা করিয়া উঠিল তাহা সে বৈষ্ণবসাধনার রসতত্ত্বের নেশা দিয়া ভরাইতে চাহিল। মুক্ত আকাশের বিহঙ্গ আসিয়া লীলানন্দ-স্বামীর দলের ছেলেখেলার খাঁচায় ধরা দিল। যে-শচীশ কখনো জ্যাঠামশায়কেও প্রণাম করে নাই সেই শচীশকে একদিন গুরুর পা টিপিতে আর তামাক সাজিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া শ্রীবিলাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল

শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কি বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু?

শচীশ উত্তর করিয়াছিল

বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি ত ভোগ করিয়াছি। এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো!

কিন্তু রসসাধনায় তীব্র মাদকতা। আইডিয়ার নেশায় ভোর হইয়া থাকা সর্বক্ষণ ঘটে না, যখনি মাটিতে পা পড়ে তখনি সেই নেশার ঘোর উদ্দাম বেগে দেহের দিকে ধায়—রূপকের ধ্যান হইতে নামিয়া তা রূপের ভোগে চরিতার্থতা খোঁজে। কলিকাতায় আসিলে দামিনীর সংস্পর্শে শচীশের রসমগ্নতা ক্ষণে ক্ষণে বিঘ্নিত হইতে লাগিল। দামিনী বিধবা তরুণী, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। জীবনরসের রসিক সে। ননীবালাও ছিল বিধবা তরুণী, কিন্তু সে রসিক মরণরসের। জীবনে তাহার আশা করিবার কিছুই ছিল না, তাই সে "মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর" করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ননীবালার ভালোবাসা ত্যাগ করিতে জানিত, দামিনীর ভালোবাসা আদায় করিতে চায়। দামিনীর দুর্দমনীয় কামনা যখন শচীশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্ছ্বসিত তখনো তা শচীশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার সেবামাধুর্যে শচীশ মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তার বেশি নয়।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তা'র শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল দামিনীকে দেখিল না।

শচীশ-দামিনীর এই বিষম বন্ধনে প্রথম সংকট আসিল পশ্চিমসমুদ্র উপকূল-গুহায় নিশীথের গভীর অন্ধকারে। তন্দ্রাচ্ছন্ন শচীশ লাথি মারিয়া সেই নরম বীভৎস "ক্ষুধার পুঞ্জ" যাহা তাহার "পায়ের উপর একরাশি কেশর" ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে দূর করিয়া দিল। দামিনীর যে ক্ষুধাকে শচীশ লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, সেই ক্ষুধাই অতঃপর তাহাকে পাইয়া বসিল। অভিমানিনী দামিনী গুরুসেবার উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। সে শ্রীবিলাসকে আড়াল করিয়া শচীশকে লইয়া যেন খেলাইতে থাকিল। শচীশ পুরাপুরি আত্মস্থ না হইলেও ধাতস্থ আছে, তবুও মনে বেশ চাঞ্চল্য। শচীশ জানে এসব প্রকৃতির মায়ার খেলা। তাই মায়ার

ফাঁদ এড়াইবার জন্য সে দ্বিগুণ উৎসাহে গুরুর পা-টিপিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু লীলানন্দ স্বামী করিবেন কি। তিনি শচীশ-দামিনীকে

> যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলি তাহাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাৎ হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে।

আসন্ন বিপদের লক্ষণ গুরুর অগোচর রহিল না। তিনি দামিনীকে ছাড়িতে পারেন কিন্তু শচীশকে পারেন না। কেননা শচীশ ও শ্রীবিলাস "গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়।" কিন্তু শচীশ চাহিলে আর গুরু বলিলেই বা দামিনী ছাড়িবে কেন। তাহার স্বামী যে বিষয়সম্পত্তি সমেত স্ত্রীর ভার গুরুকে সমর্পণ করিয়াছে এ অপমান সে ভুলিতে পারে নাই। অন্তর্দ্বন্দ্ব শচীশের শরীর-মন যেন চষিয়া ফেলিল। সে বুঝিল দামিনীর কাছ হইতে পলাইয়া গেলে কিংবা দামিনী দূরে দূরে রহিলেও তাহার স্বস্তি নাই। অতএব দামিনীর কাছে কাছে থাকিয়াই সে মনের সঙ্গে লড়াই করিতে প্রস্তুত হইল। শচীশ ভাবিয়াছিল বিদ্রোহিণী দামিনীর আকর্ষণ বুঝি বা গুরুশুশ্রূষায় কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সে যাহা ভাবিল তাহা হইল না।

> আর একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তা'র মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবার স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়। কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না।

বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া লীলানন্দ-স্বামীর আওতায় যখন শচীশ

> কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল,

তখন সত্যকার জীবনের আঘাতে রসের পাত্রটি ভাঙ্গিয়া গিয়া কামনার তলানি ছড়াইয়া পড়িল, লীলানন্দ-স্বামীর কীর্তনদলের গায়ক নবীনের স্ত্রী স্বামীর দুশ্চরিত্রতায় নিজের কর্তব্য সমাধান করিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিল। এই ঘটনায় দামিনীর চোখ খুলিয়া গেল এবং তাহাতে সমাসন্ন দ্বিতীয় ক্রাইসিসের আর সম্ভাবনা রহিল না। রসের উল্টা পিঠের, কামলালসার, ইন্ধনে আত্মত্যাগ শচীশ দেখিয়াছিল—ননীবালায়। এখন দামিনী তাহারি আর এক রূপ দেখিল —নবীনের স্ত্রীতে। দামিনীর বিপদ শচীশের কাছ হইতে যতটা নিজের কাছ

হইতে আরো বেশি। তাহার পতনের চেয়ে শচীশের পতন অনেক গুরুতর হইবে। তাই সে শচীশকে হাত-জোড় করিয়া বলিল

আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে ত সে তুমি।…তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইও না।

দামিনীর কথায় শচীশের রসের ঘোরটুকু কাটিয়া গেল। লীলানন্দ-স্বামীর দলও ভাঙ্গিয়া গেল, অন্তত শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের সম্পর্কে। এবং

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম ; তার পরে আর একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না ; তার পরে আর একদিন এই সমস্ত মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কি মানিল আর কি না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মত আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

শ্রীবিলাস ও দামিনী শচীশকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিতে গেল। শচীশ তখন সত্য-আশ্রয়ের জন্য নিজের অন্তরের মধ্যেই যেন হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতায় ফিরিতে সে তখন রাজি হইল না। বলিল

একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম, জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম, সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি সহরে ফিরিতে সাহস করি না।

শচীশের দেহের অবস্থা দেখিয়া দামিনীর নারী-মন কাতর হইল। তাই সে তাহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহিল না। অগত্যা শ্রীবিলাস একটা পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ীতে শচীশ-দামিনীকে লইয়া গিয়া উঠিল। শচীশের আত্মার ব্যাকুলতা যেন তাহার দেহ দহন করিয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়। তাহার

শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল।

আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলেই ভয় হয়।

দামিনীর সেবা সে লইতে পারে না, এবং ফিরাইয়া দিলেও দামিনী ব্যথা পায়,—ইহাতে শচীশের মনে অস্বস্তি হইতে লাগিল। ভালোবাসার টান এখন সেবার

বন্ধনে বাঁধিতেছে দেখিয়া শচীশ তাহা কাটাইতে চায়। তাহা না হইলে সে পরম সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

> যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তার কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, ঠিক উল্টা মুখে চলিলে তবেই ত মিলন হইবে? তিনি রূপ ভালবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা ত শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। একথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

একদিন রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টির ছাট আসিতেছে বলিয়া জানালা বন্ধ করিতে দামিনী শচীশের ঘরে ঢুকিয়াছিল। "শচীশ মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তা'র পরে বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।" দামিনীর ভালোবাসা-ভক্তির সেবা শচীশকে মাটির দিকে টানিতেছে। তাই যখন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া দামিনী পলাতক শচীশের লাগ পাইল তখন তাহার ব্যগ্রতায় সে ঘরে ফিরিয়া আসিল বটে কিন্তু

> ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাকে আমি খুঁজিতেছি তাকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

বোষ্টমীও এই কথাই বলিয়াছিল, একটু অন্যভাবে।

> পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্য খুঁজিতেছি আর ফাঁকি নয়।

"দামিনী যেন শ্রাবণ-মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।" বিবাহের পর হইতেই তাহার স্বামী শিবতোষ লীলানন্দ-স্বামীর কাছে মন্ত্র লইয়া জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় "কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল।" তাই স্বামীর সহিত দামিনীর কিছুমাত্র অন্তরঙ্গতা ঘটে নাই। উপরন্ত তাহার গহনাগুলি গুরুসেবায় দান করায় এবং তাহার কাছ হইতে জোর করিয়া গুরুভক্তি আদায়ের চেষ্টা করায় দামিনীর মন স্বামীর প্রতি অত্যন্ত বিমুখ হইয়া ছিল।

> যে সময় দামিনীর বাপ এবং তা'র ছোট ছোট ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময় বাড়ীতে যাট সত্তরজন ভক্তের সেবায় অন্ন তা'কে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে, তবু তা'র তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল। এমন সময় তা'র স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তিসমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

গুরু যতই তাহাকে স্নেহ-অনুগ্রহ করিতে থাকে দামিনীর বিদ্রোহ ততই বাড়ে। গুরুর ক্ষমা তাহার কাছে শাসনের অপেক্ষাও দুঃসহ। তাহার পর শচীশের আসার পর হইতে কখন-যে অজ্ঞাতসারে দামিনীর ভাবপরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। শচীশ উপস্থিত থাকে বলিয়া এখন গুরুর সান্নিধ্য দামিনীর কাম্য হইল। দামিনীর মনোভাব শচীশের অজ্ঞাত রহিল না।

গুহায় তন্দ্রাচ্ছন্ন শচীশের নিষ্ঠুর পদাঘাত দামিনীর বুকে বড়ই বাজিয়াছিল। শচীশের উপর অভিমান করিয়া সে গুরুসেবা ও ভক্তসঙ্গ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আগেকার মতো চলিতে লাগিল। নূতনের মধ্যে এই, শ্রীবিলাসকে সে অন্তরঙ্গ করিয়া টানিয়া লইয়াছে।

> দামিনী গুরুজীর কাছে ঘেঁসে না তার প্রতি তাঁর একটা অনুরাগ আছে বলিয়া, দামিনী শচীশকে কেবলি এড়াইয়া চলে তার প্রতি তা'র মনের ভাব ঠিক উল্টা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই।

এদিকে লাথি মারিবার পর হইতে শচীশের মনে আগুন ধরিয়াছে। এ আগুন শান্ত করিল দামিনীই, তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছে আগুন লইয়া খেলার বিপদ কতখানি। দামিনীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া লইয়া শচীশ মনে মনে তাহাকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ তো শুধু মনের আগুন নয়, ইহা অন্তরের দীপ্তি যাহা তাহার সমস্ত নারীপ্রকৃতিকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। শচীশের শরীরের অযত্ন স্নেহকোমল নারীহৃদয় সহিবে কি করিয়া। তাই সে আগলাইবার জন্য শচীশের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। প্রেমের বন্ধন একতরফা নয়, পরস্পর পরস্পরকে বাঁধে। শচীশ তাহার দিকের বন্ধন কাটিয়া দিয়াছে দামিনীর প্রার্থনায়, এখন শচীশের প্রার্থনায় দামিনী নিজের দিকের বাঁধন খুলিয়া দিল। এতক্ষণে শচীশ মুক্তি পাইল।

শচীশের প্রতি দামিনীর প্রেমের মধ্যে ছিল খানিকটা ভক্তি খানিকটা মোহ। শচীশের মানবত্বটুকু তাহার কাছে অপ্রকাশ ছিল। দামিনীর কাছে শচীশ ছিল একটা বৃহৎ আইডিয়ার বা ধ্যানধারণার মতো, উপাস্যদেবতার মতো। এমন ভালোবাসায় আত্মসমর্পণে নারীর চরিতার্থতা নাই। শচীশের জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলে দামিনীর চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল, তাই শ্রীবিলাস তাহার চোখে সহজে পড়ে নাই। কিন্তু শ্রীবিলাসের সাহচর্য, তাহার মুগ্ধ হৃদয়ের গোপন পূজা দামিনীর নারীপ্রকৃতির উপরে যে কঠিনতার আবরণ পাড়িয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে

ঘুচাইতে লাগিল। চোখের-বালিতে যেমন বিহারীর কথায় ও সহানুভূতিতে বিনোদিনী বাল্যজীবনে ফিরিয়া গিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিল, চতুরঙ্গেও তেমনি শ্রীবিলাসের সাহচর্যে দামিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা, পাড়াপড়শির কথা, এলোমেলো নানা কথা সহজভাবে কহিয়া গিয়া মনের বোঝা হালকা করিয়া দিত। শ্রীবিলাসের প্রেম দামিনীর সজাগ অনুভূতির গোচরে তখনো আসে নাই বটে, কিন্তু তাহার নারীচিত্তগহনে এটুকু অজানা রহে নাই যে তাহার একটু কাজ করিয়া দিতে পারিলে শ্রীবিলাস কৃতার্থ হয়।

> সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবী করাই আমার প্রতি সবচেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো—দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর চিত্ত তাহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

শচীশের মোহ কাটিয়া গেলে দামিনী দেখিল সে একেবারে নিরাশ্রয়—তাহার কোথাও স্থান নাই। লীলানন্দ-স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাওয়া মরণের অধিক হইবে। এই সংকটে শ্রীবিলাসের সসংকোচ প্রেমে তাহার আশ্রয় মিলিল।

> আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনো রকম তারে খবর পায় নাই সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না—অন্ততঃ তার কোনো রকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবী উঠিল। দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

> অনেক নদী-পর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোলকরতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে; "তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি", এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।
>
> কিন্তু কলিকাতার এই গলিতে এ কি হইল?
>
> যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক-নিমেষের পাল্লা। আর দেরী হইল না।

> কলিকাতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশীর তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব-শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

চতুরঙ্গের চরিত্র চারটি—জগমোহন, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। তাহার মধ্যে প্রথমটি যেন শচীশেরই পূর্ব-ভূমিকা। চতুরঙ্গ নামের আরো একটি অর্থ

আছে দামিনী ও শচীশের দিক দিয়া। তাহার স্বামী শিবতোষ, শিবতোষের গুরু লীলানন্দ, এবং লীলানন্দের শিষ্য শচীশ এই তিনজনের কাছে দামিনী "চতুরঙ্গ"এর (দশপঁচিশের) ঘুঁটির মতো এধার-ওধার করিয়া অবশেষে শ্রীবিলাসের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিল। শচীশের চিত্ত রস ও রূপ এবং রূপ ও অরূপের মধ্যে দোল খাইতে খাইতে অবশেষে মুক্তির নির্দেশ পাইয়াছিল॥

৩

'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬)[১] রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে নূতন ধারা এবং উপন্যাসশিল্পে নূতন টেকনিক প্রদর্শন করিল।

গোরার সঙ্গে ঘরে-বাইরের কিছু মিল আছে। গোরার প্রধান সমস্যা হইতেছে সমাজের এবং সংস্কারের বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া পীড়িত চিত্তের মুক্তি-ব্যাকুলতা,—অর্থাৎ এমন এক বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রের পরিকল্পনা যেখানে ভারত-বর্ষীয় মানবচিত্ত বহুবিচিত্র ধর্মমত ও সংস্কার সত্ত্বেও ভারতীয় আদর্শ-উপলব্ধিতে পরস্পর মিলিত হইতে পারে। গোরার এই সমস্যা ঘরে-বাইরের সমস্যার তুলনায় কতকটা দূরগত। আমাদের বাঙ্গালাদেশে বিংশ শতাব্দের প্রথম দশকে যে "জাতীয়" উন্মাদনার মত্ততা স্থির বিচারদৃষ্টিকে আবিল এবং ধ্রুব কল্যাণবুদ্ধিকে বিচলিত করিয়াছিল, তাহারি শান্তগভীর বিচার ঘরে-বাইরের অন্যতম উপপাদ্য। বাঙ্গালাদেশের এই বিক্ষোভ কিছুকাল পরে—ঘরে-বাইরে লিখিবার পাঁচ ছয় বৎসর পরে—কিছু অন্তর্বাহী হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবল রাষ্ট্রীয় ("জাতীয়") আন্দোলনে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিল। গোরায় যাহার অস্পষ্ট আভাস ঘরে-বাইরের সেই আসন্ন নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনেরই ভবিষ্যবচন ও ফলশ্রুতি। ঘরে-বাইরে দেশের অনতি-অতীত স্বদেশী-বিপ্লব প্রচেষ্টার ভাষ্য আর ভারতবর্ষের অচিরাগামী নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের আগমনী।

ঘরে-বাইরের সমস্যা ঠিক ব্যক্তি-সংঘাত নয়, আদর্শ-সংঘর্ষও নয়। প্রায় সব মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই দ্বৈধ থাকে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে স্প্লিট পার্সোনালিটি। এই ব্যক্তি-দ্বৈধের সংঘর্ষই ঘরে-বাইরের সমস্যা। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ইহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

> বিমলার struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের—সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করচে—নিখিলেশও নিজের feeling-এর সঙ্গে নিজের কর্তব্যের adjustment

[১] প্রকাশ সবুজ-পত্র ১৩২২।

করচে। অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্চে না। এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখচে।[১]

ঘরে-বাইরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা বিমলার। বিমলা রূপসী নয়, শুধু অদৃষ্টের জোরে আর সুলক্ষণের গুণে গরীবের ঘরের মেয়ে সে ধনিগৃহে আদরের কনিষ্ঠ বধূ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। বিমলার প্রতি নিখিলেশের আকর্ষণের মধ্যে তাই রূপের মোহ ছিল না। নিখিলেশও রূপকথার রাজপুত্র নয়—সেইজন্য প্রেমের সম্পর্কে বিমলার হীনতাবোধ ছিল না।

ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি,—তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। …স্বামীকে দেখ্‌লুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না; এমন কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারি মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সঙ্কোচ ছিল সেটা ঘুচল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ল।

নিখিলেশের ভালোবাসা সহজে পাওয়ায় এবং হীনতাবোধ না থাকায় বিমলার গৃহাবদ্ধ মনে দায়িত্বজ্ঞানের ও বিবেচনার কিছু অভাব ছিল। তবে স্বামীর প্রতি একটা সহজ ভক্তির টান বিমলার মনে বরাবরই ছিল। এই অনুভূতি তাহার মায়ের সূত্রে পাওয়া।

ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্য বিশেষ ক'রে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জল খাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ ক'রে কেওড়া জলের ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন; তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম। সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল।

এই ভক্তির সুরই শেষ পর্যন্ত বিমলাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে।

বিমলার বিধবা দুই জা অপূর্ব সুন্দরী। এইখানেই ছিল বিমলার অবচেতন মনের হীনতাবোধ। ইহাদের অহিত আচরণে বিমলা যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ফেলিত তাহাতে এই বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া মেজো-জার সঙ্গে নিখিলেশের সহৃদয় সখ্য বিমলা ভালোমনে লইতে পারে নাই।

আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর কারও উপরেও না, সে কেবল—সে আর বলব না।

---

১ প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৮ পৃ ৬৪।

নিখিলেশ যখন বিমলাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া থাকিতে চাহিল তখন দুইটি কারণে বিমলা রাজি হয় নাই। প্রথম তাহার দিদিশাশুড়ীর স্মৃতি আর শ্বশুরবাড়ীর সব-কিছুর প্রতি মমতা।

> এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে এ'কে এতকাল আগ্‌লে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চ'লে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে—এই কথাই বারবার আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দ্বিতীয় কারণ জায়েদের প্রতি তাহার স্বাভাবিক অথচ অহেতুক ঈর্ষা।

> যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা ক'রে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মান্‌তে চান আমি তো মান্‌তে দিতে পার্‌ব না। আমি মনে মনে জান্‌লুম এ আমার সতীত্বের তেজ।

সংসারে প্রভুত্ব নারীজীবনের প্রধান কাম্য। বিমলাও সাধারণ নারীর অতিরিক্ত নয়।

সন্দীপ আসিয়া বিমলাকে যে অত শীঘ্র মাতাইয়া তুলিল তাহার কারণ, বিমলার মন যেন কতকটা প্রস্তুত ছিল। প্রথমত নিখিলেশের আচরণে পৌরুষের চটক না থাকায় বিমলার গোপন মনের ক্ষোভ। দ্বিতীয়ত এবং প্রধানত, নিখিলেশের প্রেম তাহাকে কেবলি প্রাচুর্যে ভরিয়াছে, তাহার কাছে কিছুই দাবি করে নাই। পরস্পরের প্রেমে আদান-প্রদানের সমতা না থাকায় মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিমলার "পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল।" চাহিবার আগেই পাইবার মতো হৃদয়ের দুর্ভাগ্য আর নাই। বিমলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। নিখিলেশের অজস্র দানের মর্যাদা সে দিতে পারে নাই। বরং তার মনে গর্ব আসিয়াছিল। ইহাই তাহার অকল্যাণের মূল।

নিখিলেশের অগাধ ও অব্যক্ত প্রেম বিমলার জীবনকে সংকীর্ণ গৃহবেষ্টনীর মধ্যে পীড়িত কল্পনা করিয়া কিছু কুণ্ঠিত ছিল। কলিকাতায় লইয়া গিয়া বিমলাকে বৃহত্তর সংসারের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া পরস্পরের প্রেম যাচাই করিয়া লইয়া জীবনের পূর্ণবিকাশের পথ মোচনই ছিল নিখিলেশের মনের কামনা। বিমলার গৃহাসক্ত মন তাহাতে সায় দেয় নাই। বিমলা ঘরের ওজরে বাইরেকে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একদা যখন বাহির ঘর ভাঙ্গিয়া হুড়মুড় করিয়া আসিয়া ঘাড়ে পড়িল তখন সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। স্বদেশী-আন্দোলনের

উন্মত্ততার ঢেউ জমিদার-পরিবারের প্রাচীন পরিবেশের ও কঠিন অবরোধের বাধা ভেদ করিয়া আসিয়া বিমলাকে প্লাবিত করিল।

নিখিলেশের ধ্যানী ও আত্মনিষ্ঠ চিত্তে উন্মত্ততা-আবেগের ক্ষোভ জাগিতে পারে নাই। স্বদেশী-আন্দোলনের যেটুকু সত্য অর্থাৎ গড়িবার কাজ, তাহার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু যেটুকু মিথ্যা, যাহা ভাঙ্গিবার খেলা তাহার উপর সে নিতান্ত নারাজ ছিল। বিলাতী বলিয়াই কাপড় পোড়ানো আর বিদেশী বলিয়াই বিমলার শিক্ষয়িত্রী মিস্ গিল্‌বিকে ছাড়ানো ও অপমান করা—এই দুই ঘটনা লইয়া বিমলার সহিত নিখিলেশের অন্তরঙ্গতায় প্রথম বিরোধ-সম্ভাবনা দেখা দিল। এ বিষয়ে নিখিলেশের মনোভাবে বিমলা যেন লজ্জাবোধ করিয়াছিল। যে-নিখিলেশকে বিমলা মাটির মানুষ বলিয়া মনে করিত, তাহার এই দৃঢ়তায় তাহার বিস্ময় ও শঙ্কা জাগিল। বিমলার আত্মাভিমান আহত হইল।

এমন অবস্থায় উল্কার উদ্দীপনা লইয়া নিখিলেশের বাল্যবন্ধু সন্দীপের আবির্ভাব। ফটোগ্রাফে সন্দীপের মূর্তি বিমলার অদেখা ছিল না, তাহার চেহারা ভালো। কিন্তু সে নিখিলেশকে ঠকাইয়া টাকা আদায় করে এবং সে নিখিলেশের চেয়ে সুশ্রী,—এই ধারণা তাহার মনের তলায় থিতাইয়া থাকায় সন্দীপের উপর বিমলার প্রসন্নতা ছিল না। কিন্তু সন্দীপকে দেখিয়া ও বক্তৃতা করিতে শুনিয়া সে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। তাহার মুগ্ধ মুখশ্রী দেখিয়া সন্দীপের দেহে ও মনে উত্তেজনা বাড়িয়াছে,—এটুকুও বিমলার অজ্ঞাত থাকে নাই। তাহার নারীত্বগর্ব উস্‌কানি পাইল। বিমলার সঙ্গে পরিচয়ের পর সন্দীপের সহজ ও সরল ব্যবহার বিমলার মনে প্রত্যাশিত সঙ্কোচের অবসর দেয় নাই। তাহার বক্তৃতালব্ধ জয় সন্দীপ অসংকোচ আচরণের দ্বারা কায়েম করিয়া লইল। বিমলা ভাবিল

> যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি একটুও দ্বিধা নেই, সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এসব তর্ক তাঁর নয়।

বিমলার মনে অধিকার দৃঢ় করিবার জন্য সন্দীপ বন্দে-মাতরং মন্ত্রের ভাব লইয়া নিখিলেশের সহিত তর্ক তুলিল। সন্দীপের কথায় বিমলার মন মাতিয়া উঠিল। নিখিলেশের সহিত তাহার অন্তরের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিদারণরেখা পড়িল। মোহমুগ্ধ বিমলার নারীচিত্ত যেন সমস্ত সংস্কার ভুলিয়া গেল, এবং আদিম নারীত্বে ফিরিয়া গিয়া যখন সে সন্দীপের অনুবৃত্তি করিয়া বলিয়া উঠিল

আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ ক'র্‌ব—আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব কুড়ব; আমার রাগ আছে আমি দেশের জন্যে রাগ ক'রব, আমি কাউকে চাই যাকে কাটব কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব; আমার মোহ আছে আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব, আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব; যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

তখন নিখিলেশের ধারণা হইল যে যাহাকে সে সহধর্মিণী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার সহিত অন্তরের ব্যবধান এখনও কত গভীর।

সন্দীপের সঙ্গে যেদিন বিমলার পরিচয় হয় সেইদিন নিখিলেশের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুর সঙ্গেও বিমলার প্রথম সাক্ষাৎ। ভবিষ্যৎ সর্বনাশ হইতে যে সে শেষ অবধি বাঁচিয়া যাইবে এই ঘটনা-যৌগপদ্যে তাহারি ইঙ্গিত।

বিমলা সাধারণ নারী, এবং সেই মতোই

পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে···উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালবাসা।

একটা বিষয়ে নিখিলেশকে কখনই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। নিখিলেশের ধৈর্যশীলতা সে দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিত। সন্দীপের জোরাল ব্যক্তিত্ব এই কারণেই বিমলাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু অভিভূত করিয়াই ক্ষান্ত রহে নাই। সন্দীপের ক্ষুধিত মুগ্ধ দৃষ্টির আলোক বিমলার মনপ্রাণকে যেন শতদলের মতো বিকশিত করিল। বিমলার কাছে সন্দীপ তো একটি মানুষ শুধু নয়, সে সমগ্র দেশের বিগ্রহ। তাই তাহার কাছে তাহার স্তবগানের মাদকতা ছিল অত্যন্ত কড়াগোছের।

সন্দীপবাবু তো কেবল একটিমাত্র মানুষ নন—তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহানার মতো। তাই, তিনি যখন আমাকে ব'ললেন, মৌচাকের মক্ষিরাণী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশসেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল।

মানভঞ্জন গল্পের গিরিবালার মনোভাব এই সঙ্গে তুলনীয়। যে-নারী শুধু গৃহকোণের প্রভুত্ব পাইয়াই কৃতার্থ তাহাকে যদি বহিঃসংসারের রঙ্গমঞ্চে নেত্রী নারীর সাজ পরানো হয় তখন তাহার মত্ততার সীমা কোথায়। বিমলার গূঢ়গর্ব তাহাকে যেখানে তুলিয়া দিল সেখানে ক্ষুদ্র সংসারের ব্যঙ্গ-উপহাস তাহাকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মনকে বাস্তবতার মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না।

এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড় জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা, আর আমার মেজো-জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ ক'রতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সামান্য ব্যাপারে বিমলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এবং বিমলার সিদ্ধান্তে চমৎকৃত হইবার ভাণ করিয়া সন্দীপ বিমলার মোহমত্ততায় ইন্ধন যোগাইতে লাগিল।

ব্যাপার যে কতদূর গড়াইতে চলিয়াছে সে বিষয়ে বিমলার মন চমকিয়া সজাগ হইল যখন সে সন্দীপের লালসালোলুপতার পরিচয় পাইল,—সন্দীপ যখন তাহারি পড়িবার জন্য তাহাদের বৈঠকখানায় এমন একখানি আধুনিক ইংরেজী বই রাখিয়া আসিয়াছিল যাহাতে "স্ত্রীপুরুষের মিলনরীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে"। সেদিন নিখিলেশের আকস্মিক উচ্ছ্বাসও তাহাকে কতকটা নাড়া দিয়াছিল। সন্দীপের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বিমলার ঘোর আজ অকস্মাৎ ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহাকে "এখন জেনে-শুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে।" নিখিলেশ বিমলাকে ধ্যানের পীঠে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সন্দীপ তাহাকে ভাবের রঙে রাঙাইয়াছে। নিখিলেশের প্রেম তাহার পদতলের ভূমি। সন্দীপের আকর্ষণ ভৃগুপাতের মতো দুর্দম। তাহারি মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা বিমলাকে বিকর্ষণও করে। হয়ত আবেগের অস্পষ্ট কুহেলিকার মধ্য দিয়া এই দ্বন্দ্ব, এই নেশা একদিন আপনিই কাটিয়া যাইত,

> কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তুললেন।

সন্দীপের বাসনার এই তীব্র আবেগ বিমলাকে যেন স্বপ্নাভিভূত করিয়া দুর্দমনীয়-বেগে টানিতেছিল। তবে সন্দীপের উপর বিমলার শ্রদ্ধা আর রহিল না। বিমলা একথা বুঝে যে সন্দীপের অভিমান তাহার প্রতি অপমান, তবুও সে রাগ করিতে পারে না, তবুও তাহার মোহ কাটিতে চায় না।

> তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাব-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবুর প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসিলে বিমলার মন উচ্চভূমিতে আশ্রয় পায় ও কিছু শান্তি লাভ করে, কিন্তু সে ভাব তো স্থায়ী হয় না। সন্দীপ দেশের দোহাই পাড়িয়া বিমলার নেশাকে আবার জমাইয়া দেয়, সে নেশা বিমলাকে আত্মগ্লানি হইতে বাঁচায়।

> এমনি ক'রে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়—তখন সংকোচের বাঁধন আর টেকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। যত দিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়, আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সেই অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধ'রে উঠল—সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ ক'রলে। মনে হ'তে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী-মহিমা।

বিমলার মনে বাসনার অগ্নিশিখা জালাইয়া রাখিবার জন্য সন্দীপ তাহার বাগ্মিতা যথাসাধ্য শাণাইয়া রাখিত। সন্দীপ বলিত

> আমি চাই, এই বাণীই হচ্চে সৃষ্টির মূল বাণী—সেই বাণীই কোন শাস্ত্র বিচার না ক'রে আগুন হ'য়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে।

বিমলাও তাই বুঝিয়াছিল

> 'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হ'চ্চে আপনার পূর্ণ প্রকাশ—না বলতে পারাই হ'চ্চে ব্যর্থতা।

তবে এই উদ্দীপিত কামনার মোহকরী শক্তির বিপরীতে বিমলার মনের গোপন কোণে তাহার মায়ের স্বামিভক্তির স্মৃতি, তাহার দিদিশাশুড়ীর সংসার-মমতা, নিখিলেশের প্রতি তাহার অননুভূত প্রেম, তাহার নিজের সর্ববিধ সংস্কার—সক্রিয় ছিল তাই সে নিখিলেশের ফটোগ্রাফ এবং সাধের অর্কিড গাছটি অনাদরে ধূলায় মলিন হইতে দিয়াছিল বটে কিন্তু একেবারে ফেলিয়া দিতে পারে নাই। বিমলার জীবনের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বে এই কুণ্ঠা হইতেই তাহার মনের মোড় ফেরা শুরু হইল।

> ইচ্ছে হ'ল পরগাছাটাকে জানালার বাইরে ফেলে দিই—ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি—প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কি আছে!

তবুও, বিমলার সমস্ত সংস্কার কোনই বাধা দিতে পারিত যদি না তাহার ইতস্তত-ভাবের প্রতিক্রিয়ায় সন্দীপের মনে ইমোশনের "দুর্বলতা," অর্থাৎ তাহার সকল সংস্কার, জাগিয়া না উঠিত।

> আমার খুসী আছে কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবল দেরী হ'য়ে যাচ্চে—তেমন জোরে ফাঁস করতে পারছিনে।

এমন অনেক মুহূর্ত আসিয়াছিল যখন সন্দীপ ইচ্ছা করিলেই বিমলাকে দখল করিতে পারিত—এমন কি বিমলার মনও যেন সেজন্য উৎসুক-শঙ্কিত ছিল। কিন্তু সংকট ক্ষণে সন্দীপের পূর্ব সংস্কার জাগিয়া উঠিয়া তাহার মনকে দাবাইয়া দিয়া পিছুপানে টানিত। মানুষের মন কোমল হইয়া পড়িলে তাহার আইডিয়ার জোর কমিয়া যায়। সে ভাবে

> এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই,

> মানুষ আপনাকে যা ব'লে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

যেদিন তাহার কাছে কাজ আদায় করিবার জন্য বিমলা বিশেষভাবে প্রসাধন করিয়া আসিয়াছিল সেদিন নিখিলেশ সত্যসত্যই ব্যথা পাইয়াছিল। ইহাতে নিখিলেশের একটা মস্ত ভুলও ভাঙ্গিল। এতদিন সে মনে করিয়াছিল যে সন্দীপের ডাকে বিমলার হৃদয় বুঝি সত্যই সাড়া দিয়াছে, সন্দীপের সহিতই বুঝি বিমলার অন্তরের যথার্থ মিল। আজ সে জানিল বিমলা সন্দীপের প্রতিধ্বনিমাত্র—প্রতিনিধি নয়।

> আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী ব'লেই দেখলুম—শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

পুরুষ নিজের কামনার মোহরসে নারীকে রঙাইয়া লইয়া তাহাকে মোহিনী করে। সেই মোহিনীকে আবেশহীন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেই তবে তাহার মোহবন্ধন খসিয়া যায়। আজ নিখিলেশের সেই বন্ধনমুক্তি ঘটিল এবং তাহার মন সঙ্গে সঙ্গে বিমলাকেও মুক্তি দিল। অন্তরের বেদনার অভিষেকে নিখিলেশ নিষ্ঠুর সত্যকে বরণ করিয়া লইল।

ব্যর্থসজ্জার "অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্ত-রেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে" সন্দীপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন জানিল না সে কতটা অরক্ষিত, তাহার সংকট-মুহূর্ত কতটা আসন্ন। সন্দীপের আক্রমণের জন্য তাহার মন যেন কতকটা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সন্দীপও এই সুযোগ ছাড়িতে চাহে নাই। কিন্তু অনুরাগের আগুনে তাহার চিরকালের সংকোচও সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। বিমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া দিয়াই সন্দীপের উত্তেজনা নিভিয়া গেল। বিমলা বুঝিল কি বিপদ তাহার কান ঘেঁষিয়া গিয়াছে। বিমলা চলিয়া গেলে পর সন্দীপের মনে আফশোশ জাগিল।

> মনে হ'তে লাগ্‌ল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা। আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমল বোধ হয় আমার পরে অবজ্ঞা ক'রেই চলে গেল। ক'রতেও পারে।

কোন-কিছু করিতে না পাইয়া বিমলার মনের ঘোর যাহাতে কাটিয়া না যায় এবং তাহার পৌরুষের উপর অবজ্ঞা না আসে সেজন্য সন্দীপ তাহার কাছ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাহিয়া বসিল। সন্দীপ বুঝিয়াছিল যে বিমলার অন্তরাত্মা সন্দীপের জন্য যে-কোন কঠিন কাজ করিতে প্রস্তুত।

> বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড় দাবী ক'রব তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হ'লে সে খুসী হবে কেন? এতদিন সে ভাল ক'রে কাঁদতে পায় নি ব'লেইতো আমার পথ চেয়ে ব'সেছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল ব'লেইতো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হ'য়ে ঘনিয়ে এল।

প্রথম সংকট কাটিয়া গেলে পর সন্দীপ বিমলাকে কিছুকালের জন্য রেহাই দিল। সে বুঝিল "রসের পেয়ালার...তলানি পর্যন্ত গেলে" তাহার সম্বন্ধে বিমলার মোহ ঘুচিয়া যাইবে এবং বিমলার মোহের প্রয়োজন এখনো মিটিয়া যায় নাই। সন্দীপ বুঝিয়াছিল

> সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধ'রেছিলুম, তার রেস্ ওর মনে বাজছে আমারও মনে তার ঝঙ্কার থামেনি। এই রেস্-টুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে।

বিমলার মধ্যে সন্দীপ সমগ্র দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে,—তাহার এই কথা বিমলাকে আরো অভিভূত করিল। বিমলার স্বপ্নাবিষ্ট মন সন্দীপের দিকে আর কয়েক পা আগাইয়া গেল,—বিমলা তাহাকে এই প্রথম "তুমি" বলিয়া ডাকিল, এবং তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া অবসাদের ও পরাজয়ের কান্না কাঁদিতে লাগিল। সন্দীপের সম্মোহন-শক্তির এখানেই চূড়ান্ত জয়জয়কার। টাকা কোন ছার কথা, বিমলা গহনার বাক্স উজাড় করিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। সন্দীপ দাবি কমাইয়া পাঁচ হাজারে নামিয়া মস্ত ভুল করিল। বিমলা বুঝিতে পারিল, সন্দীপ লোভী।

বিমলার মনের দ্বন্দ্ব নিখিলেশের অগোচর থাকে নাই। সেও ব্যথা পাইতে লাগিল, তবে নিজের হৃদয়বেদনার কাছে সে ব্যথা বড় নয়। কিন্তু যেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানের কোণে বিমলার বুকফাটা কান্না তাহার কানে গেল সেদিন বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ নিখিলেশের প্রাণে বাধিয়াছিল। এই পাশবদ্ধ হরিণীর আর্তি সমস্ত ক্ষোভ ছাপাইয়া নিখিলেশকে বিচলিত করিল। নিখিলেশ মনে মনে বিমলার উপর সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ছুটি দিল। সে বুঝিল

> যাকে আমার হৃদয়ের হার ক'রব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা ক'রে রেখে দিতে পারব না।

বিমলাকে মুক্তি দিয়া নিখিলেশ নিজেও মুক্তি অনুভব করিল।

> সত্যি যেদিন পাখীকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখীই আমাকে ছেড়ে দিলে।

সন্দীপের সম্মোহন-পাশ হইতে বিমলার মুক্তি তবুও হইত না যদি-না বালক অমূল্যর সরল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাহার অন্তরে মাতৃস্নেহের রুদ্ধদ্বারে ঠেলা দিত।

সন্দীপ অমূল্যকে যে-পথ নির্দেশ করিয়াছে সে সর্বনাশের পথ, সে-পথে চলিবার যোগ্যতা তাহার এখনো হয় নাই।

> ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো ব'লে বিশ্বাস করবার যে ওর সময়। আহা ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে।

অমূল্যর উপস্থিতি এবং তাহার প্রতি বিমলার স্নেহই পরে বিমলাকে শেষ সংকটমূহূর্তে রক্ষা করিয়াছিল।

সন্দীপের মোহের বশে বিমলা স্বামীর সিন্দুক হইতে মোহর চুরি করিল। কিন্তু চুরি করিয়াই তাহার মনে অনুশোচনা জাগিল।

> আজ আমি এই যে চুরি ক'রে আনলুম, এ তো টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মতো—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি,—বিশ্বাস চুরি ধর্ম চুরি।

বিমলার স্নেহ লইয়া অমূল্যর প্রতি অহেতুক ঈর্ষা এবং সোনার উপর অকারণ লোভ, সন্দীপ-চরিত্রের এই দুই দুর্বলতা বিমলার মোহের মূলে নাড়া দিতে লাগিল। মোহর চুরির পর হইতেই বিমলা-সন্দীপের সম্পর্কে রঙীন সুরটুকু কাটিয়া গিয়াছিল। এখন মিথ্যামোহের আবরণ খসিয়া পড়ায় সন্দীপের কামনা নিরাবরণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অথচ বিমলার মনে জোর আসে না। তৃতীয় সংকটমুহূর্তের মুখে বিমলা তিষ্ঠিতে পারিল না, পলাইবার জন্য দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু সন্দীপের উগ্র লোভ এখন নিঃসংকোচ। নিখিলেশের আগমনী জুতার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিমলাকে চরম সর্বনাশ হইতে বাঁচাইয়া দিল। অমূল্যর মঙ্গল-চিন্তা বিমলার মনকে নিজের বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। "অমূল্য, নিজের জন্য ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি"—এই কয়টি কথার মধ্যে তাহার নবজন্মের সূচনা ধ্বনিত। সন্দীপের কথার আকর্ষণ বিমলাকে আর অভিভূত করে না, কেননা সন্দীপ তাহার কাছে আর সে-শক্তি নয় যে-শক্তি দেশকে জাগ্রত করিতে অভ্যুদিত। আজ সে লোভী সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তাই সহজেই বিমলা সন্দীপের মর্মে আঘাত দিতে পারিল।

> সন্দীপবাবু, আপনি গলগল ক'রে এত কথা ব'লে যান কেমন ক'রে? আগে থাকতে বুঝি তৈরী হ'য়ে আসেন?

মর্মের দুর্বলতম স্থানে ঘা লাগায় অপরিসীম ক্রুদ্ধ হইয়া সন্দীপ নিজের মহিমা হারাইল। যতই সে বিমলাকে রূঢ় কর্কশ কথা হানিতে লাগিল ততই বিমলা সন্দীপের স্বরূপ বুঝিতে পারিল এবং নিজের অন্তরে মোহমুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিল। কিন্তু কোন মানুষের সব-কিছু মিথ্যা নয়, সন্দীপেরও নয়।

প্রত্যক্ষের প্রতি সন্দীপের নিষ্ঠা, তাহার অন্তরের প্রচণ্ড শক্তি যাহা সমস্ত বাধা বিঘ্নকে উড়াইয়া দিয়া মরণকে তুচ্ছ করিয়া তাণ্ডবে মাতিয়া উঠে,—তাহা তো মিথ্যা নয়। সন্দীপের ব্যক্তিত্বের এই ভীমকান্ত দিকের আকর্ষণ বিমলার মনের অপর দিক—তাহার অপর ego—অস্বীকার করিতে পারিল না।

> আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়ঙ্কর রূপ—আর এক বুদ্ধি ব'লছে এই তো মধুর।

সন্দীপের মধ্যে যে দৈবী শক্তির প্রকাশ তাহারি চরণে বিমলা স্বামীর সাক্ষাতে তাহার গহনার বাক্স নিবেদন করিয়া দিল।

বিমলা যখন টাকা চুরি স্বীকার করিয়া লইল তখন নিখিলেশের ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া বিমলা যাঁহাকে বিদ্বেষ করিত সেই মেজোরানীই তাহার অপরাধকে উড়াইয়া দিয়া তাহাকে নিজের স্নেহপুটে টানিয়া লইলেন, এবং তাঁহারি মধ্যস্থতায় দম্পতী স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইল। বিমলা তাহার অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত ক্রন্দন ঢালিয়া দিয়া নিখিলেশের পায়ে যেন পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করিল।

> যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন ক'রে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু বিমলার বেদনা এইখানেই পর্যবসিত নয়। যে-দুইজনের স্পর্শে তাহার হৃদয়ের গভীর উৎস খুলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মৃত ও মরণাপন্ন রাখিয়া গল্পের বিধাতা বিমলার প্রায়শ্চিত্তকে নিষ্ঠুরতর করিয়া কাহিনী বন্ধ করিয়াছেন। তাহার পর নিখিলেশের বাঁচিবার আশা এবং বিমলার হতাশা,—এই দুই সংকটের মধ্যে পাঠকের মন দোল খাইতে থাকে।

নিখিলেশের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার উদার সহানুভূতি, অসীম ধৈর্য, অটুট সত্যনিষ্ঠা। তাহার সত্য কল্পনার সত্য নয়, ইমোশন-বিজড়িত কোন আইডিয়াল সত্য নয়, সে কল্যাণের সত্য, ক্ষমার সত্য, ত্যাগের সত্য। নিখিলেশের অনুভব গভীর। বাহিরের চাঞ্চল্য, মনের মত্ততা তাহার ধাতে সয় না। এইখানেই বিমলার মুখর নারীত্বের সহিত নিখিলেশের মূক পুরুষত্বের তফাৎ এবং সন্দীপের ধৃষ্ট ব্যক্তিত্বের সহিত মিল। এইজন্যই বিমলার প্রতি নিখিলেশের আকর্ষণ একটুও কমে নাই এবং এইজন্যই সে বিমলার ও সন্দীপের সম্পর্কে হস্তক্ষেপে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে।

নিখিলেশের তত্ত্বদর্শী মন সাময়িক উত্তেজনা-উদ্দীপনার মধ্যে অবিচল থাকিয়া, তাহার শেষ কতদূরে গড়াইতে পারে তাহা ভাবিয়া, নিজের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিত। সেইজন্য স্বদেশী-আন্দোলনে জনসাধারণ যখন মাতিয়া উঠিত নিখিলেশ তখন তাহাতে উৎসাহ বোধ করিত না।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত ক'রত। যেটা সাম্‌নে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা কিছুকে দেখতে পেতেন।

তাই সন্দীপও বুঝিয়াছিল

চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও ম'রেও মানতে চায় না। মুস্কিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক ক'রে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।

নিখিলেশের মতো আত্মগত শান্তহৃদয়ের পক্ষে নারীর ভালোবাসা একটা অলৌকিক মাহাত্ম্যমণ্ডিত হইয়া অনুভূত হয়। প্রতিদানের অপেক্ষা করিয়াও তাহার হৃদয় ভালোবাসিয়াই অজস্রভাবে তৃপ্তিলাভ করে। বিমলার ভালোবাসা নিখিলেশের পক্ষে অপর্যাপ্ত হইলেও তাহার সূক্ষ্ম অনুভবের কাছে নিরপেক্ষভাবে যাচাই হওয়া আবশ্যক ছিল। তাই এক সময় সে "ঘরে"র বিমলাকে কলিকাতায় "বাহিরে" আনিয়া তাহার প্রেমের পরীক্ষা লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিল।

আমি প্রেমিক সেই জন্যই আমি তালা দেওয়া লোহার সিন্ধুকের জিনিষ চাইনি—আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনমতেই ধরা যায় না।

কল্পনা-আদর্শের আতশ-কাচের মধ্য দিয়া সে বিমলাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছিল বলিয়া সে তাহার মনকে নাড়া দিতে পারে নাই। রক্তমাংসের সম্পর্কের উপরে জ্ঞানের ও তপস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রেমও জমে না। জ্ঞান ও তপস্যা দুয়েরি অভাব ছিল বিমলার। সেইজন্য সন্দীপের ইমোশন, তাহার লালসার স্থূলতা স্বভাবের ডাক ডাকিয়া বিমলার বাসনাকে, তাহার রক্তমাংসের অনুভূতিকে সহজে সাড়া দিতে বাধ্য করিয়াছিল। নিখিলেশের বিশ্বস্ত প্রেম ও ধৈর্য, ক্ষমা ও সহানুভূতিই বিমলাকে শেষ অবধি বাঁচাইয়া দিয়াছে।

সন্দীপ নিখিলেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপ্রকৃতির মানুষ হইলেও এক বিষয়ে তাহাদের দুইজনের মধ্যে মিল ছিল,—উভয়েই নিজের অন্তরের কাছে নিষ্কপট।

এই কপটতা জিনিষটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না—এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

উভয়েই নির্ভীক, কিন্তু সেই নির্ভীকতায় প্রভেদ আছে। সন্দীপের নির্ভীকতা ততক্ষণই টিকিয়া থাকে যতক্ষণ তাহার কোন আইডিয়া মনে ইমোশন জাগাইয়া রাখে। নিখিলেশের নির্ভীকতার মধ্যে ইমোশনের ছোঁওয়া নাই। তাহা অচঞ্চল, অমোঘ। উপন্যাসের উপসংহারে সন্দীপ তাই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইল, আর নিখিলেশ না পলাইবার জন্য প্রাণ দিল।

নিখিলেশের স্বাধীন চিত্ত কাহারো উপর কোনরকম বন্ধন—পারিবারিক হোক অথবা সামাজিক হোক—আরোপ করিতে চাহিত না। তাহার ব্যক্তিত্ব মানুষকে কাছে না টানিয়া যেন একটু দূরে দূরে রাখিত।

> নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি ক'রতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে-জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি না।

সন্দীপের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। নিজের ইমোশনে সে নিজে যত সহজে ভুলিতে পারিত অপরকে আরো সহজে ভোলাইতে পারিত। সত্য নিখিলেশের কাছে ধ্রুব, পারমার্থিক ও নির্ব্যক্তিক, কিন্তু সন্দীপের কাছে ব্যবহারিক। সে ভাবে

> নিখিলকে এসব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য ব'লে কোন একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত ব'লেই অসঙ্কোচে ব'লতে পেরেছে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হ'লেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে।

নিখিলেশের স্থিরবুদ্ধিতে কোনরকম ইমোশন প্রশ্রয় পাইত না। সন্দীপ ইমোশনের রসেই মাতাল হইয়া থাকিত।

> ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হ'চ্ছে আইডিয়ার যাদুকর,—সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোন প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেল্‌কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হ'ত তা'হলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ ক'রে ও পুলকিত হ'য়ে উঠত। ভোলানই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাক্‌তে পারে না।

সন্দীপের কর্মনীতি ছিল,—"সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।" নিখিলেশের ধর্মনীতি ছিল—সত্যই লক্ষ্য এবং তাহার উপলব্ধি-ক্রিয়াতেই ফললাভ। দুইজনেই সাধক, এবং দুইজনেই নিষ্কপট—এইজন্য সম্পূর্ণ বিপরীত-

প্রকৃতির হইলেও দুইজনের ব্যক্তিত্বে ছন্দের মিল ছিল। তাই মাস্টারমশায় বলিয়াছিলেন

> জানো নিখিল, সন্দীপ অধার্মিক নয় ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টোদিকে গিয়ে পড়েছে।

সন্দীপের শক্তি খাঁটি। যখন সে একটা আইডিয়ার ভাবরসের তুঙ্গশিখরে থাকে তখনো সে খাঁটি। কিন্তু এই ইমোশনে স্থিরভূমি নাই, ধৈর্য নাই। ইমোশন মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। তাই সে সর্বদাই অশান্ত। নিখিলেশের স্থিরবুদ্ধির প্রশান্তি সে পাইবে কোথায়। রসের ভিয়ানে শক্তির সাধনায় সন্দীপ শাক্ত সাধক, মন্ত্রব্যবসায়ী। সে তান্ত্রিক, কেননা তাহার সাধনা যে-শক্তির সাধনা, তা অপরকে পীড়া দিবে, ধ্বংস করিবে। কিন্তু সে শুধুই তান্ত্রিক নয়। বৈষ্ণবরসসাধনার মত্ততার আকর্ষণও তাহার কাছে কম লোভনীয় নয়। সন্দীপের জীবনদর্শন (এবং বিমলার মনে তাহার প্রতিধ্বনি) তাহারি মুখে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য বাউলগানের রীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

> আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি
> বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি,—
> আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব যাক না উড়ে পুড়ে।

সন্দীপেরও নিকড়িয়া সুরের সাধনা। তবে তাহাতে দুঃখের, ত্যাগের কঠিন তপস্যা নাই। কিন্তু সন্দীপ শেষ পর্যন্ত ত্যাগের মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিল। বিমলার প্রতি তাহার অনুরাগ বাস্তবতা পার হইয়া একটা অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আসিয়া ঠেকিয়াছিল,—একটা "কিন্তু"তে। "সেই আমার সর্বনাশী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা।" সন্দীপ লোভী, তবে সে লোভের বস্তুর মর্যাদা জানে। সে জানে

> পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড় তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে—মুহূর্তের অন্তরে যা অমর তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়।

তাই পরাজয়ের ক্ষণে সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে নাই।

গোরা-চরিত্রের ছায়া সন্দীপ-চরিত্রে সামান্য পড়িয়াছে। গোরার মতো সন্দীপেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য মনের, মতের এবং কণ্ঠের জোর। দুইজনেরই বুদ্ধির দীপ্তি চমকপ্রদ এবং কর্মক্ষমতা প্রচণ্ড। তবে গোরার বুদ্ধি বিশুদ্ধ, তাহার মন কোনো বিশিষ্ট মতবাদকে ধরিয়া ভাবরসে মাতাল হইয়া উঠে নাই, এবং তাহার যে সত্য তাহার মধ্যে আপেক্ষিকতা বা সাময়িকতা কিছু ছিল না। সন্দীপের

বুদ্ধিতে ইমোশনের পাকা রঙ ধরিয়াছিল, এবং তাহার মনে যে লালসার স্থূলতা ছিল তাহাতে গোরার নিঃসঙ্গতার ত্যাগের ও সহনশীলতার ছিটেফোঁটাও নাই।

ঘরে-বাইরের মূল ভূমিকা তিনটি—বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ। বিমলা-নিখিলেশের আত্মকথার মধ্য দিয়া আর যে-কয়টি চরিত্রের পরিচয় মিলিতেছে তাহার মধ্যে প্রধান মেজোরানী আর মাস্টারমশায়। মাস্টারমশায়ের মধ্যে নিখিলেশের জীবন-আদর্শ প্রতিফলিত। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবুর মুখের আভা অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের কোমল নম্রতায় উদ্ভাসিত। তাহারি স্নিগ্ধতায় নিখিলেশের ক্ষত-বিক্ষত অশান্তচিত্ত ধৈর্যধারণ করিতে পারিয়াছে।

> আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এই জন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন সেইজন্য আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না।

গল্পের নেপথ্য হইতে মেজোরানীর অসজ্জিত ভূমিকাটুকু বড় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত। বিমলার দুই জা রূপসী ছিলেন। তাঁহারা স্বামিসৌভাগ্য বলিয়া কিছু পান নাই, এবং যা পাইয়াছিলেন সেটুকুও তাঁহাদের ভাগ্যে বেশি দিন টিকে নাই।

> মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্বণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধ'রে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন,

> সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল—কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধ'রে মিছে জ্বলতে লাগল। কোথাও সঙ্গীত নেই, কেবলমাত্র জ্বলা।

ইঁহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্য নিখিলেশের বেদনার অন্ত ছিল না। বিমলার অভিমান ছিল

> স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না।

এই অভিমান নিতান্ত অকারণ নয়। বিমলা নিজে সুন্দরী ছিল না।

বড়রানী ছিলেন

> জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য তাঁর মুখে এত বেশি খরচ হ'ত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না।

মেজোরানী ছিলেন অন্য ধরনের।

> তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং ক'রতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না—কেন না

এ বাড়ীর ঐ রকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য।

আসল কথা নিখিলেশ যে অরূপসী বিমলাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করে তাহা এই বাড়ীর দস্তুর নয়, এবং নিখিলেশের প্রতি তাঁহার যে আবাল্য সখ্যস্নেহ তাহা বিমলার দৃষ্টিকটু ছিল। সেই সঙ্গে বিমলার সৌভাগ্যের ঈর্ষাও বিজড়িত ছিল। নিখিলেশ যখন স্বদেশী জিনিস ব্যবহার শুরু করিল তখন সে কাহারো কাছে কোন উৎসাহ পায় নাই, এমন কি বিমলার কাছেও না, কেবল মেজোরানী কিছু না বুঝিয়া শুধু নিখিলেশের মুখ চাহিয়া তাহাতে প্রশ্রয় দিতেন। বিমলা ভাবিত

আমি যে স্বামীর খেয়ালে যোগ দিইনে সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন।

একদিন মেজোরানী যখন সেলাই করিতেছেন তখন বিমলা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিল

এ তোমার কী কাণ্ড। এদিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিভ দিয়ে জল পড়ে, ওদিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার একদণ্ড চলে না।

ইহার উত্তরে মেজোরানী যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে নিখিলেশের সহিত তাঁহার স্নেহসম্পর্কটি পরিস্ফুট।

তাতে দোষ হয়েছে কী, কত খুসী হয় বল দেখি? ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মত ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারিনে। পুরুষ মানুষ ওর আর তো কোনো নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই—এখানেই ও মরবে।

বিমলার ভালোবাসার পূজায় আত্মবিস্মৃত নিখিলেশ মেজোরানীর স্নেহের আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। কিন্তু বিমলার তরফে যখন সে নিদারুণ ব্যথা পাইল তখন মেজোরানীর সতর্ক সজাগ স্নেহধারাই তাহার উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে শান্তিধারা সেচন করিয়াছিল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও—তুমি নিজেকে এমন ক'রে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারিনে। এই ব'লতে ব'লতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল। আমি একটি কথাও না ব'লে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলাকে মুক্তি দিয়া নিখিলেশের হৃদয় যেন খালি হইয়া গেল। বিমলাকে

লইয়া সে কলিকাতায় যাইবে বটে কিন্তু শান্তি পাইবে কিসে। এই সংকটে মেজোরানীর স্নেহের স্পর্শ তাহার চিত্ত ভরিয়া দিল। নিখিলেশ দেখিল মেজোরানী বাড়ীর সমস্ত মায়া কাটাইয়া তাহার সঙ্গে কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন।

> এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ী যেন কথা ক'য়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন' বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়ীতে এসেছেন।...এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখা-প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ীর সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার ক'রে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটো-খাটো জিনিষপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই ক'রে আমাদের বাড়ী থেকে যাবার মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছেন তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরানী, যিনি ন' বছর বয়স থেকে আর এ-পর্যন্ত কখনও একদিনের জন্যও এ-বাড়ী ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন।

মেজোরানীর হৃদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত বেদনাবিজড়িত স্নেহের স্পর্শে নিখিলেশের হৃদয় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। একটা তোরঙ্গের উপর বসিয়া পড়িয়া নিখিলেশ বলিল

> মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেই দিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড় ইচ্ছে করে।

উত্তরে তিনি যে কথা বলিলেন তাহাতে তাঁহার ব্যর্থ নারীজীবনের রিক্ততার গভীর হতাশ্বাস বাহির হইয়াছে।

> না ভাই, মেয়ে-জন্ম নিয়ে আর নয়—যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?

সংসারে যে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে একথা নিখিলেশ ভুলিয়াই গিয়াছিল। মেজোরানীর ব্যবহারে তাহার ভুল সে ভাঙ্গিল। নিখিলেশ বুঝিল বিমলার প্রেম যদি সে নাও পায় তবুও তাহার জীবন ব্যর্থ হয় নাই। নারীর পক্ষে বড় শক্ত প্রতিপক্ষ নারীর অপরাধ ক্ষমা করা,—মেজোরানী নিখিলেশের মুখ চাহিয়া তাহাও করিলেন। বিমলা তাঁহারি টাকা চুরি করিয়াছে জানিয়াও তাহার সকল দোষ নির্বিবাদে ঢাকিয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের সঙ্গে স্টিভেন্‌সনের *Prince Otto* উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ ভাবসাদৃশ্য আছে। স্টিভেন্‌সনের সেরাফিনা, অটো ও গোন্‌ড্রেমার্ক

যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের সঙ্গে তুলনীয়। গট্‌হোল্‌ডএর কাছাকাছি ভূমিকা হইতেছে চন্দ্রনাথবাবুর। কাউণ্টেসের ভূমিকার অনুরূপ ঘরে-বাইরেয় নাই। তবে অটোর উপর কাউণ্টেসের প্রভাব কতকটা নিখিলেশের উপর মেজোরানীর প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যদিও মনোবৃত্তি অনেকটা ভিন্নধরনের। প্রিন্স-অটোতে কাউণ্টেসকে দিয়া অটো নিজের ধনাগার হইতে মোহর চুরি করাইতে বাধ্য হইয়াছিল আর ঘরে-বাহিরের সন্দীপ বিমলাকে তাহার স্বামীর ধন চুরি করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। স্টিভেন্‌সনের উপন্যাসকাহিনীর মধ্য দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর বহিয়া গিয়াছে। ইহার উপসংহারও ব্যঙ্গাত্মক এবং পুরাপুরি মিলনান্ত। ঘরে-বাহিরের সুর সকরুণ ও গম্ভীর এবং উপসংহার ট্রাজিক ও অনভিব্যক্ত। ঘরে বাইরের ভূমিকাগুলির মধ্যে বাস্তববীজ কিছু কিছু আছে বলিয়া মনে হয়॥

৪

'যোগাযোগ' (১৯২৯)[১] যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে শুরু হয় তখন নাম ছিল 'তিন-পুরুষ'। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল কাহিনীসূত্র তৃতীয় পুরুষ অবধি টানিবেন। কিন্তু গল্প ফাঁদিবার পরে সে ইচ্ছা রহিল না। যে অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ বছরের জন্মদিনের কথা লইয়া উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছিল তাহার জন্মের সম্ভাবনার ইসারা করিয়াই তিনি কাহিনী শেষ করিয়া দিলেন। দুই তিন সংখ্যায় বাহির হইবার পর প্রধানত এই কারণে[২] রবীন্দ্রনাথ বইটির নাম পালটাইয়াছিলেন। যোগাযোগের ভূমিকায় এই নামপরিবর্তন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কিছু মূল্যবান কথা বলিয়াছেন।

> গল্প জিনিষটাও রূপ; ইংরাজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন্। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—নামে দোষ নেই। কেন না ও-নামে গল্পের কোন ব্যাখ্যাই করা হয় নি।

আমাদের দেশে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরের মিল দৈবাধীন ঘটনা। তবুও যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সচরাচর কোন দুর্ঘটনা দেখা যায় না তাহার একমাত্র কারণ এই যে উভয় পক্ষে, অন্তত স্ত্রীর পক্ষে, কোনরূপ

[১] প্রকাশ বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪ হইতে চৈত্র ১৩৩৫।

[২] ইতিমধ্যে জলধর সেনের 'তিন পুরুষ' নামে উপন্যাস বাহির হইয়াছিল। নামপরিবর্তনের ইহাও একটা কারণ।

পূর্বসংস্কার বাধা দেয় না। আগেকার দিনে মেয়েদের খুব অল্পবয়সেই বিবাহ হইত, সুতরাং তাহাদের দাম্পত্যসংস্কার বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীর আবহাওয়ায় অভ্যাস রূপে গড়িয়া উঠিত। অতএব সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কে মসৃণতাহানির সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু বেশি বয়সে বিবাহ হইলে মেয়েদের মনে, পিতৃগৃহের স্নেহছায়ায় থাকিয়া, গার্হস্থ্য সংস্কারের ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা বেশি হয়। এই ধরনের কোন কোন মেয়ের পক্ষে স্বামীর সঙ্গে মনের মিল হওয়া সম্ভব, এবং তাহা না হইলে, অর্থাৎ তাহার সংস্কারের সঙ্গে স্বামীর সংস্কারের বিরোধ ঘটিলে, সংসারে ট্রাজেডি ঘনায়। এ রকম ট্রাজেডি হয়তো শুধু অন্তরেই আবদ্ধ থাকে, বাহিরে ঝগড়াঝাঁটি গলায়-দড়ি ইত্যাদিতে প্রকাশিত ও পরিণত হয় না। তখনি ট্রাজেডি হয় নিদারুণ। বিবাহকালে কুমুর বয়স উনিশ না হইয়া যদি দশ হইত, যদি নূরনগরের চাটুয্যে-বাড়ীতে তাহার জন্ম না হইত এবং দাদা বিপ্রদাসের পাণিপল্লবতলে তাহার নবীন বয়স নীত না হইত তবে মধুসূদন ব্যক্তিটির অশেষ স্থূলতা সত্ত্বেও তাহার সঙ্গে ঘর করিতে কুমুর কিছুমাত্র বাধিত না, এবং তাহার সঙ্গে মোতির মার দৃষ্টিকোণেও কোন পার্থক্য থাকিত না।

কুমুদিনী ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসের কোন নায়িকাই "পটের সুন্দরী" নয়। কুমুই এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। ইহার কারণ আছে। প্রাচীন অভিজাত বংশের মেয়ে সে। বহু পুরুষ ধরিয়া তাহাদের গৃহে বাছাই করা সুন্দরী মেয়ে বধূরূপে আসিয়াছে। সুতরাং সে-বাড়ীর ছেলেমেয়ে অপরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক।

> একরকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশী,—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য এই শ্রেণীর।

জন্মাবধি সে সংসারের উপর দুর্ভাগ্যের দৃষ্টি দেখিয়া আসিয়াছে। সংসারের পড়ন্ত দশা, আর মাতাপিতার মৃত্যুর নিদারুণতা কুমুর মনকে নিপীড়িত ও সংকুচিত করিয়াছিল। সে-জন্য তাহার চিত্ত সর্বদা কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত থাকিত, এবং দৈব-ইঙ্গিত গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল ইত্যাদিতে আস্থা রাখিয়া সে মনে ভরসা আনিতে চেষ্টা করিত। তাহা ছাড়া তাহার মনে একটা স্বাভাবিক ভক্তিভাব, "একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস" ছিল। তদুপরি বিপ্রদাস তাহাকে সুরের দীক্ষা দিয়াছিল। কুমুর ভক্তি সুরের ধারায় বহিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিকে

ঘিরিয়া মানসপটে ভবিষ্যৎ সার্থকতার এক অস্পষ্ট আলেখ্য আঁকিয়াছিল। বিবাহের পূর্বে তাহার মনে যৌবনের বেদনা কোন সুস্পষ্ট রূপ লইয়া জাগে নাই। ভাইদের উপর যথাযোগ্য স্নেহ ও ভক্তি এবং সংসারের প্রতি প্রীতি তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইত। যেটুকু বেশি সেটুকু সে যেন সুরের রণনে অন্ধভাবে অনুভব করিত। সে জানিত তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এবং তাহাকে বিবাহ দিতে না পারায় দাদা উদ্বেগ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু মনে মনে কুমু তাহার স্বামীর কোন কল্পনামূর্তি গড়িয়া রাখে নাই। পুরাণকথায় গানে-সুরে রাধাশ্যামের যুগলরূপের মধ্যেই তাহার নিজের প্রেমের আদর্শ মিলাইয়াছিল। মায়ের কাছ হইতে সে জানিয়াছিল, স্বামিভক্তির রস মনকে কতটা ভরাইয়া রাখিতে পারে। তাই কোন বাস্তব স্বামীর কল্পনা না করিয়া স্বামিভক্তি-আদর্শটাকেই কুমু মনে মনে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল।

> সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে,—ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে,—'হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ শুন মনমোহন প্যারে'—যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখ্‌তে পাচ্ছিল।

এই সুরসাধনাই কুমুর মনকে স্পর্শকাতর করিয়াছিল স্বামী মধুসূদনের সংস্পর্শে।

সংসারে কুমুর সমবয়সী সঙ্গিনী ছিল না। সে-রকম কেহ থাকিলে কুমুর মন অবস্তু লইয়া অতটা মাতিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার স্বামীর আদর্শ দুই পাঁচটা জানাশোনা স্বামীর আদলে মাটিগড়াই হইত। সে জানিয়াছিল, স্বামীকে ভালোবাসা শ্যামসুন্দরকে ফুলজল দিয়া পূজা করার মতোই সহজ, এবং গানের সুর যেমন অন্তর ভরাইয়া তোলে স্বামীর প্রেমও তেমনি তাহার ভক্তিকে উৎসারিত করিয়া দিবে। স্বামীর আদর্শ সম্বন্ধে কুমুর কল্পনা তাহাদের সংসারের বাহিরে প্রসারিত হইতে পারে নাই। সে দাদাকে বলিয়াছিল

> ছেলেবেলা থেকে আমি যা কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদের ছাঁচে। তাই মনে একটু ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা তার আঘাত বাইরে ভিতরে নয়।

কুমু যখন শুনিতে পাইল যে ঘটক যাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ আনিয়াছে তাহার সহিত কোষ্ঠীর মিল হইয়াছে, তখন সে প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিয়াই মানিল। সেই সময় আবার তাহার বাঁ চোখ নাচিয়া যেন কথাটাকে তাহার মনে পাকা করিয়া দিল। বিপ্রদাসের কোন আপত্তিকে সে আমলই দিল না। কিন্তু পরে তাহাকে অনেকবার ভাবিতে হইয়াছে

> দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘট্‌ত না।

হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা ও ভক্তি লইয়া কুমুর হৃদয় তাহার স্বামীকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল। ইহার জন্য তাহার মন রঙীন হইয়াই ছিল।

সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল।

সংঘর্ষ লাগিল বিবাহের পূর্ব হইতেই। মধুসূদনের দাম্ভিকতা, তাহার ধনগৌরব, এ সকলের পিছনে ছিল অবচেতন হীনতাবোধ। এইজন্যই মধুসূদন তাহার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে কখনই সহজ ব্যবহার করিতে পারে নাই। কুমু মনকে শক্ত করিয়া ভক্তিকে আঁকড়াইয়া রহিল।

মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামী নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

ভক্তির যেখানে বাস্তবভূমি নাই সেখানে সংসারের সংঘর্ষ হইতে তাহা অক্ষত রাখা কঠিন। আর যেখানে ভক্তির আলম্বনই আঘাত হানিতে থাকে সেখানে তো কথাই নাই। মধুসূদনের স্থূল হস্তাবলেপ কুমুর ভক্তির মূলে নাড়া দিতে লাগিল।

যে-একটি সহজ শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত,···কর্ণের সহজ কবচের মতো

তাহারি মধ্যে কুমু নিজেকে সংকুচিত করিয়া রাখিল। বিবাহের পরদিন স্বামিগৃহে যাইবার পথে একটি সামান্য ঘটনায় তাহার ভবিষ্যৎ যেন প্রতিবিম্বিত হইল। কুমু তার থলি উজাড় করিয়া দশ টাকা দিয়া একটি মেয়েকে আড়কাটির হাত হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু যে-আড়কাটি তাহাকে লইয়া চলিয়াছে তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিবে কে।

স্বামিগৃহে আসিয়া কুমুর বিতৃষ্ণা বাড়িয়াই চলিল। এই সংসার মরুভূমির মধ্যে তাহার একমাত্র ছায়াতল দেবরপুত্র হাবুল। কিন্তু মধুসূদনের কঠোর শাসনে সেটুকু আশ্রয়ও সুলভ হইল না। মধুসূদন কুমুকে দৈবলব্ধ বস্তুর মতো ভাবিয়াছিল এবং কুমুর মন পাইবার জন্য সে বুদ্ধিবিবেচনা মতো চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু কুমুর অন্তরের সবচেয়ে কোমল স্থানে বার বার আঘাত করিয়া সে বিচ্ছেদকে বাড়াইয়াই চলিয়াছিল। বিপ্রদাসের উপর কুমুর অগাধ ভক্তি ও স্নেহ মনে পড়িলে মধুসূদনের মনে আগুন জ্বলিয়া যাইত।

কুমুদিনীর উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাহিরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এক মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া।

জবরদস্তি করিয়া কুমুকে বশ করা বোধকরি বিধাতারও সাধ্যাতীত ছিল। বিপ্রদাসের কাছে সে ধৈর্যের দীক্ষা লইয়াছে। সম্পূর্ণ আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইয়া কুমুদিনী স্বামিগৃহে আসিয়াছিল, কিন্তু দান করিবে যাহাকে সে তো তাহার আত্মার ও আত্মসমর্পণের কোন মূল্য জানে না। উপরন্তু বারবার কুমুর মর্মে বেদনা দিয়া তাহার মনের আবরণকেই শক্ত করিতেছে।

> মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু ভাবিল, সহধর্মিণী যদি না-ই হইতে পারি তবে দাসী হইয়া কর্তব্যধর্মে অটুট রহিব। কিন্তু সেখানেও গোল বাধিল।

> কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটিমাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।

মধুসূদনের শেষ ভরসা ছিল এই রাস্তায়। তাহার মনের জবরদস্তি অবশেষে সেই অঘটনই ঘটাইল।—উৎপীড়িত তরুণীকে তাহার মনের আবরণ "যাতে করে নিজের কাছে তার ভালোলাগা মন্দোলাগার সত্যকে লুপ্ত" করিয়া "অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে" আচ্ছন্ন করিয়াছিল—তাহা কাড়িয়া লইয়া নগ্ন করিয়া দিল এবং তাহার যে-দেহকে সে দেবতার পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিত এবং যে-দেহমাংসের স্থূলবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একটি পরম স্পর্শের অনুভূতিতে পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল সেই দেহকে অশুচি করিয়া দিল। এইখানেই দৈত্যের কাছে বন্দিনী রাজকন্যার পরাভব ঘটিল। কুমুর মনের স্বাভাবিক ভক্তির উৎস যেন নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

> এতদিন কুমু বার বার বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিণীর মন বল্ছে তোমাকে আমি সহ্য করব কি করে? কোন্ লজ্জায় আন্‌ব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রী করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে,—যে-হাটে মাছ-মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

ইহার পর কুমুর বেদনার পরিসীমা রহিল না। শুধু তাহারি নয়, নারীহৃদয়ের চিরকালের অসহায়তা কুমুর এই কয়টি কথায় করুণভাবে ফুকরিয়া উঠিয়াছে।

> ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার; আমাদের যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন-যে কাটে না, কোথাও-যে রাস্তা খুঁজে পাইনে। আমাদের কি দয়া কর্‌বার কোথাও কেউ নেই?

যতদিন মধুসূদন তাহার সহিত কঠিন ব্যবহার করিতেছিল ততদিন কুমুর

সমস্যা সহজ ছিল। এখন মধুসূদন তাহার মন পাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। কুমুর মনের দ্বন্দ্ব তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

> স্বামীকে মন প্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দয়া কেন হলো ?

"তাই যখন মধুসূদন ওর হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বল্‌লে, তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না?" তখন ব্যাকুল হইয়া কুমু মধুসূদনকে বলিল, "তুমি আমাকে দয়া করো।" এই মুহূর্তে মধুসূদন কুমুদিনীর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল। বিপ্রদাসের প্রেরিত তাহার এসরাজ আনিয়া দেওয়াতে কুমুর মন আরও একটু নরম হইল। তাই মধুসূদনের কাছে এসরাজ বাজাইয়া গান করিতে যে সংকোচটুকু আসিতেছিল তাহা সে সহজেই জোর করিয়া কাটাইতে পারিল। গানের সুরে তন্ময় হইয়া কুমু নিজের উপলব্ধিতে আগেকার দিনের মতো নিমগ্ন হইয়া গেল।

> যে গানটি সে ভালবাসে সেইটি ধর্‌ল; 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে'। সুরের আকাশে রঙীন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রহে গেল—'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে'।

মধুসূদনের গৃহে কুমুর আত্মপ্রকাশ শুধু এই একদিন।

মধুসূদনের নিষ্ঠুরতার অপেক্ষা তাহার ভালোবাসাকে কুমুর বেশি ভয়। কেননা মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার মতো তাহার কিছু নাই। ভালোবাসা না থাকিলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ছেদ না পড়িতে পারে, কিন্তু যেখানে ভালোবাসা আশা করিয়া শেষে বঞ্চিত হইতে হয় সেখানে স্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিতে গেলে অত্যন্ত মনের জোর চাই। কুমুর মনে সেই জোর ছিল। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া মধুসূদনের সম্পর্কে সে কর্তব্যের সম্মুখীন হইল।

> আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্রে ভাস্‌তে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।

এবার মধুসূদনের মনের বিরুদ্ধতাই সংকট সংঘটন করিল। কুমুর দিকে মন দেওয়াতে তাহার ব্যবসায়ের কাজে অমনোযোগ হইতেছিল। কুমুর দিক হইতে মন ফিরাইয়া সে কাজে লাগিয়াছে এমন সময় নবীনের সদিচ্ছাপ্রণোদিত মিথ্যা-কথা—"বৌরানী তোমার জন্যে হয়তো জেগে বসে আছেন"—আবার তাহার মনে রঙের জোয়ার বহিয়া আনিল। সে গিয়া সশব্দে বিছানায় উঠিতেই কুমুর

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনপেক্ষিতভাবে মধুসূদনকে শয়নকক্ষে দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এতটা বিবর্ণ ও উচ্চকিত হইল যে তাহাতে মধুসূদনের মনের ঘোরও তখনি ভাঙ্গিয়া গেল। এই সংঘাতে মধুসূদন-কুমুদিনীর পরস্পরের প্রতি মনোভাবের জটিলতা অনেকটা কাটিল। কুমুদিনী মনে মনে জানিল, মধুসূদনের সঙ্গ

> এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।

বাপের বাড়ী ফিরিয়া কুমু আর তাহার পূর্বের স্থানটি সহজে খুঁজিয়া পাইল না। সে বুঝিল, "সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার একটুও অভাব হয়নি।" কুমু স্থির করিল, "এই ভালবাসার উপর সে ভার চাপাবে না", সে মধুসূদনের সংসারে ফিরিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে মধুসূদন-শ্যামার সম্পর্ক বিপ্রদাসের কানে আসিল, কুমুর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার প্রস্তাব আপাতত চাপা পড়িল। এবার আর দাদার বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে কুমু ভরসা পাইল না।

হস্তক্ষেপ করিল মধুসূদন নিজে। বাপের বাড়ীতে সাদাসিধা পোশাকে কুমুর অম্লানশ্রী দেখিয়া তাহার দখল করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। মধুসূদনের চোখরাঙানি ও হুমকি বৃথায় যাইত যদি-না কুমুর অদৃষ্টের ফাঁস শক্ত টান টানিত। সন্তানসম্ভাবিত কুমুদিনীকে তাহার পিতৃগৃহের ভালোবাসা সংস্কার এবং মর্যাদা-বোধ আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে-যে মধুসূদনের হাড়কাঠে আপনার দেহ পূর্বেই বলি দিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ঠাকুর তাহাকে নিঃশেষে বঞ্চিত করেন নাই। কুমু বুঝিয়াছে, সে তাহার বিশ্বাসের কাছে, নিজের অন্তরাত্মার কাছে খাঁটি রহিয়া গিয়াছে, এবং তাই সংসারের সকল দাবির বাহিরে তাহার যে আনন্দলোক সেখানে তাহার মুক্তি অপেক্ষা করিয়া আছে। এই সুরের, এই ভালোবাসার, এই আনন্দের দীক্ষা বিপ্রদাসের কাছে সে পাইয়াছে।

> দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যে-রকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে, —কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি ; সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তাহোলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে-গারদে ঢুকতাম না। দাদা, এ-সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ-কথা বুঝতে পেরেছি।

যাহাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসে তাহাকে অমর্যাদা হইতে বাঁচাইবার জন্যই তাহার কাছ হইতে সে নিজেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিল। যাইবার আগে কুমু দাদাকে বলিয়া গেল

> কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ী যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে দেখতে না হয়। সে আমি সইতে পারব না।

হৈমন্তীও তাহার বাবাকে বলিয়াছিল

> বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আসো তবে আমি ঘরে কপাট দিব।

কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্য শুধু জাতিতে নয়, ধাতুতে ও রক্তে। কুমুর "স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশ-মর্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে", তাই "একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব" সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া রহিত। মধুসূদনের বংশ-মর্যাদা তাহার জন্মের বহুপূর্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বাল্যকালে সে ছিল "রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো"। তাই ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দিয়া হীন-মন্যতাকে ঢাকিয়া দিবার এত প্রয়াস। মধুসূদনের চরিত্র যে-ধাতুতে তৈয়ারি তাহার প্রধান গুণ কাঠিন্য। মনের কোমল বৃত্তি বলিতে যাহা বোঝায় তাহার বালাই তাহার ছিল না। মধুসূদনের সর্বস্ব ছিল কর্ম, এবং ইষ্ট ছিল সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব। মধুসূদনের পরুষ ইতর আচরণের কুশ্রীতা কুমুদিনীর মনে বার বার আঘাত ও লজ্জা দিয়াছে।

> মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন।…সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে।

মধুসূদনের বয়স যৌবনের প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহার পূর্বে হৃদয়-বৃত্তির চর্চার কোন সুযোগ সে পায় নাই, এবং সে প্রবৃত্তিও ছিল না। সুতরাং কুমুদিনীর মন পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা গভীর হইলেও যোগ্যতা এবং ধৈর্যের অভাব ছিল। উপরন্তু গুপ্ত হীনতাবোধ, অন্তরের নিষ্ফলতার জ্বালা ইত্যাদি কারণে বিপ্রদাসের প্রতি সুতীব্র ঈর্ষা তাহাকে উল্টা পথেই চালিত করিয়াছিল। "যার প্রতি মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই",—কুমু-যে দাদা বিপ্রদাসকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাই তা মধুসূদনের এত অসহ্য।

> মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা,…এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে।

অথচ কুমুর আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এই আকর্ষণ শুধু বাহিরের সৌন্দর্য নয়, কুমুর স্বভাবের স্নিগ্ধতা এবং "অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ।" কুমুর স্বভাব মধুসূদনের বিপরীত। এই বৈপরীত্যই তাহাকে প্রবল বেগে টানিতেছিল।

বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মধুসূদনের জীবনে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ ঘটে নাই। শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের সংসারে "ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই" প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তাহার প্রতি মধুসূদনের একরকম প্রসন্নতা ছিল। "যৌবনের যাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনো সঙ্কল্প" শ্যামার ছিল। মধুসূদনের অমনস্ক চিত্তও শ্যামার সম্বন্ধে অচেতন ছিল না। কেবল তাহার দিনরাত ব্যবসায়কর্মে এবং চিন্তায় ঠাসা ছিল বলিয়া ওদিকে উহার মন পড়ে নাই।

> এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে-সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত।

অতর্কিতে শয়নকক্ষে দেখিয়া কুমুদিনীর আতঙ্ক যখন মধুসূদনকে দূরে ঠেলিয়া দিল তখন শ্যামাসুন্দরীর সমাদর তাহাকে সহজেই টানিয়া লইতে পারিল। শ্যামার প্রতি মধুসূদনের আকর্ষণ ভালোবাসার নয়, শুধু রক্তমাংসের টানও নয়। শ্যামা মোটেই দুর্বোধ্য নয়, তাহার উপর সে মধুসূদনকে বড়ো বলিয়া মানে, তাই তাহার আদরে মধুসূদন স্বস্তি বোধ করে।

> কুমু থাক্‌তে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।…শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগেনি, অথচ খুব মোটা রকমের আসক্তি জন্মেছে।

তাই আসক্তি সত্ত্বেও মধুসূদন শ্যামাকে সংসারের ভার দিয়া নির্ভর করিতে পারে নাই, অথচ মোতির মায়ের উপর সে একেবারেই প্রসন্ন ছিল না কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। মধুসূদনের প্রকৃতিতে স্নেহপদার্থটার অংশ নিতান্ত কম ছিল। যেটুকু ছিল তা শুধু নবীনের ভাগেই পড়িয়াছিল। এই ভাইটিকে সে ভালোবাসিত বলিয়াই মধুসূদন তাহার স্ত্রীকে ভালো চোখে দেখিত না, কল্পনা করিত।

> মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোট ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলি বাধা ঘটায়।

আকৃতি-প্রকৃতিতে শ্যামাসুন্দরী কুমুদিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

> শ্যামাসুন্দরী অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বল্‌লে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি শাদা সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের

অপরাহ্ণের মতো বেলা যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টল্‌টলে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশেপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা।

শুধু বয়সে নয় প্রকৃতিতেও শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের মধ্যে বেশ মিল ছিল। মধুসূদনকে শ্যামা ভালোবাসিত ঠিকই, তবে নিজের ধরনে। বিবাহের আগে মধুসূদন ছিল উদাসীন, অবসর-অভাবে। বিবাহের পরে অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ আসিয়া পড়িল। বিচক্ষণ শ্যামা বুঝিল, কুমুদিনীর রূপ ও বয়স মধুসূদনকে ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল করিবে বটে কিন্তু কুমুর প্রকৃতি মধুসূদনকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। কুমুদিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সে বয়সের তফাৎ লইয়া খোঁচা দিয়াছিল

সত্যি করে বলো ভাই, আমার বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

অতঃপর মধুসূদনের মনের-গতিকের উপর শ্যামা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিল। কুমুদিনীর সম্পর্কে মধুসূদন প্রথম ঘা খাইতেই সে সাহস করিয়া মধুসূদনের হাত ধরিয়া ফেলিল এবং বুঝিল যে তাহার স্পর্শ মধুসূদনের অমধুর লাগে নাই। দ্বিতীয় দিনে শ্যামার অভিসার অর্ধপথে চুকিয়া গেল। তবে মধুসূদনকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া তাহার মনকে সে একটু উসকাইয়া দিল। তৃতীয়বারে মধুসূদনের তর্জন লাভ করিয়াই তাহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল, কেননা কুমুদিনী তখন মধুসূদনের মনকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে।

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে চল্‌ছিল। আজ বুঝ্‌লে, অসময়ে এসে অজায়গায় পা পড়েছে।

তাহার অশ্রুসজল সমবেদনা—

চালাকি করব না ঠাকুরপো! যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসিনি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে?

মধুসূদনের মনকে নাড়া দিয়া গেল। চতুর্থবারে শ্যামার আত্মসমর্পণ আর কুমুদিনীর কাছে মধুসূদনের আত্মমর্যাদার চরম পরাভব যুগপৎ ঘটিয়া গেল। কুমুদিনী চলিয়া গেল, সুতরাং তাহাদের মিলনে আর অন্তরালের আবশ্যকতা রহিল না। শ্যামা বুঝিল না যে ভালোবাসিলেই বিশ্বাস করা যায় না! মধুসূদন তাহাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিল কিন্তু গৃহিণী করিল না। অথচ কর্ত্রীত্বের লোভ

শ্যামার মজ্জাগত। সুতরাং দুইজনের সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিল। কুমুদিনীর প্রতি শ্যামার বিদ্বেষ তাহাকে মধুসূদনের কাছে আরো অবজ্ঞেয় করিল, মধুর-রসের সম্পর্কের মধুটুকু উবিয়া গেল। মধুসূদন শ্যামাকে সুখী করিতে পারিল না।

বিপ্রদাসের ভূমিকায় বাঙ্গালাদেশের অস্তায়মান অভিজাত সংস্কৃতির গোধূলি-শেষের রক্তরাগ পাঠকের হৃদয়ে করুণমধুর শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম জাগাইয়া তোলে। বিপ্রদাসকে দেখিয়া মোতির মার মনে হইয়াছিল

> আহা কী সুপুরুষ। এমন কখনো চক্ষে দেখিনি ; ঐ-যে গান শুনেছিলাম কীর্তনে—
>
> গোরার রূপে লাগ্‌ল রসের বান,—
>
> ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ায় পুরনারীর প্রাণ,
>
> আমার তাই মনে পড়্‌ল। ···যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা।

বিপ্রদাস ছিলেন পজিটিভিস্ট। বাইরের থেকে কোন দেবতাকে মানিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই বটে কিন্তু অন্তরের দেবতা তাঁহার জীবন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসীম ধৈর্যে, তাঁহার মুখের শান্ত বিষাদের ছায়ায়, তাঁহার অন্তরের তপস্যা যেন জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিত। বিপ্রদাস ভীষ্মের মতোই নিঃসঙ্গ ও ধৈর্যশীল। তিনি জানিতেন পৃথিবীতে ধৈর্যের সাধনাই কঠিনতম সাধনা, তাই চরম দুঃখের দিনে তিনি কুমুকে উপদেশ দিয়াছিলেন

> লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থাক্, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস্ সংসারে সেও মস্ত কাজ।

বিপ্রদাসের ধর্ম অন্তরের পরম-উপলব্ধির, গভীর আনন্দের এবং গভীর বেদনার ধর্ম—গানের সুরের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথের নিজের ধর্ম। বিপ্রদাস বলিয়াছিলেন

> কুমু, তুই মনে করিস্ আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বল্‌তে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে ; তাকে নাম দিতে পারিনে।

বিপ্রদাসের কাছে কুমু এই গানের সুরের দীক্ষাই লাভ করিয়াছিল। সুরের সাধনায় বিপ্রদাসের মন সহজে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু কুমুর পক্ষে তাহা সহজে ঘটে নাই। বাধা ছিল তাহার বালিকাজীবনের শিক্ষা ও নারীজীবনের সংস্কার। তবে শেষ পর্যন্ত দাদার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়, মনের সহজ ভক্তিতে এবং গানের সুরের মাধুর্যে দেবতার আনন্দ-আবির্ভাবের উপলব্ধি তাহার হইয়াছিল।

মায়ের মৃত্যুর পর কুমুদিনী বিপ্রদাসের সেবার ভার লইয়াছিল। বিপ্রদাসও কুমুদিনীকে হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাই ভাই-ভগিনীর পরস্পরের

প্রতি অন্তরঙ্গ স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধা ছিল। কুমুর কাছে বিপ্রদাস একসঙ্গে বাপ মা ভাই ও গুরু, বিপ্রদাসের কাছে কুমুদিনী একাধারে মা বোন কন্যা ও ছাত্রী। কুমু চিরকালের মতো বিপ্রদাসের সংসার হইতে চলিয়া গেলে পর বিপ্রদাসের বেদনার অন্ত রহিল না। কুমুদিনীর দুঃখের পার আছে, তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার মন ক্রমশ ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু বিপ্রদাসের মন ভরিবে কিসে। কালিদাসের নাট্যকাব্যে কণ্ব-শকুন্তলার বিচ্ছেদ এমনি সুগভীর বিষাদময়। সংসারের দাবি নিঃস্বত্বভাবে ত্যাগ করিয়া অথচ সকল দায় মাথায় লইয়া এই যে রোগশীর্ণ একলা মানুষটি তাঁহার স্নেহের একমাত্র পাত্রকে নিঃস্নেহ নির্মম লাঞ্ছনার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন, তাহারি অন্তরের অতলস্পর্শ শূন্যতায় যোগাযোগের পরিসমাপ্তি সকরুণ অশ্রুত রাগে গুঞ্জরিত॥

৫

'শেষের কবিতা' (১৯২৯)[১] যেন উপন্যাস ও কবিতার জড়োয়া শিল্প। পুরুষের অথবা নারীর পক্ষে এক সঙ্গে দুইজনকে অবিরোধে ভালোবাসা সম্ভব, এবং সে ভালোবাসার এক পাত্র সম্পর্কিত (স্বামী বা স্ত্রী) অপর পাত্র নিঃসম্পর্ক হইতে পারে।—ইহাই শেষের-কবিতার আখ্যানবস্তুর ভাববীজ। বৈষ্ণব- সাধনার "পরকীয়া"-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উপন্যাসশিল্পে যেভাবে রূপপ্রাপ্ত শেষের-কবিতায় তাহারি ব্যক্ত পরিচয়। বইটিতে সমসাময়িক সাহিত্যের ও সমাজের ফ্যাশনের সমালোচনা আছে। তবে শ্লেষ গোড়ার দিকে যতটা ঝাঁজালো শেষের দিকে ততটা নয়। সেখানে উগ্রতা কমিয়া গিয়া মানবতা ও সহৃদয়তা ফুটিয়াছে।

সবুজপত্রের কাল হইতে রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনার ও খ্যাতির উপর নিজেই যেন কটাক্ষ করিতে লাগিয়াছেন। তাহার আগে নিন্দুকের নিন্দার জন্য রবীন্দ্রনাথ দৈবাৎ কবিতায় অভিমান প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু নিজেকে লইয়া ব্যঙ্গোক্তি করেন নাই। হৈমন্তী গল্পে এই ব্যঙ্গদৃষ্টির প্রথম প্রকাশ, তাহার পর চতুরঙ্গে। গুরুজি লীলানন্দ-স্বামী আধুনিক কবিকে মোটেই পছন্দ করিতেন না, কেন না তাঁহার লেখার মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তিনি পাইতেন না, তবে কিনা "আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে।" ঘরে-বাইরের শ্লেষ আরও স্পষ্ট। সেখানে সন্দীপের ভাবান্তরে নিবারণ চক্রবর্তীর পূর্বাভাস প্রকাশিত।

[১] প্রকাশ প্রবাসী ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫। উপন্যাসটি সমাপ্ত হইয়াছিল বাঙ্গালোরে থাকিতে। শান্তিনিকেতনে (জুলাই ১৯২৮) পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। ৮ই জুলাইয়ে লেখা একটি চিঠিতে এই সংবাদ আছে। "সেই 'মিতা' গল্পটায় মাজাঘষা করছিলুম—গল্প কিছু বেড়েও গেছে।"

হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুট ক'রে নিই, চুরি তোমারই—তুমি আমার গানকে তোমার গান করেছ—না হয় নাম তোমার হলো কিন্তু গান আমার।

শেষের-কবিতায় নিবারণ চক্রবর্তীকে খাড়া করিয়া কবি আত্মসমালোচনা উপলক্ষ্যে তাঁহার কাব্যের কোন কোন সমসাময়িক সমালোচককে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা নিন্দা করে তাহারা তাঁহারি ভাবের ও ভাষার চোরাই কারবারী।—ইহাই নিবারণ চক্রবর্তী বলিতে চাহিয়াছেন।

শেষের-কবিতায় কাব্যরসের যোগান থাকায় কোন কোন ভূমিকার চিত্রণে কিছু অস্পষ্টতা আছে। তবে যে-চরিত্রগুলি কমবেশি ব্যঙ্গোজ্জ্বল—যেমন সিসি কেটি অমিত—সেগুলির ব্যক্তিরেখা বেশ স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের শেষদিকে লেখা কোন কোন ছোট ও বড় গল্পে—যেমন পয়লা-নম্বরে ও দুইবোনে—দেখা যায় যে নায়িকার ভালোবাসার দুই পাত্রের মধ্যে অমিলের একটা বিশিষ্টতা আছে। একজন প্রাণস্ফূর্ত মুখর গ্রহণশীল ও ভাবচঞ্চল, আর একজন অধ্যয়ননিষ্ঠ মিতভাষী একাগ্র ও ভাবশান্ত। শেষের-কবিতায় নায়িকার ভালোবাসার দুই পাত্র অমিত ও শোভনলালের মধ্যেও এই বিশিষ্টতা।

অমিতর চিত্ত কবির। জীবনসমুদ্রের উপরে ভাসিয়া থাকিয়াই তাহার আনন্দ। জীবনের গভীরতার দিকে সে কোন ঝোঁক অনুভব করে নাই। কারণ সে এমন কিছুরই সন্ধান পায় নাই যা তাহাকে সেদিকে টানিতে পারে। অমিতর স্বভাব সরল, আচরণ সহজ, তবে কথাবার্তা বাঁকা বাঁকা। তাই যে-সমাজে সে বিচরণ করিত সেখানে কোন তরুণী তাহার মন কাড়িতে পারে নাই। তাহার নিজের সমাজগণ্ডীর ভদ্রতার সাজে ক্লিষ্ট ও আড়ষ্ট চালচলনে পিষ্ট হইয়া সে যখন দূরে শৈলশহরের নির্জনতায় মনকে সুস্থ করিতে গিয়াছে তখনি দৈব-গতিকে লাবণ্যর সহিত পরিচয় ঘটিয়া গেল। লাবণ্য এমন কিছু সুন্দর মেয়ে নয়, কিন্তু দুর্লভ-সংঘটনের ক্ষণোজ্জ্বল মুহূর্তে তাহাকে প্রথম দেখায় অমিতর মনে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই জাগে নাই। এমন অসতর্ক মুহূর্তে লাবণ্য তাহার মনে রঙ ধরাইয়া দিল।

দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখ্‌লে। ড্রইংরুমে এ-মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়ত দেখ্‌বার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখাবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

লাবণ্যর সৌন্দর্য ও বেশভূষা দুইই চোখ-ঝলসানো নয়, সাদাসিধাই। তাহার বিশেষ মহিমা কণ্ঠস্বরের মাধুর্য।

> উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুটে উঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারি মতো নিটোল। অল্পবয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত।

শিলঙের পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে আসন্নমৃত্যুর আশঙ্কা হইতে উদ্ধারের মুহূর্তে এই মিলন অমিতকে এক অভিনব আনন্দময় জীবনের দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার "মনের উপর থেকে কত দিনের ধূলো-পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিষের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা।" অমিতর বিস্ময়-অনুরাগ লাবণ্যর আত্ম-অনাদৃত হৃদয়ে নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা আনিল এবং এক রকম অনুরাগের সঞ্চার করিল।

অমিতর ভালোবাসা যতই উচ্ছ্বসিত হয় লাবণ্যর মনে এই অনুভব ততই দৃঢ় হইতে থাকে যে অমিতর অনুরাগ লাবণ্য-ব্যক্তিটির প্রতি ততটা নয় যতটা লাবণ্য তাহার চিত্তে যে আলোড়ন ও হর্ষ আনিয়া দিয়াছে তাহার প্রতি। অর্থাৎ বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের ভাষায় লাবণ্য হইল অমিতর অনুরাগের আলম্বন ও উদ্দীপন একাধারে। অমিতকে সবচেয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল লাবণ্যর প্রশান্তি ও মননশীলতা, তাহার আচরণে ধীরতা ও অকুণ্ঠা।

> অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায়নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

লাবণ্যর মধ্যে গোরার ললিতার ছায়া যেন কিছু আছে, তবে ললিতার অভিমান ও বিদ্রোহের ভাব লাবণ্যর মধ্যে একেবারেই নাই। লাবণ্য যেন পূর্ণবয়সের এবং আরও এখনকার কালের ললিতা।

অমিত-চরিত্রে ধৈর্যের ও আপোস-হীনতার অভাব ছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়াই লাবণ্য অমিতর বিবাহপ্রস্তাবে মনের সায় পাইতেছিল না। লাবণ্যর হৃদয়ে ভালোবাসার মোহ নাই।

> লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবতঃ যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না।

লাবণ্যর প্রতি ভালোবাসায় অমিত নিজেকে বুঝিতে পারিয়াছে—"তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায় নিজেরে চিনি।" কিন্তু লাবণ্যকে সে চিনিতে পারিতেছে না তাই তাহার ভালোবাসা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। উঁচুতে উঠিলে ভালোবাসা মোহমুক্তি দেয়। তবে

> না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তি-তত্ত্ব।

লাবণ্যর আশঙ্কা, তাহাকে চিনিলে অমিতর অনুরাগের রঙ জলিয়া যাইবে, কেন না অমিত যে ভালোবাসে তাহার নিজেরই ভালোবাসাকে। সুতরাং দাম্পত্যবন্ধন সহ্য করিবার মতো আপোস-মনোবৃত্তি তাহার নয়। লাবণ্য ডুবারি-জাতীয়, অচঞ্চল প্রশান্তিতেই তাহার জীবনের সার্থকতা। "জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে" তাহার মন সরে না, তাহার "জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যই"। অমিত সাঁতারে-দলের, তাহার জীবনের সার্থকতা গতিতে, বেগে,

> জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি।

অমিতর আত্মচিন্তায় যেন রবীন্দ্রনাথের নিজের মনের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

> আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে স'রে স'রে যাব?

যখন ভালোবাসাতেই ভালোবাসার সার্থকতা উপলব্ধ হয়, তখনই প্রেমের পারমিতা, তখনি প্রেম নিষ্কাম। লাবণ্য সেই পারমিতার পরিচয় পাইয়াছিল, তাই নিঃশেষ ত্যাগ তাহার কাছে দুঃসহ হয় নাই। ভালোবাসার জন্যই সে ভালোবাসার পাত্রকে ধরিয়া রাখিল না।

অমিতর কথায় শোভনলালের স্মৃতি লাবণ্যর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ভালোবাসার আলোকে তাহার নবজাগ্রত চিত্তে শোভনলালের আত্মলোপী নীরব প্রেমের মূল্যটি ধরা পড়িয়াছিল। এদিকে সিসি-লিসিদের আগমনে অমিতর কবিত্বের পরিবেশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং কেটির উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ লাবণ্য-অমিতর মধ্যে আড়াল টানিয়া দিল। অমিত বুঝিল, কেটির সাজের ও ভঙ্গির আবরণের নীচে তাহার সরস নারীহৃদয়টি ভালোবাসার সুধাধারার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। অমিত ইহাও অনুভব করিল, তাহার সমাজ লাবণ্যকে কখনই স্বচ্ছন্দে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে না, এবং যে-সমাজে বাস করিতে অমিত অভ্যস্ত সে-সমাজের প্রান্তভাগে বিচরণ করিলে তাহাদের বিবাহবদ্ধ প্রেম দীর্ঘকাল অম্লান ও সতেজ থাকিবে না।

মুহূর্তের মুষ্টিই নিত্যকালের ভাণ্ডার। —এই তত্ত্বের উপর শেষের-কবিতার প্রতিষ্ঠা। ধূলার দুলাল রঙীন নিমিষের চকিত স্ফুরণে যে-প্রেম পরাণে আবীর গুলাল ছড়াইয়া দেয়, যে-প্রেমের হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লাগিলে চিত্ত ঝলমল

করিয়া উঠে, সে-প্রেম মুহূর্তের অথচ চিরকালের, সে-প্রেম ক্ষীণদীপ্ত এবং অদ্বিতীয়।

> গঙ্গার ও-পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ-পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোন দিনই আর হবে না।

কাব্যে এই-যে ক্ষণভঙ্গবাদ ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনার একটি বিশেষ রূপ।

একভাবে দেখিলে প্রেমের চেয়ে মানুষ বড়, আর একভাবে দেখিলে মানুষের চেয়ে প্রেম বড়। বলাকার তাজমহল কবিতায় প্রেমাতিশায়ী মানুষের জয়গান, শেষের-কবিতায় অতিমর্ত্য প্রেমের মহিম্নঃস্তোত্র। শেষের-কবিতার নাম হওয়া উচিত ছিল "ক্ষণিকা",—শিশিরবিন্দুর ক্ষণিকা নয়, বাসরঘরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া যে-ক্ষণ মানব-জীবনপ্রবাহে শাশ্বত রহিয়া যায় সেই অক্ষয় ক্ষণিকা।

> হে বাসর ঘর,
> বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর॥

৬

'দুই-বোন' (১৯৩৩)[১] ও 'মালঞ্চ' শেষের-কবিতার সঙ্গে এক-পর্যায়ের বই। নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসার দুই রূপ। এক রূপে সে পত্নী, অপর রূপে সে প্রিয়া। এই দুই মেজাজের প্রেয়সীর মধ্যে মিল ও অমিল দুইই আছে। কোন পুরুষের পক্ষে এক সঙ্গে পত্নীকে ও প্রিয়াকে ভালোবাসা অসঙ্গত ও অন্যায় নয়, কেন না এই দুইরকমের নারীপ্রেমের ভালোবাসার মধ্যে স্বতোবিরোধ নাই।—এই তত্ত্বটিই কাহিনী তিনটিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত। শেষের-কবিতায় ইহার কাব্য রূপ প্রতিফলিত। দুই-বোনে পুরুষের তরফে বাস্তব সমস্যার জটিলতা এবং নারীর তরফে তাহার সমাধান প্রতিপাদিত। মালঞ্চে নারীর তরফে সংঘর্ষ এবং পুরুষের তরফে তাহার সমাধান প্রদর্শিত।

শুধু নামে নয়, দুই-বোন গল্পের প্রথম দুই ছত্রেই আখ্যানবস্তুর মর্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে।

> মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেচি। এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।

শর্মিলা মায়ের জাত, উর্মিমালা প্রিয়ার জাত। শশাঙ্ক গল্পটির একচ্ছত্র নায়ক। নীরদ তাহার প্রতিরূপ বটে কিন্তু সে প্রতিযোগীর গুরুত্ব পায় নাই।

---

[১] প্রকাশ বিচিত্রা অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৯।

শর্মিলা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ গৃহকল্যাণী।

> বড়ো বড়ো শান্ত চোখ! ধীর গভীর তার চাউনি; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণ রেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা;[১] সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয় শুভসাধনের ভাষা।

নিঃসন্তান শর্মিলার সমস্ত চিন্তা ছিল তাহার স্বামীকে ঘিরিয়া। শশাঙ্ককে সকল আপদ-বিপদ এবং অপমান-লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার ভার সে সহজেই নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শশাঙ্কর কার্যক্ষেত্রের উপর শর্মিলা কখনো নিজের ছায়াটুকুও ফেলে নাই।

আকৃতি-প্রকৃতিতে ঊর্মিমালা জ্যেষ্ঠ ভগিনীর বিপরীত। ঊর্মিমালার মনের উপরতলায় যেন আত্মবিস্তারের সূর্যালোক ঝলকিয়া উঠিত আর শর্মিলার মনের গহনে আত্মসংকোচের সঙ্কীর্ণ প্রবাহ ধীরগতিতে বহিয়া যাইত। ঊর্মিমালা এবং শর্মিলা এই দুই নারীর মধ্যে যেন আমাদের ঘরের অতীত ও বর্তমানের রোমান্টিক নারী-আদর্শ প্রমূর্ত।

নীরদের মাহাত্ম্যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ঊর্মিমালার মন অভিভূত হইয়াছিল। কৈশোরে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ঊর্মির মনে নীরদের প্রতি যেটুকু অনুরাগের রঙ ধরাইয়াছিল তাহা নীরদের আত্মগৌরববোধে ও গুরুগাম্ভীর্যে ক্ষইয়া আসিতেছিল। নীরদের গম্ভীর ও নীরস প্রকৃতি ঊর্মির জীবনোচ্ছল সরস স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু শশাঙ্কর প্রকৃতিতে ঊর্মিমালার সঙ্গে অনেকটা মিল ছিল। তাই দুইজনে অত অনায়াসে এবং সহজে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এই ঘনিষ্ঠতার পরিণাম কি দাঁড়াইতে পারে তাহা নারীর কাছেই প্রথমে ধরা পড়িবার কথা। শশাঙ্কর প্রতি সুগভীর প্রেম শর্মিলার অনুভবশক্তিকে বাড়াইয়া দিয়াছিল, তাই এই পরিণতির আভাস সে-ই প্রথম বুঝিয়াছিল। শশাঙ্ককে আনন্দ দিয়াই ঊর্মিমালা জীবনে আপনার যথার্থ মূল্য সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল এবং তাহার চিত্তে শশাঙ্কর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল।

> শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায়নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুসি করতে পারে এই তথ্যটি অনেকদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

অনুরাগ কিছু গাঢ় হইলেও ঊর্মির মনে অস্ফুট বেদনা জাগিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মন যে ঠিক কি চায় তাহা তখনো তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া ধরা পড়ে

---

১ মকরমুখো প্লেন বালা রবীন্দ্রনাথের শিল্পে নারী-কল্যাণীত্বের একটা প্রতীক।

নাই। শর্মিলার কথাতেই অবশেষে তাহার ঘোর কাটিয়া গেল—"প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস্ জানিস্ তা?" প্রেমাস্পদের দোষ না দেখিয়া সকল অপরাধ নারীর উপর চাপানো মেয়েদের চিরকালের স্বভাব। শর্মিলার কাছেও তাই দোষটা সম্পূর্ণভাবে উর্মির তরফেই দেখা দিল।

শর্মিলার পীড়ার সঙ্কট-কালে শশাঙ্ক ও উর্মিমালা পরস্পরের দুরূহ সম্পর্ক সহজভাবেই মানিয়া চলিল। তিন পক্ষই ভাবিয়াছিল শর্মিলার মৃত্যু ঘটিলে পর এই সম্পর্কের জটিলতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু যাহা হইলে ভালো হয় তাহা প্রায়ই ঘটে না। শর্মিলা মরিল না, এবং শশাঙ্ক-উর্মির সম্পর্কে জট আরো পাকাইল। কিন্তু শর্মিলা প্রিয়া-জাতের নয়, মা-জাতের মেয়ে। এখন সে-ই অগ্রসর হইয়া সমস্যার সহজ সমাধান করিতে গেল। সে শশাঙ্ক-উর্মির বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইল। তাহাতে শশাঙ্ক ও উর্মির দুইজনেরই মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাহাদের প্রেমস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। শশাঙ্কর মন শর্মিলার দিকে ফিরিল, উর্মি বিলাতে পলাইল। উর্মির স্বভাবের ও তাহার প্রেমের পক্ষে পলায়নের ও ত্যাগের পথ ছাড়া গতি ছিল না।

'মালঞ্চ'[১] (১৯৩৪) গল্পে এই সমস্যারই উল্‌টা পিঠ দেখানো হইয়াছে। শর্মিলা যদি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া না আসিত, শশাঙ্কর প্রতি তাহার প্রেম যদি স্বার্থহীন না হইত—অর্থাৎ সে যদি মা-জাতের না হইয়া প্রিয়া-জাতের মেয়ে হইত—আর উর্মিমালা যদি তাহার ভগিনী না হইয়া স্বামীর ভগিনী হইত বা অন্যসম্পর্কিত নারী হইত তাহা হইলে সমস্যার জটিলতা যে-ভাবে দেখা দিত তাহাই মালঞ্চে উপস্থাপিত। নীরজা প্রিয়া-জাতের মেয়ে। স্বামীর অনুরাগ তাহার সর্বথা কাম্য। তাহার অবর্তমানে স্বামীর কল্যাণ-অকল্যাণের জন্য তাহার কোন ভাবনা নাই, অন্ততপক্ষে মনের কোণে। নীরজার ভালোবাসা ষোলআনা আত্ম-সর্বস্ব, সেইজন্য সরলা যে কোনকালে আদিত্যর বাল্যসখী ও স্নেহভাগিনী ছিল এই জ্ঞানও নীরজার বিশেষ ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু নীরজা শুধুই স্বার্থপর নারী নয়। নিজের প্রেম দিয়া সে স্বামীর মন এবং তাহাদের দুইজনেরই অপত্য-স্থানীয় বাগানের দরদ বুঝে। কিন্তু তাহার মরণান্তিক রোগ সত্ত্বেও বাঁচিবার ব্যাকুলতা মনের অনুদারতাকে ধীরে ধীরে প্রসারিত ও অনাবৃত করিতেছিল। জোর করিয়া দাক্ষিণ্য-ভাবনার চেষ্টা করিলেও দেহের দুর্বলতা ও প্রেমের স্মৃতি-জ্বালা তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃত করিয়া দিত। কিছুতেই শেষ অবধি সে

[১] প্রকাশ বিচিত্রা আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

প্রসন্নমনে সরলার হাতে তাহার গৃহিণীত্ব সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিল না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নীরজার নিষ্ঠুর আত্মপ্রকাশের ছবি দিয়া রবীন্দ্রনাথ একটু বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্যে গল্পটি শেষ করিয়াছেন।

আদিত্য শশাঙ্কর তুলনায় বলিষ্ঠ চরিত্র। শশাঙ্কর মতো সে কথনই আত্ম-বিস্মৃত হয় নাই, এবং তাহার কর্তব্যজ্ঞান সর্বদা সজাগ ছিল। তাহার মনের দ্বন্দ্ব শশাঙ্কর মনের দ্বন্দ্বের অপেক্ষা অনেক কঠিন। সরলার চরিত্র সহজ ও মধুর। মালঞ্চে নীরজাই প্রধান পাত্র, তাহার তুলনায় আদিত্য ও সরলা খানিকটা পটান্তরিত।

দুই-বোনের ও মালঞ্চের রচনারীতি অত্যন্ত সরল, এবং সম্পূর্ণভাবে আখ্যান-অনুগত॥

৮

অসহযোগ আন্দোলনের পরেই বাঙ্গালাদেশে নূতন করিয়া যে হিংসাত্মক বিপ্লব-প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল 'চার অধ্যায়'এ[১] (১৯৩৪) তাহারি তত্ত্ববিশ্লেষণ এবং নিরপেক্ষ মূল্যনির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। দেশের কাজ যত মহৎই হোক না কেন তাহাতে যদি মানুষের আত্মপ্রসারণ বাধা পায়, তাহার আত্মমর্যাদা নষ্ট হয় তবে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে তাহা নিতান্ত অমঙ্গলজনক, এবং মহৎ ব্যক্তিজীবনের মূল্য সবার উপরে।—ইহাই চার-অধ্যায় গল্পের মর্মকথা। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি যে কত গভীর ছিল তাহা এই বইটিতে যেভাবে প্রকটিত এমন আর কোথাও নয়। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দূরবিহারী ও অন্তর্ভেদী সত্যদৃষ্টিতে হিংসাত্মক প্রচেষ্টার মারাত্মক গলদ যে কোন্‌খানে তাহাও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভাবের উন্মাদনায় না মাতিয়া এবং শত্রুর উপর ছেলেমানুষি রাগ না করিয়া দেশের মানুষ তৈয়ারির কাজ করিয়া যাওয়াতেই যথার্থ দেশসেবা, আসল বীরত্ব। এইখানেই ঘরে-বাইরের সন্দীপের চেয়ে চার-অধ্যায়ের ইন্দ্রনাথ বড়। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল

> আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী ব'লে মা মা ব'লে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।

কানাই যখন বলিয়াছিল

> শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে দ্বেষ না করো তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কি ক'রে?

১ প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪১। গল্পটি লেখা হয় সিংহলে থাকিতে (জুন ১৯৩৪)।

তখন উত্তরে ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিল

> রাস্তায় পাথর প'ড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা ক'রে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।

যেখানে স্বভাবের মর্যাদা বিপন্ন সেখানে ফললাভের কথা উঠিতে পারে না। তাই কানাই যখন বলিয়াছিল

> কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই,

তখন ইন্দ্রনাথ উত্তর দিয়াছিল

> না-ই রহিল তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও। পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা ক'রে তাকে উপেক্ষা ক'রে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।

এলা ও অতীন্দ্র দেশের ডাকে সাড়া দিয়া নিজেদের মিলন আশা দূরে ঠেলিয়া একজন নিজের পণকে আর একজন নিজের আত্মমর্যাদাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়া শেষে আত্মবলি দিল। এই আত্মদানে দেশের স্বাধীনতা কিছুমাত্র আগাইয়া আসিল না, অথচ তাহারা নিজেরাও অকৃতার্থ হইল এবং দেশও বঞ্চিত রহিল। আত্মস্ফূর্তির পথে তাহারা ব্যক্তিকে ও দেশকে যাহা দিতে পারিত তাহার মূল্য তো কম নয়।

বাল্যকালে বাতিকগ্রস্ত মায়ের অন্ধ প্রভুত্বের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ায় এলার মনে অল্পবয়স হইতেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ দুর্দম হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকিয়াছিল।

> মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাহার অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠ্‌ত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হোতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু ক'রে ন্যায় অন্যায়বোধকে অসাড় ক'রে দিয়ে।

এলার বিবাহবিমুখতা বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার কাকীর ব্যবহারে। তাই উপায়ান্তর না দেখিয়া, সংসারবন্ধনে কোনদিন বদ্ধ হইবে না, এই বলিয়া দেশের কাছে বাগ্‌দত্ত হইয়া সে ইন্দ্রনাথের দলে ভিড়িয়া গেল। ইন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিল এলার আকর্ষণে এমন অনেক ছেলে আপনি আসিয়া ধরা দিবে, যাহাদের অপর

কোন উপায়ে ধরা যাইবে না। সে ইহাও জানিত যে এলার দীপ্তিতে আর যে-ই পুড়ুক সে নিজে পুড়িবে না। সে এলাকে বলিয়াছিল

ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।

এলাকে দলে টানা সার্থক হইল যেদিন তাহার আকর্ষণে অতীন্দ্র আসিয়া ইন্দ্রনাথের ফাঁদে ধরা দিল।

ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট্ আছে,

তাই উহার প্রতি ইন্দ্রনাথের এত ঔৎসুক্য।

দেশের কাজ করিতে গিয়া এলা বুঝিল

যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হোয়ে নেশা হয়ে উঠ্‌ছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে।

ভালো না লাগিলেও সে ছাড়িতে পারে না। তাহাদের দলের ছেলেদের মধ্যে

সবচেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—হাঁ তারাই ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরীয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মর্‌তে ছোটে আমি চাইনে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে।

অতীন্দ্র বাঁধা পড়িয়াছে নিজের সঙ্কল্পের বাঁধনে।

হাতির দাঁতের মত গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট ; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য।

অতীনকে দেখিয়া এলাই প্রথম তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এলার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য তাহার স্পর্ধাকে ছাপাইয়া অতীন্দ্রর মনে মরীচিকা জাগাইয়া দিয়াছিল।

যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে।

অতীন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া এলার

মন বল্‌লে, কোথা থেকে এলো এই অতি দূর-জাতের মানুষটি, চারিদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনি মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আন্‌তে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।

অতীন্দ্রর প্রেম এলার একান্ত কাম্য হইলেও সে প্রেম প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া লইতে তাহার সঙ্কোচ। এলা অতীন্দ্রর চেয়ে শুধু কয়েক মাসের ছোট, তাই সে নিজেকে অতীন্দ্রর অপেক্ষা বড় বলিয়াই মনে করিত। নারীর বয়স বৎসরের পরিমাণে নয়, মনের পরিমাপে। তাই সে অতীন্দ্রকে বলিয়াছিল

আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে।

অতীন্দ্রর হৃদয়কে তাহার প্রেম চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে কিনা এ সম্বন্ধে এলার সন্দেহ ছিল। সে বলিয়াছিল

> আমার আদরের ছোট খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠ্‌ত ছট্‌ফটিয়ে। যে তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরীব।

তাই এলা মনে মনে অতীন্দ্রকে দেশের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল।

অতীন্দ্রর আত্মপ্রসার হইতে পারিত শুধু তাহার বিশেষ প্রতিভার বিকাশে, এবং তাহার দ্বারাই সে দেশকে নিজের মতো করিয়া সেবা করিতে পারিত।

> নিশ্চয়ই এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন কি, তূলোধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না।

ইন্দ্রনাথের দলে মিশিয়া অতীন্দ্রনাথ দেশসেবার কাজে সুর মিলাইতে পারিল না। এখানে তাহার রুচি-অরুচির কথা তো নয়, স্বধর্ম-পরধর্মের দায়। এলা তাহাকে প্রশ্ন করিল

> কি হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এসব কথা বল্‌ছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য ব'লে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?

অতীন্দ্র বলিয়াছিল

> রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশ্যে এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্‌স্ চর্চা করতে বলেননি।

এলার প্রেমে অতীন্দ্রর কবিচিত্ত যেন কাব্য-ইতিহাসের কল্পরূপ প্রত্যক্ষ করিল। তাহার মনে হইল যেন

> দান্তে বিয়াত্রিচে জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে।

কিন্তু ঝাঁপ দিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে এ পথ তাহার নয়। তবুও ফিরিতে পারিল না।

> একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো -না হোলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরি অসহ্য ব্যথায় আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বার বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মান্‌ব না, পীড়নে হার মান্‌ব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।[১]

[১] তুলনীয়, "আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।" পরিশেষ, 'প্রশ্ন' (১৩৩৮)।

কিন্তু হৃদয়হীন দেয়ালের চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার আছে।

দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এত বড়ো লোকসান আর কিছুই নেই।

অতীন্দ্রর ফিরিবার পথ নাই।

ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেই জন্যই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারিনে।

দেশের কাজের নামে এক অনাথ বিধবার সর্বস্ব লুট করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাই এলার সঙ্গে মিলনের পথ বন্ধ।

যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই।

স্বভাবকে যে হত্যা করে সেই যথার্থ আত্মঘাতী।

স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই তো পাপে আজ তোমাকে হাতে পেয়েও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।

কিন্তু এমনি অতীন্দ্রর আত্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত যে এলাকে ঈর্ষার বিষ কামের ক্লেদ এবং পৈশাচিক প্রতিহিংসার নির্যাতন হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাকেই হত্যা করিতে হইল। নিজের বিষ খাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না যেহেতু মারাত্মক রোগ তাহাকে প্রতিমুহূর্তে মরণের দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল।

তাহার পর ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বল্‌লে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণ-শক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।...দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প, এবং প্রভুত্বের গৌরব।

বিদেশ হইতে বিজ্ঞানের জয়পত্র লইয়া দেশে ফিরিয়া ইন্দ্রনাথ অধ্যাপনায় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লাগিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু উপরওয়ালার ঈর্ষা তাঁহাকে গবেষণার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিল। তিনি

বুঝ্‌তে পারলেন এদেশে তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ রুদ্ধ।

যে জগদ্দল শক্তি দেশের বুকের উপর চাপিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া রহিয়াছে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে অসংখ্য বাধা সৃজন করিতেছে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে ইন্দ্রনাথ নামিয়া পড়িলেন।

ওরা চারিদিকের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে চারিদিকে এসে জুটল,…কেন? আমি ডাকতে পারি ব'লেই। সে কথাটা ভালো ক'রে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক।…রসিয়ে তুল্লুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা।

ইন্দ্রনাথের ভূমিকা স্থত্রধারের। রঙ্গমঞ্চে এলার ও অতীন্দ্রর ভূমিকা জমিয়া উঠতেই তাঁহার খালাস। তাই ইন্দ্রনাথ চরিত্রের কোন পরিণতির ইঙ্গিত নাই।

চার-অধ্যায়ের পর রবীন্দ্রনাথ প্রায় পাঁচ বৎসর কোন গল্প লেখেন নাই। তাহার পর একেবারে ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাসে 'রবিবার' গল্প প্রকাশিত হয়। চার-অধ্যায়ের সঙ্গে এই গল্পটির সম্পর্ক আগে দেখাইয়াছি॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

"বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে বল্‌তে পারিনে, বল্‌তে বল্‌তে ভাবি, মৌমাছিদের পাখা যেমন উড়্‌তে গিয়ে গুন্‌গুন্ করে।"

১

শিল্পী দুই জাতের, আদিকর্মিক ও নবকর্মিক। আদিকর্মিক স্রষ্টা। নবকর্মিক কারিগর। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই আদিকর্মিক—কবি এবং মনীষী। তাঁহার সৃষ্টিশিল্পের বিশেষ বিশেষ ভাবনার পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাটকে গল্পে উপন্যাসে দেখিয়াছি। আর এক অভিনব ভাবনার পরিচয় তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে পাই। কবিতায় গানে সুরে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের নূতন উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবন্ধে তিনি হয় আনন্দের নূতন উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছেন অথবা আমাদের চিন্তার আগ্রহ বর্তমানকে কেন্দ্র করিয়া অতীত হইতে ভবিষ্যতে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস ছাড়া গদ্য রচনা—অধিকাংশই কোন বাঁধাধরা শ্রেণীতে ফেলা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে তাঁহার প্রবন্ধের আলোচনা এই কয়টি সোপান ধরিয়া করা যায়,—(ক) পর্যটক-ভাবনা, (খ) স্বগত-জল্পনা, (গ) কৌতুক-কল্পনা, (ঘ) সাহিত্য ও শিক্ষা ভাবনা, (ঙ) ব্যক্তি-জীবন ভাবনা, (চ) সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র ভাবনা, (ছ) ধর্ম-ভাবনা, (জ) আত্মকথা, (ঝ) পত্র এবং (ঞ) বিবিধ ॥

২

ছাপার অক্ষরে গদ্য রচনা লইয়া রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ১৮৭৬ সালে। তখন তাঁহার বয়স পনেরো। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনিই উদ্যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য রচনা জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ভুবনমোহিনী-প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী—এই তিনখানি প্রায় সদ্যঃপ্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের সমালোচনাই

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ বলিয়া সাধারণ ধারণা। জীবনস্মৃতিতে প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে। ইহা চতুর্থ খণ্ড জ্ঞানাঙ্কুরের শেষ প্রবন্ধ। আমার মনে হয় এই বছরের জ্ঞানাঙ্কুরে ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রবন্ধ নয়। 'প্রলাপ'[১] হইতেছে পদ্য "প্রলাপ", যাহার রচনারীতিতে বালক রবীন্দ্রনাথের হাতের অভ্রান্ত ছাপ রহিয়াছে। আর 'প্রলাপ-সাগর'[২] হইতেছে গদ্য "প্রলাপ", যাহার রচনাশৈলীতেও রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়।[৩] 'প্রলাপ-সাগর' রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলে ইহা তাঁহার প্রথম কৌতুক-রচনা।

কবিতার তুলনায় গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রবীণতা প্রথম হইতেই দেখা গিয়াছিল। তাহার কারণ দুইটি। (১) আত্মভাবনা প্রকাশের পথ পদ্যে ছিল সংকীর্ণ, গদ্যে ছিল অবারিত। (২) রবীন্দ্রনাথ নিজে ভাবিতেন, এবং তাঁহার ভাবনায় সমসাময়িক লেখকদের (ও সমালোচকদের) ভ্রান্তি ও মূঢ়তা ধরা পড়িয়াছিল আর তাঁহার মনে উষ্মা সঞ্চার করিয়াছিল। সেই উষ্মাই বালকের গদ্যের ভাষায় তেজ ও তীক্ষ্ণতা দিয়াছিল।

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ অচিরপ্রকাশিত তিনখানি তথাকথিত গীতিকাব্যের[৪] সমালোচনা প্রসঙ্গে গীতিকাব্যের লক্ষণ ও স্বরূপ এবং মহাকাব্যের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে চৌদ্দ পনেরো বছরের বালকের লেখা এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, ইহার নিজস্ব মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ও সাহিত্যের নাড়ীজ্ঞান তখনি যে রবীন্দ্রনাথের হইয়া গিয়াছে।

প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

> মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিয়া সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সংগীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইভাবে গীতি-কাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত

[১] অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ১২৮২ ; বৈশাখ ১২৮৩।

[২] ফাল্গুন, চৈত্র ১২৮২ ; বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ১২৮৩।

[৩] যেমন, "তবে আমার এই সকল পাগলামীর পরিচয়ে কেহ আমাকে কবির শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম।"

[৪] বই তিনখানি যথাক্রমে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর লেখা। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ) পৃ ৪২০, ৪২১ ও ৪১৬ দ্রষ্টব্য।

করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি বাহির হইয়াছিল।[১] পাঠ্যপুস্তকরূপে মেঘনাদবধকে বাল্যে গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য কাব্যটির উপর বালক রবীন্দ্রনাথের প্রসন্নতা থাকিবার কথা নয়। তাঁহার নিজের কবিপ্রকৃতিও সর্ববিধ কষ্টকল্পনার ও আড়ম্বরের প্রতি সবিশেষ বিতৃষ্ণ ছিল। এই দুই কারণে বালক কবি-সমালোচক মেঘনাদবধের উপর অতিরিক্ত নির্মম হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখিয়াও রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকে রেহাই দেন নাই। পাঁচ বছর পরে এই নামে আবার একটি প্রবন্ধ লিখেন।[২] অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রতিকূল সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখিতে চাহেন নাই। গ্রন্থ-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিকূল অভিমত দিতে বাধ্য হইয়াছেন তখন যথাসম্ভব অল্পভাষণ করিয়াছেন এবং কিছু-না-কিছু গুণ—যদি থাকে—আবিষ্কার করিয়া যথাসম্ভব প্রিয়ভাষণ করিয়াছেন। একদা তিনি সাধনায় একসঙ্গে দুইটি উপন্যাসের সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত করি।[৩] প্রথমে একটি বড় রচনার সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন

> গ্রন্থখানি একটি রীতিমত উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু, পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বী স্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ববিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র আয়োজন আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু; ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একথা একবারও ভুলিতে পারি নাই যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন।…কেহই সত্যিকার

১ বাকি অংশ ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

২ ভারতী ১৮৮৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'সমালোচনা'য় সংকলিত।

৩ সাধনা ফাল্গুন ১৩০১।

প্রথম ভাগ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯০৭)। ইহাতে নবজীবন (১২৯১) হইতে একটি গল্প এবং বালক (১২৯২), সাধনা, ভারতী ও বঙ্গদর্শন হইতে প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগ সাহিত্যচিন্তা ও ভ্রমণ-বিষয়ক।[১] 'পঞ্চভূত' ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত কিছু কিছু পত্রাংশ[২] ও দুইটি বন্ধুস্মৃতি প্রবন্ধও আছে।

দ্বিতীয় ভাগ 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭)। ইহাতে আছে—'রামায়ণ' (১৩১০), 'মেঘদূত' (১২৯৫), 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'কাদম্বরীর চিত্র' (১৩০৬), 'কাব্যের উপেক্ষিতা' ও 'ধম্মপদং'।

তৃতীয় ভাগ 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)। ইহাতে তিনটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধ 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' সাধনায় 'মেয়েলি ছড়া' (১৩০১) নামে বাহির হইয়াছিল। অপর প্রবন্ধ, 'কবিসঙ্গীত' (১৩০২) ও 'গ্রাম্য সাহিত্য' (১৩০৫)।

চতুর্থ ভাগ 'সাহিত্য' (১৯০৭)। ইহাতে এগারোটি প্রবন্ধ আছে—'সাহিত্যের তাৎপর্য' (১৩১০), 'সাহিত্যের সামগ্রী' (১৩১০), 'সাহিত্যের বিচারক', 'সৌন্দর্যবোধ (১৩১৩), 'বিশ্বসাহিত্য,' 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য', 'সাহিত্য সৃষ্টি' (১৩১৪), 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' (১৩০১), 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৩০৫) ও 'কবিজীবনী' (১৩০৮)।

পঞ্চম ভাগ 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭)। ইহাতে চারটি প্রবন্ধ ও বারোটি সমালোচনা আছে—'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩০০), 'সঞ্জীবচন্দ্র' (১৩০১), 'বিহারীলাল' (১৩০১), 'বিদ্যাপতির রাধিকা' (১২৯৮), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৩০১), 'রাজসিংহ' (১৩০১), 'ফুলজানি' (১৩০১), 'যুগান্তর' (১৩০৫), 'আর্যগাথা' (১৩০১), 'আষাঢ়ে' (১৩০৫), 'মন্দ্র' (১৩০৯), 'শুভ বিবাহ' (১৩১২), 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৩০৫), 'সাকার ও নিরাকার', 'জুবেয়ার' ও 'ডি প্রোফণ্ডিস'।[৩]

দশম ভাগ 'রাজা প্রজা' (১৯০৮)। ইহাতে এই এগারোটি প্রবন্ধ আছে—'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৩০০)[৪], 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৩০০),

---

[১] ১৩০০ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'ও খানিকটা সন্নিবিষ্ট আছে।

[২] অধিকাংশ পত্র পরে ছিন্নপত্রে পূর্ণতর আকারে দেওয়া আছে।

[৩] শেষ প্রবন্ধটি পুরাতন রচনা, 'সমালোচনা' থেকে নেওয়া।

[৪] প্রবন্ধটি জেনেরেল এসেম্ব্লিজ ইনস্টিটুশন হলে চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষ্যে পড়া হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন।

'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১), 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১), 'কণ্ঠরোধ' (১৩০৫), 'অত্যুক্তি', 'ইম্পীরিয়ালিজম' (১৩০২), 'রাজভক্তি' (১৩১২), 'বহুরাজকতা' (১৩১২), 'পথ ও পাথেয়' ও 'সমস্যা'।

একাদশ ভাগ 'সমূহ' (১৯০৮)। ইহাতে এই ছয়টি প্রবন্ধ আছে—'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১), 'দেশনায়ক', 'সফলতার সদুপায়' (১৩১১), 'সভাপতির অভিভাষণ'[১] ও 'সদুপায়' (১৩১৫)।

দ্বাদশ ভাগ 'স্বদেশ' (১৯০৮)। ইহাতে এই আটটি প্রবন্ধ আছে—'নূতন ও পুরাতন' (১২৯৮), 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৩০৯), 'দেশীয় রাজ্য' (১৩১২), 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (১৩০৮), 'ব্রাহ্মণ' (১৩০৮), 'সমাজভেদ' (১৩০৮), 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' (১৩১০)।

ত্রয়োদশ ভাগ 'সমাজ' (১৯০৮)। ইহাতে পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছ 'চিঠিপত্র' ছাড়া এই সাতটি প্রবন্ধ আছে—'আচারের অত্যাচার' (১২৯২), 'সমুদ্রযাত্রা' (১২৯৯), 'বিলাসের ফাঁদ' (১২৯২), 'নকলের নাকাল' (১৩০৮), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১২৯৮), 'অযোগ্য ভক্তি' (১৩০৫) ও 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫)।

চতুর্দশ ভাগ 'শিক্ষা' (১৯০৮)। ইহাতে সবশুদ্ধ সাতটি প্রবন্ধ আছে—'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২), 'শিক্ষা-সংস্কার' (১৩১৩), 'শিক্ষা-সমস্যা' (১৩১৩), 'জাতীয় বিদ্যালয়' (১৩১৩), 'আবরণ' (১৩১৩) এবং 'সাহিত্য সম্মিলন' (১৩১৩)।

শিক্ষার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে। তৃতীয় সংস্করণে এই সব প্রবন্ধ (ও পত্রাংশ) সংযোজিত হইয়াছে—'তপোবন' (১৩১৬), 'শিক্ষার বাহন' (১৩২২), 'মনোবিকাশের ছন্দ' (১৩২৬), 'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮)[২], 'পত্র'[৩], 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য' (১৩৩৫), 'ধ্যানী জাপান' (১৩৩৬), 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৩৩৯)[৪] ও 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৩৪০)। পরিশিষ্টরূপে আরও পাঁচটি রচনা আছে।

পঞ্চদশ ভাগ 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯)। ইহাতে এই প্রবন্ধগুলি আছে,—'বাংলা উচ্চারণ' (১২৯৮), 'টা টো টে' (১২৯৯), 'স্বরবর্ণ "অ"' (১২৯৯),

---

[১] পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী (১৩১৪)। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

[২] পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। [৩] 'যাত্রী' হইতে গৃহীত।

[৪] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত (১৯৩৩)।

'স্বরবর্ণ "এ"' (১২৯৯), 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' (১৩০০), 'বাংলা শব্দদ্বৈত' (১৩০৭), 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩০৮), 'সম্বন্ধে কার' (১৩০৫), 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' (১৩০৫), 'বাংলা বহুবচন' (১৩০৫) এবং 'ভাষার ইঙ্গিত'।

ষোড়শ ভাগ 'ধর্ম' (১৯০৯)। ইহাতে প্রবন্ধ আছে এই পনেরোটি—'উৎসব' (১৩১২), 'দিন ও রাত্রি' (১৩১২), 'সদুপায়' (১৩১২), 'ধর্মের সরল আদর্শ' (১৩০৯), 'প্রাচীন ভারতের "এক"' (১৩০৮), 'প্রার্থনা' (১৩১১), 'ধর্মপ্রচার' (১৩১০), 'বর্ষশেষ', 'নববর্ষ', 'উৎসবের দিন' (১৩২২), 'দুঃখ' (১৩১৪), 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' (১৩১৩), 'স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' (১৩১৩), 'ততঃ কিম্' (১৩১৩) ও 'আনন্দ রূপ' (১৩১০)।

গদ্যগ্রন্থাবলী শেষ হইবার সাত বছর পরে (১৯১৬), দুইখানি প্রবন্ধগ্রন্থ বাহির হইয়াছিল—'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'। সঞ্চয়ে আছে, 'রোগীর নববর্ষ'[১], 'রূপ ও অরূপ',[২] 'নামকরণ', 'ধর্মের নবযুগ',[১] 'ধর্মের অর্থ',[১] 'ধর্মশিক্ষা',[১] 'ধর্মের অধিকার'[২] ও 'আমার জগৎ'[৩]। সঞ্চয়ে আছে—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা',[৪] 'আত্মপরিচয়', হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়',[৫] 'ভগিনী নিবেদিতা', 'শিক্ষার বাহন', 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি', 'কৃপণতা', 'আষাঢ়' ও 'শরৎ'।[৬]

'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিন ধরিয়া 'কমলা বক্তৃতামালা' রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। বইটি প্রবন্ধসমষ্টি নয়।

'সাহিত্যের পথে'য় (১৯৩৬) আছে এই প্রবন্ধগুলি—'বাস্তব',[৭] 'কবির কৈফিয়ৎ', 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য, (১৩৩০), 'সৃষ্টি', 'সাহিত্যধর্ম'[৮] 'সাহিত্যে নবত্ব'[৯], 'সাহিত্য-বিচার'[১০], 'আধুনিক কাব্য', 'সাহিত্যতত্ত্ব'[১০] ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য'। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারশিপ্ বক্তৃতা রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল (ফাল্গুন ১৩৩০)[১১]।

[১] প্রকাশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৩১৮-১৯)। [২] প্রকাশ প্রবাসীতে (১৩১৮)।

[৩] প্রকাশ সবুজপত্রে (১৩২১)।

[৪] ওভার্টুন হলে চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত (৪ চৈত্র ১৩১৮)।

[৫] চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত (কার্তিক ? ১৩১৮)।

[৬] প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯), দ্বিতীয় প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১৯) এবং অপর সব প্রবন্ধ সবুজপত্রে (১৩২১-২২) প্রকাশিত।

[৭] প্রকাশ 'বিচিত্রা'য় (১৩৩৪)।

[৮] প্রবাসীতে 'যাত্রীর ডায়ারি' নামে (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) প্রকাশিত।

[৯] প্রকাশ প্রবাসীতে (১৩৩৬, ১৩৪১, ১৩৪১)। [১০] প্রবাসী ১৩৩৬, ১৩৪১।

[১১] 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৩৯।

'কালান্তর'এর (১৯৩৭) প্রবন্ধগুলি অন্যত্র অসংকলিত এবং ১৯১৫ হইতে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত। কাল অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি এই—'বিবেচনা ও অবিবেচনা', 'লোকহিত ও লড়াইয়ের মূল',[১] 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'[২], 'ছোটো ও বড়ো', 'বাতায়নিকের পত্র', 'শক্তিপূজা', 'সত্যের আহ্বান'[৩], 'হিন্দু মুসলমান',[৪] 'সমস্যা', 'সমাধান', 'শূদ্রধর্ম', 'বৃহত্তর ভারত'[৫], 'কালান্তর'[৬] ও 'নারী'[৭] ॥

৪

ঘরের কোণ ছাড়িয়া বালক রবীন্দ্রনাথ যেদিন পিতার সঙ্গে হিমালয়ের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন সেইদিনটি তাঁহার জীবনে বৃহৎ পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছিল। বাহিরের টান তাঁহাকে পরে বারবার টানিতে থাকে এবং মধ্য বয়স হইতে গৃহকোণ আর তাঁহাকে কখনো দীর্ঘদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। বেশিদিন কোথাও নীড় বাঁধিয়া থাকিলে পথের বাসনা তাঁহার জাগিয়া উঠিত এবং সেই বাসনা মিটিয়া গেলেই আবার কোণের মানুষ নীড়ের টানে ফিরিয়া আসিত। রবীন্দ্রনাথের বিদেশভ্রমণ, বিশেষ করিয়া কৈশোরের প্রথম বিলাতপ্রবাস, তাঁহার গ্রহণশীল চিত্তকে বাহির বিদেশের, বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছিল। তাহার পর তাঁহার প্রত্যেক বিদেশযাত্রার ও পর্যটনের অভিজ্ঞতা তাঁহার চিন্তাধারায় নূতনতর বেগ সঞ্চারিত করিয়াছে। তাঁহার চিঠিপত্রে ডায়ারিতে ও বিবিধ রচনায় ইহার অজস্র প্রমাণ ছড়াইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাতে যান (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ হইতে ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) তখন তাঁহার বয়স সতেরো-আঠারো। সেখান হইতে তিনি ভারতীর জন্য তেরোটি পত্রাকার প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।[৮] 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে এই রচনাগুলি তৃতীয় বর্ষের

[১] সবুজপত্র ১৩২১। [২] 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পুস্তিকাকারেও বাহির হইয়াছিল (১৯১৭)।
[৩] প্রবাসী (১৩২৪, ১৩২৬, ১৩২৮)। [৪] 'শান্তিনিকেতন' পত্র (১৩২৯)।
[৫] প্রবাসী (১৩৩০, ১৩৩২, ১৩৩৪)। [৬] পরিচয় (শ্রাবণ ১৩৪০)।
[৭] প্রবাসী (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)।
[৮] প্রকাশিত সকল পত্র ভারতীর জন্য লেখা হয় নাই। য়ুরোপ-প্রবাসীর-পত্রের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, "বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল ;—কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে।"

(১২৮৬) ভারতীতে বাহির হইতে থাকে, এবং পরে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় (শকাব্দা ১৮০৩, ১৮৮১)।[১] ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা গদ্য গ্রন্থ। ভারতীতে কোন কোন পত্রের সঙ্গে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের যে মন্তব্য পাদটীকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল। য়ুরোপ-প্রবাসী কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই পত্রগুলিতে তাঁহার মনোবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম প্রথম তিনি নিতান্তই গৃহকাতর ছিলেন তাই গোড়ার চিঠিগুলিতে বিলাতি সমাজের জীবনযাত্রার প্রতি বিরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর বিদেশে তাঁহার মন বসিতে শুরু হইলে পর বিলাতি সমাজের ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনায় নিন্দার ঝাঁঝ কমিতে দেখা গেল, এবং বিলাতি সমাজের তুলনায় আমাদের সমাজের দোষগুলি তাঁহার নজরে ঠেকিল। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে থাকেন।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের রচনারীতিতে বিশেষত্ব আছে। পত্রগুলি সবই কথ্যভাষায়, স্থানে স্থানে ঘরোয়া ইডিয়মে লেখা। ইহার আগে সাহিত্যে কথ্যভাষা নক্‌শা-জাতীয় ব্যঙ্গ-রচনায় ও নাটকে ছাড়া অন্যত্র ব্যবহৃত হয় নাই। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন

> আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মুখোমুখী একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

কিছু অমার্জিত হইলেও রচনাভঙ্গি বেশ সরল এবং মনোরম। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রতিমানপ্রাচুর্য, তখনি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যেমন

> আমি যে ঘরে বোসতেম সে ঘরে বাড়ীর দশজনে যাতায়াত কচ্চে, আমি এক পাশে বসে লিখচি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে কোরে ঢুলচেন, আর একদিকে মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর কোরে নামতা পড়াচ্ছেন।[২]

> যা'দের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত থাক্‌তে হবে, তা'দের সঙ্গে যদি মন খুলে কথাবার্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাস্‌বে, তাদের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যোচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে, আর মুখের উপর একটা সম্ভ্রমের মুখস্ পোরে দিন রাত্রি থাকতে হয় তা' হোলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাব?[৩]

---

[১] ১৮০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ।

[২] পঞ্চম পত্র। প্রায় এই ছবিটি দিয়াই মানসীর 'বঙ্গবীর'এর রঙ্গমঞ্চ উদ্‌ঘাটিত, "ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে নামতা পড়েন উচ্চৈঃস্বরেতে"। [৩] সপ্তম পত্র।

শাশুড়িরা যে ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করিনে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার কোর্তে পারেন যে উপকারটা বউয়ের হোক, কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় ত সে ঝিয়েরি![১]

ইহার পর অনেকদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের কোন গদ্যরচনায় কথ্যভাষা অবলম্বিত হয় নাই।[২] তাহার কারণ তখনো সাধুভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য পরিপূর্ণ বিকাশে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। সে কাজ রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে তিনি ও তাঁহার প্রভাবিত কোন কোন লেখক সাহিত্যের বাহনরূপে কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক সাহিত্যগোষ্ঠীও য়ুরোপ-প্রবাসীর-পত্রের কথ্যরীতি গম্ভীর সাহিত্যের উপযোগী বলিয়া মনে করেন নাই। তবে ঠাকুরবাড়ির চিঠিলেখার স্টাইলে কথ্যভাষার বিশ্রব্ধ ভঙ্গি পূর্ব হইতেই ছিল।[৩]

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যটন-নিবন্ধ হইতেছে 'সরোজিনী প্রয়াণ'।[৪] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টীমার "সরোজিনী"তে চড়িয়া রবীন্দ্রনাথ, দুই ভ্রাতা ও সসন্তান মধ্যম ভ্রাতৃজায়া সমভিব্যাহারে বরিশাল যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যাত্রার উদ্যোগ-পর্বেই যে দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে শেষ পর্যন্ত বরিশাল অবধি যাওয়া ঘটে নাই, কিছু দূর গিয়া তাঁহাদের ফিরিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধটিতে শুধু এই ভ্রমণের কথাই নাই, রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে গঙ্গার উজানে যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং বাল্যে পেনিটির বাগানে ও পিতার সঙ্গে বোটে এবং কৈশোরে চন্দননগরে গঙ্গা ও গঙ্গার তীরভূমি তাঁহার মনে যে রঙ ধরাইয়াছিল তাহার ছাপও ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। "এই যে-সব ছবি আমার মনে উঠিতেছে, একি সমস্তই এইবারকার ষ্টীমার যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি।" শিলাইদহ-সাজাদপুরে গিয়া পদ্মার প্রেমে পড়িবার পূর্বে কবি গঙ্গার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গঙ্গার এই দুইতীরের জনপদ-জীবনের রোমান্স্‌

---

১ দশম পত্র।

২ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' এবং ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের বাহিরে চলিত ভাষার ব্যবহার সবুজ-পত্রেরও অনেক আগে রবীন্দ্র-রচনায় দেখা গিয়াছে—'শান্তিনিকেতন' উপদেশ ও চিন্তামালায় (প্রথম খণ্ড জানুয়ারি ১৯০৯)।

৩ দেবেন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৪ ভারতী শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১২৯১। বিচিত্র-প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত।

তাঁহার প্রথম ছোটগল্প দুইটিতে[১] পরিবেশ রচনা করিয়াছে। পদ্মাতীরের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নিবিড়তর, কেননা সেখানে তিনি দীর্ঘকাল শুধু ভাসিয়াই ফিরেন নাই, ডাঙ্গায়ও বাসা বাঁধিয়া ছিলেন। তাই সাধনার গল্পগুলিতে যে-জীবনরসের কারবার তাহাকে রোমান্টিক বলিয়া তুচ্ছ করিলে চলিবে না। পদ্মা-বাসের কালে রচিত কোন কোন গল্পের মধ্যে গঙ্গাতীরের জনপদের ছবিও স্থান পাইয়াছে।[২] যে দৃষ্টি লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করিয়াছিলেন সেই বিশিষ্ট রসদৃষ্টির প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল সরোজিনী-প্রয়াণে।

> সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়।

স্বভাবোক্তির সঙ্গে স্নিগ্ধতার মিলনে সরোজিনী-প্রয়াণের ভাষায় একটি বিশেষ মাধুর্যের সঞ্চার হইয়াছে।

পরের বছরে বালকে রবীন্দ্রনাথের দুইটি ভ্রমণবিষয়ক ছোট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, 'দশদিনের ছুটি' এবং 'বরফ পড়া (দৃশ্য)'। বর্ণনা সরল ও সরস।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাতে গিয়াছিলেন শিক্ষার্থী হইয়া।[৩] তখন তাঁহার বয়স অল্প, তাই বিদেশী জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়-লাভে তখন তাঁহার কোন স্পৃহা ছিল না। বয়স বাড়িলে তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্থলে থাকিয়া বিলাতি জীবনের সত্য পরিচয় পাইতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ বাড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১২৯৭ সালে ভাদ্র মাসে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যাত্রার পালা[৪] একটুও দীর্ঘ হইল না। বিলাতি জীবনের ও ইউরোপীয় সভ্যতার যেটুকু ক্ষণিক পরিচয় পাইলেন তাহাই পর্যাপ্ত মনে করিয়া দুই মাস যাইতে না যাইতে দেশে ফিরিয়া

---

১ 'ঘাটের কথা' এবং 'রাজপথের কথা'।

২ বলা বাহুল্য তখনো গঙ্গা দুইতীরে কলের বেড়ি পরে নাই।

৩ কর্তৃপক্ষের প্রেরণায় আরো একবার এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের পথে রওনা হইয়াছিলেন। সেবারে তিনি কলিকাতা হইতে জাহাজ ধরিয়াছিলেন। এই যাত্রা ভঙ্গ হয় মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়া। এই যাত্রায় আশুতোষ চৌধুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

৪ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড)' নামে গ্রন্থবদ্ধ (১৩০০), পরে সংক্ষেপ করিয়া 'পাশ্চাত্যভ্রমণ'এ সংকলিত (১৩৪৩)।

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আসল কথা হইতেছে যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মানস প্রকৃতিতে একটা দ্বন্দ্ব সর্বদা জাগরূক ছিল। তিনি ছিলেন পর্যায়ক্রমে পর্যটক এবং গৃহবাসী। শেষের ভাবটাই ছিল প্রবলতর, তাই পর্যটনে ক্লান্তি আসিতে সাধারণত বিলম্ব হইত না।

এই স্বল্পকালস্থায়ী বিদেশভ্রমণের বৃত্তান্ত, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' নামে সাধনায় প্রথম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। সাধনায় এই ডায়ারি বাহির হইবার কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতায় ইউরোপের ও ভারতবর্ষের সমাজ ও আদর্শ তুলনা করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া চৈতন্য লাইব্রেরীর এক বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (ভূমিকা), প্রথম খণ্ড' নামে (১২৯৮)।

এই প্রবন্ধে ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। তবে এক স্থানে নিজের বিরুদ্ধসমালোচনার সরস বিশ্লেষণ আছে। বিরুদ্ধসমালোচকদের আপত্তির সাফাই রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দিয়াছেন।

> অল্প দিন হয় আমার কোন লেখা যদি আমার দুরদৃষ্টক্রমে কারো অবিকল মনের মত না হত তিনি বল্‌তেন আমি তরুণ, আমি কিশোর, এখনো আমার মতের পাক ধরেনি। আমার এই তরুণ বয়সের কথা আমাকে এতকাল ধ'রে এতবার শুনতে হয়েছে যে শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে এই একটা সংস্কার অজ্ঞাতসারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এই বাংলাদেশের অধিকাংশ ছেলেই বয়স সম্বন্ধে প্রতিবৎসর নিয়মিত ডব্‌ল্‌ প্রমোশন্‌ পেয়ে থাকে কেবল আমিই পাঁচজনের পাকচক্রে কিম্বা নিজের অক্ষমতাবশতঃ কিছুতেই কিশোরকাল উত্তীর্ণ হতে পারলুম না।
>
> এই ত গেল পূর্বের কথা। আবার সম্প্রতি যদি আমার স্বভাববশতঃ আমার কোন রচনায় এমন একটা বিষম অপরাধ ক'রে বসি যাতে কারো কারো সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হয়ে পড়ে তা হলে তিনি বলেন আমি সম্পদের ক্রোড়ে লালিতপালিত, দরিদ্র ধরাধামের অবস্থা কিছুই অবগত নই। আমার সম্বন্ধে এইপ্রকারের অনেকগুলো কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকাতে আমি সাধারণের সমক্ষে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ভাবেই আছি। এইজন্য উচ্চমঞ্চে আরোহণ ক'রে অসঙ্কোচে উপদেশ দেবার চেষ্টা আমার মনে উদয় হয় না।

এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রবন্ধরচনার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন।

> প্রথমতঃ আমার ভাষা সম্বন্ধে আমি চিন্তিত আছি। আমি প্রচলিত ভাষা এবং পুঁথির ভাষার মধ্যে পংক্তিভেদ রক্ষা করি নি।
>
> দ্বিতীয়তঃ ভাবেরও আনুপূর্বিক সঙ্গতি নেই। বিশ্বরচনা থেকে আরম্ভ করে দরখাস্ত রচনা পর্যন্ত সকল রচনাতেই হয় সাধারণ থেকে বিশেষের পরিণতি, নয় বিশেষ থেকে

সাধারণের উদ্ভব, হয় সূক্ষ্ম হতে স্থূল, নয় স্থূল হতে সূক্ষ্ম, হয় বাষ্প থেকে জল, নয় জল থেকে বাষ্পোদ্‌গম হয়ে থাকে। আমি যে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কিসের থেকে কি করচি ভাল স্মরণ হচ্চে না।…তৃতীয়তঃ শত্রু মিত্র সকলেই মনে করবেন আমার এ লেখা প্র্যাক্‌টিকেল হয় নি; সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করা ছাড়া সাধারণ এ'কে আর কোন ব্যবহারে আনতে পারবেন না।…এখানকার অনেকেই স্বমনঃকল্পিত দর্শনবিজ্ঞানের সৃষ্টি ক'রে এবং স্বগৃহরচিত পলিটিক্‌স্ চর্চা ক'রে এই নিরাধার চিন্তা-জগতের উন্নতিবিধানের চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে এখানকার লোকেরাও আমার নামে অভিযোগ ক'রে থাকেন যে, আমার দ্বারা কোন প্র্যাক্‌টিকেল্ কাজ হচ্ছে না, কেবল রাশি রাশি বাষ্প রচনা ক'রে দেশের বীর্যবলবুদ্ধি আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছি।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারি কয়েকখানি লইয়া 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯) সঙ্কলিত।[১] ১৯২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সিয়ামে যান। এই দুই পর্যটনের সময় লেখা ডায়ারি এবং চিঠিপত্র 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি[২] এবং 'জাভা-যাত্রীর পত্র'[২] নামে সংকলিত হইয়া 'যাত্রী'র (১৯১৯) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমযাত্রীর-ডায়ারিতে ভ্রমণের কথা বিশেষ কিছু নাই, তবে সে-সময়ে কবির চিত্তপটে যে-ভাব খেলিতেছিল তাহার পরিচয় যথেষ্টই আছে। যৌবনের পত্র ও ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে কবির কর্মচঞ্চল জ্ঞাননিষ্ঠ মনের পরিচয় পাই। আর পরিণতবয়সের ডায়ারিতে ও চিঠিতে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠ ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তের দ্যুতি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের অনেক রচনার মর্মগ্রহণে এই সব চিঠি-ডায়ারি হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে তাঁহার বিচিত্র মনীষার ও বিরাট ব্যক্তিত্বের চকিত ও অভাবনীয় দর্শন মিলে। কবে-যে একদিন বিকাল বেলায় ছাদে বসিয়া চা খাইতে খাইতে সামনের বাড়ীর ছাদে ক্রীড়ারত উদ্দাম শিশুকে দেখিয়া তাঁহার মন বহিঃপ্রকৃতির সহিত সমতান বোধ করিয়া বিশ্বানুভূতিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল সে-কথা হঠাৎ একদিন সমুদ্রবক্ষে জাহাজের ডেকে তাঁহার মনে পড়িয়া যায়।[৩] সেই সঙ্গে তাঁহার প্রথমজীবনের আত্মীয়-বন্ধুসহচরদের ও ক্ষণ-পরিচিত-অপরিচিতদের কথা মনে পড়িল—যাঁহারা বহুদিন

---

[১] শ্রাবণ ১৩২৬। পরে 'জাপানে-পারস্যে'র (শ্রাবণ ১৩৪৩) অন্তর্ভুক্ত।

[২] প্রবাসীতে প্রকাশিত।

[৩] রবীন্দ্রনাথের শৈশব ভৃত্যরাজতন্ত্রের অধীনে বন্দীদশায় কাটিয়াছিল বলিয়া শিশুর উদ্দাম ক্রীড়ারতিতে তিনি অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিয়া যেন আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিতেন।

বিস্মৃত কিন্তু একদা যাঁহাদের হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা ধারা তাঁহার প্রতিভাকে ফুলে ফলে বিকশিত হইতে সহায়তা করিয়াছিল।

'যাত্রী'র পর এই পর্যায়ের লেখা হইতেছে 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), এবং 'জাপানে পারস্যে'র (১৯৩৬) সংকলিত পারস্য-ভ্রমণকাহিনী ॥

৫

য়ুরোপ-প্রবাসীর-পত্রের পরে যে দুইটি গদ্যগ্রন্থ বাহির হইল সে দুইটিতেই বিবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্বগত চিন্তার আকারে উপস্থাপিত। 'বিবিধ প্রসঙ্গ'এর (ভাদ্র ১৮০৫ শকাব্দ, ১৮৮২) "প্রসঙ্গ"গুলি 'আলোচনা'র (১৮৮৫) প্রসঙ্গের তুলনায় কিছু বড়ো। লেখক যেন পাঠকের সম্মুখে বসিয়া বলিয়া যাইতেছেন, এইভাবে লেখা। লেখার ভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ধাঁচ দৈবাৎ দেখা যায়। যেমন

> আমার এই হৃদয়টি একটি ভগ্নাংশ, আর একটি সংখ্যার সহিত গুণ করিয়া ইহা যিনি পূরণ করিয়া দিবেন তাঁহাকে আমার সর্বস্ব পারিতোষিক দিব।[১]

'বিবিধ প্রসঙ্গ' সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি-ও-গানের সমসাময়িক রচনা[২] এবং কতকটা এই তিন কাব্যগ্রন্থের পরিপূরক। উদাহরণ হিসাবে 'আত্মসংসর্গ' প্রসঙ্গের শেষাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> আমরা মানুষরা কতকগুলা কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু, ক্ষুধার্ত পিপীলিকার মত জগৎকে চারিদিক হইতে ছাঁকিয়া ধরিয়াছি ; উষাকে, জ্যোৎস্নাকে, গানের শব্দকে দংশন করিতেছি, একটুখানি খাদ্য পাইবার জন্য। হায় রে, খাদ্য কোথায় ! হে সূর্য উদয় হও ! চন্দ্র হাস ! ফুল, ফুটিয়া ওঠ ! আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা কর ; আমাকে যেন আমার পাশে বসিয়া না থাকিতে হয় ; অনিচ্ছারচিত বাসর শয্যায় শুইয়া আমাকে যেন আমার আলিঙ্গনে কাঁদিতে না হয় !

শেষ প্রসঙ্গ 'সমাপন', বইটির ভূমিকা। রচনাগুলির কৈফিয়ৎ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> ইহা, একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সকলগুলি কি আমি মানি, না বিশ্বাস করি? সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।…
>
> …আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মত ফুলের মত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পোষণকার্যে সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়ত কাজে লাগিতে পারে।

---

১ 'জমাখরচ' (পৃ ৭৫)। ২ প্রকাশ ভারতী ১২৮৮-৮৯।

> দৃশ্য। পদ্মাতীরস্থ পল্লীগ্রাম। বারান্দার সম্মুখে নদীতটে একখণ্ড ধান্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। ঘনরোপিত শিশু ধান্য বৃক্ষগুলি যেন গাঢ় সবুজবর্ণের অগ্নিশিখার মত কাঁপিতেছে। এই নিবিড় সবুজ রঙটি যেন নিরতিশয় নিদ্রার মত দৃষ্টিকে আপনার অন্তস্তলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে চায়, দুইটি চক্ষু তাহার সুগভীর কোমলতার মধ্যে বারম্বার-অবগাহন করিয়া কিছুতেই আর তৃপ্তির শেষ হয় না।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্যচ্ছন্দের উৎপত্তি বিষয়ে যে অনুমান করিয়াছিলেন ভাষাবিজ্ঞানে এখন সেই কথাই বলে।

> আমার বিশ্বাস, ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোট ছেলেরা যেমন ছড়া ভালবাসে, তাহার ভাবমাধুর্যের জন্য নহে—কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝঙ্কার মাত্রই কানে ভাল লাগিত। এইজন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, ততই ছন্দের সঙ্গে ভাব সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের দুই একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

পঞ্চভূতের-ডায়ারিতে সহজ চালে সরল ভাষায় মনোহর ভঙ্গিতে গভীর কথা অনেক আছে।

সাহিত্যে কৌতুকরসের সৃষ্টি সহজ নয়। কড়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ অথবা সস্তা রসিকতা যাহা সচরাচর আমাদের সাহিত্যে কৌতুকরস বলিয়া চলে তাহার কথা বলিতেছি না। যাহাকে ইংরেজীতে হিউমার বলে তাহা করুণরসের পাশ ঘেঁষিয়া যায়। যে ঘটনা বা পরিণতি অবচেতন মনের অপেক্ষিত নয় যদি সহসা তাহাই ঘটিয়া যায়, তখন যে অমনস্ক পীড়াবোধ আমাদের চিত্তের যুক্তি-আশ্রয়ী অংশকে ঈষৎপরিমাণে উত্তেজিত করে তাহাই কৌতুকরসের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু সেই ঈষৎ বেদনাবোধ যদি সজাগ থাকে তবেই করুণরসের অভিব্যক্তি। পঞ্চভূতের ডায়ারিতে 'কৌতুকহাস্য' এবং 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রস্তাব দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলিয়াছেন।

> আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসঙ্গত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত চির-প্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে, হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার

অনতিদুঃখেরও নহে, সেইজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়। অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।

'পঞ্চভূতের ডায়ারি' অথবা 'ডায়ারি' নামে যে প্রবন্ধগুলি অল্পস্বল্প পরিবর্জন ও পরিবর্তন লাভ করিয়া 'পঞ্চভূত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯৭) তাহাতে স্বগত-জল্পনা শ্রেণীর প্রবন্ধরচনার উৎকৃষ্ট এবং সরস নিদর্শন পাই। সাহিত্য শিক্ষা সমাজ ও জীবনের নানা বিষয় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের মনকে ভাবাইয়া তুলিত। সেই ভাবনার কিছু কিছু টুকরা এই রচনায় রহিয়াছে॥

৬

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে অন্তর্বাহী কৌতুকরসের স্বাদ প্রায়ই পাওয়া যায়। গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় কৌতুকরসায়ন সংযোগে রচনার তীব্রতা ও স্বাদুতা বাড়াইয়াছেন। দীর্ঘ রচনার মধ্যে তাহার ভালো উদাহরণ 'পঞ্চভূত'।

যে সব প্রবন্ধে কৌতুকরসের যোগানই মুখ্য সেগুলিকে তিনভাগে ফেলা যায়—ঝাঁঝালো ব্যঙ্গময়, মৃদু ব্যঙ্গময় ও বিশুদ্ধ কৌতুকময়।

ঝাঁজালো ব্যঙ্গময় প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ দুই চারটির বেশি লিখেন নাই এবং তাও প্রথম দিকে। যেমন 'ভানুসিংহের জীবনী'[১] ও 'রসিকতার ফলাফল'[২]। প্রাচীন ইতিহাসের ও পুরাতত্ত্বের গবেষণা আমাদের দেশে আনাড়ির হাতে যেভাবে (অদ্যাপি) পরিচালিত হয় তাহাকেই এই মর্মভেদী শাণিত রচনায় উপহাস করা হইয়াছে। রূঢ় এবং সত্য বলিয়াই কি প্রবন্ধটি উপেক্ষিত হইয়াছিল? ভানুসিংহের জীবনীর উপভোগ্যতা আজও অক্ষুণ্ণ। প্রবন্ধটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার রীতিতে কোটেশন দিয়া লেখা। যেমন

আমাদের দেশের যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণবচূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন

১ প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯১) নবজীবনে প্রকাশিত। কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

২ ভারতীতে (বৈশাখ ১২৯২) প্রকাশিত। সংশোধিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঙ্গকৌতুকে সংকলিত।

করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য হইয়াছি এইত আমার বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

তাহার পর লেখক বেদ পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য ঘাঁটিয়া এবং অবশেষে বত্রিশ-সিংহাসন বেতাল-পঁচিশ তুলসীদাসের রামায়ণ আরব্য-উপন্যাস ও সুশীলার-উপাখ্যান প্রভৃতি অর্বাচীন ও আধুনিক বই লইয়া "বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে" পান নাই। সেজন্য পাঠকের কাছে লেখক সাফাই গাহিয়াছেন

কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন—দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

তাহার পরে ভানুসিংহের জন্মকাল-বিচার। নানা পণ্ডিতের নানা মত। কেহ বলেন ৪৫১ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, কেহ বলেন ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ, কেহ বা বলেন ১১০৯ হইতে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে। "মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে" ভানুসিংহের জন্মকাল হয় ৮১৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে নয় ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে।

আমার কোন কোন মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

অতঃপর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে জীবৎকাল বিচার। ভাষা যতই পুরানো হয় ততই শব্দের আকার ছোট হইয়া আসে। যেমন "গমন করিলাম" হইতে "গেলুম", "ভ্রাতৃজায়া হইতে "ভাজ"। এই নজীরে "ভানুসিংহ" হইতে "ভানু" অনেক অর্বাচীন পরিণতি। নীল-পুরাণ হইতে লেখক দেখাইলেন যে বৈতস ভানুর বংশজাত, এবং "যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে বৈতস ৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের লোক"। সুতরাং ভানুর জন্ম নিশ্চয়ই তাহার অনেক আগে। সে অনুসারে তাঁহার জন্মকাল ৪৩৮ খ্রীস্টাব্দ। এদিকে আবার

একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না হউক দু হাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃষ্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা খৃষ্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

তাহার পর প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে জন্মস্থান-বিচার। সিংহলে ত্রিন্‌কমলীতে একটি পুরাতন কূপ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে

ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। "হ"টিকে কেহ "ক্ষ" বলিতেছেন, বা "ঞ্চ" বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে "হ"

তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার "ভ"টিকে কেহ বা বলেন "র্চ্চ" কেহ বা বলেন "ক্লৈ", কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, "ভানুসিংহ" শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই।...কিন্তু আবার একটা কথা আছে। নেপালের কাটমুণ্ডের নিকটবর্তী একটি পর্বতে সূর্যের (ভানু) প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্তিটা পাওয়া গেল না।

লেখক অনুমান করিতেছেন মুসলমান শাসনের সময়ে সিংহমূর্তিটি ধ্বংস হইয়া থাকিবে। "সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে" সিংহমূর্তিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই সেকালের ভানু প্রতিমূর্তির অবশিষ্টাংশ, না হইলে ইহার কোন অর্থই থাকে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে হওয়াই সম্ভব।

তবে তিনি কার্যগতিকে নেপাল হইতে পেশোয়ারে যাতায়াত করিতেন কিনা সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। এবং স্নান উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিনক্‌মলীর কূপে যাওয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্য নহে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের বাসস্থান সম্বন্ধে "অপ্রকাশচন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহা লেখকের মতে বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়"।

তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন।

ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে লেখক বিনীতভাবে তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন

তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লেখক অনিচ্ছুক। শুধু এইটুকু তিনি বলিয়াছেন

ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয়বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে (।) বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না তাহাই তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

মৃদুব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি গদ্যগ্রন্থাবলীর সপ্তম খণ্ড 'ব্যঙ্গকৌতুক'এ (১৯০৭)

সংকলিত আছে। যেমন, 'বর্ষার চিঠি',[১] 'ডেঙে পিপড়ের মন্তব্য',[২] 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব',[৩] 'প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব',[৪] 'লেখার নমুনা',[৫] 'মীমাংসা',[৬] 'সারবান সাহিত্য',[৭] 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ',[৮] ইত্যাদি। ১২৯৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের প্রবন্ধ আর লিখেন নাই। তবে ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহার আলোচনা আগে করিয়াছি।

বিশ্রব্ধ কৌতুকময় রচনাগুলি সংখ্যায় না হোক পরিমাণে বেশি। বালকে (১২৯২) ও ভারতীতে প্রকাশিত হেঁয়ালি নাট্যগুলি গদ্যগ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ ভাগ 'হাস্য কৌতুক'এ (১৯০৭) সংকলিত আছে। এই সঙ্গে সাধনায় প্রকাশিত, সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে যাহাকে 'ভাণ' (monologue play) বলে সেইরূপ দুইটি ছোট রচনা—'বিনি পয়সার ভোজ' ও 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি'—উল্লেখযোগ্য। এ দুইটিও ব্যঙ্গকৌতুকে সংকলিত।

বিশ্রব্ধ কৌতুক সংলাপের ভাণ্ডাগার 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ('চিরকুমার সভা') নাট্য-রচনার মধ্যে আলোচিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে অনাবিল কৌতুকরসের পথ বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখাইয়াছিলেন। তবে তিনি শুচিতা বাঁচাইয়া চলিলেও সর্বদা প্রায়ই এড়াইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ দুই কাজই করিয়াছেন। কৌতুকরসের ফল্গুধারা রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনায় অনির্বচনীয় রমণীয়তার সঞ্চার করিয়াছে। একটু উদাহরণ দিই। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ক্ষণিকের জন্য যে অযথা অজস্র অর্থব্যয় হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'রাজভক্তি'[৯] প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। তাহার আরম্ভটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

> রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারো রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? বিস্তর বাতি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকও মুড়ালো।
>
> ব্যাপারখানা কি? একটি কাহিনীমাত্র। রাজা ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া যত কম

---

[১] বালক শ্রাবণ ১২৯২। [২] ঐ? [৩] বালক চৈত্র ১২৯২। [৪] সাহিত্য (১২৯৮)।
[৫] রচনা ১২৯৮। [৬] ঐ ১২৯৮। [৭] ঐ ১২৯৮।
[৮] সাধনায় প্রকাশিত। [৯] রাজাপ্রজায় সংকলিত।

জানা যায়—দেশের সঙ্গে যত কম যোগ স্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু যত্নে—বহু নৈপুণ্য ও সমারোহ সহকারে সমাধা হইল।

বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ কূপমণ্ডূকতাকে উপহাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'আত্ম-পরিচয়'[১] লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সরস রচনার বিচিত্র নিদর্শন পাই।

কিম্বা হয়ত আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিম্বা দুই দিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া যে আমিও সে পুল পার হইব না কিম্বা স্নান সম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে একথা মানা যায় না। অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টম পুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসিপিসি ও খুড়ো জ্যাঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, "তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে সুরু করিয়াছিস। ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল।" চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই। কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীর ছেলে সে পরিচয়টা পাকা।

নিতান্ত সাধারণ চিঠিপত্রেও রবীন্দ্রনাথের অনায়াসসিদ্ধ কৌতুকরসসৃষ্টির পরিচয় ছড়াইয়া আছে। যেমন

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কোনোমতেই মরবার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর ছেলের রাজ্যভোগের আশা যেমন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিল এবারকার শরতের সেই দশা। বর্ষা শেষ পর্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল।[২]

৭

সাহিত্যের আলোচনা লইয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনার আরম্ভ। তাঁহার প্রথম দুই তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ আগে করিয়াছি। মেঘনাদবধের উপর ছাড়াও দেশী ও বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এগুলির কতকগুলি পরিবর্তিত আকারে 'সমালোচনা'য় (১৮৮৭) স্থান পাইয়াছে।[৩] গ্রন্থাকারে অসংকলিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ (—তখন বয়স উনিশ বছর—)

---

[১] পরিচয়ে সংকলিত।

[২] 'পথে ও পথের প্রান্তে'য় (১৯৩৮) সংকলিত পত্র হইতে।

[৩] 'অনাবশ্যক', 'তার্কিক', 'বিজ্ঞতা', 'মেঘনাদবধ কাব্য' (দ্বিতীয় প্রবন্ধ), 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', 'সঙ্গীত ও কবিতা', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', 'ডি প্রোফণ্ডিস্‌', 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন', 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'বসন্তরায়', 'বাউলের গান', 'সমস্যা', 'একচোখো সংস্কার' ও 'একটি পুরানো কথা'। সমালোচনা হিতবাদী গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। 'ডি প্রোফণ্ডিস্‌' ছাড়া আর কোন প্রবন্ধ পরে গদ্যগ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় ছিল। প্রবন্ধের নাম 'বাঙ্গালী কবি নয়'।[১] আরম্ভ

> বাঙ্গালা ভাষায় কয়টিই বা কবিতা আছে? এমন কবিতাই বা কয়েকটি আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কয়টি বাঙ্গালা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্বলপদ শিশুর মত গৃহের প্রাঙ্গণ পার হইলেই টলিয়া পড়ে না?

পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন

> এই সকল প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থে কল্পনা বঙ্গরমণীদের মত অন্তঃপুরবদ্ধ।...ধনপতি একবার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সিংহলে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, স্বর্গে গেলেও যদি বাঙ্গালী ইন্দ্র, বাঙ্গালী ব্রহ্মা দেখা যায়, তবে সিংহলে নূতন কিছু দেখিবার প্রত্যাশা কিরূপে করা যায়? কবিকঙ্কণচণ্ডী অতি সরস কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীরা এ কাব্য লইয়া গর্ব করিতে পারে, কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব করিতে পারে, অত আশায় কাজ কি, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব করিতে পারে।...কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙ্গা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে।...কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট?

"আধুনিক বাঙ্গালী কবিতা" লইয়া বিস্তারিত আলোচনা "বড় সহজ ব্যাপার নহে"। তাই সংক্ষেপে দুইচারটি কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

> সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে, এবং গাঢ়তা আরো অল্প।...সামান্য নাড়া পাইলেই যে জলবুদ্বুদ্গুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কি করিয়া বলি বাঙ্গালী কবি? হইতে পারে বাঙ্গালায় দুই একটি ভাল কবিতা আছে, দুই একটি মিষ্ট গান আছে। কিন্তু সেইগুলি লইয়াই কি বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য জাতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে পারে যে বাঙ্গালী কবি?

সমালোচনার প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্পপ্রীতির ঝোঁক প্রকাশিত। বৈষ্ণব-কবিতার দিকে টান,[২] বাউল গানের প্রতি আগ্রহ, দেশীয় সঙ্গীতের উপরে অনুরাগ—এ সবই রবীন্দ্রনাথের মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

---

[১] ভারতী ভাদ্র ১২৮৭।

[২] প্রথম বর্ষের সাধনায় প্রকাশিত ও আধুনিক-সাহিত্যে সংকলিত 'বিদ্যাপতির রাধিকা' এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রবন্ধ।

ধর্মসঙ্গীত শুনিতে রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল হইতে অভ্যস্ত। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার অন্তরে ততদূর প্রবেশ করিতে পারে নাই যতদূর বাউলের গান করিয়াছিল। কিন্তু সে আরও পরের কথা। একটি গানের বইয়ের[১] সমালোচনা উপলক্ষ্যে 'সমালোচনা'য় সংকলিত 'বাউলের গান' প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে মেকির ছড়াছড়ি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ খাঁটির দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তা সে খাঁটি যতই তুচ্ছ হোক না কেন। যেখানে কষ্টকল্পনা প্রকট নয়, যেখানে আড়ম্বরের আয়োজনে কল্পনার দৈন্য চাপা দিবার প্রয়াস নাই, যেখানে হৃদয় আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে কাব্যকলা-সৌষ্ঠবের অভাব থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য পিষ্টপেষিত রুচিবিকৃত সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত তরল কবিগানের অতিরিক্ত মূল্য তিনিই ধার্য করিয়া গিয়াছেন।

> তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ,—এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌর-জনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি প্রথম পথপ্রদর্শক।[২]

সাধনার যুগে রবীন্দ্রনাথ যেন বাঙ্গালা দেশের অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতেছিলেন। বাঙ্গালাদেশ তাহার জীব ও জড় প্রকৃতি লইয়া তাঁহার অন্তর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। সেই অন্তরের এমন একটু পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিব্যক্ত হইল যাহা তাঁহার আগে কেহ লক্ষ্যই করে নাই। 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'[৩] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাইলেন যে মেয়েলি ছড়ার মধ্যে

> একটি আদিম সৌকুমার্য আছে,—সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস।

শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে—শুধু বাঙ্গালাদেশে নয়, ভারতবর্ষে—সর্বপ্রথম মেয়েলি ছড়ার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৪] পল্লীগীতি-সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের উদ্যম আগেই দেখা দিয়াছিল।[৫]

---

[১] নাম 'সঙ্গীতসংগ্রহ। বাউলের গাথা'। খাঁটি বাউলের গান ইহাতে একটিও ছিল না।

[২] গুপ্তরত্নোদ্ধারের সমালোচনা (সাধনা জ্যৈষ্ঠ ১৩০২)। লোকসাহিত্যে 'কবি সঙ্গীত' নামে সংকলিত।

[৩] 'মেয়েলি ছড়া' নামে সাধনায় প্রকাশিত (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১)। লোকসাহিত্যে সংকলিত।

[৪] সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা মাঘ ১৩০১ ও কার্তিক ১৩০২।

[৫] ভারতী বৈশাখ ১২৯০।

অনেককাল পরে পল্লীগীতির মাধুর্য উদ্‌ঘাটন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'গ্রাম্য সাহিত্য'[১]। বাঙ্গালায় ফোক্‌ লিটারেচর বলিতে যে বস্তু বুঝায় তাহা মেয়েলি ছড়া, পল্লীগীতি এবং ছেলে-ভুলানো গল্প। এ সাহিত্যের মূল্যবিচারে রবীন্দ্রনাথই শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সাধনার পালা চুকিবার আগেই আধুনিক বাঙ্গালার পল্লী হইতে প্রাচীন ভারতের তপোবনে রবীন্দ্রনাথের অভিনিষ্ক্রমণ হইল। সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বাল্যাবধি। এখন সে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। প্রথম জীবনে লেখা অনেক প্রবন্ধে রামায়ণ-মহাভারতের এবং কালিদাসের কাব্যের প্রসঙ্গ থাকিলেও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত সাধনায় এবং পরিণতি প্রদীপ-ভারতী-বঙ্গদর্শনে। গদ্য-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রাচীন সাহিত্য'এ (১৯০৭) যে কয়টি প্রবন্ধ আছে তাহা এই তিন পত্রিকায় প্রথম বাহির হইয়াছিল (১৩০৬-১৩০৯)। এই প্রবন্ধগুলির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নূতন সৌন্দর্যের মণ্ডন দিলেন। 'তপোবন'[২] ইত্যাদি প্রবন্ধের দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে প্রাচীন দিনে ফিরিয়া গিয়া নয়, প্রাচীন দিনের চিন্তার ঋজুতা ও সাধনার শক্তি এখনকার দিনে অধিগত করিলেই আমাদের প্রগতি ও সার্থকতা।

'আধুনিক-সাহিত্য'এ সংকলিত প্রবন্ধের অধিকাংশই গ্রন্থ-সমালোচনা উপলক্ষ্যে লেখা।

'সাহিত্য'এ সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা আছে। চারটি প্রবন্ধ—'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি'—জাতীয় শিক্ষাপরিষদে (National Council of Education) গঠিত এবং স্বসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩১৩-১৪)। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যালোচনা-প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এগুলি বিশেষ মূল্যবান্‌।

সৌন্দর্যবোধ যে সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত রচনার মূল প্রেরণা এবং সৌন্দর্যের অনুভূতি যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিনিষ্ঠ নয় সেই তত্ত্ব সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে। আর্টের অনুশীলনে নিয়ম-সংযম বেশি করিয়া মানিতে হয়। প্রয়োজনের অতীত না হইলে কোন বস্তুর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অনুভূত হয় না এবং হইলে সে বোধ

---

১ ভারতী ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫। লোকসাহিত্যে সংকলিত।

২ প্রবাসী ১৩১৬। দ্বিতীয় সংস্করণ 'শিক্ষা'য় সংকলিত।

আনন্দে পর্যবসিত হয়। এ আনন্দ খুশি নয়, উল্লাস নয়, এ স্থিরচিত্তের প্রশান্তি,—জীবনের সঙ্গে জগতের সমরস।

সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব ; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিতে গেলে বিশেষ রকমের শিক্ষার ও সাধনার দ্বারা মনের গোচর বাড়াইতে হইবে।

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

মঙ্গল এবং সুন্দরের মধ্যে সম্পর্ক বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, দুইই আমাদের মুগ্ধ করে,—মঙ্গল সাধারণত প্রয়োজনীয়ের দ্বারা, সুন্দর অনির্বচনীয়ের দ্বারা। কিন্তু

যথার্থ যে-মঙ্গল প্রয়োজনসাধনেরও উর্ধ্বে তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে।

সেই আকর্ষণ সুন্দরের আকর্ষণ।

লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন, এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই সুন্দর ছন্দেই সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া একথা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর। কারণ, মঙ্গল-মাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে।

সৌন্দর্যবোধ যখন সত্যের উপলব্ধি আনে তখনি আনন্দের আস্বাদ।

যে-সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ। এইরূপে বুঝিলে, সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।

মানবের সমস্ত সাহিত্য সঙ্গীত ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এইদিকেই চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে চিত্রে শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। পূর্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্যে চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত, তাহার উপরে মনকে টানিতেছে।

'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সর্বভূমিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন।

ইংরেজীতে যাহাকে কম্প্যারেটিভ লিটারেচর বলা হয় তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য বলিয়াছেন। সংসারে মানুষের আত্মপ্রকাশ দুইদিকে, কর্মে এবং ভাবনায়। কর্মরচনায় মানুষের ধারাবাহিক পরিচয় আছে ইতিহাসে, আর ভাবনায় তাহার ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ আছে সাহিত্যে (এবং বিবিধ শিল্পে)। মানুষের হৃদয়ের ধর্ম তাহাকে সাহিত্যের (ও শিল্পের) নির্বাধ পথে নিরন্তর ঠেলা দিতেছে। আমাদের হৃদয়ের ধর্মই এই যে,

> সে আপনার আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে নিজে পুরা নহে। অন্তরের সত্যকে কোনপ্রকারে বাহিরের সত্য করিয়া তুলিলে সে বাঁচে।

এইখানেই সাহিত্যের বিশ্বভূমিত্ব। "সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে" এবং "সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমতো দেখাই হয় না"।

'সাহিত্যের পথে'র (১৯৩৬) প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে রুচিভেদের মূল্য বিচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য একদা বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের দলাদলি আশ্রয় করিয়া মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। সে বিষয়ে আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি।[১] পত্রাকারে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সাহিত্যের কাজ কি এবং সাহিত্যে অসুন্দর বাস্তবের স্থান কতটুকু সে বিষয়ে তাঁহার নির্দেশ আছে।

> একদিন নিশ্চিত করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না,—সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।
>
> তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলেছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেইটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না-বলি তাতে কিছু আসে যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

---

[১] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ৩-৯ দ্রষ্টব্য।

৮

জীবনী-প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ বেশি রচনা করেন নাই। যাহা করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রামমোহন রায়' এবং 'বিদ্যাসাগর চরিত'।[১] উনবিংশ শতাব্দের বাঙ্গালীর মধ্যে এই দুই ব্যক্তির মনস্বিতা, দৃঢ়চিত্ততা ও কর্মনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল। সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য পাইয়াছেন। বিদেশী কবি ও লেখকদের মধ্যে ইয়েট্‌স্ ও স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের উপর প্রবন্ধের (১৯১২) নাম করিতে হয়।[২] তবে এগুলি প্রসঙ্গকথার মতো॥

৯

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এক করিয়া দেখিতে প্রয়াসী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রবন্ধাবলী সব সময় সমাজ দেশ রাষ্ট্র ধর্ম ইত্যাদি খণ্ডবিষয় অনুসারে ভাগ করা চলে না। তবুও যেসব প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সামাজিক অথবা ঐতিহাসিক সমস্যার আলোচনা বিশেষভাবে করিয়াছেন সেগুলির বিষয়ে এখন মোটামুটি কিছু বলিব। প্রথম, মধ্য ও শেষ জীবনের তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে আমার আলোচনা নিবদ্ধ রাখিতেছি।

ইংরেজী শিক্ষা, আমাদের স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে এবং নূতন শক্তি ও প্রেরণা দিয়াছে। এই সঙ্গে যদি সমাজশৃঙ্খলাবোধ প্রবল না হয়, যদি ছোটোকে টানিয়া লইয়া বড় আপন উচ্চভূমিতে না তোলে, যদি আপনার লাভলোভে ও অহংকারে মত্ত হইয়া আরও অসংহতির দিকে ধাবিত হই তবে আমরা কিছুতেই স্বাধীন জাতির সংঘশক্তি লাভ করিতে পারিব না।—এই কথা রবীন্দ্রনাথ বার-বার বলিয়াছেন। (স্বাধীনতা লাভ করিবার এতকাল পরেও এই সত্য আমরা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।) একথা প্রথম এবং খুব স্পষ্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রগুচ্ছাকার প্রবন্ধে ১২৯২ সালে বলিয়াছিলেন। (তখন তাঁহার বয়স তেইশ-চব্বিশ।) 'চিঠিপত্র' নামে (এবং পরে পুস্তিকাকারে ১২৯৪) প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি কল্পিত ঠাকুরদাদা-নাতির মধ্যে চিঠির আকারে উপস্থাপিত হইয়াছিল। ঠাকুরদাদার বকলমে রবীন্দ্রনাথ সেকালের ভালোকে সরাসরি উপেক্ষা না করিতে এবং বর্তমানকালের ভালোমন্দকে যাচাই করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন আর বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না থাকিয়া, ভারতীয় মাত্র না

১ চারিত্রপূজায় সংকলিত। ২ 'পথের সঞ্চয়'এ (১৯৩৯) সংকলিত।

রহিয়া, সর্ববাধাবন্ধহীন মানুষ হইতে আহ্বান করিয়াছেন। নাতি সাজিয়া তিনি অতীতকালের প্রতি অন্ধ অনুরক্তি ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানকালকে স্বীকার করিয়া সমাজকে জীবন্ত এবং চলিষ্ণু রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম চিঠি দাদামহাশয় ("শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মণঃ") নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালীরা পুরাতন সামাজিক ভদ্র ব্যবহার মানিয়া চলিতেছে না এই অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন

> তোমার দৃষ্টান্তে তোমার ছোট ভাইরাও আমার কথা মানিবে না, দাদামহাশয়ের কাজ আমার দ্বারা একেবারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। এই কর্তব্যপাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য অবিশ্রাম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, সমাজে অনেকগুলি দস্তুর প্রচলিত আছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় নহিলে তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, সকল মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তুরে বদ্ধ থাকিতে হয় নতুবা তাহারা সমাজের কার্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না।

দাদামশায়ের অভিযোগ এড়াইয়া নাতি "শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মা" যে পাল্টা অভিযোগ আনিল তাহার মধ্যে নিগূঢ়ভাবে স্বকালের সমালোচনা আছে।

> স্ব-দেশ যেমন একটা আছে, স্ব-কালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভাল না বাসিলে স্ব-কালেরও কাজ করা যায় না, তেমনি স্ব-কালকে ভাল না বাসিলে স্ব-কালের কাজও করা যায় না।…ঠাকুরদাদা মশায়, তুমি যে তোমাদের দেশকে ভালবাস এবং ভাল বল, সে তোমার একটা গুণের মধ্যে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে তোমাদের কালের কর্তব্য তুমি করিয়াছ। তুমি তোমার বাপ-মাকে ভক্তি করিয়াছ, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সাহায্য করিয়াছ, শাস্ত্রমতে ধর্মকর্ম করিয়াছ, দানধ্যান করিয়াছ, হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ।—সে কালের কাজ তোমরা শেষ করিয়াছ অসম্পূর্ণ রাখ নাই, সেইজন্য আর এই বৃদ্ধবয়সে, অবসরের দিনে সে কালের স্মৃতি এমন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কালের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন?

সেকাল-একালের বিবাদপ্রসঙ্গে দাদামহাশয় উত্তরে লিখিলেন

> কালের কি কিছু স্থিরতা আছে নাকি? আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে, কালস্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্তী শৈলের মত কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিবে না?
>
> …তুমি পরিবর্তনকেই প্রভু বলিয়াছ, কালকেই কর্তা বলিয়া মানিয়াছ—অর্থাৎ ঘোড়াকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছ এবং আরোহীকেই তাহার অধীন বলিয়া প্রচার করিতেছ। কালের প্রতি ভক্তি এইটেই তুমি সার ধরিয়া লইয়াছ, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি, ধ্রুব আদর্শের প্রতি ভক্তি তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।…
>
> যদি সত্যই এমন দেখিয়া থাক যে এখনকার কালে পিতামাতাকে কেহ ভক্তি করে না,

অতিথিকে কেহ যত্ন করে না, প্রতিবেশীদিগকে কেহ সাহায্য করে না—তবে এখনকার কালের জন্য শোক কর, কালের দোহাই দিয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রচার করিও না।

অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্তমানকে সংযত হইতে হয়।

নাতি লিখিল

ভাবের প্রতি আমাদের দেশের নিষ্ঠা নাই, ব্যক্তির প্রতিই আসক্তি···কেবল দলাদলি, কেবল আমি আমি আমি এবং অমুক অমুক অমুক করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়া যে, দেশের কোন কাজ কোন মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে ইহা আমরা মনে করিতে পারি না।

···প্রকৃত বীরত্ব, উদার মনুষ্যত্ব, মহত্ত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গুরুতর কর্তব্যপালনের জন্য অনিবার্য আবেগ, ক্ষুদ্র বৈষয়িকতার অপেক্ষা সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—এ সকল আমাদের দেশে কেবল কথার কথা হইয়া রহিল—দ্বার নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া জাতির হৃদয়ের মধ্যে ইহারা প্রবেশ করিতে পারিল না—কেবল বাষ্পময় ভাষার প্রতিমাগুলি আমাদের সাহিত্যে কুজ্ঝটিকা রচনা করিতে লাগিল।

তবে হতাশার হেতু নাই।

আমরা আশা করিয়া আছি। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ সকল সংকীর্ণতা ক্রমে আমাদের মন হইতে দুর হইয়া যাইবে।

নাতির চিঠি পড়িয়া খুশি হইয়া ঠাকুরদাদা লিখিলেন

আসল কথা, ভীম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন, সে বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা ত স্মৃতি নহে, প্রাণ ধরিয়া রাখা স্মৃতি।···মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীম দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা ত নকল মানুষ! অনেকটা মানুষের মত।··· কেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা নিতান্ত অসহায়! আমাদের এত সব উন্নতির মূল কোথায়? এসব উন্নতি রাখিব কিসের উপরে! রক্ষা করিব কি উপায়ে!···অন্ধকারের উপরে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজীর উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজী ফেশানে করতালি দিতেছি।[১]

শেষে লিখিলেন

আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই। মহত্ত্বের একাল সেকাল কি!

বাঙ্গালা দেশ থেকে দূরে গিয়া নবীনকিশোর যেন দেশের মহিমা অনুভব করিয়া ঠাকুরদাদাকে লিখিল

---

[১] "বঙ্গদেশের" বদলে "ভারতবর্ষের" বসাইয়া লইলে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এখনকার দিনের (১৯৬১) পক্ষে আরও বেশি করিয়া খাটে।

বিপুল মানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি।

অতীতের তাৎপর্যও এখন প্রত্যক্ষ হইতেছে।

আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই ত চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি…ত বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি ত সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব-প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ত বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্ত-ভাগে ছিল, তখন ত সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্ট হয় নাই।…আপনাপন বাঁশ-বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মনসাসিজের বেড়া ডিঙ্গাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া ?…তখন বাঙ্গালা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক,…তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

শেষে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে,… কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড়লোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড়লোক হইব। আমার ত আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়লোক জন্মিবেন যাহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এমনভাবে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

শেষ চিঠি ঠাকুরদাদার। তিনি বলিয়া দিলেন

সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও কিন্তু পশ্চাতের সহিত বিবাদ করিও না। এক প্রেমের সূত্রে অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া রাখ।

১৩১৪ সালে প্রাদেশিক সম্মিলনীর (Provincial Conference) অধিবেশনে সভাপতি রূপে রবীন্দ্রনাথ পাবনায় যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে দেশের শুধু তৎকালীনই নয় অধুনাকালীন রাষ্ট্রীয় সমস্যার সর্বকালীন সমাধানের নির্দেশ আছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ যে গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহার উপযোগিতা আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরেও সমান আছে।

যখন রবীন্দ্রনাথ এই অভিভাষণ দিয়াছিলেন তখন দেশ বিশেষ সংকটাবস্থার সম্মুখীন। শাসনকর্তৃপক্ষ প্রজাদের এক অংশকে বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী বাঙ্গালাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন। তাহার উপর কংগ্রেসে—যাহার "পশ্চাতে রাজ্যসাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই, কেবল মাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য সভাকে বহন করিতেছেন"—সেই কংগ্রেসে দলাদলি প্রবল হইয়া বিচ্ছেদের

আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়াছে। এই উভয়সংকট এড়াইয়া দেশ যাহাতে সর্ব্বশক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া ঈপ্সিতের পথে অগ্রসর হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহারই নির্দেশ দিলেন। প্রথম সংকটের বিষয় বলিলেন

> বাহির হইতে এই হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব।

> যাই হোক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ যে সহিষ্ণুতা যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সংকট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর সহ্য করিতেই হয়।

> একথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মত, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গে এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে।
>
> এইত আমাদের নূতন দল; এ ত আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই সুখে দুঃখে ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে।

অভিভাষণের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ দেশের কর্মপন্থায় যে মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমত

> বর্তমানকালের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোটবাঁধা ব্যূহবদ্ধতা, Organization।

দ্বিতীয়ত

> আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না।…জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

অতএব ঘনিষ্ঠ জনসংযোগ আবশ্যক। তৃতীয়ত

> শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

চতুর্থত

> মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয়; কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে

রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনি একই কর্মের দুর্গমপথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে…

১৩৪৮ সালে আশী বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়াছিলেন ('সভ্যতার সংকট' নামে) সে তাঁহার সর্বশেষ মহৎ রচনা, এবং তাহা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ তাহা এখন দিনে দিনে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। ইংরেজকে যে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং তিনি ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে

একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।

কিন্তু ভবিষ্যতের এ ভাবনা দুঃখকর হইলেও তাঁহার বেদনার কারণ এ নয়। সে হইতেছে—ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তরসম্পদের উপর তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল

আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনের দেবদূত, মানবস্তোমের উদ্‌গাতা। সুতরাং

মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

যে তিনটি প্রবন্ধ লইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবস্থিতির ও দূরদৃষ্টির আলোচনা করিলাম তাহা তাঁহার বয়সের তিন কালে লেখা, এবং সে প্রবন্ধের পাঠক-শ্রোতাও তিনশ্রেণীর। 'চিঠিপত্র' যখন লেখেন তখন তাঁহার বয়স তেইশ-চব্বিশ, প্রবন্ধটি অল্পবয়সীর জন্য লেখা এবং 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ পড়া হইয়াছিল শিক্ষিত ও মনস্বী বাঙ্গালীর রাষ্ট্রসভায় শিক্ষিত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে। তখন তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। 'সভ্যতার সংকট' লেখা হইয়াছিল মৃত্যুর তিন মাস আগে। রচনাটির উদ্দিষ্ট শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতবাসীও নয়, পৃথিবীর জনমণ্ডলী॥

১০

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে অপর প্রবন্ধের কথা বলি।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার দুইটি অভিমত প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রথমত ইংরেজের হাতে ভারতীয়ের অকারণ অবমান ও লাঞ্ছনা। দ্বিতীয়তঃ গলাবাজি ও দরখাস্তবাজি সম্বল করিয়া আমাদের নিস্তেজ পোলিটিকাল এজিটেশন।

সাধনার যুগে তাঁহার রাষ্ট্রনীতিক অভিমত হৃদয়াবেগ বর্জন করিয়া সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিষয়ে সাধনায় প্রকাশিত তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'[১] অত্যন্ত মূল্যবান্। ইংরেজ-চরিত্রের যে ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীন স্বাতন্ত্র্য শাসক-শাসিতের মধ্যে ভেদ মানিয়া ও দূরত্ব রাখিয়া গৌরব বোধ করে তাহাই ইংরেজ-রাজত্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে,—'ইংরাজ ও ভারতবাসী'[১] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি এই যে অমোঘ সত্য-অনুভব করিয়াছিল তাহা মিথ্যা হয় নাই।

> এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

"যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না সে পৃথিবীতে সম্মান পায় না।" ইংরেজের সহিত সংঘর্ষে আমরা নিজের মান রাখিতে পারি না এবং সেজন্য আমরা ঘরে বাইরে কোথাও সম্মান পাই না।—একথা সত্য, এবং অনেকেই বলিয়াছেন। কিন্তু কেন-যে আমরা ইংরেজের সঙ্গে ব্যবহারে আত্মসম্মান রক্ষায় অক্ষম তাহার মূল কারণ রবীন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রসারী দৃষ্টিতেই ধরা পড়িয়াছে। লাঞ্ছিত বাঙ্গালীর মর্মবেদনা এমন করিয়া আর কেহ বলিতে পারে নাই।

> অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট কর্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালী কর্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কি অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধান বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়সাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি এক মুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরাজের মত স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন? আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়। ইহাই আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

---

১ প্রকাশ সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০, 'রাজাপ্রজা'য় (১৩১৫) সংকলিত।

মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার-প্রবর্তনের অনেককাল আগে হইতেই ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়া নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার চিন্তা করিতেছিলেন। এইরূপ একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সুবিচারের অধিকার'[১] রচনা করেন। তৃতীয় পক্ষ যেখানে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে সেখানে আমাদের একমাত্র পন্থা নিজেদের দলাদলি মিটাইয়া যথাসম্ভব সংহত হওয়া।

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময় (তখন স্বদেশী যুগের পূর্ব ভোগ চলিতেছে—) রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই। এই সময়ে লেখা নিটোল ও তেজস্বী প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতার দীপ্তি ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে যে সত্য কথা নিষ্কপট ও কঠিন ভাবে অভিব্যক্ত তাহার উপযোগিতা ও মূল্য এখনো অক্ষুণ্ণ।[২]

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কবি বলিয়া মানি। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিকাল ছিলেন। তিনি আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনের গঠনের দিকেই বরাবর জোর দিয়া আসিয়াছেন। অরণ্যে রোদন হইলেও তিনি পুনঃপুন বলিয়াছেন যে সংহত হইয়া আত্মস্থ হইয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি না করিলে বাহিরের শত উত্তেজনাতেও কিছু হইবে না। আর চাই নির্ভীকতা। ইহার অভাবেই আমাদের আন্দোলনে গলার জোর বাড়িলেও গায়ের জোর লাগে নাই॥

১১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংসারে ধর্মের হাওয়া বহিত। সে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার ঠাট ছিল না। ছিল নম্রতার, ভক্তির, আনন্দের প্রবাহ। তত্ত্বালোচনা যেটুকু তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার মূলসূত্র উপনিষদ্ ও তৎসহযোগী শাস্ত্রের মত অনুসারে। ধর্মচিন্তা রবীন্দ্রনাথের জীবনচিন্তার সঙ্গে জড়াইয়া ছিল। তাঁহার প্রথম জীবনের রচনায় তাই ধর্মচিন্তা বাদ পড়ে নাই। 'আলোচনা'র (১৮৮৫) 'ধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের ধর্মচিন্তামূলক রচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

---

[১] প্রকাশ সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১, 'রাজাপ্রজা'য় সংকলিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' (বৈশাখ ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

[২] 'আত্মশক্তি' (১৩১২), 'রাজাপ্রজা' (১৩১৫), 'সমূহ' (১৩১৫), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯১৮) ইত্যাদি গ্রন্থে সংকলিত।

সেই বয়সেও যে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কোনরকম গোঁড়ামি স্থান পায় নাই, প্রবন্ধটিতে শিব-কালীর রূপক হইতে তাহা বুঝিতে পারি।

> শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্‌বসন পরিয়া ভূতনাথ-পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত। কণ্ঠের মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ রহিয়াছে। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিনী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত কখনো কোনরকম বন্ধন স্বীকার করেন নাই, ধর্মের বন্ধনও নয়। ব্রাহ্মসমাজের আবেষ্টনে পরিবর্ধিত হইয়াও তিনি নিজেকে "ব্রাহ্ম" বলিয়া মনে করিতেন না। যতদিন ব্রাহ্মসমাজে অসহিষ্ণু "অ-হিন্দু" সংকীর্ণতা দেখা দেয় নাই ততদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু যখন সে সমাজে "ব্রাহ্ম" মনোভাব প্রকট হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের খাতা হইতে তাঁহার নাম সহজেই কাটা পড়িল। 'গোরা' উপন্যাসে এবং 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের এই সংকীর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে হিন্দুত্ব সম্প্রদায়গত নয়, ইহা জাতিগত সমাজগত ও সংস্কারগত।

> হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি ধর্ম। কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কালভেদী অন্তর্দৃষ্টি এবং সর্বভেদী চিন্তাশক্তির সহিত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার মর্মগত ঐক্যের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'য়।[১] বিভিন্ন জাতির ও ভাবপ্রবাহের প্রতিঘাতে ভারতবর্ষে বার বার অভিনব সৃষ্টিসমন্বয় ও প্রাণস্ফূর্তি দেখা দিয়াছে। এই সমন্বয়ের ও প্রাণস্ফূর্তির সহজ সাধনাই বিশ্বসমাজে ভারতবর্ষের উপায়ন।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম ব্যক্তিগত, তাই তাঁহার ধর্ম বিশেষভাবে তাঁহার নিজেরই। বাহিরের কোন মত বা সংস্কার যতই মহৎ হোক না কেন তাহা মানিয়া চলা তাঁহার ধাতে ছিল না। উপনিষদের উদার বাণীকে তিনি নিজের

---

১ প্রকাশ প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯।

হৃদয়ে ধ্যানে ও ধারণায় ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহাকে কোনমতেই "ধর্ম" ছাপ দিতে পারি না। একটি চিঠিতে[১] রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম সম্বন্ধে একটু আভাষ দিয়াছিলেন।

> শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বল্‌তে পারিনে—কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বল্‌লেই হয়; আমার সমস্ত জীবন দিয়ে সে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুল্‌তে পারব, সেই আমার চরম সত্য।

কোন নাম যদি দিতেই হয় তবে রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে বলিব জীবনধর্ম। নিখিলপ্রাণসমষ্টির (প্রচলিত কথায় পরমাত্মার) অংশ ব্যষ্টিপ্রাণ (অর্থাৎ মানবাত্মা) রূপে মহাকালপ্রবাহের (অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরের) বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণতার অভিমুখে চলিয়াছে,—এই বোধ এবং সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির অবিচ্ছিন্ন ঐক্য উপলব্ধি, ইহাই মানবাত্মার সাধ্য, এবং এই অভিসারসাধনার আনন্দেই তাহার সিদ্ধি। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্ব নিখিলের মধ্যে প্রকৃতি ও মানবসমাজ দুইয়েরই সঙ্গে নিজের অখণ্ড যোগটি উপলব্ধি করিয়াছিল। শুধু সূর্যের দীপ্তিতে চন্দ্রের কান্তিতে প্রকৃতির শ্যামসমারোহে নদীপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে নয়, বৃহৎপ্রকৃতি যেখানে রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছে সেখানেও, এমন কি বিশ্বভুবনের চরম নেতি মৃত্যুতেও এই ধারণী তাঁহাকে ধারণ করিয়াছে। সুদূর অতীতে বৈদিক ঋষিকবি ঝড়ের তাণ্ডবে পর্জন্যদেবতার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া উদাত্ত সঙ্গীতে বন্দনা করিতেন। প্রকৃতির অনুরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথও অপরূপের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন

> বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—কষাহত কালোঘোড়ার মসৃণ-চর্মের মত নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—পরপারে স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল-আকাশের মাঝখানে নিজের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশেহারা হইয়া আসিয়া পড়িল, সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙ্গা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ-যে অপরূপের দর্শন। এইত রস।[২]

বিরাটের উপলব্ধি বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যেমন সহজলভ্য মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বড় জটিল, তাহাতে শক্তি আছে দুর্বলতাও

---

[১] বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৯৭১-৭৯।

[২] 'সুন্দর' (ভারতী ১৩১৮)।

আছে, প্রেম-প্রীতি আছে বিরোধ-আঘাতও আছে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজযোগটি অবিচ্ছিন্ন রাখাই বোধ করি সবচেয়ে কঠিন সাধনা, যদিও আমাদের প্রাচীন সাধক-কবিরা ইহাকেই "সহজ" সাধনা নাম দিয়াছিলেন। এই সুকঠিন "সহজ"-সাধনাতে রবীন্দ্রনাথের সহজাত সিদ্ধি। ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার অতিলৌকিক দৃষ্টি তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সৃষ্টির দেশকালাতিশায়ী সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্য সাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।[১]

রবীন্দ্রনাথের সাধনা মানবত্বের সাধনা। তাই এখানে দুঃখভীত আপনবাঁচা বৈরাগ্যের ঠাঁই নাই।

> জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিতে পারি।[২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সাধনাই চরম নয়।

> আমার স্বধর্ম কী তা নিয়ে বিতর্ক আর ঘুচল না। এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রস-বোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়।[৩]

রবীন্দ্রনাথ মানুষসত্তাটি তাঁহার কবিসত্তার অপেক্ষা বৃহত্তর, তাঁহার জীবন তাঁহার সকল শিল্পসৃষ্টির উর্ধ্বে। তাই বৃহত্তম জীবনশিল্পের জন্য পদে পদে তাঁহাকে নিজের শিল্পসৃষ্টির জাল, সংকীর্ণ অনুভাবের মোহ, কাটাইয়া সর্বদা আগে চলিতে হইয়াছে। শিল্পীর পক্ষে এ কঠিন সাধনা। অতিশয়োক্তির অপবাদ মানিয়া লইয়া বলিব, এ-সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের সমানধর্মা কেহ নাই।

> আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েছে। সে-সাধনা হচ্ছে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা। আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।

---

১ 'দুঃখ' (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৪), 'ধর্ম' বইটিতে (১৩১৫) সংকলিত।

২ 'ততঃ কিম্' (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩১৩), 'ধর্ম' বইটিতে সংকলিত।

৩ "আপনমনে গোপন-কোণে লেখাজোখার কারখানাতে" ইত্যাদি গানটি তুলনীয়।

৩২

'চতুরঙ্গ' এই সাধনারই এক রূপককাহিনী। এই সাধনার সহযোগী জীবনদেবতা-তত্ত্ব। এই তত্ত্বের প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে পঞ্চভূতের-ডায়ারির প্রথম প্রবন্ধে।

স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন।[১]

১২

শান্তিনিকেতনে মন্দিরে উপাসনাকালে রবীন্দ্রনাথ একদা যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন (জানুয়ারি ১৯০৯ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত) সেগুলি খর্ব পুস্তিকাকারে ষোল খণ্ডে বাহির হইয়াছিল।[২] রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা-রচনাবলীর মধ্যে এই 'শান্তি-নিকেতন' উপদেশমালা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ইহার ভাষা। য়ুরোপপ্রবাসীর-পত্র এবং য়ুরোপযাত্রীর-ডায়ারির পরে এই স্বগতচিন্তাময় ছোট ছোট প্রবন্ধগুলিতেই রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটু উদাহরণ দিই।[৩]

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড় বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন ত আছেন—তাঁর আবির্ভাব ত সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়া তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে একমুহূর্তে আমার হঠাৎ কি হল জানিনে—আমার মনেতে এই কথাটা জেগে উঠ্‌ল যে মা আছেন। তখনি তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বল্লেন "তুমি এসেচ?"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম—মায়ের বাড়িতেই বাস করচি তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই, কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চল্‌চে।

১৩

নিজের জীবনকথা লইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক'এ (১৩১১) বাহির হইয়াছিল।[৪] এই প্রবন্ধে

---

[১] সাধনা ১৮৯৯। 'বঙ্গভাষার-লেখক' গ্রন্থে আত্মপরিচয় দ্রষ্টব্য।

[২] প্রথম থেকে অষ্টম (১৯০৯), নবম থেকে একাদশ (১৯১০), দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ (১৯১১), চতুর্দশ (১৯১৫) এবং ষোড়শ (১৯১৬)। সংযোজনসহ দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৯৩৫)।

[৩] অগ্রহায়ণ ১৩১৫।

[৪] বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃ ৯৬৫-৯৭৪।

জীবনকাহিনী বলিতে বেশি কিছু নাই। নিজের জীবনের গতি ও তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা কবি-লেখক হিসাবেই সাধারণের কাছে তাঁহার জীবনকথার বিশেষ মূল্য। যে ব্যক্তিসত্তা নিজেকে সাহিত্যশিল্পে অভিব্যক্ত করিয়া আসিতেছে তাহাকেই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি দিয়া বাহির হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গোড়াতেই লিখিয়াছিলেন

> কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ক্ষমা চাওয়া নিষ্ফল হইল। প্রবন্ধটি পড়িয়া কোন কোন কবি-লেখক যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য ছিলেন অথচ তাঁহার প্রতিভাগৌরবে মনে মনে খুব প্রসন্ন ছিলেন না, তাঁহাদের হইয়া এখন মৌন ভঙ্গ করিয়া একজনের—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—প্রতিবাদ লেখনীতে মুখর হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।[১] তাহাতে বিদ্বেষ মিটিল না।[২]

শুধু আত্মজীবনী বলিয়াই নয় সাহিত্যশিল্পরূপেও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)[৩] অনুপম রচনা। বিষয় ভাব ও ভাষার এমন সুসমন্বয় দ্বিতীয় কোনো বাঙ্গালা বইয়ে দেখা যায় নাই। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কথাই বলিয়াছেন। বইটি পড়িবার সময়ে আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেকালের গন্ধ গান দৃশ্য স্পর্শের স্বাদ পাইতে পাইতে চলিতে থাকি, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি, এবং কয়েকটি মহৎ হৃদয়ের চকিত পরিচয় পাই। যদি কোন একটি রচনাকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের প্রতিভূ বলিতে হয় তবে সে জীবনস্মৃতি।

জীবনস্মৃতিতে অকথিত বাল্যজীবনের ছোটখাট স্মৃতি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সীদের জন্য 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) লিখিয়াছিলেন। বইটিকে জীবনস্মৃতির পরিপূরক বলা চলে। অব্যবহিত পরে লেখা 'গল্পস্বল্প' (১৯৪১) বইটিতে বাল্যস্মৃতির আরও কিছু টুকরা ছেলে-ভুলানো গল্পের মালায় গাঁথা পড়িয়াছে।

---

[১] বঙ্গদর্শন মাঘ ১৩১৪ দ্রষ্টব্য।

[২] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ) পৃ ৩৬৫ দ্রষ্টব্য।

[৩] প্রকাশ প্রবাসী ১৩১৮-১৯।

চিঠিপত্রের[১] মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার ছোটছোট নোট রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও শিল্প বুঝিবার পক্ষে সেগুলি কম সাহায্য করে না॥

১৪

বাঙ্গালায় চিঠির মধ্য দিয়া সাহিত্যরসের স্বাদ যে পুরাপুরিই পাওয়া সম্ভব তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসংখ্য চিঠিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই শক্তি তাঁহার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথেরও ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যেমন পত্ররচনায়ও তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনো মনোযোগ ছিল না। বড়ো ও ছোটো ভাই পত্র-রচনাশক্তি পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'পত্রাবলী'তে তাঁহার পত্ররচনার বিশেষত্বের প্রমাণ আছে।[২]

চিঠির ছাঁদে প্রবন্ধরচনার রীতি রবীন্দ্রনাথেরই উদ্‌ভাবনা। তাঁহার প্রথম গদ্যের বইয়ে তাহার প্রথম নিদর্শন আছে। দ্বিতীয় নিদর্শন 'চিঠিপত্র' (১২৯২)। তাহার পর 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯), 'যাত্রী' (১৯২৯) ও 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১) এবং কতকগুলি প্রবন্ধের নাম করিতে পারি।[৩]

য়ুরোপপ্রবাসীর-পত্র প্রথমে ছাপার জন্য লেখা হয় নাই, ব্যক্তিগত চিঠি রূপেই লেখা। শেষের চিঠিগুলি ছাপার জন্যই লেখা। জমিদারির ভার লইয়া পদ্মা-পালিত ভূভাগে যাইবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজনকে যে চিঠি লিখিতেন তাহা অবশ্যই ছাপার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু তাহাতে স্বগত-চিন্তাময় অথবা চিত্রময় প্রবন্ধের পূর্ণ মূল্য বিদ্যমান। পরবর্তী জীবনে লেখা অজস্র চিঠির অধিকাংশ সম্বন্ধে একথা কিছু কম খাটে না। পত্রাকার প্রবন্ধ ও প্রবন্ধাকার পত্রের মাঝামাঝি হইতেছে ডায়ারি।

তাঁহার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেরও যে সাহিত্যমূল্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন এবং তাঁহার কোন কোন স্বজন আর প্রিয়নাথ সেন ও মোহিতচন্দ্র সেনের মতো সমজদার বন্ধুরাও মানিতেন। ইঁহাদের প্রযত্নে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের চিঠিপত্র সবই বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের চিঠি হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তাঁহার বক্তব্য সমর্থন

[১] অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

[২] বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (পঞ্চম সংস্করণ) পৃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

[৩] যেমন 'বাতায়নিকের পত্র' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৬) 'কালান্তর'এ সংকলিত।

করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার চিঠি হইতে অংশ তুলিয়াছিলেন প্রথমে 'বঙ্গভাষার লেখক'এ প্রকাশিত প্রবন্ধে। সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তিনি পত্রাংশকে স্থান দিলেন সর্বপ্রথম 'বিচিত্র প্রবন্ধ'এ (১৯০৭)।[১] তাহার পর জীবনস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রথম পত্র-ও-পত্রাংশ সংকলন 'ছিন্নপত্র' বাহির হইল (১৯১২)।[২] রবীন্দ্রনাথের মধ্যযৌবনের অনেক কবিতার ও অনেক গল্পের ধাত্রী, গ্রামের ও জন্মভূমির নির্দেশ এবং শেষজীবনে আঁকা কোনো কোনো চিত্রভাবনার ইঙ্গিত এই ছিন্নপত্রাবলীর মধ্যে ছড়ানো আছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে আরও দুইটি পত্রগুচ্ছ সংকলিত হইয়াছিল, —'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০) এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৯৩৮)।[৩] তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 'চিঠিপত্র' নামে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা হইতে তাঁহার গদ্যভাষার কিছু ব্যবধান আছে। সে ব্যবধান যে-কোন ভালো লেখকের রচনায় প্রত্যাশিত। তবে গদ্য-কবিতায় সে ব্যবধান ব্যাকরণের বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কেবল বাগ্‌বিধিতে—অর্থাৎ syntax এ—কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। গদ্যকবিতার ভাষা[৪] ছাড়িয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা তাঁহার পদ্য ও গদ্য ভাষার মধ্যবর্তী বলিয়া মানিতে হয়। তাঁহার চিঠিপত্রের ভাষায় গদ্যের স্পষ্টতা ও ঋজুতা আছে, পদ্যের উপকরণ-প্রাচুর্য নাই, অথচ পদ্যের লঘুতা ও ক্ষিপ্রতা যথাসম্ভব বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের ভাষায় নির্বাধ অকুণ্ঠতা সাধারণ পাঠকের ভালো লাগে॥

১৫

মানবিক প্রায় সব ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের যথোচিত জিজ্ঞাসা ছিল। আগের আলোচনায় তাঁহার জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয়গুলির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। এখন বিজ্ঞান-চিন্তায় তাঁহার মনোযোগের পরিচয় দিতেছি।

বস্তুবিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল বাল্যাবধি। তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে পদার্থবিদ্যা রসায়ন অস্থিবিদ্যা প্রভৃতির কিছু পাঠ লইয়াছিলেন। কিন্তু

---

[১] 'জলপথে', 'ঘাটে' ও 'স্থলে' শীর্ষকে। এই পত্রাংশগুলির অধিকাংশই পূর্ণতররূপে ছিন্নপত্রে আছে।

[২] সম্প্রতি ছিন্নপত্রের পূর্ণতর সংস্করণরূপে 'ছিন্নপত্রাবলী' বাহির হইয়াছে।

[৩] পরে তিনখানি পত্র-সংকলন 'পত্রধারা' নামে তিনখণ্ডে গ্রথিত হইয়াছে।

[৪] এখানে "ভাষা" diction অর্থে লইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানে কৌতূহল তাহা হইতে জন্মায় নাই। পিতার সহিত হিমালয় ভ্রমণের সময়ে তিনি পিতৃমুখে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি শুনিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান গ্রহনক্ষত্রগুলি চিনিয়াছিলেন। এইভাবেই তাঁহার বিজ্ঞান-কৌতূহলের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। এবং এই কৌতূহলেরই বিলম্বিত ফল 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭)। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তের মোটামুটি পরিচয় এই বইটিতে সরল ও মনোহর ভাবে দেওয়া আছে।

মাতৃভাষায় রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল শৈশবাবধি। তিনি কি করিয়া বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন ও আধুনিক রূপ আয়ত্ত ও অধিগত করিয়াছিলেন সে কথা আগে কিছু বলিয়াছি। বাঙ্গালাভাষার আলোচনা করিতে করিতে তিনি ভাষাবিজ্ঞানের সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালাভাষার উচ্চারণরীতির এবং ব্যাকরণের কোনো কোনো জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান করিয়াছিলেন। সে প্রবন্ধগুলি বালক সাধনা ভারতী প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি 'শব্দতত্ত্ব' (১৯০৯) বইটিতে সংকলিত আছে। এই প্রবন্ধগুলির কথা মনে রাখিলে রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালী ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম বলিতে হয়।

'বাংলাভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) সাধারণ পাঠকের জন্য উজ্জ্বল সরস রচনা॥

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গান

"মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই"
"গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে"

১

পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে গানে ও কবিতায় তফাৎ ছিল না। ষোড়শ শতাব্দ হইতে গানে ও কবিতায় একটু একটু করিয়া ছাড়াছাড়ি শুরু হইল। চৈতন্য-জীবনী কাব্যগুলি গেয় মঙ্গল-পাঁচালী কাব্যের ছাঁচে ঢালা হইলেও সেগুলির কোনো কোনোটিতে গানের সুরের সঙ্গে আবশ্যিক যোগ রহিল না। এই হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে পঠনীয় (অর্থাৎ অ-গেয়) কবিতার আরম্ভ। গানের এই ক্ষতি পূরণ হইল পদাবলীতে। পদাবলীকীর্তন-পদ্ধতিতে গীত ও গীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হইয়া সাহিত্যে ও সঙ্গীতে নূতনতর ঐশ্বর্য বিস্তার করিল। কালক্রমে, বিষয়বস্তুর একঘেয়েমির ফলে, এবং গীতিকবিতার ফর্মের বৈচিত্র্যহীনতার জন্য যত না হোক আঁখরের জালজঞ্জালে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, কীর্তনরীতির গীতি-দীপ্তি কমিয়া আসিল। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগ নাগাদ প্রধানত পশ্চিমী মোগলাই রীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বাঙ্গালা গান স্বতন্ত্র—"বৈঠকি" —পথ ধরিল। তখন গীতি হইতে গীত বিচ্ছিন্ন হইল। বৈষ্ণব-পদাবলীতে আর সজীব স্পর্শ রহিল না, গানেও সাহিত্যের জীবস্পন্দন দেখা গেল না। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে গীতি ও গীত দুইই বাদ দিয়া বিদেশী সাহিত্যের ছাঁচ লইয়া সাহিত্যের নূতন কারখানা বসিল। পুরানো প্রবাহপথ দুইটি গীতি ও গীত এড়াইয়া সাহিত্যের ধারা পরিচালিত হইল নূতন-কাটা খালে। প্রাণের ধারাস্রোত কাটা খালে কতক্ষণ বহিবে। সে স্রোত বাঁক ঘুরিয়া নিজের পথ নিজেই কাটিয়া চলিল, এবং আবার গীতি ও গীত প্রবাহদ্বয় মিলিত হইয়া সাগরের দিকে ধাইল। রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই যুক্তবেণী প্রবাহ, তাঁহার গানে সেই প্রবাহের সাগরসঙ্গম। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায়, ফর্মের ঐশ্বর্যে ও বস্তু-ভাবের মহিমায়, বাঙ্গালা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিল। তাঁহার গানের বেদনায় সুরের প্লাবনে যেন দিগ্‌দিগন্ত হারাইয়া গেল॥

২

ভাবে এবং রূপে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সহসা নজরে পড়িবার নয়। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনায় গানের বিশেষ সাহিত্যিক মূল্যটুকুর বিচার সাধারণত কেহ করেন না। এখানে সে কাজ করিতেছি।

কবিতা ও গান উভয়ত্রই কবিসত্ত্ব স্বয়ংপ্রকাশিত। তবে আধারভেদের দরুন সে প্রকাশে কিছু কিছু বিশিষ্টতা দেখা যায়। সহজ করিয়া বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সাধারণত রূপের রসাভিব্যক্তি, গানে প্রধানত রসের রূপ-পরিণতি। তাঁহার কবিতায় "আমি"র ভাবনা, গানে "তুমি"র ধারণা। ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন, গানও লিখিয়াছেন। সেই কবিতা ও গান মিলাইয়া দেখিলে দুইটি আধারের বিভিন্নতা সহজে বোঝা যায়। "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে"—গীতালির এই গানটি ও "তুমি কি কেবলি ছবি" —বলাকার এই কবিতাটি প্রায় একই সময়ের রচনা, এক মাস ব্যবধানে লেখা। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের আঁকা একটি ছবি হইতে গানটির উদ্দীপনা আসিয়াছিল, আর চিরবিরহিত প্রিয়জনের প্রতিকৃতি দেখিয়া কবিতাটির প্রেরণা জাগিয়াছিল। গানটিতে তুমি-আমির মাঝখানে কেহ নাই, বিরহ ছাড়া কোনো বাধা নাই এবং সে বিরহও অনির্বাধ নয়। কবিতাটিতে তুমি-আমির মাঝখানে রহিয়াছে নিখিলে স্মৃতিবিস্মৃতির লুকোচুরি খেলা। আরো উদাহরণ দিই। জলক্রীড়ারত তরুণী জলের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়িতেছে এমনি একটি ছবির প্রেরণায় "একলা বসে একে একে অন্য মনে" গানটি লেখা,[১] আর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছবি অবলম্বনে বিচিত্রিতার 'পুষ্পচয়িনী' কবিতাটি রচিত। গানটির উদ্দিষ্ট কবিজীবনদেবতা, কবিতাটির বিষয় রোমান্টিক রসকল্পনা।

অতএব বলিতে পারি কবিসত্ত্বের আবেদন কবিতায়, নিবেদন গানে। কবির কথায়, তাঁহার কবিতা বাহিরের নাটশালার, গান অন্তরের অন্তঃপুরের। তাই কবিতায় অমন দীপ্ত বর্ণসম্পাত, গানে অমন মায়াময় স্বপ্নসুষমা। আর এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গানগুলিতে সুরের অপরিসীম মাধুর্য সত্ত্বেও সাধারণ শ্রোতার মনে বসিবার ও মর্মে লাগিবার মতো ভার ও আটা নাই। এই কথা মনে করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন

---

[১] রবীন্দ্র-সঙ্গীত পৃ ২২৩ দ্রষ্টব্য। গানটি প্রবাহিণীতে সংকলিত আছে।

বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তারপরে? কেউ চুপ ক'রে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে। তাতে কী এসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়—
চাস্‌নে ফিরে দে তারে বিদায়।
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলায় আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়।[১]

ঋগ্‌বেদের এক ব্রহ্মোদ্য (mystical) সূক্তের একটি শ্লোকে আছে যে পর্বত-বাসিনী বাণী সলিল তক্ষণ করিতে করিতে একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টপদী নবপদী এবং পরম ব্যোমে সহস্রাক্ষরা হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।[২] বৈদিক কবির এই ভাবনা সফল হইয়াছে, মনে করি। বৈদিক কবির ছাঁদে বলিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গানে সহস্রাক্ষরা বাণী সুরের রথে ভর করিয়া পরম ব্যোমে উধাও হইয়াছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া কবি একটি গানে এই অনির্বচনীয় অগাধ অনুভবের আভাস দিয়াছেন।

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনায় জীবন-মরণ, ইহলোক-পরলোক, কিছুরই মূল্য উপেক্ষিত নয়। তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে জীবনের ও ভুবনের কোন সুরই অশ্রুত নাই ॥

৩

অষ্টাদশ শতাব্দে গীতিকবিতা (অর্থাৎ পদাবলী) হইতে গান পৃথক্ রূপ ধরিল। গানের ফর্মে বিশিষ্টতা দেখা দিল দুইদিকে, আকারের সংক্ষেপে আর মিলের একতানে। পদাবলীতে ছত্র-সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং দশ-বারোর কম ছত্র পদাবলীতে মিলে না। গানে ছত্রসংখ্যা কমের দিকে চার হইতেও বাধা নাই, ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ-বারো। গানের স্তবকের শেষ ছত্রগুলিতে একই মিল থাকে, পদাবলীতে প্রায়ই তা নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গানে এই দুই

---

[১] 'শেষবর্ষণ' (১৯২৫)।

[২] "গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতী একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥" ১. ১৬৪. ৪১.

বিশেষত্ব প্রায়ই আছে। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁহার কবিতার তুলনায় আকারে ছোট, এবং মিল সাধারণত একটিই।

রবীন্দ্রনাথ যখন কোন কবিতাকে গানে পরিবর্তিত করিয়াছেন তখন আকার ছোটই হইয়াছে। যেমন, মানসীর 'তবু' কবিতাটিতে সনেটের উপযোগী চোদ্দ ছত্র, গানে—ধুয়া বাদ দিয়া—তাহা কমিয়া হইয়াছে নয়। কবিতায় সাতটি মিল, গানে চারটি। কবিতার ধুয়া প্রত্যেক স্তবকের আদিতে আছে, গানে তাহা স্বভাবতই শেষে আসিয়াছে। কবিতা ও গানের রূপ পাশাপাশি দেখানো গেল।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি'	তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে	যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে।
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,	
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।	
	যদি থাকি কাছাকাছি,
তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি	দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,	তবু মনে রেখো।
দেখে' না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,	
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।	যদি জল আসে আঁখিপাতে,
	একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে	একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদপ্রাতে,
উদাস বিষাদ ভরে কাটে সন্ধ্যা বেলা	তবু মনে রেখো।
অথবা শারদপ্রাতে বাধা পড়ে কাজে,	
অথবা বসন্ত রাতে থেমে যায় মেলা।	
	যদি পড়িয়া মনে
তবু মনে রেখো যদি মনে প'ড়ে আর	ছলছল জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে,
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।	তবু মনে রেখো।

কবিতা ও গান দুইরূপের মধ্যে সংযোগ বিয়োগ নাই, অথচ আকারে অসমান, এবং কবিতার তুলনায় গানে ছত্রসংখ্যা অনেক বেশি—এমন একটি উদাহরণ দিতেছি।

গানটি কবিতা-স্বরূপে বারো ছত্র

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী
পূর্ণশশী ঐ-যে দিল আনি।
বকুল ডালের আগায়
জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।

কোন গোপন কানাকানি
পূর্ণশশী ঐ-যে দিল আনি।
আবেশ লাগে বনে
শ্বেতকরবীর হঠাৎ জাগরণে।
ডাকছে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন নাম-না-জানা পাখি।
কার মধুর স্বপন খানি
পূর্ণশশী ঐ-যে দিল আনি॥

গীত-রূপে বাইশ ছত্র

হেমন্তে
কোন বসন্তেরি বাণী
পূর্ণশশী ঐ-যে
দিল আনি॥
বকুল ডালের আগায়
জ্যোৎস্না যেন
ফুলের স্বপন লাগায়।
কোন গোপন কানাকানি
পূর্ণশশী
ঐ ঐ ঐ যে
দিল আনি॥
আবেশ লাগে বনে
শ্বেতকরবীর
হঠাৎ জাগরণে।
ডাকছে থাকি থাকি
নাম-না-জানা পাখি
ঘুমহারা।
কার মধুর স্বপন খানি
পূর্ণশশী
ঐ ঐ ঐ যে
দিল আনি॥

গানে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় দুইয়ের বেশি অক্ষরের (এমন কি একাধিক পদের) মিল করিয়াছেন। যেমন,

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল।...

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায়, বুঝি তার নাগাল মেলে না।...

আমি আর সইতে পারি নে
সুরে বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারি নে।...

তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি
কেন যে মোরে কাঁদাও আমি সে জানি।...

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি কে রে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি কে রে তুই।...

এরকম বহু অক্ষরের ও বহু পদের একটানা মিল রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাই বলিলেই হয়। একটি মনে পড়িতেছে, বীথিকার 'উদাসীন' কবিতায়।

তোমায় ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।

৪

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন গানেও তেমনি ভাষণশিল্পে বৈচিত্র্য প্রচুর। তবে গভীরভাবের গানগুলিতে ভাষা যেন মুখের আর রীতি সেইমত সরল এবং সহজ। এমন অনেক গান আছে যাহাতে অশিক্ষিতের অপরিচিত শব্দ তো নাইই অনক্ষরের অজ্ঞাত শব্দও না থাকার মধ্যে। কিছু উদাহরণ দিই। "সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি"—ফাল্গুনীর এই গানটিতে শব্দসংখ্যা উনসত্তর, পুনরুক্তি বাদ দিলে তেষট্টি, কিন্তু তৎসম শব্দ পাঁচটির বেশি নয় (—ঋণী, প্রভাত, সন্ধ্যা, প্রণাম, আনন্দ)। "তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি"—গীতালির এই গানে পুনরুক্তি বাদ দিলে শব্দসংখ্যা বাহান্ন, এবং তাহার মধ্যে তৎসম শব্দ তিনটি মাত্র (—কূল, রাত্রি, ভ্রূকুটি)। "ওরে তোরা নেই বা কথা বললি"—গানটিতে পুনরুক্তি ধরিয়া শব্দসংখ্যা উন-

সত্তর, তাহার মধ্যে তৎসম শব্দ মোট চারটি এবং এই চারটি তৎসম শব্দের মধ্যে তিনটি অনক্ষরেরও অজ্ঞাত নয় (—অন্তর, বাদ্য, বন্ধ), সুতরাং অশিক্ষিতের অপরিচিত শব্দ একটিমাত্র (—পল্লী)। "পাগল যে তুই কণ্ঠ ভ'রে"—এই গানে মোট শব্দ সাতান্ন, তৎসম শব্দ চার (—কণ্ঠ, সাহস, সৃষ্টি, আকাশ), তাহার মধ্যে দুইটি (—সাহস, আকাশ) এতই চলিত যে সে দুইটিকে তদ্‌ভব বলাই সঙ্গত।

গানে একদিকে এই নিতান্ত হালকা চাল, অপরদিকে অপরিচিত সংস্কৃত (তৎসম) শব্দবহুল এমন গম্ভীর চালও আছে যাহা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় চালাইতে উৎসাহ দেখান নাই। যে সব ভারি শব্দের কবিতার ভূমিতলে চঙ্‌ক্রমণ ষ্টীম রোলারের মতো নিদারুণ সশব্দ মন্থর হইত তাহা গানে সুরের চক্রান্তে গগনে উধাও হইয়াছে। যেমন

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর—হে গম্ভীর ;
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর,
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লীর মঞ্জীর—হে গম্ভীর।...

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।

মধুগন্ধে-ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া নীপকুঞ্জতলে
শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে।
ফিরে রক্ত-অলক্তকধৌত পায়ে ধারাসিক্ত বায়ে
মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথিপ্রান্তে জ্বলে।

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে
মর্মরমুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষভরা ধরণীর
বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।

অল্প কয়েকটি গানে মিল বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেমন

ওরে জাগায়োনা, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে
ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি।
দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে,
যাক ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা।
হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে দীর্ঘ বিভাবরী—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছে জাগিয়া॥[১]

গদ্যকবিতার ছাঁদও গানে উপেক্ষিত হয় নাই।

---

১ 'শ্যামা' (১৯৩৯)।

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ন সন্ধ্যায়
সাথীহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্যছায়াতলে।

গানটির প্রথম ছত্র বোধ করি গদ্যকবিতার পক্ষেও অচল হইত॥

৫

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন-গানকে নূতন ও অভূতপূর্ব প্রাণ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে কীর্তন-সুরের সৃষ্টিবিপুলতা ভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির ইতিহাসে নূতন পাতা খুলিয়াছে। কীর্তন-গানের নির্মাণেও রবীন্দ্রনাথ অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন, পদের সঙ্গে আঁখরের মিলন ঘটাইয়া। যেমন

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে।
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে
প্লাবন-ঢালা শ্রাবণ-ধারাপাতে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে।
আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এল,
সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদোসর সাথে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে।

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন রিমঝিম শবদে বরিষে"—জ্ঞানদাসের এই পদটি কীর্তনীয়াদের মুখে মুখে আখর-ভারাক্রান্ত না হইয়া যদি কোনো কবির কল্পনায় পুষ্পিত হইত তবে সে অভিনব-পদাবলীর রূপ এমনই দাঁড়াইত।

কীর্তনের "তুক" রীতি অবলম্বন করিয়াও রবীন্দ্রনাথ গানে অভিনবত্ব প্রকট করিয়াছেন। যেমন

ও দেখা দিয়ে সে চলে গেল,
ও চুপিচুপি কী বলে গেল,
ও যেতে যেতে গো কাননেতে গো
কত যে ফুল দ'লে গেল।
মনে মনে কী ভাবে কে জানে,
মেতে আছে ও যেন কী গানে;
নয়ন হানে আকাশ-পানে
চাঁদের হিয়া গলে গেল।

ও পায়ে পায়ে যে বাজিয়ে চলে
বীণার ধ্বনি তৃণের দলে,
কে জানে কারে ভালো কি বাসে,
বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে,
জানি নে ও কি ছলে গেল ॥

রবীন্দ্রনাথের গানের ঠাটে বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাব বাউল গানের তুলনায় কম নয়। তবুও রবীন্দ্রনাথের গানের ফর্ম প্রায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিজস্ব।

রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দুই হাজারের উপর, এবং সে গানের গঠন-বৈচিত্র্যও বহুতর। তবে মোটামুটি বলা যায় যে তাঁহার গানে ছত্র ও মিলের হিসাবে এই জোটই সবচেয়ে বে বেশি দেখা যায়,—ক, ক। খ+খ, ক। গ+গ, ঘ+ঘ, ক ॥ যেমন

ক জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
ক। বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।
খ+ এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
খ তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
ক। গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায়ে।
গ+ নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
গ আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
ঘ+ আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
ঘ তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া,
ক ॥ ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে ॥

অথবা

ক জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
ক। আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
খ+ সেথায় প্রেমের চরম সাধন;
খ যায় খসে তার সকল বাঁধন—
ক। মোর হৃদয়পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে।
গ+ ওগো জানি, আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
গ তোমার গভীর রাতের শান্তি-মাঝে ক্লান্তিহারা।
ঘ+ আমার দেহে ধরার পরশ
ঘ তোমার সুধায় হল সরস—
ক। আমার ধূলারই ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে।

৬

রবীন্দ্রনাথের গানের ইতিহাসে চার অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় পরীক্ষা। পিয়ানোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্ট গতের অনুসারে গানরচনায় তাহার প্রস্তুতি। তাঁহার নিজের সুর দেওয়া গান প্রথম লেখা হইল আমেদাবাদে। বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া রচনা ও প্রয়োগ করিলেন। এখানে প্রস্তুতি সুরসৃষ্টির ততটা নয় যতটা গানের ঠাটের অভিনবত্বের ও অভিনয়-নির্ভরতার।

বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষায় ও ফর্মে 'ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলী'র কবিতা-গানগুলি লেখা। সুরের মহিমাই এই অনুকৃতিকে (প্যাস্টিশ্) কালোত্তীর্ণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকৃতির-প্রতিশোধ হইতে কল্পনা পর্যন্ত (১২৯১-১৩০৭)। পল্লীসঙ্গীতের ও কীর্তনগানের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির নিজস্বতা এই সময়েই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গানে ভাবের সঙ্গে সুর মেলানোও এই হইতে শুরু। কীর্তনগানের বিভিন্ন রীতির মধ্যে মধু-কানের পদ্ধতিই ছিল সবচেয়ে সরল এবং লোকসঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া প্রাণবান্। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মধু-কানের প্রভাব যে অল্প নয় তাহার ভালো প্রমাণ রহিয়াছে প্রকৃতির-পরিশোধের "মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে" এবং মায়ার-খেলার "ওকে বলো সখি বলো, কেন মিছে করে ছল"—এই গান দুটিতে। গানে লোকসঙ্গীতের সুর আশ্রয় করিয়া হৃদয়বেদনার প্রকাশ আরম্ভ হইল এই সময়েই। কড়ি-ও-কোমলের "আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়" গানটিতে মেঠো সুরে অনন্তের বাঁশি বাজিয়াছে।

তখনকার বৈঠকি গানের মধ্যে নিধুবাবু শ্রীধর কথক প্রভৃতির টপ্পা (অর্থাৎ খুব ছোট প্রণয়গান) ভালো রচনা ছিল এবং সুরে চড়িলে আরও ভালো শুনাইত। এই রীতিতেও রবীন্দ্রনাথ দুই চারটি বেশ ভালো গান রচনা করিয়াছিলেন। যেমন

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই;

সে যদি চাহে মরি-যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লানমুখে, সখী, সে-যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয় ;
বুঝিল না সে-যে কেঁদে গেল,
ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা॥

এখন রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবিতায় নিজেরই মর্মবাণী শুনিতেছেন। তাই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার গান বৈষ্ণব-পদাবলীর রূপ-রস-মিথলজির বাঁধন কাটাইয়া সর্বজনীনতায় মুক্ত। যেমন

ওগো শোন কে বাজায়,
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে,
যমুনারই কলতান
কানে আসে কাঁদে প্রাণ—
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

কড়ি-ও-কোমলের একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবির মূলধন বহুগুণিত করিয়াছেন।

তোমার গোপন কথাটি সখী রেখো না মনে,
শুধু বোলো আমায় বোলো গোপনে।...

কীর্তন-ঠাটের এই গানটি রবীন্দ্রনাথের বোধ করি প্রথম নিজস্ব ও বিশিষ্ট গান। গানটি কথায় সুরে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুভাবেই লেখা।[১]

বাউলের সুরে গান প্রথম বেশি লেখা হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই তিনি বাউল গান রচনায় মন দেন। তাঁহার বাউল সুরের স্বদেশী গানগুলি দেশের তরুণদের পাগল করিয়াছিল।[২] প্রথম দিকের বাউল গান সবই হালকা চালের। যেমন, রাজা-ও-রানীতে "যমের দুয়ার খোলা পেয়ে",

---

১ জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য।

২ খেয়ার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিসর্জনে "আমারে কে নিবি ভাই", গোড়ায়-গলদে "যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে"। বাউল গানের ভাব ও ভঙ্গি পুরাপুরি দেখা গেল "ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে" গানে। বাউল-গানের গভীরতায় তখনো কবি ডুব দেন নাই, এবং তাঁহার অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে তখনো মরমিয়া রঙ ধরে নাই।

শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতাকে গানে-সুরে রূপ দিয়াছিলেন। একাজের সূত্রপাত অনেক আগেই। মানসীর 'বর্ষার দিনে' সুরে রূপান্তরিত হইল ১২৯৯ সালে। মানসীর 'তবু' গীতরূপ পাইল এবং সোনার-তরীর 'দুই পাখী' কীর্তনের সাজ পরিল এই সময়েই। কল্পনার দুইটি কবিতা—'হতভাগ্যের গান' ও 'বিদায়'—সঙ্গে সঙ্গেই সুরের অভিষেক পাইয়াছিল।

শান্তিনিকেতনে নীড় বাঁধিবার পর হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইতিহাসে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। পদ্মা-তীরে বাস ও পরিভ্রমণ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বহু বৈরাগী-বাউল দরবেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং বাউল-গানের ও ভাটিয়ালি, শাড়ি প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের মর্মপরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। শান্তি-নিকেতনে আসিবার পর কবিসত্ত্বের দৃক্‌কোণ পরিবর্তিত হইল এবং বিরহদহন কবিচিত্তে সকরুণ বৈরাগ্যের রঙ ধরাইয়া দিল। একদা বোলপুরের পথে শোনা

> খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়
> ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

—বাউল গানের এই যে পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল, এখন তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ডালপালা মেলিল। গানে বাউল-রীতির প্রভাব ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা ও ভঙ্গির অন্তরঙ্গতা সঞ্চার করিল এবং সুরে খোলা হাওয়ার অকারণের উদ্দাম হর্ষ ভরিয়া দিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির সহস্রধারা নামিল।

কালবশে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে বৈষ্ণব-পদাবলীর এবং কীর্তনগানের প্রাণপ্রবাহ ক্ষীণ হইয়া আসিলে বাঙ্গালা গীতিকবিতার জীবনধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ভদ্রলোকলোচনের অগোচরে বাউল-দরবেশ-কর্তাভজা ইত্যাদি অসাম্প্রদায়িক "সহজ" জীবন-উপাসক মরমিয়াদের সাধন ও ভজন-গানে। এই গানের ইতিহাস অনেকদিনের, কিন্তু এই সাধকদের জীবনের সঙ্গে যোগ সর্বদা অবিচ্ছিন্ন থাকায় তাঁহাদের অধ্যাত্মগীতি কখনো বৈষ্ণব-পদাবলীর মতো কঠিন ও পাকা সাজ করিয়া কালবারিত হইয়া পড়িতে পারে নাই। তাই বাউল গানের কথায় ও সুরে জীবনের গভীর বাণী—জীবনের সঙ্গে ভুবনের সহজ

আনন্দের নিবিড় অন্তরঙ্গ যোগ—উৎসারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্ত্ব যে এই "সহজ"-সাধকদেরই সজাতি তাহা উভয়ের গানের ভাব ও ভাষা হইতে বোঝা দুরূহ নয়।[১] একটি সাদৃশ্য আকস্মিক হইলেও সত্যসত্যই অদ্ভুত। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজ-সাধকদের একটি গানের অজ্ঞাত কবি যেন বিরহিণী প্রিয়ার ভূমিকা লইয়া নির্ভরসুপ্ত উদাসীন প্রিয়কে জাগাইতেছে,—"উট্‌ঠ ভড়ারো করুণমণু"।[২] গীতালির একটি গানে ইহার অসংশয়িত প্রতিধ্বনি।

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

বৌদ্ধ "সহজিয়া" রচনাটির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানে পড়িতে পারে না। গীতালি বাহির হইবার অনেক কাল পরে এই বৌদ্ধ গান নেপালের পুঁথিগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল।

বাউল গানের আবেদন দুইদিক দিয়া। চালে-তালে আছে নাচের দোলা, উদ্দাম উল্লাসের বিস্ফার। ভাব-সুরে আছে সকরুণ শান্তি, নিষ্কিঞ্চন নিষ্প্রত্যাশার মুক্ত-আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ বাউল-রীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলেন প্রথমে স্বদেশী গানে। সে গানে জাগিল জীবনরসের উন্মাদনা, এবং তাহা বর্তমান শতাব্দের গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপনা আনিয়া, বাঙ্গালীর অন্তরে জাতীয় জাগরণের সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া দিল। "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে" প্রভৃতি গানের কথায়-সুরে মরা মানুষও খাড়া হইয়া উঠে। স্বদেশী গানে বাউল-গানের প্রথম আবেদন—নাচের মাতন ও উল্লাস—প্রকটিত।

দ্বিতীয় আবেদনের প্রকাশ কবিসত্ত্বের অন্তরবাণীতে, এবং তাহা প্রথম দেখা গেল খেয়ার মর্মবাণীতে, "আমার নাই বা হল পারে যাওয়া"—এই গানে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই গানটির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে।

কীর্তন ও বাউল পদ্ধতির যুক্ত প্রভাবই যে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির অসামান্যতার একটা প্রধান কারণ এ কথা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। গীতাঞ্জলির কবিতাগানগুলির ভাষা সোজা, ভাব ভক্তিনম্র, সুর প্রাণনিঙ্‌ড়ানো। সুতরাং এ গানগুলির আবেদন সর্বলৌকিক, সর্বভূমিক ও

১ 'কর্তাভজার কথা ও গান' (বিশ্বভারতী-পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮) পৃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

২ *Old Bengali Texts* (Linguistic Society of India) দ্রষ্টব্য। আরও একটি গান আছে এইরকম।

যথাসম্ভব সর্বকালিক। গীতিমাল্যে ভক্তিনম্রতার বিষাদ মিলাইয়া আসিয়াছে, এবং সুরের যাদুতে জোর লাগিয়াছে। সেইজন্য ফর্মের দিক দিয়া কবিতা-ঘেঁষা হইলেও রূপে ও ভাবে গীতিমাল্যের গান মোটামুটি সমৃদ্ধতর হইয়াছে। "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে"—কবিতা ধরিলে বেশ গদ্যঘেঁষা মনে হইবে। কিন্তু সুরের ছোঁওয়া লাগিলে গানটি অপরূপের ওপারে চলিয়া যায়। গীতালিতে পুনরায় কবিতার ভাগ কমিয়া গানের ভাগ বাড়িয়াছে, সেই সঙ্গে সুরমাধুর্যও। ভাষায়-ভাবে বোলে-চালে গীতালির "তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে" গানটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। গীতালিতে ভক্তির আবেশ প্রায় ছুটিয়া গিয়াছে। দূরের বাঁশির ডাক কবিসত্ত্বের অন্তর দুর্নিবার আকর্ষণে টানিতেছে সব ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে, কিন্তু বাহিরে সাড়া ফুটে না। তাই ক্ষুব্ধ অনুযোগ, "যেতে যেতে চায় না যেতে ফিরে ফিরে চায়"। ফাল্গুনীতে দূরের বাঁশি নিকটতর হইয়াছে এবং উৎকণ্ঠাও বাড়িয়াছে,—"ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইতিহাসে শেষ অধ্যায়ের সূচনা। এখন গানে ভাব-সুর-লয়ের সঙ্গে নাচের জ্যামিতিক প্যাটার্ন মিলিয়া গেল। গানের ঠাটে নিত্য নূতন রূপ দেখা দিল এবং সৃষ্টির প্রধান ঝোঁক পড়িল সুরের বিচিত্র আলিম্পনায়। এই নব নব সুরসৃষ্টিপ্রবণতা শেষ মুহূর্ত অবধি মুক্তধারায় প্রবহমাণ ছিল। গানের এই দুরূহ সুরশিল্পের উদাহরণ অনেকই আছে। তাহার মধ্যে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কড়ি-ও-কোমলের 'গান রচনা' ("এ শুধু অলস মায়া") সনেটটি এই সময়ে যে গানের সাজ পরিল তাহার সুরে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য—সুরের অকুণ্ঠ উঠা-নামা ও অপুনরাবর্তনীয় বিসর্পণ—আরোপ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়াছেন।[১] ভারতীয় সঙ্গীতে সুরের আবর্ত অর্ধবৃত্তাকার ও বৃত্তাকার, কবিতার মিলের মতো সুরের প্রবাহ নির্দিষ্ট কালের পর আবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসে গোড়ার সুরে। ইউরোপীয় সঙ্গীতে সাধারণত সুর-প্রবাহ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে না, বিচিত্রভাবে ওঠানামা করিয়া গোড়ার সুরে না ফিরিয়াই গান শেষ হইয়া যায়। সুরবৈচিত্র্যের সঙ্গে সুরপ্রবাহের অপুনরাবৃত্তি "এ শুধু অলস মায়া" গানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহা প্রায় অসাধ্যসাধন॥

---

[১] রবীন্দ্র-সঙ্গীত পৃ ১১৬ দ্রষ্টব্য।

৭

লিরিক কবিতার অভিনব বিকাশ রবীন্দ্রনাথের গানে। কোন কোন গানের সুরে কবিতার ছন্দেরই লঘুতর এবং দ্রুততর বেগবান স্পন্দন শোনা যায়। এসব গানের সুরে টান নাই, চালে ঝোঁক আছে। "চলি গো চলি গো যাই গো চলে", "সংকোচের বিহ্বলতা", "জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে" ইত্যাদি। কখনো কখনো বা গানে যে সুরের ঝোঁক কবিতার ছন্দের ঝোঁকের তা বিপরীত। যেমন "দিনের বেলা বাঁশি তোমার"—গানটিতে সুরের ঝোঁক পড়িয়াছে দ্বিতীয়

দি´নের বেলা	বাঁ´শি তোমার	বা´জিয়েছিলে	অ´নেক সুরে—
´গানের পরশ	প্রা´ণে এল	আপ´নি তুমি	রই´লে দুরে।

অক্ষরে কবিতারূপে আবৃত্তি করিলে ছন্দের ঝোঁক পড়ে প্রথম অক্ষরে

´দিনের বেলা	´বাঁশি তোমার	´বাজিয়েছিলে	´অনেক সুরে—
´গানের পরশ	´প্রাণে এল	´আপ্‌নি তুমি	´রইলে দুরে।

তেমনি "গোপন কথাটি রবে না গোপনে"

গীতছন্দে

গোপ´ন	কথা´টি	রবে´না	গোপ´নে,
উঠি´ল	ফুটি´য়া	নীর´ব	নয়´নে।

কবিতাছন্দে

´গোপন কথাটি	´রবে না গোপনে,
´উঠিল ফুটিয়া	´নীরব নয়নে।

কোন কোন গান আবার সুরের চাল ধরিয়া ছত্রের আকার-পরিবর্তন করিয়াছে। যেমন "কেন রে এতই যাবার ত্বরা"।

কবিতা (দ্রুত)

কেন রে এতই যাবার ত্বরা—
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর
গানের ভরা।
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবি
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী,
নিল কি বিদায় শিথিল করবী
বৃন্তঝরা।
এখনি তোমার পীত উত্তরী
দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের
আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোতকূজনে হল যে আকুল,
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল
বসুন্ধরা।

গান (বিলম্বিত)

কেন রে এতই যাবার ত্বরা—
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর
গানের ভরা।
এখনি মাধবী
ফুরালো কি সবি,
বনছায়া গায়
শেষ ভৈরবী, নিল কি বিদায়
শিথিল করবী বৃন্তঝরা।
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল কপোতকূজনে
হল যে আকুল, চরণপূজনে
ঝরাইছে ফুল বসুন্ধরা॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

কথার আভা

"তুমি আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে।
এই যে আমি মালা আনি তার বাণী কেউ শোনে ?
পথ দিয়ে যাই যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই-যে পেতে ;
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া, তার ভাষা কেউ বোঝে ?"

১

রূপক শব্দশক্তির মূল উৎস। বহু ও দীর্ঘ ব্যবহারে রূপকের রঙ চটিয়া যায়, বিশেষ শব্দটি সাধারণ শব্দে পরিণত হয়। তখন প্রয়োজন হয় নূতন রূপকের অথবা পুরানো রূপকের নূতন রঙকরা রূপের। এইখানেই শক্তিশালী কবির শিল্পচাতুর্যের অবকাশ। কোন কোন আধুনিক বিদেশী কবি ও লেখক বিশেষ বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জনার জন্য নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ধরনের শব্দকে পারিভাষিক বা সাংকেতিক বলিতে হয়। ব্যাপকভাবে এরকম শব্দ সাহিত্যে চালানো যায় না। ভাষায় ও সাহিত্যের অতীত ইতিহাসকে অনেকটা মানিয়া লইতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার ও সাহিত্যসাধনার সমন্বয় ও পরিণতি। মননে ও প্রকাশে আবহমান ভারতীয় সাহিত্যে যাহা-কিছু মৌলিক বিশিষ্টতা তাহা রবীন্দ্র-রচনায় অবশ্যই অন্তর্লীন এবং কোনো-কোনো ভাবে ব্যঞ্জিত। ভারতীয় সাহিত্যসাধনা প্রথম হইতেই অধ্যাত্মভাবনাময় সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের তুলনায় সমধিক পরিমাণে রূপকাশ্রিত। সুতরাং রবীন্দ্র-বাণীশিল্পে রূপকের ব্যবহার অনপেক্ষিত নয়। রূপকের প্রাধান্য গানেই বেশি দেখা যায়, কেননা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার ব্যক্ততম প্রকাশ গানেই। এই কারণে এতক্ষণে গানের প্রসঙ্গে রূপকের আলোচনা করিতেছি।

অস্তি-নাস্তির, গতি-স্থিতির পেণ্ডুলামে মহাকালের নিমেষ-গণন চলিয়াছে। বিশ্বভুবনের পটও এই টানাপোড়েন বোনা পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও অধ্যাত্মভাবনাও দ্বৈততত্ত্বাশ্রিত, তবে সে দ্বৈততত্ত্ব নাস্তি-বর্জিত, তাহাকে বলিতে পারি সর্বাস্তিবাদী। একদিক হইতে জীবনদেবতা অভিসারে আগাইয়া আসিতেছে, অপরদিক হইতে অন্তর্যামী স্বয়ংবরে আগাইয়া চলিয়াছে,—

কবিসত্তার এই দ্বিধাভিন্ন (ego ও super-ego) অভিযানে জীবন পূর্ণতার পানে অগ্রসর। ইহাই রবীন্দ্র-ভাবনায় দ্বৈতবাদ। এই দ্বৈতবাদ যে গভীরতর অদ্বৈতানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পরে আলোচনা করিতেছি।

রবীন্দ্র-রচনায় কতকগুলি রূপকের মূলে পাই গতি-স্থিতির মতো দ্বৈত। প্রায় সব সিম্বল্ই জোড়া-জোড়া,—চলা : বসা ; স্রোত : পথ ; নাড়া : সাড়া ; বাহির : অন্তর ; সাধনা : সিদ্ধি ; পথিক : অতিথি ; বধূ : বিরহিণী ; বাঁশি : বীণা ; আগুন : প্রদীপ ; শিকল : রাখী ; হাট : ঘাট ; আকাশ : নীড় ; ইত্যাদি। কখনো বা সিম্বল একই, উক্ত বা উহ্য বিশেষণ অনুসারে অর্থ দ্বৈত। যেমন "বন্ধ দুয়ার" বোঝায় অজ্ঞানজনিত বাধা, মূঢ়তা ("যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"), "খোলা দুয়ার" দ্যোতনা করে প্রস্তুতি বা স্বাগত ("তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে")। তেমনি "ঘাট"এরও দুইটি অর্থ ; নৌকারোহীর প্রতিমা অন্তর্ভাবিত হইলে বোঝায় জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, সংসারের অভিজ্ঞতা, জন্মজন্মান্তর ("আমারে যে নামতে হবে ঘাটে"), আর খেয়া-পারের যাত্রী বুঝাইলে অর্থ—শান্ত জীবনরসিক, জীবনরসতৃপ্ত অনাকাঙ্ক্ষী ("নেই যদি বা জমল পাড়ি ঘাট আছে তো বসতে পারি")। "ধূলা" একভাবে বোঝায় তুচ্ছতার বিফলতা ("বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ হইয়া অবোধে ভুলায়"), অপরভাবে বোঝায় জগৎসংসারের সব কিছুর অব্যক্ত পরিণাম ("কিছু তো তার রইবে বাকি তোমার পথের ধূলা ঢাকি")। "ফাগুন" একভাবে বসন্ত ঋতু ("ফাগুনে যে বান ডেকেছে মাটির পাথারে"), অন্যভাবে কবিসত্ত্বের যৌবনস্মৃতি ("আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে যে তায়")।

সাধারণত অত্যন্ত পরিচিত বস্তুই রবীন্দ্রনাথের সিম্বলের আধার। অল্প কতকগুলির জড় পৌঁছায় পুরাণকাহিনীতে, কালিদাসের কাব্যে ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে। দুই-একটি রূপক অধ্যাত্মভাবনাসমুত্থ ॥

২

বিশিষ্ট রূপক শব্দের উদাহরণ দিতেছি।

পথ : স্রোত। পথ কালধৃত জীবন, মানুষের ওঠা-বসার দেওয়া-নেওয়ার মুহূর্তমালা ; জীবনের অগ্রগতি, ভবিষ্যতের দিক। "পথ কোথা পাই পারাবারে" ; "পথের ধারে আসন পাতি" ; "পথ আমাদের দিয়েছিল ডাক"। স্রোত অখণ্ড জীবনপ্রবাহ, সেই সংবেদনার অনুভাব ; বন্ধনহীনতা। "যেতে যেতে গভীর

স্রোতে ডাক দিয়েছ তরী হতে"; "দিনের পরে দিন চলে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা"।

পথ : ঘর। যথাক্রমে প্রয়াসের ও প্রতীক্ষার রূপক। "ঘরেই তোমার আনাগোনা পথে কি আর তোমায় খুঁজি"।

পথ : রথ। পথ ব্যক্তির, কবিসত্ত্বের সচেষ্ট জীবনলীলা। "পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে, তোমার পরশ আসে কখন কে জানে"। রথ জীবনদেবতার আবির্ভাব, পরম আনন্দের অনুভাব। "তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে"।

পায়ের চিহ্ন : রথের রেখা। পায়ের চিহ্ন দ্যোতনা করে অনধিগত-আনন্দ-স্মৃতি, জীবনের পরমমুহূর্ত যাহার মূল্য পরে ধরা পড়িয়াছে, অর্থাৎ জীবনদেবতার গোপন আবির্ভাব। "হৃদয়ে মোর কখন জানি পড়ল পায়ের চিহ্নখানি"। রথের রেখার দ্যোতনা পরমবেদনার অভিজ্ঞতা, জীবনদেবতার প্রকাশ্য আবির্ভাব। "যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া, আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া"।

হাট : বাট। হাট জীবনের ভালোমন্দর লাভালাভের অভিজ্ঞতা, বাট সংসারের কর্মধারা। "তোরা কোন্ রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে"; "তোরা পাবার জিনিষ হাটে কিনিস"। তুলনীয়, "ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর"।

আগুন : প্রদীপ। "আগুন" দুঃখদহনের ভস্মনির্বাণ, অগ্নিপরীক্ষা। "জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে, ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে"। "প্রদীপ" দুঃখদহনের মঙ্গল-আলোক। "আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন"। "প্রদীপ" যখন জীবনের প্রতীক তখন "শিখা" জ্ঞানের, অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রতীক।

শিকল : রাখী। "শিকল" জীবনে অগ্রগতির বাধা, সংসারে জালজঞ্জাল-বন্ধন। "ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে"। "রাখী" জীবনদেবতার সঙ্গে যোগসূত্র, জীবনে সার্বিক আনন্দের ভরসা। "আমার হাতের রাখীখানি বাঁধো তোমার দখিন-হাতে"।

বাঁশি : বীণা। সিম্বল হিসাবে বাঁশির দুইটি অর্থ,—এক, সংসারের কাজ-ছাড়ানো জীবনদেবতার ডাক ("আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে"), দুই, জীবনের দুঃখবেদনার মধ্য হইতে উৎসারিত অকারণ হর্ষের

অনুভাব ("পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা")।[1] "বীণা" জীবনে ও ভুবনে আনন্দবোধ ("প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে"; "তোমার বীণা আমার মনোমাঝে, কখনো শুনি কখনো ভুলি কখনো শুনি না যে"; "বুকের কাছে বাজ্‌লো যেন বীণ")। বেণু ও বীণা রবীন্দ্র-বাণীর বোধ করি সবচেয়ে বড়ো সিম্বল। বেণুর রূপকের জন্য কবি বৈষ্ণব-পদাবলীর কাছে ঋণী। বীণার রূপক তাঁহার নিজস্ব। বেণুর আরো একটি মানে আছে সিম্বল হিসাবে। বিরহের নিঃসঙ্গ ব্যাকুলতা অনেক সময় বেণুর[2] রূপকে ধ্বনিত হইয়াছে। ("আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু, হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু"।)

চিরন্তন জীবলীলার নির্হেতু আনন্দপ্রবাহের রূপক হিসাবে মাঠে ধেনু-চারণ আর রাখালের খেলা ও বেণুবাদন রবীন্দ্র-রচনায় সুপরিচিত। "চরবে গোরু খেলবে রাখাল ঐ মাঠে"; "মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী"। চিরকালের সংসারের অবিচ্ছিন্ন কাজের ধারার রূপক ভরা নৌকার খেয়া "ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী, এমনি সেদিন উঠবে ভরি"।

তারা : ফুল। যথাক্রমে প্রতীক্ষা ও সফলতার সিম্বল। "তারায় তারায় রবে তারি বাণী কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।"

ধূলা : ঘাস। যথাক্রমে চিরন্তন জড়ের ও চিরন্তন মৃত্যুহীন প্রাণের, এবং উভয়ে একত্র জগৎসংসারের প্রতীক। "আমার মুক্তি ধূলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে"।

জীবনের দুঃখসুখের সংকীর্ণতা ও সংক্ষিপ্ততা ব্যঞ্জিত হইয়াছে পাত্র ও পেয়ালা রূপকে। "মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদবেদনায়"; "ওদের তখন নেশা ধরেছিল, রঙিন রসের প্যালা ভরেছিল"। ইহা হইতে জন্মমৃত্যুব্যবচ্ছিন্ন মর্ত্য-জীবনের রূপক অর্থও আসিয়াছে। "আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক্ ভেঙে চুরে"। আবার পরমবেদনার অথবা পরম সুখসঞ্জাত চরম অভিজ্ঞতার প্রতীক-রূপেও পেয়ালা ব্যবহৃত হইয়াছে। "আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি কে রে তুই"; "রঙিন রসের প্যালা ভরেছিল"।

উত্তরীয় : আনন্দের সুনিশ্চিত প্রত্যাশা অথবা আনন্দের স্পর্শ। "অধীর পবনে তার উত্তরীয় দূরের পরশন দিল কি ও"; "ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙীন উত্তরীয় পর পর পর তবে"।

---

১ বাঁশের বাঁশির সঙ্গে বুকের পাঁজরের, দেহের অস্থির উপমা সহজেই আসে। বাঁশিতে ছিদ্র থাকে, আর চেষ্টা করিয়া ফুঁ দিয়া বাজাইতে হয় তাই বাঁশি বাজানোর সঙ্গে বেদনার মিল। বীণার তার আঙুলের হালকা ছোঁয়ায় যেন আপনিই বাজে, তাই সহজ আনন্দের সঙ্গে বীণার তুলনা।

২ এখানে বেণুর মৌলিক অর্থ, 'বাঁশ'। এই রূপকে শীর্ণ একাকী বাঁশগাছের অপূর্ব প্রতিমান।

বাতায়ন : চিত্তের প্রশান্তি। "ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে"; "জ্বাল্‌ব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি"।

আসন : গভীর অনুভূতির জন্য চিত্তের প্রস্তুতি; অধ্যাত্ম-অনুভবের প্রতীক্ষা। "গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে"; "পথের ধারে আসন পাতি"।

বেদী : ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি। "নতুন গানে কাঁচা সুরের প্রাণের বেদী গড়ো"।

মালা : ধৈর্যনম্রতা; আনন্দের স্বীকৃতি; শান্ত প্রতীক্ষা। "বিজন দিবস-রাতিয়া কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া"; "বড়ো সাধে জালিনু দীপ গাঁথিনু মালা"; "আমায় তাই পরালে মালা ফুলের গন্ধঢালা"।

ছুটি : সংসারের ভালোমন্দর দায় হইতে মুক্তি। "ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীল গগনে", "বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই"।

জোড়া জোড়া প্রতীক-শব্দের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রাস আসিয়া গিয়াছে। উপরে পথ : রথ, হাট : বাট : ঘাট ইত্যাদিতে তাহার উদাহরণ মিলিবে। আরও, কম স্পষ্ট অথচ অর্থনিষ্ঠ জোড়া প্রতীকের উদাহরণ একটি দিতেছি।

দূর : সুর। এ প্রতীকে দূর বোঝায় দূরস্থিত প্রিয় বা আনন্দ-উৎস, আর সুর প্রিয়ের আহ্বান বা আনন্দের টান। "দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে", "দূরের হাওয়া ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে"॥

৩

রবীন্দ্র-রচনায়—বিশেষ করিয়া গানে—কবিসত্ত্বের নিজেকে নায়িকা রূপে কল্পনা অন্তর্ভাবিত রূপক প্রয়োগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই কল্পনার মূলে আছে বৈষ্ণব-কবিতার সাক্ষাৎ প্রভাব। সেই সঙ্গে কালিদাসের ও মেঘদূতের পরোক্ষ প্রভাবও আছে। পদাবলীর রাধা আর মেঘদূতের যক্ষকান্তা (এবং যক্ষ) মিলিয়া গিয়াছে কবিচিত্তের অনাদি বিরহভাবনায়। খুঁজিলে এই ভাবনার মধ্যে রাধাভাবের অনেক রসেরই ইঙ্গিত মিলিবে। যেমন মানিনীর প্রতি সখী।

বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায় পথের চরণফেলা দিনযামিনী,
হে গরবিনি।

ক্ষণমিলনের বেদনাব্যাকুলতা, যেমন

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ করে
প্রাণ সুধায় ভরে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যাথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

প্রাণের বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবিতার দূতীর মতো উৎপ্রেক্ষিত করিয়াছেন।

বেদনা দূতী গাহিছে, ওরে প্রাণ,
তোমারি লাগি জাগেন ভগবান্।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে…

বেদনা শুধু অচিরাগামী মিলনেরই আমন্ত্রণ আনে না, মিলনের উপস্থিত আনন্দও গোচর করিয়া দেয়।

তুমি যে আছ বক্ষে ধরে
বেদনা তাহা জানাক মোরে—
চাব না কিছু কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে।

এখানে কবিভাবনা বৈষ্ণব-রসচিন্তার উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

কবিসত্ত্বের স্বয়ংবরকল্পনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর সংকেতকুঞ্জে রাধা-অভিসারের সঙ্গে রঘুবংশের রাজসভায় ইন্দুমতী-স্বয়ংবর মিশিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলিতে পারি স্বয়ংবরাভিসার। রবীন্দ্রনাথের রূপকে অভিসার মুখ্যত জীবনদেবতার তরফে। জীবনদেবতা কবিসত্ত্বের দিকে আগাইয়া আসিতেছে যুগ যুগ ধরিয়া ("আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে" ; "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা বন্ধু হে আমার")। স্বয়ংবর অন্তর্যামীর, তিনি কবিসত্ত্বকে দুঃখসুখের, জীবনমৃত্যুর মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া পরিচালিত করিতেছেন জীবনদেবতার হাতে সমর্পণ করিতে ("কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়" ; "কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে")।[১] বিশ্বভুবনের এই যে আয়োজন এ কেবল জীবনদেবতা-অন্তর্যামীর মিলনের স্বয়ংবরযাত্রার সমারোহ—এই ছবিটির পরিবেশে স্বয়ংবরযাত্রিণী কবিচিত্তবধূ গানের সুরের বিচিত্র দোলায় যেন আসন গ্রহণ করিয়াছে।

---

১ চতুরঙ্গে শচীশের উক্তি (৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা,
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিস্রোত বেয়ে
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা॥

গীতাঞ্জলির একটি গানে বিশ্বভুবনের রূপরসে নিখিল বিরহের যে বিস্তার কল্পিত হইয়াছে তাহা স্বয়ংবরসভারই ভূমিকা। বিরহের এ এক অপূর্ব ব্যাখ্যা।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায় তোমার বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেম হায়, কত বাসনায়, কত দুখে সুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার জীবন মাঝে হে॥

পূর্বে উল্লিখিত বেদনার আনন্দরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

যক্ষকান্তার বিধুর মূর্তিখানা ঢাকা পড়িয়াছে রাধার ছায়ায়। দুই একটি গানে ইহার ব্যতিক্রম আছে। যেমন

ওগো মিতা সুদূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে রোপিলে যারে[১]
সেই মালতী আজি বিকশিতা—সে কি জান'।
যারে তুমি দিয়েছ বাঁধি
আমার কোলে সে উঠিছে কাঁদি—সে কি জান',
সেই তোমার বীণা বিস্মৃতা॥[২]

[১] তুলনীয় মেঘদুত, "যস্তোপান্তে কৃতকতনয়ঃ"। [২] ঐ "উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে"।

বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রভাবের প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনায় "নাম"এর তাৎপর্য বিচার আবশ্যক। "নাম" সাধারণত পরম আশ্বাস-সান্ত্বনার ও প্রত্যাশিত আনন্দভাবনার সিম্বল ("সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে, শান্তি-ধারায় বেদন গেল ধুয়ে")। "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ"—এই বৈষ্ণব কবিতাটির ভাবে অনেকগুলি গান অনুপ্রাণিত। যেমন

বলো সখী বলো তারি নাম আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
যে নাম মিলে যাবে বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়,
সে নাম মদির হবে যে বকুলঘ্রাণে,
বলো বলো আমার কানে কানে।
না হয় সখীদের মুখে মুখে
যে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে অকারণে মন উতলা হবে
সে নাম শুনাইব গানে গানে।
বলো বলো আমার কানে কানে॥

চৈতন্যের ধর্মে ভক্তিসাধনায় নামের যে মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মহৎ তাৎপর্য রবীন্দ্র-ভাবনায় উপেক্ষিত হয় নাই। যেমন

তোমারি নাম বলব নানা ছলে
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে বলব চোখের জলে।

৪

পুরাণকাহিনী-আশ্রিত রূপক রবীন্দ্র-রচনায় বেশি নাই। যাহা আছে তাহার মধ্যে প্রধান শিব-রুদ্র। শিবরূপে তিনি সুন্দর, কালিদাসের কাব্যের নায়ক। রুদ্ররূপে তিনি বৈদিক দেবতা, তাণ্ডবে মত্ত। রুদ্রের ক্রোধদাহ অন্যায় ধ্বংস ও পাপ দাহন করিয়া ভুবনকে মার্জিত করে, জীবনকে মার্জনা করে। সুতরাং রবীন্দ্র-কবিভাবনায় রুদ্রের দক্ষিণ ও বাম দুই মুখের মধ্যে মৌলিক অসামঞ্জস্য নাই। রবীন্দ্রনাথের উমা কালিদাসের কাব্য হইতেই আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-কল্পনা উর্বশীতে বিশেষভাবে সাধারণীকৃত। উর্বশী-কল্পনাটির রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কোন স্থান নাই, এটি নিতান্তই কাব্যগত প্রতিমা। খুব প্রাসঙ্গিক না হইলেও একটি কথা এখানে বলিতে হইতেছে। চিত্রার 'উর্বশী' কবিতায় অনেকে বিশেষ করিয়া বিদেশী কবিকল্পনার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে "ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে" সমুদ্রগর্ভ হইতে উর্বশীর উত্থান ভারতীয় কবিকল্পনার অনুসারী নয়। এ ধারণা অসমীচীন। সমুদ্রমন্থন কাহিনীর অনেক রকম বিবরণ পাওয়া যায় সংস্কৃত পুরাণে এবং বাঙ্গালা পাঞ্চালীতে। কোন কোন বিবরণে উর্বশী প্রভৃতি কতিপয় অপ্সরার জন্ম সমুদ্র-মন্থনের ফলে বলা হইয়াছে। অমৃত ও বিষ দুইই এই সমুদ্রমন্থন হইতে উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে অমৃত-বিষ-উর্বশীর উদ্ভব এক প্রতিমান-সূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিভাবনায় মিথলজি যে কেমন নিপুণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ভালো উদাহরণ আছে এই গানে

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি,
তোমার নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর।
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে;
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর।
পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
'পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর।'
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর॥

অন্ধকার হইতে আলোক, পাষাণ ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা, উষর মৃত্তিকায় ধারাবর্ষণ, তাহাতে শ্যামল পুষ্পে নগ্নধরণীর লজ্জানিবারণ: নাস্তি হইতে তেজ, কঠিন জড় হইতে জীবন, জীবন হইতে রস,—এই অপরূপ উৎপ্রেক্ষায় রামচন্দ্রের অহল্যা উদ্ধার কাহিনী কী যে অপূর্ব উজ্জ্বল নিটোল লিরিক্ রূপ পাইয়াছে এই গানটিতে তাহা সহৃদয়ের সংবেদ্য। ভারতভারতীর এই এক পরিপূর্ণতা॥

অধ্যাত্মভাবনামূলক রূপক "আমি : তুমি : ও" এই তিন পুরুষের সর্বনামে পর্যবসিত। "আমি" কবিসত্ব বা অন্তর্যামী। "তুমি" কবিসত্ত্বের আলম্বন, তাহার পরমপ্রেয়ঃ, জীবনদেবতা। "ও" বিশ্বভুবনের বাহ্য আর যাহা-কিছু, অর্থাৎ তুমি আমি ছাড়া ইতর জন।

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবি সোজাসুজি।...
শুনব কী আর বুঝব কী বা,
এই তো দেখি, রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কি আর তোমায় খুঁজি॥

আবার বলি। রবীন্দ্র-বাণীর গহনগম্ভীর ঝঙ্কার তাঁহার গানে। কবি-ভাবনার অধ্যাত্মচিন্তার সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সহজ প্রকাশ তাঁহার গানে। শিশুকাল হইতে রবীন্দ্রনাথের নির্লিপ্ততার, তটস্থ দৃষ্টির শিক্ষা। সুতরাং আনন্দসিদ্ধিতে ত্যাগের সাধনা তাঁহার কাছে সহজ হইয়াছিল। ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকিলেও বলিতেছি রবীন্দ্রনাথ সহজযোগসিদ্ধ। কোন বন্ধনই দীর্ঘকাল ধরিয়া কবিসত্ত্বকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। বাণীশিল্পের এমন অপরূপ রসবন্ধনও তাঁহাকে সর্বদা ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই কবি নিজেকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন পানে চেয়ে আছে প্রভাতরবি।

জীবনে রূপরসের উপযোগে নির্লিপ্ত স্বচ্ছ-দৃষ্টির স্পষ্ট নির্দেশ আছে এই গানে

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায়, বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান কেবলি বাণী

পরশ তাহার নাহিরে মিলে, নাহিরে পরিমাণ—
দেবসভায় সে সুধা করে পান।
নদীর স্রোতে ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখি-কোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

আমি-তুমির, অন্তর্যামী-জীবনদেবতার দ্বৈত যে অদ্বৈতের, "একং সৎ"এরই দৃশ্যভেদ তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবিসত্ত্ব—তাঁহাকে অন্তর্যামীর সঙ্গে এক অথবা পৃথক্ যে-ভাবেই দেখি না কেন—নিখিলেরই অংশ, এবং সে অংশ চ্যুত হইলে নিখিলেরই চ্যুতি। সুতরাং কবিসত্ত্বের কাছে জীবনদেবতার প্রয়োজন যতখানি জীবনদেবতার কাছে কবিসত্ত্বের প্রয়োজনও ততখানিই।

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে;
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে।
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি;
সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা;
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে॥

"আমার" মুক্তি না হইলে "তোমার" মুক্তি নাই, এবং সর্বজনের মুক্তি না হইলে "আমার"ও মুক্তি নাই—"আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে"।—এ তো অভিনব মহাযান। "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে", কেননা সর্বকাল সর্বজনের মধ্যে "আমার"ই তো বিলসিত, "আমি" যে চিরন্তন নব। এ ভাবনা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" চিন্তারই ওপিঠ।

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা,
মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে…

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

ইহার পরেই অনির্বচনীয় নিখিল-আনন্দস্রোতের সহজসরল বচনীয়তা। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" নয়, "সোঽহম্"ও নয়, একেবারে "ময়ৈবায়ম্" কবিভাবনার ও অধ্যাত্মচিন্তার পারমিতায় "তুমি" মিশিয়া যায় "আমি"তে, তাই "ওরা" হইল "তোরা"।

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল-খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায় তাই না হারায়,
ওগো তাই হেরি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না—হল না—
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে।
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না—মেলে না—
ওগো তোরা আয় রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে আমার বুকে
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে॥

সে দুই নয়ানে দেখিয়া কী যে বোঝা গেল কী যে না গেল বলিতে পারিব না। শুধু এই কথাই মানি,

মধুর তোমার শেষ যে না পাই
প্রহর হল শেষ॥

বিশিষ্ট কাল ও ঘটনা পঞ্জী

২৫ বৈশাখ	১২৬৮	জন্ম	কলিকাতা (জোড়াসাঁকো)
৭ মে	১৮৬১		
	? ১৮৬৬	গুরুমহাশয়ের শিক্ষা	
	? ১৮৬৭	এক অপরাহ্নে মায়ের ঘরের দরজায় বসিয়া রামায়ণ পড়া	
		ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ	
	? ১৮৬৮	নর্মাল স্কুলে প্রবেশ ('গিন্নী' গল্পের ঘটনা)	
	? ১৮৬৯	স্কুলে বাঙ্গালা পরীক্ষায় কৃতিত্ব	
		জ্যোতিঃপ্রকাশ গাঙ্গুলি কর্তৃক পদ্যরচনায় হাতেখড়ি	
		প্রথম কলিকাতার বাহিরে যাওয়া	পেনেটি
	? ১৮৭০-৭১	গীতগোবিন্দ পাঠ	বোট (গঙ্গা)
		ঘরে বাঙ্গালা পড়া বন্ধ	
		বড় দাদার মেঘদূত আবৃত্তি	মূলাজোড়
	? ১৮৭২	বেঙ্গল একাডেমিতে প্রবেশ	
২৫ মাঘ	১৮৭৩	উপনয়ন (গায়ত্রী-দীক্ষা)	
ফাল্গুন-আষাঢ়		পিতার সহিত ভ্রমণ	শান্তিনিকেতন, অমৃতসর, ডালহাউসি
	১৮৭৪	সেণ্ট জেভিয়ার্সে প্রবেশ	
		প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ পাঠ এবং ভাষাবিশ্লেষণে আগ্রহ	
		প্রথম বিদ্বজ্জনসমাগম অনুষ্ঠান	
	১৮৭৫	গৃহে সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য পাঠ	
		কুমারসম্ভব ও মেঘদূত অনুবাদ	
		বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ	
		বিহারীলাল চক্রবর্তীর সহিত পরিচয়	
		জ্ঞানাঙ্কুরে কবিতা প্রকাশ	
২১ ফাল্গুন		মাতার মৃত্যু	
		হিন্দুমেলায় কবিতা পাঠ	
		জ্ঞানাঙ্কুরে প্রবন্ধ প্রকাশ	
	১৮৭৬	"গহনকুসুম কুঞ্জ মাঝে" রচনা	

	১৮৭৭	ভারতী প্রকাশ	
		'অলীকবাবু' অভিনয়ে অংশগ্রহণ	
	১৮৭৮	বিলাত যাত্রার উদ্যোগপর্বরূপে বোম্বাই গমন	
		বাঙ্গালা গান রচনা ও গানে প্রথম নিজের সুর দেওয়া	আমেদাবাদ
২০ সেপ্‌টেম্বর		বিলাত যাত্রা ও পাবলিক স্কুলে প্রবেশ	ব্রাইটন, টর্কি
	১৮৭৮-৭৯	'য়ুরোপ-প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের পত্র' রচনা	লণ্ডন
	১৮৭৯	লাটিন শিক্ষার উদ্যোগ	লণ্ডন
		ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ	
		লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত পরিচয়	
		'ভগ্নহৃদয়' রচনা আরম্ভ	টর্কি
ফেব্রুয়ারি	১৮৮০	'দুদিন' কবিতা রচনা	লণ্ডন
		দেশে প্রত্যাগমন	
১৬ ফাল্গুন	১৮৮১	'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়	
এপ্রিল	১৮৮১	'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধ পাঠ (সভাপতি—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)	
		বিলাত যাত্রার উদ্যোগ ও মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন	
		আশুতোষ চৌধুরীর সহিত পরিচয়	
		বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ	
		'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনা	
শ্রাবণ	১৮৮২	বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সংবর্ধনা	
		সারস্বত-সমাজ প্রতিষ্ঠা	
		রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত পরিচয়	
		প্রিয়নাথ সেনের সহিত বন্ধুত্ব	
		'বৌঠাকুরাণীর হাট' রচনা আরম্ভ	
২৩ ডিসেম্বর		'কালমৃগয়া' অভিনয়	
	১৮৮২-৮৩	'প্রভাতসঙ্গীত' রচনা	চন্দননগর, কলিকাতা, দার্জিলিং
	১৮৮৩	'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনা	কারোয়ার
২৪ অগ্রহায়ণ		বিবাহ	কলিকাতা
	১৮৮৩-৮৪	'ছবি ও গান' রচনা	কারোয়ার, কলিকাতা
৮ বৈশাখ	১৮৮৪	বধূঠাকুরাণীর মৃত্যু	
		'বালক' প্রকাশ	
		"সরোজিনী" ষ্টীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ	

		শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহিত সখ্য	
		ট্রেনে স্বপ্নে 'রাজর্ষি'-গল্পবীজ প্রাপ্তি	
আশ্বিন-কার্তিক		ছবি আঁকার অস্ফুট চেষ্টা	
কার্তিক-অগ্রহায়ণ		প্রথম দুই ছোটগল্প প্রকাশ	
	১৮৮৫-৮৬	'কড়ি ও কোমল' রচনা	কলিকাতা, নাসিক, বোম্বাই (বান্দ্রা)
মাঘ		'কড়ি ও কোমল' প্রকাশ	
	১৮৮৭-৯০	'মানসী' রচনা	কলিকাতা, গাজিপুর, সোলাপুর, পুনা, কলি-কাতা, শান্তিনিকেতন, লণ্ডন, লোহিতসাগর
নভেম্বর	১৮৮৮	জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম	
জানুয়ারি	১৮৮৯	বেথুন কলেজে 'মায়ার খেলা' অভিনয়	
মে		'রাজা ও রাণী' রচনা	সোলাপুর
	১৮৯০	জমিদারির ভারগ্রহণ	
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ		'বিসর্জন' রচনা	সাজাদপুর
জুন		'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম দৃশ্য ('অনঙ্গ আশ্রম') রচনা	শিলাইদহ
২৪ আগষ্ট		দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা	
		স্বপ্নে 'মালিনী' নাটকবীজ লাভ	লণ্ডন
১৩ অক্টোবর		বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন	
	১৮৯০-৯১	'পোষ্টমাষ্টার' রচনা	সাজাদপুর
এপ্রিল-মে	১৮৯১	হিতবাদীতে সাতটি ছোটগল্প প্রকাশ	
সেপ্টেম্বর		'চিত্রাঙ্গদা' রচনা	পাণ্ডুয়া (উড়িষ্যা)
নভেম্বর		'সাধনা' প্রকাশ	
৭ই পৌষ		শান্তিনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠা	বোলপুর
	১৮৯২-৯৩	'সোনার-তরী' রচনা	শিলাইদহ (কুঠী ও বোট), কলিকাতা, শান্তিনিকেতন, সাজাদ-পুর, যমুনা নদী (বোট), রামপুর বোয়ালিয়া, তালদণ্ডা খাল (উড়িষ্যা), "উড়িয়া" ষ্টীমার (কটক হইতে কলিকাতা), "মিলো" ষ্টীমার (পদ্মা), সিমলা

১৭ ডিসেম্বর	১৮৯২	এমারেল্ড্ থিয়েটারে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়	
		সঙ্গীতসমাজে 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়	
	১৮৯৩	'পঞ্চভূত' রচনা আরম্ভ	
		জেনেরল এসেম্ব্লিজ্ ইনস্টিটিউশন্ হলে চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পাঠ (সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র)	
আগষ্ট	১৮৯৪	'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ রচনা	সাজাদপুর
নভেম্বর		সাধনার সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ	
৭-৮ ডিসেম্বর		'উর্বশী' কবিতা রচনা	নাগর-পদ্মা (পতিসর হইতে শিলাইদহ পথে)
	১৮৯৩-৯৫	'চিত্রা' রচনা	রামপুর বোয়ালিয়া, কলিকাতা, পতিসর, ইত্যাদি
এপ্রিল	১৮৯৫	সাহিত্য পরিষদে 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধ পাঠ	
		পাটের ব্যবসা আরম্ভ	কুষ্টিয়া
এপ্রিল-জুলাই	১৮৯৬	'চৈতালি' রচনা	পতিসর, সাজাদপুর
মে-জুন		'মালিনী' রচনা	উড়িষ্যা (পাণ্ডুয়ায় ?)
সেপ্‌টেম্বর		সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলি কর্তৃক 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ (কবির ছবি সমেত)	
	১৮৯৭-১৯০০	'কল্পনা' রচনা	শিলাইদহ ইত্যাদি
	১৮৯৭	'গান্ধারীর আবেদন' কবিতা রচনা	
অগ্রহায়ণ	১৩০৪	ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠ (সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)	
	১৮৯৮-৯৯	'ভারতী' সম্পাদন	
		শিলাইদহে সপরিবারে স্থিতি	
	১৯০০	ব্যবসায়-সংকট ও ঋণভার	
শ্রাবণ		'ক্ষণিকা' প্রকাশ	
? ডিসেম্বর		'বিসর্জন' অভিনয়	
বৈশাখ	১৯০১	নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ	
আষাঢ়		জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ	
১ শ্রাবণ		মানপত্র লাভ	মজঃফরপুর
২৪ শ্রাবণ		মধ্যম কন্যার বিবাহ	
আশ্বিন		শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বাস	

অগ্রহায়ণ		"ব্রহ্মচর্যাশ্রম" বিদ্যালয় স্থাপন	শান্তিনিকেতন
৭ অগ্রহায়ণ	১৯০২	পত্নীর মৃত্যু	
	১৯০২-০৩	'উৎসর্গ' রচনা	হাজারিবাগ, গিরিডি, আলমোড়া
মার্চ	১৯০৩	'শিশু' রচনা	আলমোড়া ইত্যাদি
১৮ মাঘ		সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু	শান্তিনিকেতন
	১৯০৩-০৪	দ্বিতীয় 'কাব্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশ (মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)	
৭ শ্রাবণ	১৯০৪	চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে মিনার্ভা থিয়েটারে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ (সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত)	
		হিতবাদী কার্যালয় কর্তৃক গদ্য 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ	
৬ মাঘ	১৯০৫	পিতার মৃত্যু	
	১৯০৫-০৬	'ভাণ্ডার' সম্পাদন	
		'খেয়া' রচনা	কলিকাতা, গিরিডি, শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ
জ্যৈষ্ঠ	১৯০৫	ভাণ্ডারে জাপানী কবিতার অনুবাদ প্রকাশ	
১৭ আষাঢ়		সাহিত্য সম্মিলন	ত্রিপুরা
৯ ভাদ্র		টাউন হলে 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ পাঠ	
৩০ আশ্বিন		রাখীবন্ধন শোভাযাত্রা	কলিকাতা
আষাঢ়	১৯০৬	'খেয়া' প্রকাশ	
১৫ আগষ্ট	১৯০৬	টাউন হলে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের উদ্বোধনে অভিভাষণ (সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ)	
১৭-১৮ কার্তিক	১৯০৭	সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব	বহরমপুর
২৬ জ্যৈষ্ঠ		কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ]	
৭ অগ্রহায়ণ		কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু	মুঙ্গের
		প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব	পাবনা
বৈশাখ		'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা	
সেপ্‌টেম্বর	১৯০৮	'শারদোৎসব' রচনা ও অভিনীত	শান্তিনিকেতন
১৫ অগ্রহায়ণ	১৯০৯	ওভারটুন হলে 'তপোবন' প্রবন্ধ পাঠ	
১৪ মাঘ	১৯১০	জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ	
ফাল্গুন		সাহিত্য সম্মিলন	ভাগলপুর
সেপ্‌টেম্বর		'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ	
অক্টোবর		'রাজা' রচনা	শিলাইদহ

৫ চৈত্র	১৯১১	'রাজা' অভিনয়ে অংশগ্রহণ	শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ		তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ	
শ্রাবণ-ভাদ্র		'অচলায়তন' রচনা	শিলাইদহ
ভাদ্র		প্রবাসীতে 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশ আরম্ভ	
অগ্রহায়ণ		'ডাকঘর' রচনা	শান্তিনিকেতন
১৪ মাঘ	১৯১২	পঞ্চাশত্তম বয়ঃপূর্তি উপলক্ষ্যে টাউন হলে সংবর্ধনা	
৩ চৈত্র		ওভারটুন হলে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ পাঠ	
১৫ মে		তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা	
	১৯১২-১৪	'গীতিমাল্য' রচনা	শান্তিনিকেতন, শিলাইদহ, লোহিত সমুদ্র, লণ্ডন, ফার ওক্‌রিজ, ভূমধ্যসাগর, কুষ্টিয়ার পথে (পাল্‌কিতে), কলিকাতা, রামগড়
৩০ জুন		চার্লস এনড্রুজের সহিত পরিচয়	লণ্ডন
১৭ জুলাই		ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রোকাডোরা হোটেলে সংবর্ধনা (সভাপতি ইয়েট্‌স্)	লণ্ডন
১২ নভেম্বর		ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশ	
		য়ুনিটেরিয়ান ক্লাবে বক্তৃতা	আর্বানা (ইউনাইটেড ষ্টেটস্)
জানুয়ারি	১৯১৩	ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা	শিকাগো
		অয়কেনের সহিত সাক্ষাৎ	
১৪ ফেব্রুয়ারি		হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	রচেষ্টার
মে-জুন		ক্যাক্‌সটন হলে ছয়টি বক্তৃতা	লণ্ডন
৪ সেপ্‌টেম্বর		স্বদেশ যাত্রা	
১৩ নভেম্বর		নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিসংবাদ	কলিকাতা
২৩ নভেম্বর		স্পেশাল ট্রেন যাত্রায় কবি-সংবর্ধনা	শান্তিনিকেতন
২৬ নভেম্বর		বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট্ উপাধি দান	কলিকাতা
২৫ বৈশাখ	১৯১৪	'অচলায়তন' অভিনয়	শান্তিনিকেতন
		'সবুজপত্র' প্রকাশ	

শ্রাবণ-কার্তিক		'গীতালি' রচনা	কলিকাতা, শান্তিনিকেতন, সুরুল, বুদ্ধগয়া, বেলা ষ্টেশন, পালকি-পথে (বরাবর হইতে বেলা ষ্টেশন), রেলপথে (বেলা হইতে বুদ্ধগয়া), এলাহাবাদ
চৈত্র		সবুজপত্রে 'ফাল্গুনী' প্রকাশ	
		বিচিত্রা সভা প্রতিষ্ঠা	
অক্টোবর	১৯১৫	কাশ্মীর ভ্রমণ	
	১৯১৪-১৬	'বলাকা' রচনা	শান্তিনিকেতন, রামগড়, কলিকাতা, এলাহাবাদ, সুরুল, রেলগাড়ি, শিলাইদহ, পদ্মা (বোট), শ্রীনগর, বঙ্গোপসাগর
১৬ মাঘ	১৯১৬	'ফাল্গুনী' অভিনয়	কলিকাতা
৩ মে		জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রা	
১২ জুন		রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় বক্তৃতা	টোকিয়ো
১৪ সেপ্টেম্বর		আমেরিকায় পৌঁছানো	
জানুয়ারি	১৯১৭	জাপানে প্রত্যাবর্তন	
মার্চ		কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন	
সেপ্টেম্বর	১৯১৮	'ডাকঘর' অভিনয়	
২৩ ডিসেম্বর	১৯১৮	বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপন	শান্তিনিকেতন
জানুয়ারি-মার্চ	১৯১৯	দক্ষিণ ভারতে পর্যটন ও বক্তৃতা	মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূর, ইত্যাদি
৩ জুলাই		বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভ	শান্তিনিকেতন
মার্চ-মে	১৯২০	পশ্চিম ভারতে পর্যটন ও বক্তৃতা	বোম্বাই, আমেদাবাদ, বড়োদা ইত্যাদি
১৪ মে		চতুর্থবার বিলাতযাত্রা	
১৯ জুন		বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	অক্সফোর্ড
আগষ্ট-অক্টোবর		ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম হইয়া আমেরিকা (ইউনাইটেড ষ্টেট্স্) ভ্রমণ	
১৪ এপ্রিল	১৯২১	প্লেনে ব্রিটেন হইতে প্যারিসে গমন	
এপ্রিল-জুন		মধ্য-ইউরোপ ভ্রমণ	
২০ মে		বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	হামবুর্গ

২৩ মে	বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	কোপেনহেগেন
	আরাত্রিক শোভাযাত্রা	
২, ৩ জুন	বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	বার্লিন
৭ জুন	বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	মিউনিক
১৫ জুন	বক্তৃতা	ভিয়েনা
১৬ জুলাই	দেশে প্রত্যাগমন	
১৫ আগষ্ট	ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ পাঠ	
১৮ আগষ্ট	আলফ্রেড থিয়েটারে ঐ দ্বিতীয়বার পাঠ	
১৭, ১৮ ভাদ্র	'বর্ষামঙ্গল' অভিনয়	
১৩ জানুয়ারি ১৯২২	'মুক্তধারা' রচনা শেষ	শান্তিনিকেতন
মার্চ	গানরচনা	শিলাইদহ
৩১ ভাদ্র	আলফ্রেড থিয়েটরে 'শারদোৎসব' অভিনয়	
সেপ্‌টেম্বর-অক্‌টোবর	দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত ও সিংহল ভ্রমণ	
১০ ফাল্গুন ১৯২৩	ম্যাডান থিয়েটারে 'বসন্তোৎসব' অভিনয়	
২৬-২৮ আগষ্ট	এম্‌পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনয়	
২৩ অক্‌টোবর	'রক্তকরবী' খসড়া পাঠ	শান্তিনিকেতন
১৮-২০ ফাল্গুন ১৯২৪	বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডারশিপ্‌ বক্তৃতা	কলিকাতা
২১ মার্চ	চীনযাত্রা	হংকং, সাংহাই, পিকিন ইত্যাদি
২৯ মে	জাপানে পৌছানো	
২১ জুলাই	দেশে প্রত্যাবর্তন	
২৪ সেপ্‌টেম্বর	পঞ্চমবার ইউরোপ যাত্রা	
১৯২৩-২৫	'পূরবী'-রচনা	শিলং, ভারত সাগর, আরব সাগর, ভূমধ্য সাগর, লিসবন বন্দর, আটলান্টিক সাগর, আর্জেন্টিনা, ইটালি
২৬ সেপ্‌টেম্বর ১৯২৪	'সাবিত্রী' কবিতা রচনা	হারুনামারু জাহাজ (ভারত সাগর)
১৮ অক্‌টোবর	'অপরিচিতা' ও 'আনমনা' কবিতা রচনা	আণ্ডেস জাহাজ (আটলান্টিক সাগর)
৭ নভেম্বর	বুয়েনোস এয়ারিসে পৌছানো	
৫ জানুয়ারি ১৯২৫	দক্ষিণ আমেরিকা পরিত্যাগ	
২২ জানুয়ারি	বক্তৃতা	মিলান

১৭ ফেব্রুয়ারি		দেশে প্রত্যাবর্তন	
ভাদ্র		'শেষবর্ষণ' অভিনয়	
১০ ফেব্রুয়ারি	১৯২৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	
২৫ বৈশাখ	১৯২৭	'নটীর পূজা'র অভিনয়	শান্তিনিকেতন
১২ মে		ষষ্ঠবার ইউরোপ-যাত্রা	
জুন-ডিসেম্বর		ইউরোপ ভ্রমণ	ইটালি, সুইট্‌স্‌জারল্যাণ্ড, জার্মানি, নরোয়ে, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস
১২ জুন		ইটালির রাজার সহিত সাক্ষাৎ	
		ক্রোচের সহিত সাক্ষাৎ	
২১ সেপ্‌টেম্বর		"মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গান রচনা	ষ্টুটগার্ট
		"চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে" গান রচনা	কোলোন্
৩০ অক্‌টোবর		"দিনের বেলায় বাঁশি তোমার" গান রচনা	বুকারেষ্ট (রুমানিয়া)
২৬ কার্তিক		'লিখন' ছাপা	বুডাপেস্ট (হাঙ্গেরি)
১৮ ডিসেম্বর		ইজিপ্‌ট হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন	
১৭ চৈত্র	১৯২৭	হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব	ভরতপুর
মে-জুন		'যোগাযোগ' রচনা আরম্ভ	শিলং
জুলাই-অক্‌টোবর		দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ	
	১৯২৭-২৮	'মহুয়া' রচনা	শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, সিঙ্গাপুর, ভারত সাগর, বাঙ্গালোর
৪, ৭ চৈত্র	১৯৮২	সাহিত্যধর্ম-আলোচনা সভা	কলিকাতা
জুন		'সংস্কার' গল্প রচনা	মাদ্রাজ
২৮ জুন		'শেষের কবিতা' রচনা শেষ	বাঙ্গালোর
ফেব্রুয়ারি-জুলাই	১৯২৯	জাপান-কানাডা ভ্রমণ	
৬ এপ্রিল		বক্তৃতা	ভিক্‌টোরিয়া (কানাডা)
৮ এপ্রিল		বক্তৃতা	ভ্যাঙ্কুবার (কানাডা)
১২-২২ শ্রাবণ		'তপতী' রচনা	শান্তিনিকেতন
জানুয়ারি	১৯৩০	বক্তৃতা	বরোদা
মার্চ-ডিসেম্বর		সপ্তমবার বিলাতযাত্রা	
২ মে		প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী	প্যারিস
১৯, ২১, ২৬ মে		হিবার্ট বক্তৃতামালা	অকস্‌ফোর্ড
২ জুন		চিত্রপ্রদর্শনী	বার্মিংহাম

১১ জুলাই		বেতারে বক্তৃতা	বার্লিন
১৪ জুলাই		আইনষ্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ	বার্লিন
১৬ জুলাই		চিত্রপ্রদর্শনী	বার্লিন
		'The Child' কবিতা রচনা	বার্লিন, মিউনিক
১৭-১৯ জুলাই		বক্তৃতা	ড্রেসডেন
১৯-১৪ জুলাই		চিত্রপ্রদর্শনী	মিউনিক
১ আগষ্ট		চিত্রপ্রদর্শনী	কোপেনহেগেন
১৭ সেপ্টেম্বর		চিত্রপ্রদর্শনী	মস্কো
অক্টোবর-ডিসেম্বর		চিত্রপ্রদর্শনী	নিউইয়র্ক, বোষ্টন
১৭ মাঘ	১৯৩১	দেশে প্রত্যাগমন	
জানুয়ারি	১৯৩২	টাউন হলে ও আর্ট স্কুলে চিত্রপ্রদর্শনী	
	১৯৩২	'বিচিত্রিতা' রচনা	খড়দহ, শান্তিনিকেতন
	১৯৩২-৩৫	'বীথিকা' রচনা	শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, চন্দননগর, কলিকাতা, বরানগর
১২ এপ্রিল	১৯৩২	প্লেনে ইরান-যাত্রা	
এপ্রিল-মে		ইরানে ও ইরাকে ভ্রমণ	
৩ জুন		দেশে প্রত্যাগমন	
আগষ্ট		বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপক	কলিকাতা
ডিসেম্বর		অধ্যাপক রূপে প্রথম বক্তৃতা	
১৫, ১৮, ২০ জানুয়ারি	১৯৩৩	বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা বক্তৃতামালা	
ফেব্রুয়ারি		অধ্যাপক রূপে দ্বিতীয় বক্তৃতা	
ভাদ্র-আশ্বিন		'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' অভিনয়	
সেপ্টেম্বর		অধ্যাপক রূপে তৃতীয় বক্তৃতা	
নভেম্বর-ডিসেম্বর		চিত্রপ্রদর্শনী, বক্তৃতা ইত্যাদি	বোম্বাই, ইত্যাদি
৮ ডিসেম্বর		অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা	ওয়ালটেয়ার
৩ ফেব্রুয়ারি	১৯৩৪	অধ্যাপক রূপে চতুর্থ বক্তৃতা	
বৈশাখ-আষাঢ়		সিংহল-ভ্রমণ	
৫ জুন		'চার অধ্যায়' রচনা শেষ	ক্যাণ্ডি
১৬ জুলাই		অধ্যাপক রূপে পঞ্চম বক্তৃতা	কলিকাতা
৮ ফেব্রুয়ারি	১৯৩৫	কনভোকেশন বক্তৃতা	বারাণসী
১২ ফেব্রুয়ারি		ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নে বক্তৃতা	এলাহাবাদ
১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি		ছাত্র সম্মিলনে সভাপতিত্ব	লাহোর
২৫ বৈশাখ		"শ্যামলী" গৃহ-প্রবেশ	শান্তিনিকেতন

৪ জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৫-৩৮	বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব	
	১৯৩৬	'পত্রপুট' রচনা	শান্তিনিকেতন
১১ মার্চ		এম্পায়ার থিয়েটারে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'	
	১৯৩৭	'শ্যামলী' রচনা	
১৭ ফেব্রুয়ারি		বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন ভাষণ	কলিকাতা
১০-১১ ফেব্রুয়ারি		প্রাণসংশয় পীড়া	শান্তিনিকেতন
২৫ সেপ্টেম্বর		'প্রান্তিক' রচনা	শান্তিনিকেতন
৯ অক্টোবর	১৯৩৮	ছায়া-সিনেমায় নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'	কলিকাতা
৮ ফেব্রুয়ারি	১৯৩৯	শ্রী-সিনেমায় 'তাসের দেশ'	কলিকাতা
১৮ আগষ্ট		মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপন	কলিকাতা
ডিসেম্বর		'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ	
১৬ ডিসেম্বর		বিদ্যাসাগর-ভবন উদ্বোধন	মেদিনীপুর
৭ আগষ্ট	১৯৪০	অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী বিতরণ অনুষ্ঠান	শান্তিনিকেতন
সেপ্টেম্বর		'চিত্রলিপি' প্রকাশ	
১ বৈশাখ	১৩৪৮	জন্মদিনের বাণী 'সভ্যতার সংকট' প্রকাশ	শান্তিনিকেতন
১৩ মে		ত্রিপুরা-রাজ কর্তৃক "ভারতভাস্কর" উপাধি দান	শান্তিনিকেতন
২৫ জুলাই		অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতা আগমন	
৭ আগষ্ট	১৯৪১		
২২ শ্রাবণ	১৩৪৮	তিরোভাব	কলিকাতা (জোড়াসাঁকো)

নির্ঘণ্ট

[অগ্রে তারকা-চিহ্ন গ্রন্থ-নামের নির্দেশক, সংখ্যার পরে তারকা-চিহ্ন ফুটনোটের নির্দেশক, উদ্ধৃতি-চিহ্ন রচনার নাম নির্দেশক।]

চিত্রাবলী
ও
মানচিত্রাবলী

হউক এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তকের দোষানুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উক্তবিধ দোষ সমস্ত স্বত্ত্বেও ইহা যে এক খানি বঙ্গভাষায় আদর যোগ্য পুস্তক হইয়াছে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্রূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক সংকলন জন্য কার্ত্তিকেয় বাবু অবশ্যই কৃতজ্ঞতা ভাজন ইহা বলা বাহুল্য।

বন ফুল।

কাব্য।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

১ম সর্গ।

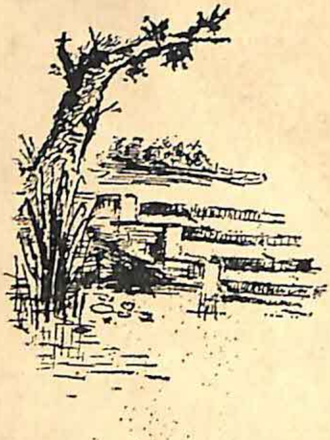
চাইনা জ্ঞেয়ান, চাইনা জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে!

"দীপ নির্ব্বাণ"

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজত সুষমাময়, প্রদীপ্ত তুষার চয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখর মালা বিশাল মহান্;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায়, গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি শির, ছেলে খেলা পৃথিবীর
ভুরুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন
কত নদী কত নদ, কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন!
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীত সমীরণে, দুলায়ে পাদপগণে
বহিছে নির্ঝর-বারি করিয়া চুম্বন,
হিমাদ্রি শিখর শৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি, তুষার বিভায় নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা রহেছে নিদ্রিত।
পর্ব্বতের পদতলে, ধীরে ধীরে নদী চলে
উপল রাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গ কূল, সিক্ত করি বৃক্ষ মূল
নাচিছে পাষাণ-তট করিয়া প্রহত!
চারি দিকে কতশত, কল কলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে, আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

কল্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র ছায়ে ছায়ে, পাদপের গায়ে গায়ে
ডুবায়ে চরণ-দেশ স্রোতস্বিনী নীরে?
চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর!



বধূ।

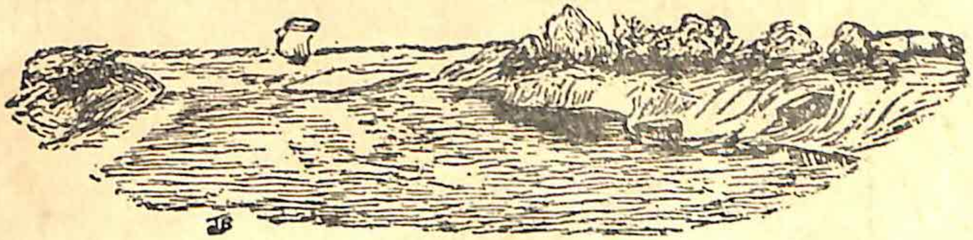
"বেলা যে প'ড়ে এল, জল্‌কে চল্‌!"
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌!" ১

২

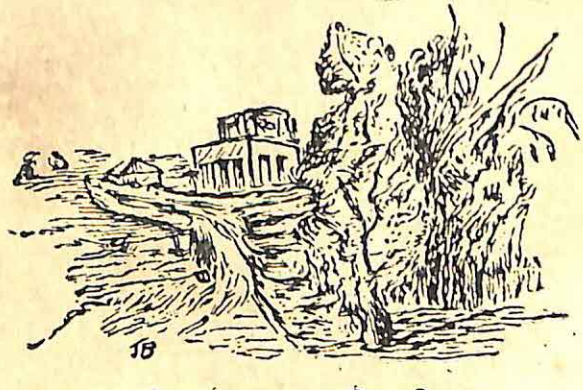
কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ, শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা!



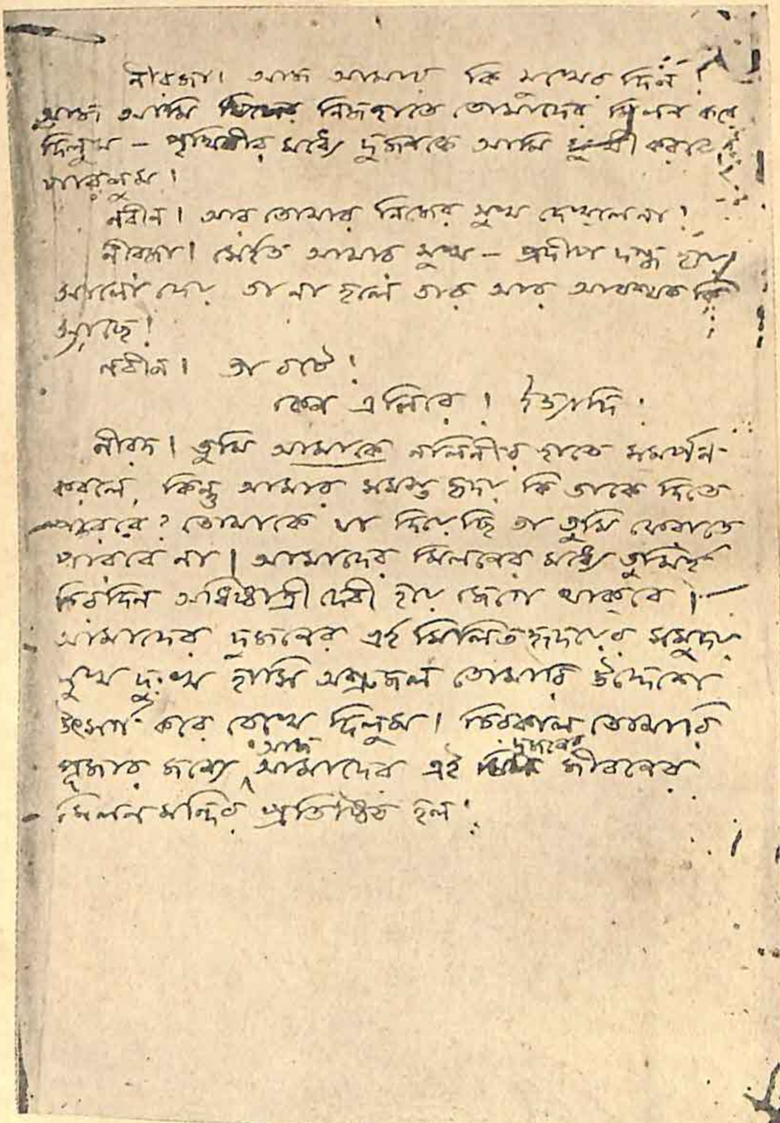
'বধূ' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত
(সাধনা ১২৯৮)



গোরাই ও পদ্মার সঙ্গমে।



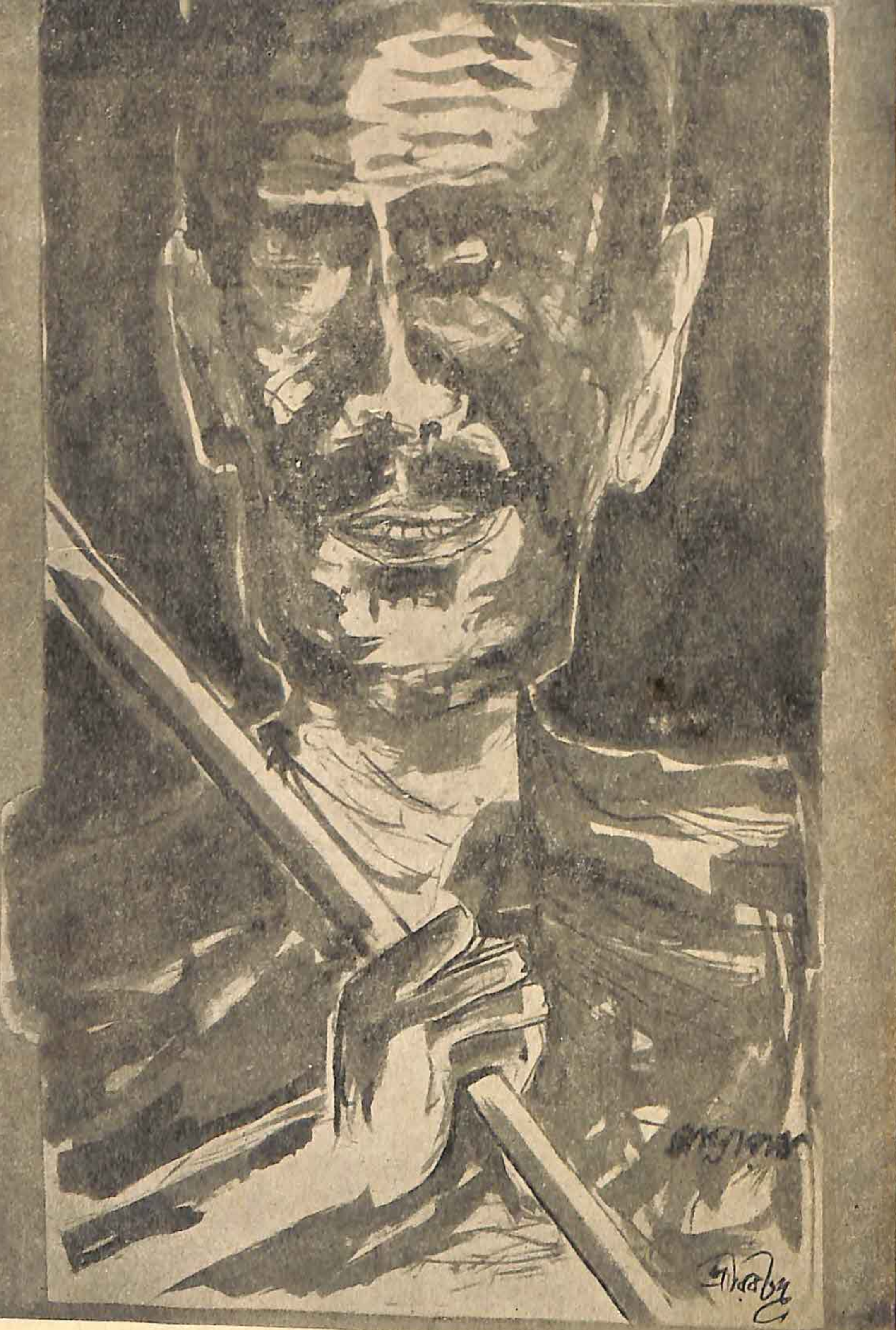
শিলাইদহের কুঠিবাড়ী
যতীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত
(সাহিত্য ১৩০৭)


নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন!
আজ আমি নিজের হাতে তোমাদের মিলন করে
দিলুম — পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে
পারলুম।
নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখলে না!
নীরজা। সেইত আমার সুখ — প্রদীপ দগ্ধ হয়ে
আলো দেয়, তা না হলে তার আর আবশ্যক কি
আছে!
নবীন। তা বটে!
[illegible] এলিয়ে! ইত্যাদি
নীরজ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ
করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে
পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে
পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই
চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে।—
আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয়
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে
উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি
পূজার জন্যে আজ আমাদের এই দুজনের জীবনের
মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল।

অভিনয়ের উদ্দেশ্যে (?) সংযোজন
('নলিনী'র উপসংহার)



“ভূত হয়ে দেখা দিল বড়ো কোলা ব্যাঙ”
(‘খাপছাড়া’)

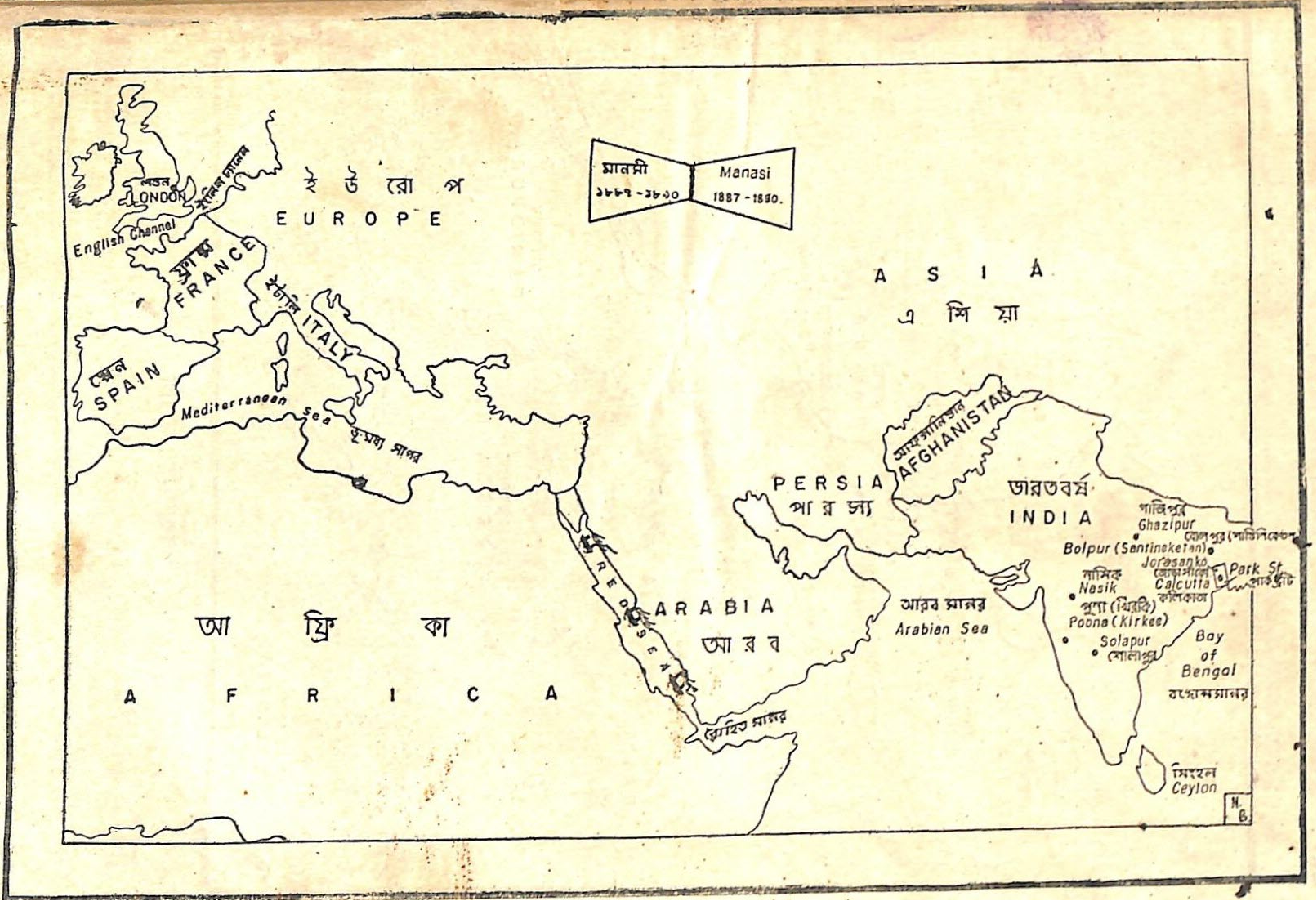


পাল্লারাম
('সে')

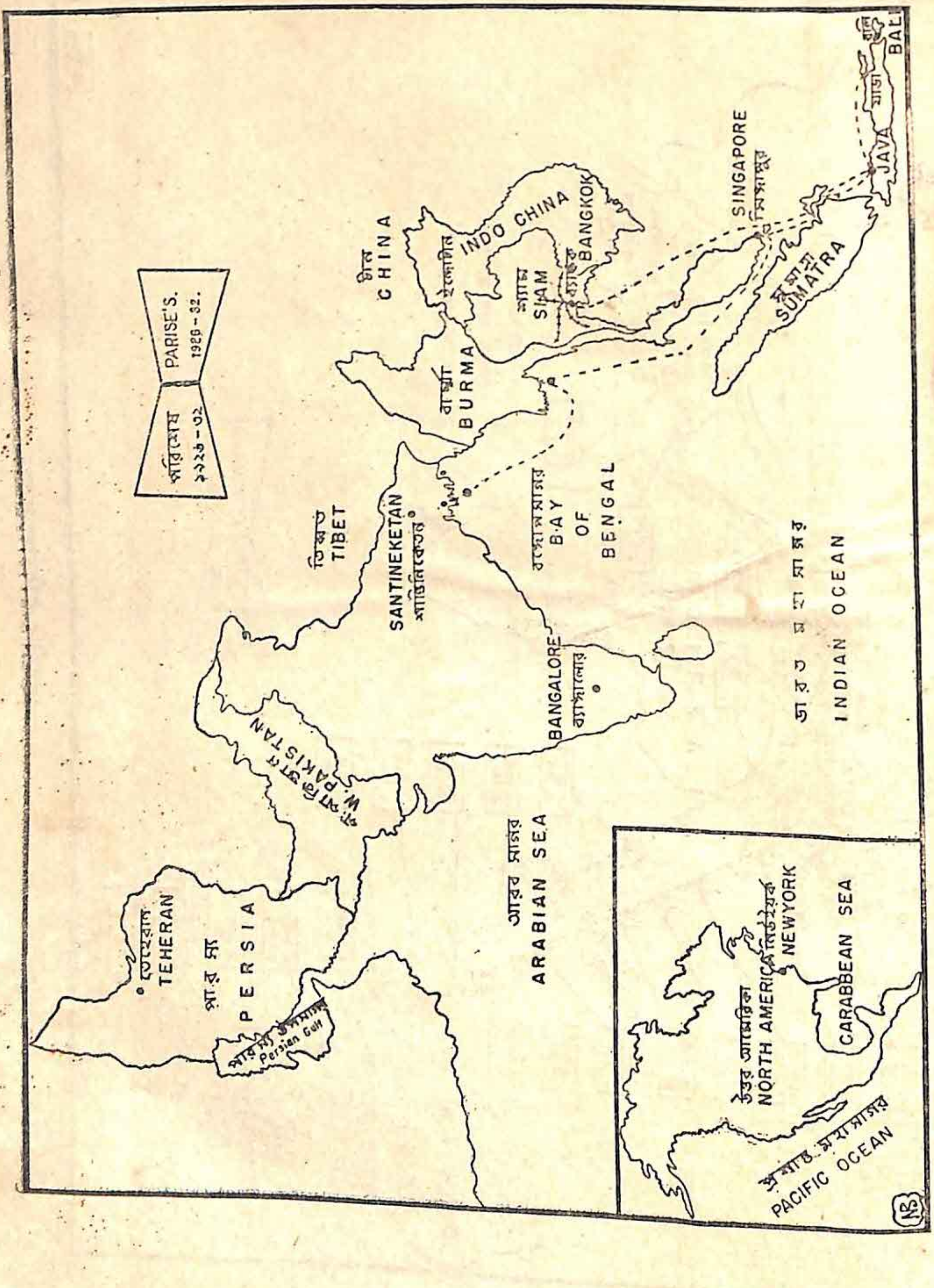


আত্ম-প্রতিকৃতি

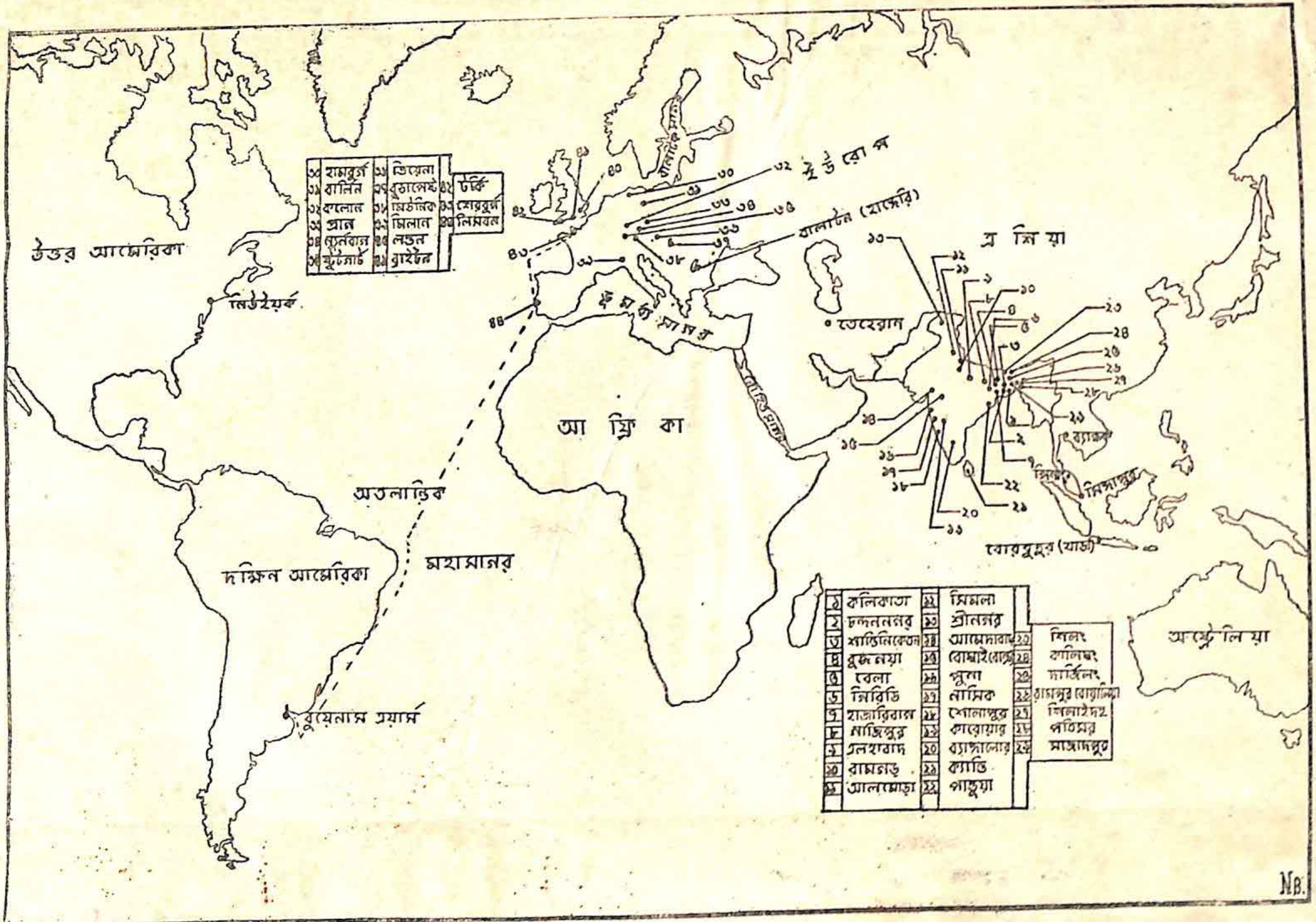
(বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯)



'মানসী'র কবিতারচনা-স্থান



'পরিশেষ'এর কবিতারচনা-স্থান



রবীন্দ্ররচনার ভূমণ্ডলচিত্র